নীল শৈল

সুরেন্দ্র মহান্তি

অনুবাদক

জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ার্দ্দার

বামাচরণ মিত্র
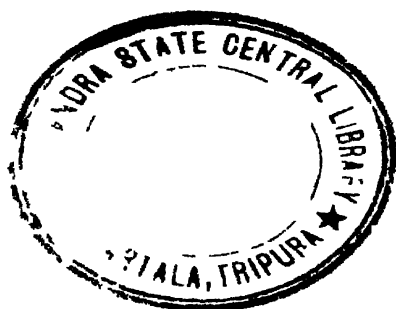
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নিউ দিল্লী

সুরেন্দ্র মহান্তি,

বাংলা অনুবাদ : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া,

Rs. 18.00

Original Title NILA SAILA (Oriya)
Bengali Translation NIL SAILA

ডিসট্রিবিউটর্স
সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সিস
22, রাজা উডমণ্ড স্ট্রীট,
কলিকাতা 700 001

ডাইরেক্টর, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীণ পার্ক
নিউ দিল্লী-110016 কর্তৃক প্রকাশিত এবং পুরাণ প্রেস
21, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা 700 004 থেকে মুদ্রিত।

অবতরণিকা

ওডিষা উপন্যাসেব ক্রমবিকাশেব পথে প্রথম উপন্যাস 'পদ্মমালী'[1], তৎপববর্ত্তী 'বিবাসিনী' ও 'লছমা' প্রভৃতিতে আংশিক ঐতিহাসিকতা ও অর্ধ-ঐতিহাসিকতাব যে সুব শুনা গিয়াছিল তাহা যে তৎকালীন ভাবতীয় বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটপবিবর্তনেব দ্বাবা প্রভাবিত ইহাতে সন্দেহ নাই। সর্বভাবতীয স্তরে ইহাই অনেকাংশে ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদ্ভব কালও বটে। তখন হইতে আজ পর্যন্ত ওডিয়া ভাষায় উপবি-উক্ত উপন্যাসগুলি ভিন্ন 'কমলকুমাবী', 'বীর ওড়িয়া', 'পদ্মিনী', 'বলাংগী', 'প্রতিভা' ও 'সীমান্ত আহ্বান' প্রভৃতি প্রায় অর্ধশত ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিত ও প্রকাশিত হইযাছে।

স্বাধীনতাব পববর্তী যুগে নূতন অন্বেষণ, নূতন জিজ্ঞাসা ও নবীন আশা আকাঙ্ক্ষা এবং তজ্জনিত হর্ষবিষাদেব ফলে ভারতীয় উপন্যাস সমস্যামূলক, সমাজধর্মী, বাস্তববাদী ও মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়া জটিল হইয়া উঠিযাছে। আন্তর্জাতিক উপন্যাসের বেদনাবিধুর নিঃসঙ্গ মানুষের কঠোর জীবনসংগ্রাম ক্রমে ক্রমে ইহাতে অধিক হইতে অধিকতর প্রতিফলিত হইতেছে। সুতরাং এ যুগের বহু বাদ-বিসংবাদ ও পুবাতন মূল্যবোধেব বিস্ময়কব পরিবর্তনেব মধ্যে অতীতেব প্রেরণা বা ইতিহাসেব উদবোধন ও ঈশ্বর নীতি যখন তরুণ মনে আশা আশ্বাসনা সঞ্চার কবিতে না পারিয়া 'হিপি-ইজম্' তথা নাস্তিকতায় পর্যবসিত-প্রায, এমনি সময়ে 'নীল শৈল'ব মত এক ভক্তিরসাশ্রিত ঐতিহাসিক

1. প্রকাশকাল 1888

উপন্যাসের পরিকল্পনা গ্রন্থকার শ্রীসুরেন্দ্র মহান্তির নির্ভীক ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়। সম্ভবতঃ এই নির্ভীকতা ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 'নীল শৈল'র সম্মান ও লোকপ্রিয়তার জন্য বিশেষভাবে দায়ী।

'নীল শৈল' এবং লেখকের অন্যতম উপন্যাস 'অন্ধ দিগন্ত' যে আত্মপ্রত্যয়-সঞ্জাত, তাহার প্রথম উন্মেষ তাঁহার প্রথম গল্প 'বন্দী'র[1] মধ্যেই সূচিত হইয়াছিল। তাঁহার সৃষ্টিপ্রতিভা মুখ্যতঃ গল্পাশ্রয়ী হইয়া থাকিলেও কেবল ছোট গল্পে তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বৈচিত্র্য-বোধের ভিতর দিয়া তাঁহার সৃষ্টিশক্তি এক ক্রমবিবর্তিত পথে ওড়িয়া ছোট গল্পের শ্রীবৃদ্ধি করিযাছে। ক্রমে তাহা উপন্যাস ও জীবনীকে আশ্রয় করিয়া বিপুল আত্মশক্তির উৎস হইয়া উঠিয়াছে। চিরন্তন সাহিত্যের যে উদবোধনী শক্তি (evocative aspect) তাহা তাঁহার অধিকাংশ গল্প ও উপন্যাসে বিদ্যমান। মানবপ্রাণের চিরন্তন সংগ্রামের এক নিঃসঙ্গ করুণ ও বেদনাব্যথিত আলেখ্যই প্রকৃতপক্ষে 'অন্ধ দিগন্ত' ও 'নীল শৈল'র মর্মস্থল। এই আলেখ্য পাঠকের হৃদযে যে ভাববৈচিত্র্য বা ভাবরূপ সৃষ্টি করে তাহাই এই দুইটি উপন্যাসের চিরন্তনতার মানদণ্ড।

'নীল শৈল' সাধারণ্যে এক ভক্তিরসাত্মক ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া গৃহীত। কিন্তু গুণাত্মক দিক হইতে বিবেচনা করিলে সংঘর্ম-ধর্মী মানুষের কালজয়ী সংগ্রামের ইহা এক অবিনাশী লিপি। সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধাই এখানে ভক্তিরূপে পরিচিত, অপরাজেয়

1. 'উৎকল সাহিত্য' মাসিক পত্রিকায 1938-39 মধ্যে প্রকাশিত।

আত্মার পদধ্বনিই এখানে মহাসংগীতে রূপান্তরিত। সুতরাং ইতিহাস এখানে গৌণ।

ঐতিহাসিক বিচারে 'নীল শৈল'র আখ্যানভাগ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটনা। খোর্ধার ভোই বংশের রামচন্দ্রদেব (ইতিহাসে যিনি দ্বিতীয় রামচন্দ্রদেব) এই সময়ে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া হাফিজ্ কাদর্ বেগ্ রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। মুসলমান হইয়াও কটকের নায়েব নাজিম হিন্দুবিদ্বেষী তকী খাঁর আক্রমণ হইতে ওড়িশা ও ওড়িয়ার অন্তরঙ্গ প্রাণশক্তি জগন্নাথকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছিলেন তাহার রোমাঞ্চকর ইতিহাস 'নীল শৈল'র ঘটনাপ্রবাহে পরিস্ফুট। উপন্যাসবর্ণিত তকী খাঁ, রামচন্দ্রদেব, বেণু ভ্রমরবর, দেওয়ান কৃষ্ণ নরীন্দ্র, রিজিয়া বিবি ও ললিতা মহাদেঈ প্রভৃতি ওড়িশার ঐতিহাসিক চরিত্র এবং জগুনি, সর(-অ) ও 'সান-(অ) পরিছা' বিষ্ণু পশ্চিমকবাট মহাপাত্র প্রমুখ কাল্পনিক চরিত্রসমাবেশে লেখক উৎকলের সেই দুর্দিনের নিখুঁত চিত্র পরিবেষণ করিয়াছেন। স্থূলতঃ, ইতিহাসের অমোঘ গতির মধ্যে ক্ষতবিক্ষত ওড়িয়া জাতির অপরাজেয় আত্মার অভ্যুদয়ই 'নীল শৈল'র প্রাণবস্তু।

ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাস নহে। তাই লেখক যেখানে ইতিহাস ছাড়িয়া 'মাদলা পাঞ্জি'[1] জনশ্রুতি ও কল্পনার আশ্রয় নিয়া চিলিকা-তীরের পরিত্যক্ত পাইক বসতি বা সরদেঈ চটি অথবা 'শৃঙ্গগিরি'-কন্দর ও গুরুবাঈ দ্বীপের ন্যায় স্থানের বিচিত্র বর্ণনার মধ্যে

1. মাদলা পাঞ্জি—পুরী জগন্নাথ মন্দিরের তালপাতার পঞ্জী বা রোজনামচা ; ইহাতে শ্রীক্ষেত্র তথা উৎকলের সহিত নানা জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীও লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

মৌলিক কল্পনাপ্রসূত বহু ঘটনা ও চিত্তাকর্ষক চরিত্রের সংযোজন ঘটাইয়াছেন, সেই সকল ক্ষেত্রে তাঁহার অদ্ভুত সৃজনীশক্তি, কল্পনা ও কিংবদন্তীর ঊর্ধ্বে অপূর্ব ঐতিহাসিক গৌরবে বিরাজমান। সে সকলের বিস্তৃত আলোচনা এ স্থলে সম্ভব নহে। সুতরাং এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সমগ্র উপন্যাসটিতে আখ্যানবিন্যাস ও ঘটনা-প্রবাহের যে স্বাভাবিকতা রক্ষিত হইয়াছে তাহা ইহার চরিত্রগুলির বিকাশ ও গতিশীলতার পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। ঘটনাপ্রবাহের স্বচ্ছন্দতায় কি মুখ্য কি গৌণ সমস্ত চরিত্রের মানসিক আবেগ ও সংঘাতসংকুল ক্রমবিকাশ কিরূপ প্রাণবন্ত তাহা রামচন্দ্রদেব, জগুনি, সর(-অ) ও মালকুদা গ্রামের বৃদ্ধা পাইক রমণীর মত কয়েকটি চরিত্রের সাহায্যে প্রমাণ করা যাইতে পারে।

উপন্যাসের নায়ক রামচন্দ্রদেবের চরিত্র প্রথম হইতেই সংঘর্ষময়। পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরের প্রাচীরের পাশে 'গুহারিআ'[1] রূপে ও স্বর্গদ্বারে রাত্রি নিশীথে আগন্তুকরূপে তাঁহার ধৈর্য, অটলতা, ও ভক্ত-সুলভ অভিমান অতি তাৎপর্যপূর্ণ। পরবর্তী কোনো পরিচ্ছেদে শতরঞ্চের ছকের মাধ্যমে ইহা আরও জটিল ও বেদনাবিধৌত হইয়াছে। দেশ ও দেবতার সুরক্ষার জন্য বহিঃশত্রু ও গৃহশত্রু উভয়ের বিরুদ্ধে, বিশ্বাসঘাতকতা, হীন স্বার্থ ও নীচ ষড়যন্ত্রের চক্রব্যূহের মধ্যে তিনি যে সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন তাহা আধুনিক যুগের যন্ত্রণাজর্জরিত মৌন একক সংগ্রামেরই দ্যোতক। তাই এই উপন্যাসের অতীতায়ন অতীতের রোমন্থন মাত্র নহে, বর্তমানের উপভোগ্য প্রতিফলন। হেমিংওয়ে তাঁহার *The Old Man and the Sea* উপন্যাসে

1. গুহারিআ— যে দেবদর্শনার্থী দেবতার কাছে 'গুহারি' অর্থাৎ অনুযোগ ও নালিশ জানাইতে আসে।

দুরন্ত জীবন-যুদ্ধের রূপায়নের জন্য উপন্যাসের নায়ককে অন্তহীন সমুদ্রের পটভূমিকায় উপস্থাপিত করিয়া যে উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন, সুরেন্দ্র মহান্তির রামচন্দ্রদেব সেই উদ্দেশ্য ও সেই সংগ্রামের বার্তাবহ। এ সংগ্রামের সমস্ত নৈরাশ্যের ভিতরে আশার যে ক্ষীণ রেখা পরিলক্ষিত হয় তাহা নিশ্চিতরূপে শাশ্বত ও মানবতাবাদী। সেই হেতু সকল সংকট বিপর্যয় প্রেম ও পিচ্ছিলতার ভিত্তিভূমির উপরে উক্ত চরিত্রটি স্বচ্ছন্দ ও চিত্তাকর্ষী। ধর্ম- সমাজ- ও সংস্কারহারা রামচন্দ্রদেব এক নিঃসঙ্গ রাত্রির নক্ষত্রের মত সম্পূর্ণ রিক্ত হইয়া থাকিলেও তাঁহার পুরুষকারের তেজ যে অবিচলিত রহিয়াছে ইহাই সম্ভবতঃ এই চরিত্রের মধ্য দিয়া আধুনিক সংগ্রামী বিশ্বের প্রতি লেখকের আশা ও আশ্বাসের বাণী। রিজিয়ার সহিত শব্-এ-বরাত্ রাত্রির প্রথম মিলনলগ্নে বহু বেদনাদিগ্ধ মানসিক আলোড়নের মধ্যেও এই অটলতার বিলোপ ঘটে নাই। স্থূলতঃ, মানুষের অব্যাহত জৈত্রযাত্রাকে রামচন্দ্রদেবের চরিত্রের মধ্য দিয়া এই ভাবে রূপায়িত করা হইয়াছে।

জাতীয়তাবোধ রামচন্দ্রদেবের চরিত্রের অন্য এক উল্লেখনীয় দিক। চিলিকার গুরুবাঈ দ্বীপে জগন্নাথের উপস্থাপনার পর লেখকের মর্মস্পর্শী জাতীয়তার অভিব্যক্তি রামচন্দ্রদেবের মুখে অতিশয় ভাবগর্ভ হইয়াছে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে রামচন্দ্রদেব ভক্ত, বীর, দেশপ্রেমী, ত্যাগী ও এক কর্মনিষ্ঠ চরিত্ররূপে সমগ্র উপন্যাসটিতে বিরাজমান। তাঁহার ভাবান্তর, মানসিক প্রতিক্রিয়া ও প্রাসঙ্গিক দার্শনিকতার মধ্যে ঔপন্যাসিক তাঁহার চরিত্রের নানাদিক পরিস্ফুট করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

বাস্তববাদী রামচন্দ্রদেবের উপরি-উক্ত দিকগুলি ভিন্ন তাঁর ভাবুক দার্শনিক মনের নিখুঁত চিত্রণ উপন্যাসের শেষাংশে অতুলনীয় কলা-

নৈপুণ্যের পরিচায়ক। ইহাতে করুণ জিজ্ঞাসা ও অন্তহীন নৈরাশ্যের অন্তর্বাণী রহিয়াছে সত্য, তথাপি ইহা আশানিষ্ঠ জীবনের এক অনির্বচনীয় লিপি। ধর্মান্তরিত রামচন্দ্র আপন প্রশ্নের উত্তরে আপনি যাহা অনুভব করিয়াছেন তাহাই তাঁহার প্রকৃত পরিচয়। তিনি ইতিহাসে ধর্মদ্রোহী হাফিজ্ কাদর্ বা দুর্বলমনা রামচন্দ্রদেব হিসাবে পরিচিত হইতে পারেন, কিন্তু ইতিহাসের উর্ধ্বে যে অন্তর্যামী আছেন তাঁহার দৃষ্টিতে তিনি অন্তহীন সংঘর্ষ, গ্লানি ও অন্তর্দাহের এক মূর্ত চেতনা রূপে দেখা দিবেন।

রামচন্দ্রদেবের মত মুখ্য চরিত্র ছাড়িয়া মালকুদা গাঁয়ের বৃদ্ধা পাইক রমণীর মত পার্শ্বচরিত্রের দিকে তাকাইলেও তাহাতে লেখকের সৃষ্টিশক্তির অসামান্যতা উপলব্ধি কবিতে হয়। এইরূপ চরিত্র তাহার অনর্গল অফুরন্ত অভিসম্পাত-বাক্যে সাধারণতঃ এক প্রকার হাস্য-রসেরই খোরাক জোগাইয়া থাকে। এই দিক হইতে ইহা ফকীর-মোহনের রেবতীর আয়ীমার সহিত তুলনীয়। কিন্তু আলোচ্য চরিত্রে সে হাস্যের অন্তরালে দেশপ্রেমজনিত আকুলতা, তীব্র করুণতা ও নিমল স্বচ্ছ দৃষ্টির যে আভাস পাওয়া যায় তাহাই এই চরিত্রসৃষ্টির বিশেষত্ব।

তেমনি সর(-অ) ও জগুনি— ঝড়ের মুখে দুইটি শুকনা পাতা। অতীত ও ভবিষ্যৎহীন এই চরিত্র দুইটির দৈনন্দিনতায় যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে। রক্তমাংসের দ্বন্দ্ব ও দোলনের মধ্যে ইহারা বাস্তব। জগন্নাথ দর্শনের জন্য সরর উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষা, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বেপথুতে তাহার বিড়ম্বিত নারীত্বের প্রতিমূর্তি অতিশয় উজ্জ্বল। রথযাত্রার পরে নির্জন চটিঘরে তাহার হৃদয়ে যে প্রশ্নগুলি দেখা দিয়াছিল তাহা মনুষ্য-জীবনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা, ক্ষোভ ও অতৃপ্তির জীবন্ত প্রতীক।

পাপপুণ্যের ভয় ও পরজন্মে স্বামীর সহিত পুনর্মিলনের জন্য বিধবা সরর অন্তহীন প্রতীক্ষার মধ্যে সহসা ভাগীরথীকুমারের আবির্ভাবে তাহার হৃদয়-যমুনায় সারা রাত যে বীচিবিক্ষোভ দেখা দিয়াছে তাহাতে তাহার নিষ্ফল নারীত্ব ও আদর্শের নিত্য সংগ্রাম পরিস্ফুট হইয়া এই চরিত্রটিকে অধিক স্বাভাবিক ও ধুলা-মাটির করিয়া তুলিয়াছে। ফলতঃ, তাহার অনুভূতিতে যে জৈব উত্তাপ ও উন্মনতা দেখা যায় তাহা এই উপন্যাসে অনেক উৎকণ্ঠাময় মুহূর্ত সৃষ্টি করিবার অবকাশ দিয়াছে। এই কারণে সরদেঈর রিক্ত জীবন ও বেদনাক্ত অনুভূতি তাহার অবচেতনের বিশ্লেষণে অত্যন্ত স্পষ্ট। এক গৌণ চরিত্ররূপে পরিকল্পিত হইলেও এই চরিত্র-সৃষ্টির সফলতা সারা উপন্যাসটিতে অনুভূত হয়। লেখকের ভাষায়—"সরদেঈ" তাঁহার "অবচেতনের সৃষ্টি।" তাহার "মধ্যে ভাগ্যবিড়ম্বিত ওড়িশা যেন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।"

জগুনি সরর কর্মশক্তি, অবলম্বন, ও আদর্শের সতর্ক প্রহরী। সাধারণ মানুষের মোহমায়া এ চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করায় সহায়ক হইয়াছে। উপন্যাসের শেষাংশে ইহার উদাসীনতা ইহার কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দেয়। জগন্নাথকে চিলিকার মধ্যে নিরাপদ স্থানে রাখিবার সময়ে জগুনির অনাসক্ত ভক্তির মধ্যে তাহার মন হইতে সরদেঈয়ের স্মৃতি প্রায় মুছিয়া আসিয়াছে। যাহা কিছু তাহার আপনার বলিয়া রহিয়া গিয়াছে তাহা হইল নির্বাক কর্মী জগুনির জগন্নাথ ও জগন্নাথের 'চলন্তি প্রতিমা' খোর্ধার রাজার প্রতি আগ্রহ ও কর্তব্যের ভিতরে অস্বস্তিকর বাস্তবকে মিশাইয়া দিবার অজ্ঞাত প্রয়াস। উপন্যাসের ইহা একটি ক্ষুদ্র চরিত্র হইলেও ঘটনাবলীর ক্রমপরিণতিতে ইহার স্থান বিশেষভাবে উল্লেখনীয়।

এইরূপ অন্যান্য বহু মুখ্য ও গৌণ চরিত্র ঘটনাচক্রকে পুষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চিত্রণকুশলতার সৌন্দর্যে 'নীল শৈল'কে মহিমা-মণ্ডিত করিয়াছে। বর্ণনা রীতি অপেক্ষা সংকেত সূচনা ও ঘটনার আবর্তের মধ্যে চরিত্রসুলভ অভীপ্সা (motive) সাফল্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

পুশ কিনের মতই উপন্যাসিক সুরেন্দ্র, তাঁহার চরিত্রবিন্যাসে তিনি ঐতিহাসিক সত্য, চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য ও তাৎকালিক চিত্রের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধনে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং উৎকলের আশা-নিরাশা, বীরত্ব ও ক্লৈব্য, তথা ঐতিহাসিক গৌরব ও ঐতিহাসিক বিদ্রূপের এক অক্ষুন্ন চিত্র তাহার লেখনীতে সম্ভব হইয়াছে। ওড়িশার ইতিহাসের অনেক লুপ্ত অধ্যায় উজ্জীবিত করিতে গিয়া তিনি স্থানে স্থানে প্রবন্ধ-সুলভ বর্ণনাশৈলী ও দার্শনিকতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছেন। এমনি স্থানগুলিতে উপন্যাসের গতির মন্থরতা 'নীল শৈল'র শৈলীগত মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া থাকিতে পারে এমন আশঙ্কা হয়। অবশ্য এইরূপ কয়েকটি স্থলে ছাড়া অন্য সর্বত্রই সুরেন্দ্রর শৈলীতে তাহার স্বকীয়তা সুপ্রকাশ। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ওড়িশার সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি অনেক তৎকালীন ওড়িয়া ও যাবনিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সে শব্দগুলির ভাব-দ্যোতনা ও সংগতি সৃষ্টি করিবার অনবদ্য শক্তি এই উপন্যাসে সুপরি-স্ফুট। লেখক-অবলম্বিত এই শৈলীতে বিষয়বস্তুর সহিত লেখকের একাত্মতা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। কবিতার ভাষার মত তাঁহার প্রকাশভঙ্গীতে প্রত্যেক শব্দের ধ্বনি, সংগতি ও ব্যঞ্জনা শিল্পীহৃদয়ের বৌদ্ধিক বিচক্ষণতা প্রকাশ করে।

কলার স্বভাবসুন্দরতায় বিশ্বাসী হইলেও শিল্পের অন্তরালে শিল্পীর

উদ্দেশ্যপ্রণোদনাকে লেখক আদৌ অস্বীকার করেন নাই। সেইজন্য উপন্যাসের আখ্যানভাগকে চরিত্র ও ঘটনার প্রবাহে ছাড়িয়া দেওয়ার রীতিকে তিনি এইচ. জি.ওএল্‌স্‌-এর মত অনেক ক্ষেত্রে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ইহা ব্যতীত শক্তিশালী শৈলী ও উৎকণ্ঠাময় পরিবেশের মধ্যে 'নীল শৈল'র চরিত্রগুলির স্থিতি ও সংঘর্ষের চিত্র অতিশয় সরস ও বাস্তব। ঔপন্যাসিক যে সংঘমে বিশ্বাসী তাহা কেবল দেহের বা জড় প্রয়োজনবোধের সংযম নহে। ইহা দেহ ও আত্মার সম্মিলিত সংগ্রাম। সুতরাং ভক্তি ও দেশাত্মবোধ এখানে এক রেখায় মিলিত। এই হেতু 'নীল শৈল' যতখানি জাতীয়তাবাদী ততখানি ভক্তিবিলোল, যতখানি রুদ্র কঠোর ততখানি ক্লান্ত-কোমল। লেখক ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিকতা ও বাদবিসংবাদকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত মিলাইয়া যে অপূর্ব ভাবগুঞ্জন সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা ভারতের ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিরল। তাই কুঞ্জ গড়নায়ক, সর(-অ) বা রামচন্দ্রদেবের মত চরিত্রগুলি সেই ভাবময় রাজ্যে এক-একটি সশরীরী চেতনা হিসাবে পরিগণিত হইলেও তাহাদের তিক্ত-মধুর স্থিতি ও নির্যাতিত জীবন-জিজ্ঞাসাকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হওয়া যায় না। জীবনযুদ্ধে তাহারা কেবল ওড়িশা ও ওড়িয়ার দুর্জয় অভিমান নহে, 'নীল শৈল'র জগন্নাথের ন্যায় তাহারা বিশ্বচেতনার ও নিখিল মানবাত্মার প্রতিনিধি। তাহারা তাই অপরাজিত অনবদমিত মহাপূর্ণতার আদিঅন্তহীন ভাববিহ্বল মূর্তি।

পরিশেষে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে বিষয়বস্তু, চরিত্র, পরিবেশ এবং ভাষা ও ভাবের দিক হইতে 'নীল শৈল' এক সার্থক উপন্যাস।

উদ্‌বর্তন-সংঘষের 'বড়দাণ্ডে'[1] ইহা এক সরস ও বিষণ্ণ ইতিকথা। ইহাতে স্বস্তি আছে, গ্লানিও আছে… আছে মহাচেতনার এক অপরাজেয় প্রকাশ।

পীতাম্বর প্রধান (উপগুপ্ত)
বারিপদা
অধ্যাপক, ওড়িয়া বিভাগ
মহারাজ পূর্ণচন্দ্র মহাবিদ্যালয়।

1. বড় দাণ্ড— পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখস্থ সুপ্রশস্ত রাজপথ যেখান দিয়া রথযাত্রার সময়ে জগন্নাথের রথ টানা হয়, সদর রাস্তা।

ভূমিকা

1

ওড়িশায় আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে শ্রীজগন্নাথের স্থান সর্বজনবিদিত। কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম মতবাদ বা সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে জগন্নাথ আবদ্ধ নহেন। শবর বিশ্বাবসু হইতে আরম্ভ করিয়া আর্য ইন্দ্রদ্যুম্ন, বৌদ্ধ ইন্দ্রভূতি, শৈব শঙ্করাচার্য, পাঞ্চরাত্রিক রামানুজ, শুদ্ধাভক্তিবাদী শ্রীচৈতন্য, শূন্যবাদী বলরাম-জগন্নাথ ও শিখ ধর্মগুরু নানক পর্যন্ত বিভিন্ন মতবাদ ও সম্প্রদায় শ্রীজগন্নাথের মৈত্রী সাধনার মধ্যে সমন্বিত হইয়াছে। শ্রীজগন্নাথ বুদ্ধদন্ত-গর্ভিত এই বিশ্বাসে বৌদ্ধেরা জগন্নাথকে মহাবৌদ্ধরূপেও আরাধনা করিয়া থাকেন। ইসলামধর্মী সালবেগ ও যবন হরিদাস প্রমুখ ভক্তগণও বহু মর্মস্পর্শী 'জণাণে'[1] শ্রীজগন্নাথের আরাধনা করিয়াছেন। বাস্তবিক, সার্বজনীন মানবের মৈত্রী সাধনার ইষ্টদেবরূপে শ্রীজগন্নাথের পরিকল্পনা যেমন অদ্বিতীয় তেমনই বিরাট ও উদার।

আবার এই বিরাটত্ব হইতে দূরে— প্রত্যেক ওড়িয়া প্রাণে শ্রীজগন্নাথের জন্য একটি মধুর প্রীতিপবিত্র স্থানও আছে, প্রকৃতই ওড়িয়ার হৃদয়ক্ষেত্রে পাতা সে যেন এক সুবিস্তীর্ণ 'শরধা-বালি'[2]।

1. জণাণ (উচ্চারণ অকারান্ত)— ভগবানের উদ্দেশে রচিত ভক্তিগীতি যাহাতে ভক্তহৃদয়ের দুঃখ অনুযোগ ও অভিমান জানানো হয়।

2. শরধা-বালি— জগন্নাথের রথ যাইবার 'বড়দাণ্ডে'র ধুলা, লোকে বড়ই 'শরধা' করিয়া (ভালবাসিয়া) এ ধুলা অঙ্গে মাখে।

ভক্তি সেখানে গৌণ, প্রীতিই মুখ্য। জগন্নাথ অপেক্ষা ওড়িয়া জাতির এমন অন্তরঙ্গ আত্মীয় আর কেহ নাই। তাই 'সর্বমঙ্গল জগন্নাথ' স্মরণ মাত্র ওড়িয়া গৃহস্থের সকল অমঙ্গল-আশঙ্কা বিদূরিত হয়। জগন্নাথকে ওড়িয়া 'কলামুহা' (কালামুখো) বলিয়া যেমন গালি দেয়, 'জগা বলিআ' (জগন্নাথ-বলরাম) বলিয়া ডাকিযা তেমনি আদরও কবে, 'কালসর্প' বলিয়া অভিমান কবে, 'পহণ্ডি'ব'[1] সময় তাঁহার বিগ্রহকে মাটিতে আছডায, প্রহার করে। এ সবও ওড়িয়ার দৃষ্টিতে আরাধনার অঙ্গীভূত। জগন্নাথকে এইরূপ স্নেহদৃষ্টিতে দেখার পরম্পবা সম্ভবতঃ জগন্নাথের শবর-সেবিত শবরী-নাবায়ণ পর্যায় হইতে চলিয়া আসিতেছে। বাস্তবিক, শ্রীজগন্নাথেব মধ্যে দেবতা যেন মানুষ হইয়াছেন, তাহাব সিংহদ্বারে তেমনি মানুষও হইয়াছে দেবতা।

2

এ সকল তথ্য বহুবিদিত: কিন্তু উৎকল সাম্রাজ্যেব রাজনৈতিক ইতিহাসে জগন্নাথেব যে মহিমময স্থান সে সম্বন্ধে তেমন কোনও আলোচনা হয় নাই। স্মবণাতীত কাল হইতে কেমন কবিয়া জগন্নাথ উৎকলের রাষ্ট্রদেবতারূপে বিবেচিত হইয়া আসিতেছেন জানা নাই; তবে 'মাদলা-পাঞ্জি'[2]তে দেখি রাজা অনঙ্গভীমদেবেব কাল হইতে

1. পহণ্ডি— অতি ধীব পদক্ষেপ; বথযাত্রাব সময বিগ্রহদিগকে বথের দিকে যাত্রা কবানো, মনে হয যেন তাঁহাবা হেলিতে দুলিতে দীর্ঘ পদক্ষেপে চলিতেছেন।

2. মাদলা পাঞ্জি— পুবী জগন্নাথমন্দিবের শ্রীক্ষেত্র তথা উৎকল ইতিহাস-সংবলিত তালপাতাব পঞ্জী বা বোজনামচা; ইতিহাস ব্যতীত নানা জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীও ইহাতে লিপিবদ্ধ হইযাছে।

উৎকল সাম্রাজ্যের সিংহাসনে রাজাদের অভিষেকের বিধি ছিল না :—

> "ইঁহার (চূড়গঙ্গ) পুত্র অনঙ্গভীমদেব ইঁহার ইচ্ছায় বলিলেন আমাদিগের নাম পুরুষোত্তমদেব। ইনি নগর কটকে থাকিয়া শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথদেবকে সমস্ত সমর্পণ করিয়া তাঁহার 'রাউত'[1] হিসাবে থাকেন।…
>
> ওড়িশা রাজ্যের রাজা শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভু এমত কহিয়া অভিষেক হইলেন না।" —মাদলা পাঞ্জি

সূর্যবংশী সম্রাট্‌গণও শ্রীজগন্নাথকে আগঙ্গাগোদাবরী বিস্তৃত উৎকল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর জ্ঞান করিতেন। সেইজন্য সূর্যবংশী সম্রাট্‌গণের রাজত্বকালে সমস্ত প্রধান রাষ্ট্রীয় ঘোষণা শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে ঘোষিত হইত। জয়বিজয় দ্বারের ওড়িয়া শিলালেখগুলি আজও তার সাক্ষ্য দিতেছে। আবার উৎকল সাম্রাজ্যের মান রক্ষার জন্য শ্রীজগন্নাথ যে রত্নসিংহাসনের ঐশ্বর্য সমারোহ ত্যাগ করিয়া কাঞ্চি অভিযানে একজন সাধারণ 'রাউত'রূপে বাহির হইয়াছিলেন তাহা পুরুষোত্তম দাসের 'কাঞ্চি-কাবেরী' কাব্য হইতে আরম্ভ করিয়া ওড়িয়া সাহিত্যে বহু উপকথা কাহিনী ও নাটকের অন্তঃপ্রেরণা জোগাইয়াছে। এই কাঞ্চি-যাত্রার আলেখ্য অঙ্কন না করা পর্যন্ত ওড়িশার চিত্রকরদেরও কলা-পিপাসা যেন প্রশমিত হয় নাই।

ষোড়শ শতাব্দীতে উৎকলের স্বাধীনতালোপের পরেও আকবরের সেনাপতি মানসিংহ কেবল শ্রীজগন্নাথের জন্যই খোর্ধার[2] রাজনৈতিক স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন—

1. রাউত— যুদ্ধ-বৃত্তিধারী প্রজা।
2. খোর্ধা।— ইদানীন্তন কালে ইহা পুরী জেলার অন্যতম মহকুমা।

"ওড়িশার ভূমি মানুষের উৎকাঙ্ক্ষা অথবা বিজয়লালসা চরিতার্থের জন্য অভিপ্রেত নহে। ইহা দেবরাজ্য— এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ইহা নিখিল মানবের তীর্থভূমি।" —স্টার্লিং

'কপিলসংহিতা'য়ও ওড়িশা "সর্বপাপহরং দেশং ক্ষেত্রং দেবৈস্তু কল্পিতং"-রূপে কথিত হইয়াছে। সেইজন্য উপকথাশ্রুত রক্তবাহু হইতে আরম্ভ করিয়া ইতিহাসবর্ণিত মোগল সেনাপতিগণ পর্যন্ত উৎকল অধিকারের জন্য যতবার যত আক্রমণ হইয়াছে জগন্নাথ সে সকল কোনও আক্রমণ হইতে বাদ যান নাই। প্রত্যেকবার এইরূপ আক্রমণের সময়ে জগন্নাথ আত্মগোপন করিয়া উৎকলের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে অন্তরাল হইতে বার বার দৈব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। জগন্নাথের সহিত ওড়িয়া জাতির আত্মা সেই সকল সংগ্রামে বার বার অপরাজেয় রহিয়াছে। উৎকলের রাষ্ট্রজীবনে জগন্নাথের এই সুমহৎ স্থান হেতু ওড়িশা অধিকারের অব্যবহিত পরে ফোর্ট উইলিয়ম হইতে ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কম্পানির পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছিল :—

"It has been the anxious solicitude and desire of the Commissioners founded upon the express orders of His Excellency the Most Noble Governor-General that no interference or intervention should be experienced at the pagodah of Juggernath by any act of their authority."

3

অষ্টাদশ শতাব্দীতে খোর্ধার ভোই রাজবংশের জনৈক রাজা রামচন্দ্রদেব (দ্বিতীয়) ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া হাফিজ্ কাদর্

বেগ্ নামে পরিচিত হন। কিন্তু তিনি মুসলমান হইয়াও কটকের তৎকালীন নায়েব-নাজিম হিন্দুবিদ্বেষী তকী খাঁর আক্রোশ হইতে অব্যাহতি পান নাই। তাঁহার আক্রমণ হইতে জগন্নাথ ও সেই সূত্রে ওড়িশার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রামচন্দ্রদেব বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুদ্রোহ লোকাপবাদ ও লাঞ্ছনার মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছিলেন তাহার কাহিনী যেমন রোমাঞ্চকর তেমনই প্রাণস্পর্শী। মাদলা পাঞ্জিতে তাঁহার সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে। বিগত শতাব্দীতে পুরী রাজবংশের রানী সূর্যমণি পাট মহাদেঈ রাজা মুকুন্দদেবকে রাজা বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া বিষয়ে যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাতেও হাফিজ্ কাদ্র্ সম্বন্ধে উল্লেখ ছিল :—

"As a precedent I take the liberty to bring to your notice that one of my ancestors named Rajah Ram Chandra Deb who ascended the throne in 1660 Sakabda (1723 A.D.) having been compelled to associate with a daughter of the then Mohammedan Noble was not allowed to perform the services of Jagannath or to enter the Temple and as he expressed his desire to worship the idol the Patitapaban Dev, a representative of Jagannath was set up at Singhaduar (the Lion Gate of the Temple) in order that the fallen Raja might be able to see and worship it from outside."

রামচন্দ্রদেব হাফিজ্ কাদ্র্ বেগ্ নামে পরিচিত হইবার পরেও শ্রীজগন্নাথের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তি লুপ্ত হয় নাই। মন্দিরে তাঁহার

প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ায় তাঁহার দর্শন ও সেবার জন্য সিংহদ্বারের গুমটিতে জগন্নাথের পতিতপাবন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

সাম্প্রদায়িক সংস্কারমুক্ত এই মৈত্রীদেব জগন্নাথের মান রক্ষার জন্য ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হাফিজ্ কাদ্র্ বেগ্ (রাজা রামচন্দ্রদেব)-এর সংগ্রাম এই উপন্যাসের কথাবস্তু।

রামচন্দ্রদেবের সেই বেদনাজর্জরিত নিঃসঙ্গ সংগ্রামের ইহা এক অধ্যায় মাত্র। তকী খাঁর আক্রমণ হইতে ওড়িশা রাষ্ট্রের ইষ্টদেব জগন্নাথকে রক্ষা করিবার জন্য রামচন্দ্রদেব (হাফিজ্ কাদ্র্) বহুবার রাত্রির দস্যুর ন্যায় বিগ্রহদিগকে চিলিকা হ্রদের মধ্যস্থ নানা দ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া আঠগড় (গঞ্জাম)-এর পাহাড় জঙ্গল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। অবশেষে তকী খাঁর ধর্মান্ধ জেদই ভাঙিল, তিনি জগন্নাথকে স্পর্শও করিতে পারিলেন না, এবং সেই সূত্রে খোর্ধা রাজ্যও রহিল অপরাজিত। তাহার সম্পূর্ণ বিবরণী এই উপন্যাসের কথাবস্তু নহে, সেইজন্য ইহা এক প্রকার অসম্পূর্ণ মনে হইতে পারে। কিন্তু এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে জীবনের ন্যায় কলাসৃষ্টিও অসম্পূর্ণ। স্বয়ং জগন্নাথের বিগ্রহও অসম্পূর্ণ। ব্যঞ্জনার মধ্যেই কেবল সেই মহাপূর্ণতার আস্বাদ মিলিয়া থাকে, কলাক্ষেত্রেও তাহাই।

4

ফকীরমোহনের পরবর্তী কালে ঐতিহাসিক উপন্যাস ওড়িয়া উপন্যাসের এক প্রধান ঐশ্বর্য হইলেও ফকীরমোহনের 'লছমা'র পরে মৌলিক ঐতিহাসিক উপন্যাস খুব কমই লেখা হইয়াছে, লেখা হয় নাই

বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এরূপ অবস্থায় অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসকে ভিত্তি করিয়া ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা আমার পক্ষে যে ধৃষ্টতা তাহা আমি বেশ অনুভব করিতেছি। ইহাতে আমি কতখানি কৃতকার্য হইয়াছি সুধী পাঠকবৃন্দ তাহার বিচার করিবেন।

এই উপন্যাসবর্ণিত তকী খাঁ, রামচন্দ্রদেব, বকশী বেণু ভ্রমরবর, দেওয়ান কৃষ্ণ নরীন্দ্র, রিজিয়া বিবি ও ললিতা মহাদেঈ প্রমুখ নরনারী ওড়িশার ইতিহাসের চরিত্র। মাদলা পাঞ্জি ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য পঞ্জী তথা নানা ইতিহাস হইতে তাঁহাদের বিবরণী পাওয়া যায়। দ্বিতীয় রামচন্দ্রদেবকে অনেকে নায়েব-নাজিম মুর্শীদ কুলি খাঁর শাসনকালে অবস্থাপন করিয়া থাকেন, কিন্তু মাদলা পাঞ্জি অনুসারে রামচন্দ্রদেব মহম্মদ তকী খাঁর সমসাময়িক হইয়া থাকায় আমি তাঁহাকে তকী খাঁর শাসনকালেই অবস্থাপন করিয়াছি। তবে ইতিহাস এখানে মুখ্য নহে, গৌণ।

এখানে মুখ্য— ওড়িশার ইতিহাসের এক ঘোর দুঃসময়ে ওড়িশার অপরাজেয় প্রাণশক্তির আলেখ্য। এ সংগ্রাম ধর্ম জাতি বা দেশের কোনও শত্রুর বিরুদ্ধে নহে, মানুষের মনুষ্যত্বের শত্রুর বিরুদ্ধে ইহা এক নিঃসঙ্গ বেদনাব্যথিত সম্প্রদায়-সংস্কারমুক্ত আদর্শনিষ্ঠ সংগ্রাম। যুগে যুগে সে সংগ্রাম ভিন্ন ভিন্ন রূপে অব্যাহত রহিয়াছে। আমার 'অন্ধ দিগন্ত' উপন্যাসেও ইহাই ছিল মর্মকথা।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর ওড়িশার সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টি করিবার প্রয়াসে আমি এখানে অধুনালুপ্ত অনেক প্রাচীন ওড়িয়া শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। এ-সকল শব্দ ও তাহার প্রয়োগ-পরম্পরা আজও শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে জীবন্ত রহিয়াছে। সেই-সব প্রাচীন শব্দ কিরূপ ভাবদ্যোতক, আবার খাঁটি নির্ভাজ ওড়িয়া এবং

সেগুলির পুনরুদ্ধার ওড়িয়া ভাষাকে কিরূপে সমৃদ্ধ করিতে পারে, তাহার কতক উদাহরণও ইহাতে পাওয়া যাইতে পারে।

এইরূপ একটি উপন্যাস লেখার কল্পনা আমার মনে কখনও ছিল না। কিন্তু 1964 সালে রথযাত্রার সময় অতি নিকট হইতে বিগ্রহদিগের 'পহণ্ডি বিজয়'[1] দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। জগন্নাথ ওড়িয়া জাতির কিরূপ অন্তরঙ্গ সেদিন সেই জনসমুদ্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিয়াছিলাম। বাস্তবিক আমার মনে হয় সমগ্র পৃথিবীতে ইহা এক শ্রেষ্ঠ বর্ণাঢ্য ও প্রেরণাময় দৃশ্য। কাদম্বরী-প্রমত্ত বলদেবের দৃপ্ত 'পহণ্ডি', তাঁহার কেতকী 'টাহিআ'র[2] ঠমক, 'বিজে কাহালি'[3] ও ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে আমার দৃষ্টিপথে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল ইতিহাসের বহু ক্ষতবিক্ষত সেই অপরাজেয় ওড়িয়া আত্মার অভ্যুদয়। সেদিনের সেই অবিস্মরণীয় অনুভূতি আমায় যে প্রেরণা দিয়াছিল 'নীল শৈল' তাহার পরিণতি। ইহার মধ্যে সে হৃদয়াবেগের স্পন্দন পাঠকপাঠিকাগণ অনুভব করিলে এ অকিঞ্চনের শ্রম সার্থক হইবে।

বাহুড়া দশমী

সুরেন্দ্র মহান্তি

1. বিজয় অথবা বিজে— রাজা বা দেবতার গমন।

2. টাহিআ— সোলা ও কেতকী ফুলের শিরোভূষণ বিশেষ, রথযাত্রা ইত্যাদি উৎসবে বিগ্রহগণের মাথায় পরানো হয়।

3. বিজে কাহালি— দেবতা বা রাজা 'বিজে' অর্থাৎ যাত্রা করার সময় যে বড় বড় ভেঁপু বাজানো হয়, trumpet।

প্রথম পরিচ্ছেদ

1

রোদে-পোড়া ভুঁয়ে-লোটা বটগাছের এলানো ঝুরি। উই ঢিপির ভিতর থেকে ভুইফোঁড়ের মত গজানো রোগাটে খেজুর গাছ। লতা-পাতায় ঘেরা আম নাগকেশর করঞ্জ পলাশের ঝোপ-জঙ্গল। কোথাও বা নির্জন চটি-ঘর। তার মধ্যে ধুলোয় ভরা জগন্নাথ সড়ক এঁকে বেঁকে মরা অজগরের মত চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে। আকাশে পাঁশুটে মেঘের পাল, অপরাহ্ন-সূর্যের প্রখর দীপ্তি তার আড়ালে ম্লান হয়ে গেছে। এক বিষণ্ণ ধূসর আলোয় চারিদিক পাঁশুটে বর্ণ। সড়কে একটি যাত্রীও দেখা যায় না। সড়কের দুই ধারের গাছে পক্ষিকুলের কাকলিও নীরব। চারিদিকে এক অস্বাভাবিক ভৌতিক নীরবতা। সেই নির্জন জগন্নাথ সড়কে একজন অশ্বারোহী সম্মুখের বিসর্পিল ধূসর পথের দিকে চিন্তাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে ধীর কদমে ঘোড়া চালিয়ে পুরীর দিকে যাচ্ছিলেন।

আজ ভাদ্রের শুক্লাএকাদশী, পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের পার্শ্ব-পরিবর্তন। কাল 'সুনিআ'[1]: বামনজন্ম, আর যদুবংশের বীর শ্রীগজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাট কলবর্গেশ্বর বীরাধিবীরবর

1. সুনিআ— ভাদ্র মাসের শুক্লাদ্বাদশী, এই তিথি থেকে নূতন ওড়িয়া সন ও পুরীর রাজার 'অঙ্ক' গণনা করা হয়।

মহারাজ শ্রীশ্রীশ্রীরামচন্দ্র দেবের সাত 'অঙ্ক'[1] শেষ হয়ে আট 'অঙ্ক' আরম্ভ হবে।

অশ্বারোহী সহসা পাগলের ন্যায় অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন। তাঁর ঘোড়া চমকে উঠল, রাস্তার ধারে কয়েকটি ঘুঘু চরছিল উড়ে পালাল। আপন হাসির প্রতিধ্বনিতে অশ্বারোহীও যেন চকিত হয়ে চারিদিকে চাইলেন। পায়ের 'পাণ্ডোই'[2] দিয়ে ঘোড়ার পেটে আঘাত ক'রে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। অশ্বক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিপটল একখানি মেঘের ভ্রম সৃষ্টি ক'রে হাওয়ায় ভাসতে লাগল।

'স্নানযাত্রা' ও বামনজন্ম উপলক্ষে প্রতি বৎসর এই সময়ে জগন্নাথ সড়কে কাতার দিয়ে 'পঞ্চকোশী'[3] যাত্রীর দল চলতে থাকে। পশ্চিমা যাত্রীও অনেক থাকে, কেউ গরুর গাড়ী কেউ পাল্কি কেউ উট বা ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে, নয়তো পদব্রজেই। পঞ্চকোশী যাত্রীদের মধ্যে তাদের সহজেই আলাদা ক'রে চিনে নেওয়া যায়। সড়কের ধারে লাল নীল কালমেঘা শাড়ীর মিছিল, সঙ্গ-সাঙ্গাতের দলের কলহাস পরিহাস, যাত্রীদের অকারণ হাক-ডাক চীৎকার কোলাহল— কিছুই এ বৎসর নেই। গৌড়দেশ থেকে আসা বৈষ্ণবদেরও কারও দেখা নেই।

ওড়িশায় আবার মোগলের হাঙ্গামা লাগবে এমন আশঙ্কা দেখা দেওয়া অবধি শ্রীক্ষেত্রে যাত্রীদের যাওয়া আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

1. অঙ্ক— পুরীর রাজার সিংহাসনারোহণ থেকে গণিত অব্দ, কিন্তু এই গণনায় 1,6,16 20,26,30 প্রভৃতি সংখ্যাগুলি ডিঙিয়ে যাওয়া হয়।

2. পাণ্ডোই— প্রাচীনকালের জুতা।

3. পঞ্চকোশী যাত্রী— কাছ থেকে আসা যাত্রী, পাঁচ ক্রোশের মধ্যেই যাদের ঘর।

সুজা খাঁ নায়েব-নাজিমের আমল থেকে অবশ্য জিজিয়ার জুলুম আর নেই, সড়কের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে জিজিয়ার ঠিকাদারদের লুণ্ঠনের ভয় আর তত নেই। সুজা খাঁর আমলে জগন্নাথও মোগলের উৎপাত থেকে কতক পরিমাণে নিশ্চিন্ত ছিলেন। কেবল তকী খাঁ কটকের নায়েব-নাজিম হয়ে আসার দিন থেকে মোগলদের শ্যেন দৃষ্টি আবার জগন্নাথের উপরে পড়েছে। মোগলের হাঙ্গামার ভয়ে পুরীর রাজপথ জনশূন্য. জগন্নাথ সড়কে যাত্রী আসবে কোথা থেকে ?

পিপিলীতে আবার মোগল ঘাটি বসেছে। পিপিলী বাজার পার না হওয়া পর্যন্ত অশ্বারোহী যেন এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন এমনিভাবে ঘোড়া ছোটাচ্ছিলেন। পিপিলী পার হওয়ার পর তিনি ঘোড়ার গতি আবার মন্থর ক'রে দিয়েছেন।

সামনে ভার্গবী নদী। বালুগর্ভা নদীর ক্ষীণ ধারাটি যেখানে তন্বী-বধূর কটিতটের মত বঙ্কিম হয়ে উঠেছে সেইখানে অপরাহ্ণ সূর্যের এক ঝলক তাম্র আলো ঝলমল করছে কাঞ্চিমেখলার মধ্যমণির মত।

অশ্বারোহী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সড়কের একটা চড়াই ভেঙে উঠতে লাগলেন।

ভাদ্র মাসের অর্ধেক পার হয়ে গেছে, তবু একবিন্দু বৃষ্টি নেই। কৃপণের দানের মত শ্রাবণমাসে যে সামান্য কয় পসলা বৃষ্টি হয়েছিল তাতে চাষীরা কিছু কিছু কৃষিকাজ আরম্ভ করেছিল। ক্ষেতে ধান্যশিশুরা আলের পর আলের নিষ্করুণ নৈরাশ্যের মধ্য থেকে সবুজ স্বপ্নের মত মাথা তুলেছে, কিন্তু ঝুলন একাদশীর পর থেকে আর বৃষ্টির দেখা নেই। 'গহ্মা'[1] পূর্ণিমাতেও মাটি ভিজল না। ক্ষেতে ধানগাছ সব

1. গহ্মা পূর্ণিমা— ঝুলন পূর্ণিমা।

কাঠফাটা রোদে জ্বলে পুড়ে গেছে। জগন্নাথ সড়কের দুই পাশে যতদূর চোখ যায় কেবল খরায় জ্বলে যাওয়া ধানক্ষেত। তারি ভিতরে বুড়ো বলদের পাল অস্থিপঞ্জর মেলে শুকনো মাটি শুঁকে বেড়াচ্ছে। আর কালো কালো ছায়ার মত এক একটি কঙ্কালসার মানুষ শিশু-ধান্যের সেই শ্মশানের মধ্যে কি খোঁজে তারাই জানে।

আবার যে আকাল পড়ল তাতে আর ভুল নেই। ধানের 'ভরণ'[1] এবার কত কাহন হবে কে জানে। মানুষে মানুষের মাংস খাবে। স্বয়ং প্রকৃতিও একটা জাতিকে ধ্বংস করবার জন্য করাল গ্রাস মেলেছে।

পুরী আরও অনেকটা পথ। সামনে ভার্গবীর আর একটি ধারা। অশ্বারোহী হঠাৎ লাগাম টেনে ঘোড়া থামালেন।

সড়কের উপর একজন 'দণ্ডবতী' (দণ্ডিখাটা যাত্রী) পিছন থেকে তার চেহারা দেখে অশ্বারোহী প্রথমে সে মানুষ অথবা প্রেত ঠাহর করতে পারলেন না। দীর্ঘ পথশ্রমে তার পা দুটো ফুলে উঠেছে, দুই হাত রক্তাক্ত, তাতে নেকড়া জড়ানো। ধুলো ঘাম ও পথশ্রমে বিবর্ণ দেহ। মাথার এক এক গোছা রুক্ষ চুল কাঁধের উপর দিয়ে পিঠে এসে পড়েছে।

যাত্রী তার দুই শীর্ণ হাতে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে ধরা ঢিলটা আবার সামনের দিকে ফেলে দিল, যেখানে পড়ল সেই পর্যন্ত সে ধুলোভরা সড়কের উপরে দণ্ডবৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

তারপর আবার উঠল, আবার ফেলল, আবার লম্বা হয়ে পড়ল।

শত উত্থান-পতন সংঘাত-সংঘর্ষ বেদনা ও যন্ত্রণার মধ্যে সদা

1. ভরণ— শস্যের বড় মাপ বিশেষ, 80 গৌণীতে (এক গৌণী একটি বড় হাঁড়ি) 1 ভরণ হয়।

অপসৃয়মান এক লক্ষ্যের পিছনে অনন্ত যুগ ধ'রে চলেছে যে মানবযাত্রী, এ যেন সেই অপরাজেয় অনবদমিত অক্লান্ত তীর্থযাত্রী, ছুটেছে মুক্তির পিপাসায়।

অবিরত অনন্ত সে যাত্রা।

তকী খাঁর আতঙ্কেও সে যাত্রা রুদ্ধগতি হয় নি।

আজ একাদশী।

শ্রীমন্দিরের চূড়ায় একাদশীর মহাদীপ তোলার সময় 'চিনরা'রা[1] নাকি আজকাল খোর্দার রাজার নামে আর ডাক পাড়ে না।

ডাক পড়ছে বকশী বেণু ভ্রমরবর হরিচন্দন মহাপাত্রের নামে। বকশীর অভিপ্রায় কি? নানা কথাই তো শোনা যাচ্ছে। আজ কিন্তু চক্ষু-কর্ণের সে সব বিবাদ ভঞ্জন করতে হবে।

অশ্বারোহী দ্রুত বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

2

"কার মান ইজ্জত তুমি রাখলে জগন্নাথ? মান-উদ্ধারণ ধ্বজা উড়িয়ে নিজের মানও তো নিজে রাখতে পার নি। বাজু খাঁ কালাপাহাড় তোমায় চামড়ার দড়িতে বেঁধে গরুর গাড়িতে ধানের গাদা বওয়ার মত হাতীর পিঠে ফেলে তোমায় গৌড়ের রাজপথে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নিজেকেই তো রক্ষা করতে পার নি, আমার মান বা আর কি করে রাখবে তুমি?"

1. চিনরা (উচ্চারণ চিন-অরা)— পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে যারা মন্দির বেয়ে চূড়ায় মহাদীপ তোলে ও জগন্নাথের উদ্দেশে ডাক পাড়ে।

শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের সামনে ‘মেঘনাদ পাচেরি’র[1] এক পাশে দাঁড়িয়ে রাত্রির অন্ধকারে যে ‘গুহারিআ’[2] মন্দিরের নীলচক্রের দিকে চেয়ে এই অনুযোগ জানাচ্ছিল তার দুই চোখ হঠাৎ এক অব্যক্ত আবেগ ও অভিমানে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। অন্ধকার না হলে দেখা যেত অপরাহ্নে যে অশ্বারোহী নির্জন জগন্নাথ সড়কে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিলেন, এই ‘গুহারিআ’ সেই অশ্বারোহী।

স্বগতোক্তির মত তিনি আপন মনে ব’লে চলেছিলেন : “না, না, আমার মানের প্রয়োজন নেই, তোমারি মান থাকুক জগন্নাথ! তোমার মান রক্ষার জন্যই তো আমি জেনে শুনে তোমার কাছ থেকে দূরে সরে আছি। তবু তোমার শ্রীভুজের সেই থোপা থোপা ‘দঅনা’[3] ফুলের সুগন্ধ ভেসে আসে, তবু তোমার পদ্মপলাশ লোচন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে, বলে: আমি মহামরণ, আমি মহামুক্তি! ফিরে আয় রে অবোধ সব অভিমান ভুলে, এইখানে শান্তি, এইখানে মোক্ষ, পুনর্জন্মের ব্যূহ ভেদ ক’রে এইখানে নীল নির্বাণ!...সমস্ত পথ আমার কেবল কাঁটায় ভরা, কিন্তু নিজের হাতেই তো সে কাঁটা আমি ছড়িয়েছি জগন্নাথ! তবু আমার খেদ নেই সন্তাপ নেই, জগন্নাথ! তোমারি মান থাকুক, উৎকলের মান থাকুক, আমি বরং পতিত হই।”

1. মেঘনাদ পাচেরি— মন্দির রাজবাড়ি বা গড়ের চৌহদ্দির সুউচ্চ প্রাচীর।

2. গুহারিআ— যে দেবতার কাছে ‘গুহারি’ অর্থাৎ অনুযোগ ও নালিশ জানায়।

3. দঅনা— দমনক বা নাগদমনক পুষ্প, যা কৃষ্ণ ও বলরাম কংসের উদ্যান থেকে চুরি করেছিলেন (‘ওডিয়া ভাষাকোষ’)।

মেঘলা চাঁদের আলোয় শ্রীমন্দিরের চূড়ায় নীলচক্রের পানে চেয়ে গুহারিআর হঠাৎ মনে পড়ল অতীতের এক স্মৃতি। বয়স তখন তাঁর তেরো কি চৌদ্দ। এক ভয়ঙ্কর ঝড় হয়ে গেছে সে বছর। ঝড়ে দেউলগুলির চূড়া থেকে চক্র সব ভেঙে নীচে এসে পড়েছিল। এখনও মনে পড়ে সে সময় লোকমুখে শোনা সেই আতঙ্কের কথা— সেদিন সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ের রাতে। শ্রীমন্দিরের নীলচক্র ভেঙে নাকি ভণ্ড গণপতির[1] দেউলের কাছে উড়ে এসে পড়েছিল। মনে পড়ে তাই শুনে খুনাখলা গড় থেকে পিতার সঙ্গে ঘোড়ায় চ'ড়ে তিনি পুরী এসেছিলেন। সেই অশুভ লক্ষণ দেখে দেশে আবার মোগল হাঙ্গামা লাগবে ব'লে চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছিল।

'গুহারিআ'র চোখের সামনে ভেসে উঠল মহারাজ দিব্যসিংহ দেবের ছায়ামূর্তি। আজানুলম্বিত দুই বাহুতে অভয়, বিশাল বক্ষে স্পর্ধিত বিস্তার, দুই প্রশান্ত চক্ষুতে অতল গভীরতা।

সত্য সত্যই সে বৎসর নায়েব-নাজিম সুজা খাঁ খোর্ধা আক্রমণ করল। কিন্তু দিব্যসিংহ দেব সুজা খাঁর ফৌজকে সারঙ্গ গড় পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন। মোগলের হাঙ্গামা কেটে গেলে মন্দিরের চূড়ায় মহারাজ দিব্যসিংহের 31 'অঙ্কে' আবার বসানো হয়েছিল বর্তমান নীলচক্র।

দধিনউতির[2] উপরে মহাদীপ তুলে 'চিনরা'রা সেদিন ডাক

1. ভণ্ড গণপতি— উৎকলরাজ পুরুষোত্তম দেব কাঞ্চির রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাঁর গণপতি-বিগ্রহকে নিয়ে এসে স্থাপনা করেছিলেন, তিনিই ভণ্ড গণপতি ব'লে খ্যাত।

2. দধিনউতি— ওড়িশার মন্দিরের চূড়ার দধিভাণ্ডের আকৃতিবিশিষ্ট অংশ, যার উপরে ত্রিশূল চক্র প্রভৃতি বসানো থাকে।

পেড়েছিল—"মহাপ্রভু, মহারাজ দিব্যসিংহ দেবকে শঙ্খে পুরে চক্র আড়ালে রাখ হে মহাপ্রভু—।"

আজও মহাদীপ উঠবে।

কিন্তু 'চিনরা'রা আজ নাকি ডাক পাড়বে বকশী বেণু ভ্রমরবর হরিচন্দন মহাপাত্রের নামে।

খোধার রাজা আজ আপন রাজ্য হতে আপন হাতে নির্বাসিত !

বাদুড়ের ডানার মত নীরব সন্ধ্যা নেমে আসছিল মেঘলা জ্যোৎস্নার ম্লানিমা মাখানো নিজন 'বড় দাণ্ডে'র[1] উপরে। দূরে দেবদারু আর নারকেল গাছের মাথাগুলি দেখাচ্ছিল উদাসীন অবধূতদের রুক্ষকেশ মস্তকের মত। চারিদিকে প্রেতপুরীর নীরবতা। উৎকর্ণ হয়ে শুনলেও কোথাও একটি শব্দ শোনা যায় না— না সন্ধ্যার শাঁখ, না আরতির ঘণ্টা, না শিশুর ক্রন্দন !

মন্দিরের দক্ষিণ দিকের গলির ভিতরে 'গুহারিআ' তাঁর ঘোড়াটি বেঁধে রেখেছিলেন। কেবল সেই ঘোড়ার পা ঠোকার শব্দ ভিন্ন আর কোনো শব্দ নেই কোনো দিকে।

সান (-অ) পরিছা[2] বিষ্ণু পশ্চিমকবাট মহাপাত্র কি সংকেত বিস্মৃত হয়েছেন ? সংকেত অনুসারে তাঁর তো এখন এইখানে আসার কথা ছিল !

গুমটির মধ্যে বাঁ পাশের বেদীর উপরে ইতিমধ্যে পিতলের প্রদীপে আলো জ্বলে উঠেছে। দ্বারপাল বীর হনুমানের সিন্দূরলিপ্ত

1. বড় দাণ্ড— পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত স্থান ও রাজপথ। দাণ্ড অর্থে সদর রাস্তা বা প্রকাশ্য স্থান।

2. সান (উচ্চারণ অকারান্ত) পরিছা— জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান সেবাধিকারিক দুইজন : বড় পরিছা ও সান (অর্থাৎ ছোট) পরিছা।

বিরাট প্রস্তর মূর্তি দীপালোকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। বেদীর নীচে দুই জন দেউলজাগা পাইক দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে ব'সে ভাঙ্গের নেশায় ঢুলতে ঢুলতে পাহারা দিচ্ছে। দৈনিক মালকুস্তিপুষ্ট দেহের পেশীগুলি তাদের বন্দুকের মত নিটোল। পরনে কৌপীন, অনাবৃত দেহ। নাভির নীচে আঁটা এক একখানি গামছা, তাতে তাদের পৃথুল উদর পৃথুলতর ক'রে তুলেছে।

মোগল-হাঙ্গামার ভয়ে দূরদেশী যাত্রীরা সকলে শ্রীক্ষেত্র ছেড়ে চ'লে গেছে, নইলে সাধারণতঃ তারা ঝুলন পর্যন্ত থাকে। হিন্দুবিদ্বেষী তকী খাঁ নায়েব-নাজিম হয়ে আসা অবধি সকলের মনে এক আতঙ্ক বাসা বেঁধেছে। তাই আজ 'পঞ্চকোশী' যাত্রীটিরও দেখা নেই। ক্ষেত্রবাসী নিত্যনৈমিত্তিক দর্শন-অভিলাষীরা ভিন্ন আর কেউ প্রায় মন্দিরের ভিতরে যাওয়া আসা করছিল না। অশরীরী ছায়ার মত তাদের নীরব প্রবেশ ও প্রস্থান সেই নির্জনতাকে যেন আরো নিবিড় করে তুলেছিল।

কোনো যাত্রীর পদশব্দ কানে গেলে দেউলজাগা পাইকেরা ঈষৎ চঞ্চল হয়ে ঢুলুনি ভেঙে পাশে রাখা মুগুরের বাঁটে হাত রাখছিল, কিন্তু যারা মন্দিরে আসছিল তারা প্রায়ই দুই এক গৌড়দেশীয় বৈষ্ণব— নয়তো বা ক্ষেত্রবাসিনী বৃদ্ধা ম্লেচ্ছদের হাতে যাদের নারীত্ব লুণ্ঠিত হবার ভয় নেই। কম্পিত শিথিল কণ্ঠে 'প্রভু প্রভু' ডাক ছেড়ে যখন তারা গুমটির মধ্যে ঢুকছিল তখন সেই দেউলজাগা মল্লযুগলের মুখ বিরক্তির রেখায় কুঞ্চিত হয়ে উঠছিল!

একজন গলা খাঁকার দিয়ে একবার উঠে বাইরে এল। সিংহদ্বারের সামনে বড় দাণ্ড নির্জন। বড় দাণ্ডের দুই ধারের গৃহ ও মঠে আলোর একটি রেখাও নেই। আকাশে মেঘ আর অন্ধকার বাড়ছে।

হাওয়াটা গায়ে হঠাৎ ঠাণ্ডা ঠেকল।

সিংহদ্বারের গুমটির মধ্যে সন্ধ্যাদীপের আলো বাতাসে নেচে উঠল। সেই অস্পষ্ট আলোয় সিংহদ্বারের পাশে দণ্ডায়মান 'গুহারিআর' ছায়ামূর্তি দেখতে পেয়ে পাইক হেঁকে বললে—"কেরে বেইপো[1] ওখানে চোরের মত দাঁড়িয়ে?"

'গুহারিআ'র আপাদমস্তক উত্তেজনা ও আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। তিনি নিরুত্তরে পূর্ববৎ দাঁড়িয়ে রইলেন।

অন্য পাইকও কোমরে গামছা কষতে কষতে বাইরে এসে 'গুহারিআ'র দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে, তার পর বললে, "আরে, ও 'বেহপো' কাপালিক রে। ওর সঙ্গে লাগিস্ নিতে, এখনি যদি 'ধ্বংস হয়ে যা' বলে ঝোলার ভিতর থেকে এক মুঠো বাইতঙ্ক[2] বিচির গুঁড়ো ছিটিয়ে দেয় না, সারা গা হুতাশনের মত জ্বলবে রে!"

কাপালিকেরা জগন্নাথ ভক্ত হলেও সাধারণতঃ মন্দিরের ভিতরে যায় না। তাই দেউলজাগা পাইকেরা সেদিকে আর বিশেষ দৃষ্টি না দিয়ে তাদের জায়গায় ফিরে গেল।

গুহারিআর মুখের রেখাগুলি আত্মবিদ্রূপে কুঞ্চিত হল।...'বেইপো কাপালিক!'...হুঁ, কাপালিক এই আর কি?

কয়েকটি স্থানীয় যাত্রী আরতি দেখতে মন্দিরে আসছিল। চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে তাদের কথাবার্তা দূর থেকেও শোনা যাচ্ছিল। 'গুহারিআ' উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলেন।

একজন বলছিল, "আবার মোগল-হাঙ্গামা শুরু হবে এ বাজে কথা হে। গজপতি মহারাজা রামচন্দ্র দেব তো মুসলমান হলেন,

1. বেইপো— পুরী অঞ্চলের অশিষ্ট গালি বিশেষ।
2. বাইডঙ্ক (উচ্চারণ অকারান্ত)— আলকুশী।

যবনীর হাতে মাংস খেলেন, কলমা পড়লেন— নায়েব-নাজিম তকী খাঁর হলেন ভগ্নীপোত। মোগলে আর ওড়িশা আক্রমণ করবে কেন ?"

অন্য একজন টিপ্পনী কাটলে, "রাজা না হয় মুসলমান হয়ে রক্ষা পেলেন, জগন্নাথ আর রক্ষা পেলেন কই ? রক্তবাহু থেকে কালাপাহাড় পর্যন্ত যত লোকে ওড়িশা আক্রমণ করলে জগন্নাথকে জয় না করা অবধি ওড়িশাকে জয় করতে পারলে কে ? সেজন্য কলমা প'ড়ে রামচন্দ্র দেব রক্ষে পেতে পারেন, কিন্তু জগন্নাথ রক্ষে পাবেন কেমন করে ?"

প্রথমে যে কথা বলেছিল তার গলায় শোনা গেল : "বেণু ভ্রমরবর গজপতি রাজা হলে, কে জানে, হয়তো জগন্নাথের মান রক্ষা হতে পারে। জগন্নাথ কি তাই করবেন ? কে জানে, তাঁর মায়া তিনিই জানেন !"

সিংহদ্বারের কাছে এসে যাত্রীরা প্রথমে 'সংকডুইটির পাদস্পর্শ ক'রে সেই হাত মাথায় ঠেকিয়ে তার পর নিজের গালে চড় মারতে মারতে গুমটির ভিতর ঢুকল।

ভিতর থেকে দেউলজাগা একজন খেঁকিয়ে উঠল : "আরে এখানে কড়ি ফেল্, জাগা হনুমানের কাছে কড়ি না ফেলে টঙটঙিয়ে সিধে দর্শনে চলে যাস্ যে বড় !— বেইপো পচ্ছিমে যাত্রী এবার গুণ্ডিচায়[1] (রথযাত্রায়) যা জমেছিল 'গঙ্গা' পূর্ণিমা পর্যন্ত দিব্যি রোজগার চলত। তা না, এখন বড় দাণ্ডে ঘুঘু চরছে। এবার রথে

1. গুণ্ডিচা— জগন্নাথের প্রতিষ্ঠাতা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের রানী, যাঁর নামে গুণ্ডিচা মন্দির নির্মিত; জগন্নাথ রথযাত্রা ক'রে সেইখানেই যান, তাই রথযাত্রার অন্য নাম গুণ্ডিচা যাত্রা বা সংক্ষেপে গুণ্ডিচা।

যত যাত্রী হয়েছিল এত যাত্রী দিব্যসিংহ দেবের আমলের পর আর তো দেখি নি।"

অন্য জন ভাঙের নেশা-জড়ানো গলায় ফোড়ন দিলে: "আরে বুঝলি না মিতে, বেণু ভ্রমরবর গুণ্ডিচা মন্দিরে যে নতুন জগমোহন তুলিয়েছেন, যাত্রী হয়েছিল তাই দেখবার জন্য! ঠাকুরের এত বড় ভক্ত থাকতে ম্লেচ্ছ একটা কিনা বসল গজপতির গদিতে, বেণু ভ্রমরবর যে তিমিরে সেই তিমিরে!"

পাইক দু'জন আবার ঢুলতে লাগল। বাইরে সেই গুহারিআ মেঘে ঢাকা আকাশের পানে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ঘন মেঘের ভিতর থেকে একটি কেবল তারা কখন উঠে উঁকি মারতে লাগল।

সেই তারাটিতে ফুটে উঠল যেন বহু বিনিদ্র রজনীর শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালাভরা সেই এক দুশ্চিন্তা: বেণু ভ্রমরবর হরিচন্দন মহাপাত্রকে কেন্দ্র ক'রে ওড়িশার দিকে দিকে আজ জয়জয়কার। তিনিই নাকি কেবল খোর্ধার সেই বংশের মর্যাদা বজায় রাখবেন, জগন্নাথের মহিমা রক্ষা করবেন।

বেণু ভ্রমরবরের পিতা ভগবান ভ্রমরবর, মহারাজ হরেকৃষ্ণদেবের দেওয়ান ছিলেন। শ্রীমন্দিরের ভোগ আসার জন্য 'রোষঘর'[1] থেকে মন্দিরের ভিতর বরাবর 'অছিণ্ডা পাবচ্ছ'[2] তিনিই গড়িয়েছিলেন। বকশী বেণু ভ্রমরবর তাঁর বিজাত পুত্র, তিনি এখন গুণ্ডিচা মন্দিরের জগমোহন তুলিয়েছেন, আবার জগন্নাথের কাছে দৈনিক 'বকশী ভোগের' ব্যবস্থাও করেছেন। এই কীর্তির জন্য তিনি নাকি তৃতীয়

1. রোষঘর (উচ্চারণ অকারান্ত)— রসুইঘর, রন্ধনশালা।

2. অছিণ্ডা পাবচ্ছ—সিঁড়ি বা ধাপের বদলে একনাগাড়ে ঢালু পথ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন। যাত্রীসংগ্রাহক গোমস্তাদের মারফতে তিনি এই কথা ওড়িশার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রচার করছেন।

তকী খাঁর মত দুর্দান্ত নায়েব-নাজিম, যে শ্রীক্ষেত্রের দিকে শ্যেনদৃষ্টি মেলে বসে আছে, তার চোখে ঠুলি এঁটে গুণ্ডিচা বাড়ীতে জগমোহন গড়ানো তো সহজ কথা নয়, কিন্তু বেণু ভ্রমরবর সেই অসাধ্যসাধন করেছেন। তেলেঙ্গা মুকুন্দদেবের কাল থেকে মুগুনি পাথরের যে সব থাম গুণ্ডিচা মন্দিরের প্রাঙ্গণে প'ড়ে ছিল, ওড়িশার একশ দেড়শ বছরের ভুলে যাওয়া ইতিহাসের মত, বকশী বেণু ভ্রমরবর সেই থামগুলি তুলে তাই দিয়ে জগমোহন গড়ালেন। সে কি সহজ কাজ! দিনে সব চুপচাপ, রাত্রে দেউল তোলা। শত শত কারিগর কয় রাত্রির মধ্যে এত বড় জগমোহন গ'ড়ে তুলল। যাত্রী-। গোমস্তাদের এমনি সব সত্য মিথ্যা মেশানো বর্ণনায় বেণু ভ্রমরবরের যশোগান লোকের মুখে মুখে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছড়িয়ে গেল।

এ সবের উপর এবার বকশী বেণু ভ্রমরবর রথের সময় 'ছের পহঁরা'[1] করলেন। রাজা ম্লেচ্ছ, পতিত; তাই না তিনি 'ছেরা পহঁরা' করবেন না, কিন্তু তাঁর বদলে 'জেনামণি'[2] ভাগীরথীকুমার তো 'ছেরা পহঁরা' করতে পারতেন। কিন্তু তা কই হল? 'বড় পরিছা'[3] গৌরী

1. ছেরা পহঁরা— রথ টানার আগে রথের উপরে উঠে সেখানে সুগন্ধী জলের ছড়া দিয়ে ঝাঁট দেওযা। জগন্নাথের রাজসেবক হিসাবে গজপতি রাজাকে এ কাজ স্বহস্তে করতে হয।

2. জেনামণি— রাজকুমারের পদবী।

3. বড় পরিছা— জগন্নাথ মন্দিরের দুই প্রধান সেবাধিকারিকের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ। অন্যজন সান (-অ) অর্থাৎ ছোট পরিছা।

রাজগুরু সব নাটের গুরু গোবধন! তিনিই সুর তুললেন: বড় জেনা (বড় রাজকুমার) নাবালক। 'ছেরা পহঁরা' করলেন বকশী বেণু ভ্রমরবর। যা এ অবধি ছিল রাজসেবকরূপে গজপতির এক বহু সম্মানিত বিশেষাধিকার, রামচন্দ্র দেব তা থেকে এমনিভাবে বঞ্চিত হলেন। আর বঞ্চিত করলেন বেণু ভ্রমরবর।

আকাশে মেঘের মাঝখানে সেই তারার দীপ্তিতে ফুটে উঠেছিল ভ্রমরবরের দুই চোখের হিংস্র ঔজ্জ্বল্য, দন্তাঘাত করবার জন্য সে যেন সুযোগ খুঁজছে। চেহারায় বিনয়ী নম্রতা, 'তরোরপি সহিষ্ণুতা' ভাব। কপালে হরিমন্দিরের তিলক ফোঁটা, মুণ্ডিত মস্তক, গলায় রুদ্রাক্ষ ও তারি সঙ্গে তুলসীমালা, মুখ গুম্ফশ্মশ্রুহীন, কেবল চোখ দুটি অতি ভয়ঙ্কর।

মেঘ ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছিল।

সেই প্রথম তারাটির পাশে আর একটি তারা কখন ফুটে উঠেছিল— খোর্দার আকাশে দুশ্চিন্তার সে দ্বিতীয় নক্ষত্র: জেনামণি ভাগীরথীকুমার রায়।

রাত বাড়ছে। 'সন্ধ্যাধূপের'[1] 'কাহালি'[2] তবু বাজল না। মোগলের হাঙ্গামা লাগবে শোনা যাওয়া অবধি শ্রীক্ষেত্রের দেউলগুলিতে আরতির বাজনা আর বাজছে না। অশরীরী ভয় অন্ধকারের লোমশ হাত বাড়িয়ে চারিদিক থেকে এগিয়ে আসছে।

খোর্দার চতুর্দিক থেকে আজ সর্বনাশের জাল ক্রমে ঘিরে আসছে। দক্ষিণে চিকাকোলের ফৌজদার রঘুনাথপুর-টিকালী থেকে চিলিকা পর্যন্ত ভূখণ্ড অধিকার করার পরেও তার ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয় নি। উত্তরে

1. ধূপ— ভোগ ও আরতি।
2. কাহালি— তূরী।

তকী খাঁ খোর্ধার উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে কেবল সুযোগের অপেক্ষায় আছে। এদিকে ঘরে দুই গৃহশত্রু— বেণু ভ্রমরবর আর ভাগীরথীকুমার রায়!

'সান পরিছা' বিষ্ণু পশ্চিমকবাট মহাপাত্র সঙ্কেত বিস্মৃত হলেন নাকি? 'গুহারিআ'র ক্রমে ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল।

নির্বিঘ্ন নিশুতি চিরে মন্দিরের ভিতর থেকে সহসা শঙ্খ, ভেরী মহুরি,[1] বাঁশী, রাবা,[2] কাঁসর, ঘণ্টা, শিঙ্গা ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি আরতির বাদ্য বেজে উঠল। উত্তাল সমুদ্র-গর্জনের মত বহু কণ্ঠের নিনাদ ভেসে এল— "মণিমা[3] মহাবাহু, চক্র আড়াল কর হে—!"

কোনো ক্ষুদ্র যাচ্ঞা নেই, তুচ্ছ প্রার্থনা নেই, অনন্ত মহাশূন্যের অসীমতার মধ্যে বিলীন হয়ে যাবার জন্য সান্ত সসীমের সে যেন উত্তাল আকুতি— "হে মণিমা মহাবাহু—!"

'গুহারিআ' আর চোখে যেন কিছু দেখতে পেলেন না, কানে কিছু শুনতে পেলেন না। এক উত্তুঙ্গ লহরী দুই বাহুতে তাঁকে তুচ্ছ ভয়-ভাবনা দুশ্চিন্তা-আশঙ্কার কর্দমপঙ্ক হতে তুলে যেন অভয়লোকের দিকে নিয়ে গেল।

আকাশে মেঘের অন্ধকার আর নেই। শত সূর্যের দীপ্তিতে শ্বেতকমল বনের মত তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তার পটভূমিতে 'বলিআরভুজে'র[4] দুই মহা বাহু যেন অভয়মুদ্রায় উত্তোলিত। কাল-

1. মহুরি— সানাই।

2. রাবা— বড় ঢাক।

3. মণিমা— প্রভু, দেবতাকে সম্বোধন। রাজা ও রানীকেও এই সম্বোধন করা হয়।

4. বলিআরভুজ (উচ্চারণ অকারান্ত)— জগন্নাথ; বলিআর অর্থে বলীয়ান্।

স্রোতের মহাঘূর্ণি তাঁর পদতলে শত শত দুর্গপ্রাচীর ভূলুণ্ঠিত ক'রে, শত সহস্র সিংহাসন ও মুকুট ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে ডুবিয়ে উঠিয়ে আর্তনাদ আবার হর্ষরোলের মধ্যে প্রখর কলনাদ ক'রে বয়ে চলেছে। ইতিহাসের সেই দুর্নিবার স্রোতেব মধ্যে কে জিতল কে হারল, কে মুক্ত কেই বা পতিত— সব নিতান্ত তুচ্ছ! সে কলরোলের ঊর্ধ্বে অনন্ত প্রশান্ত অভয়মুদ্রাঙ্কিত করপল্লবে উদবোধন : ভয় নাই, ভয় নাই, এ রাত্রিরও প্রভাত আছে।

'গুহারিআ' সম্মোহিতের মত "মণিমা! মণিমা।" ব'লে ডেকে উঠে বড়দাণ্ডের ধুলোর উপরে লুটিয়ে পড়লেন।

কতক্ষণ প'ড়ে ছিলেন তাঁর জ্ঞান ছিল না। হঠাৎ কার মৃদু করস্পর্শে তাঁর সম্মোহিত তন্দ্রা যখন ছুটল চাবিদিক আবার তখন আবছা মেঘলা অন্ধকাব আর নিস্তব্ধতার মধ্যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে।

সান পরিছা বিষ্ণু পশ্চিমকবাট মহাপাত্র 'গুহারিআ'র উপব ঝুঁকে প'ড়ে ব'সে অনুচ্চ কণ্ঠে বলছিলেন : "এখানে এমনি ক'রে প'ড়ে আছেন? পিপিলীর ফৌজদারের কোনো গুপ্তচর দেখে ফেললে সর্বনাশ হবে!"

'গুহারিআ' প্রকৃতিস্থ হযে সতর্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহাদীপ উঠবে কখন?"

সান পরিছা বললেন, "মোগল-হাঙ্গামা কেটে না যাওয়া অবধি মহাদীপ তোলা আমি বন্ধ ক'রে দিয়েছি। তাতে দুই কাজই হবে।"

'গুহারিআ' বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, "কিন্তু এই সামান্য কারণে একাদশীতে মহাদীপ তোলা বন্ধ ক'রে দিলে?"

সেখানেই সেই অবস্থায় আর বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ ছিল না। সান পরিছা বললেন, "ঘোড়াটা বালিসাহীর মোড়ে বাঁধা আছে।

আপনি সাত-লহরী মঠের কাছে চলুন। আমি দেউলের 'নীতি'[1] সেরে পরে আসছি।"

3

একাদশীর চাঁদ এক মেঘের আড়াল থেকে আর এক মেঘের আড়ালে কেবলি হারিয়ে যাচ্ছিল— খোর্ধার ভোই বংশের বিড়ম্বিত ইতিহাসে সৌভাগ্য আর দুর্ভাগ্যের লুকোচুরি খেলার মত।

উত্তর ওড়িশার বিদ্রোহী আফগান পাঠানরা যখন মোগল রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে জোট বাঁধত, অথবা বাংলা সুবার উপরে আচমকা কোনো আক্রমণ হত, কিংবা দিল্লীতে মোগল মসনদ-আকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে অনবরত শীতল স্নায়ুযুদ্ধ হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠত সম্মুখ যুদ্ধে, সেই সময়ে কটকের নায়েব-নাজিমরা ওড়িশার উত্তর সীমান্ত আগলাতে ব্যস্ত থাকত ব'লে খোর্ধার রাজারা দু'দণ্ড নিশ্বাস ফেলতে পারতেন। শ্রীক্ষেত্রের দেউলগুলি তখন ধোপদুরস্ত করা হ'ত, বারো মাসে তেরো পার্বণ আবার সাড়ম্বরে শুরু হত। আর, তা না হ'লে অন্য সময়ে আত্মরক্ষার দায়ে খোর্ধার রাজধানী অখ্যাত অজ্ঞাত জনপদে ইতস্তত: ঘুরে বেড়াত— যাযাবরের ভ্রাম্যমাণ শিবিরের মত। দুরন্ত ছেলেকে ঘুম পাড়াতে মায়েরা ঠানদিদিরা গাইত কোন জানপদ কবির ঘুমপাড়ানী গান :—

> 'মেঘ-অ বরষিলা টপর (-অ) টপর (-অ)
> কেশুর (-অ) মহিলা গজা
> কেউঁ রাইজা (-অ) রে বহিলে মো রজা
> তেলেঙ্গী বাইদ বজা।'

1. নীতি - মন্দিরের নিত্যকর্তব্য কর্ম।

[বৃষ্টি পড়ল টাপুর টুপুর
কেশুর গজালো
কোন রাজ্যে রইলেন মোর রাজা
তেলেঙ্গী বাদ্য বাজা।]

স্বয়ং জগন্নাথও এ যাযাবরত্ব থেকে সে সময় মুক্ত থাকতেন না। যবন আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কখনও দোবন্ধার পথ দিয়ে গিয়ে নৌকায় উঠে চিলিকার ভিতরে, আর কখনও বা চতুর্দোলায় চ'ড়ে দক্ষিণ ওড়িশার অরণ্যে তাকে আত্মগোপন করতে হত। এর জন্য সেবকগণের মধ্যে 'চাপ[1] দলাই আরিআ সেবক' নামে এক স্বতন্ত্র বৃত্তিভোগী সেবক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রয়োজন হ'লে জগন্নাথকে সহসা শ্রীক্ষেত্র হতে চিলিকার ভিতরে স্থানান্তরিত করার জন্য সারা বছরই চিলিকার দুটি মোহানা মাণিকপাটনা ও খালকাটি পাটনায় নৌকো সাজিয়ে প্রস্তুত থাকাই ছিল তাদের কাজ। ইঙ্গিত মাত্রেই তারা দোবন্ধার ঘাট থেকে পরমেশ্বরেব বিগ্রহ নৌকায় তুলে চিলিকার ভিতরে নিয়ে যেতেন।

আর এদিকে, কখনও রণপুরের সীমানায় মাণত্রী, কখনও খণ্ডীআপড়ার বোলগড, কখনও চন্দনপুব আব কখনও বা দাণ্ড-মুকুন্দপুর নয়তো কপিলেশ্বরপুর-শাসন প্রভৃতি অখ্যাত পল্লীগ্রামে খোধার নরপতি আপন মান বাঁচিয়ে ঘুরে বেড়াতেন।

দিব্যসিংহ মহারাজের 24 'অঙ্কে' নবাব সুজা খাঁ যুদ্ধে পরাস্ত হওয়া অবধি এ সব বন্ধ ছিল। কিন্তু হিন্দুবিদ্বেষী তকীখাঁ নায়েব-নাজিম হয়ে কটক আসার পর থেকে আবার তা শুরু হল।

'সান পরিছার' অপেক্ষায় সাত-লহরী মঠের কাছে সমুদ্রসিকতায়

1. চাপ (উচ্চারণ অকারান্ত)—সুসজ্জিত বড় নৌকা।

পাদচারণা করতে করতে 'গুহারিআ' মনে মনে ইতিহাসের এই সমস্ত গতি ও দুর্গতির আলোচনা করছিলেন।

সম্মুখে অন্ধকার সমুদ্র। আকাশ মেঘাবৃত। দিক্‌চক্রবালের উপরে একটি নীলাভ রেখা আকাশ ও সমুদ্রের মধ্যে ক্ষীণ ব্যবধান সূচিত করছিল— সকল অন্ধকারের সীমান্তে আলোর সম্ভাবনার মত ফেনচূড় লহরীর বিশাল জলপ্রাচীর বেলাভূমিকে গ্রাস করবার জন্য একটির পর একটি ক্ষেপা মহিষের মত ছুটে আসছিল। বেলাভূমির দিক থেকে যে সব ফেনকিরীটহীন খর্বকায় ঢেউ প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল তারা সেই মত্ত দিঙ্‌নাগদের দন্তাঘাতে মরণান্তক আর্তনাদ ক'রে আবার বেলাভূমির উপরে এসে আছড়ে পড়ছিল।

আক্রমণ ··· আত্মরক্ষা ··· পরাজয়!

আত্মরক্ষা ··· আক্রমণ ··· পরাজয়!

খোধার ইতিহাসের বিড়ম্বনার পৌনঃপুনিকতার মত এই ঢেউ-গুলির উত্থান ও পতন, অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরণের বিরাম ছিল না। চারিদিকে কি এক বিষণ্ণ পরিবেশ!

আগন্তুক 'গুহারিআ' সাত-লহরী মঠের দিকে ফিরে এলেন, কিন্তু 'সান পরিছা'র তখনও দেখা নেই।

ম্লান পানসে চাঁদের আলোয় সাত-লহরী মঠ একটা অন্ধকারের জঞ্জাল স্তূপের মত দেখতে লাগছিল।

গজপতি প্রতাপরুদ্র দেবের আদেশে পুরী শ্রীক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত হয়ে শূন্যবাদী সন্তকবি জগন্নাথ দাশ এইখানে স্থাপনা করেছিলেন তাঁর সাধনপীঠ। কিংবদন্তী বলে, জগন্নাথের সাধনবলে সমুদ্র সেদিন সাত লহরী পিছু হটে গিয়ে রাজার দণ্ড ও নিগ্রহের

বাহিরে সৃষ্টি করেছিল এক সাগরোদ্ভূত ভূমি। 'অতিবড়ী'[1] জগন্নাথ দাশ এইখানেই নিয়েছিলেন জীবন্ত সমাধি। এখন কিন্তু অতিবড়ী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শূন্যসাধনা পরিত্যক্ত, প্রেমভক্তির স্বাচ্ছতার মধ্যে তা প্রায় লুপ্ত। সে সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব সাধক ও ভক্তেরা ফিরে গিয়েছিল শ্রীক্ষেত্রের ভোগৈশ্বর্যময় মঠবাড়ীগুলিতে। সাত-লহরী মঠটি তাই কাঁটালতা আর ফণীমনসার বনের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে ছিল। বালিয়াড়ির ভিতর থেকে সেদিকে তাকালে মঠের মন্দিরের ঊর্ধ্বভাগ ভিন্ন আর কিছু দেখা যেত না। উদাসীন সন্ন্যাসী নচেৎ ভবঘুরে ভিখারীরা কখনো কখনো সেখানে আশ্রয় নিত।

সেই মন্দিরের নিকটবর্তী হয়ে আগন্তুক লক্ষ্য করলেন ভিতর থেকে ক্ষীণ আলোর একটি অস্পষ্ট রেখা মন্দিরের সোপানশ্রেণীর উপরে এসে পড়েছে। আগন্তুক ক্ষণেক থমকে দাঁড়ালেন, তার পর 'সান পবিছা' হয়তো ইতিমধ্যে এসে মন্দিরের মধ্যে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন ভেবে আবার এগলেন। কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ ক'রে তিনি চমকে উঠলেন: জগন্নাথ দাশের সমাধি-বেদীর নীচে শতছিন্ন শয্যায় এক মুমূর্ষু বৃদ্ধের কঙ্কালসার দেহ শায়িত। সমাধির উপবিস্থ মৃৎপ্রদীপের ক্ষীণ আলোক ভিতরের ভৌতিক পরিবেশকে আরো ভয়াবহ ক'রে তুলেছিল। সেই মুমূর্ষু আলো বৃদ্ধের দুই চক্ষুতে প'ড়ে জীবনের ক্ষীণ সূচনা দিচ্ছিল মাত্র। তার কণ্ঠে তুলসীর মালা, কপালে তিলক চন্দন। শিয়রে জগন্নাথের চিত্রপট আর একটি লাল বেতের ছড়ি। কাছে প্রসাদী তুলসী বেলপাতা, কয়েকটি ফুল, মহাপ্রসাদ আর 'কুড়ুআ'তে[2] এক কুড়ুআ প্রসাদ।

1. অতিবড়ী— অতি বড়, সন্তকবি জগন্নাথ দাশকে শ্রীচৈতন্য এই নাম দিয়েছিলেন।

2. কুড়ুআ— মাটির গভীর পাত্র যাতে মন্দিরের ভোগ পাক হয়।

আগন্তুকের পদশব্দে বৃদ্ধ ঘাড় বেঁকিয়ে তাঁর দিকে চাইলেন। তাঁর গলায় শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ানি সেই ভৌতিক পরিবেশকে ঘনীভূত করল।

'সান পরিছা' কই? এই মুমূর্ষু বৃদ্ধই বা কে? আগন্তুক কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই সময় একটি পঁচিশ ত্রিশ বৎসর বয়সের যুবা ঘুম-ভাঙা চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসে সেখানে উপস্থিত হল। চেহারা ও পরিধানে মনে হয় যুবক উত্তর ভারতীয় যাত্রী।

আগন্তুক কিছু বলবার আগেই সেই যুবক পশ্চিমা বুলিতে বললে, "আমরা মুসাফির।" এই বৃদ্ধ কে, এ অবস্থাই বা কেন ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে সে যা বললে তাতে আগন্তুক বুঝলেন তারা বৎসরেক কাল পদব্রজে যাত্রা ক'রে মাত্র গত বাহুড়া দশমীর[1] দিন শ্রীক্ষেত্রে এসে পৌঁছেছে। বৃদ্ধ তার পিতা, রথের উপরে শ্রীজগন্নাথ দর্শন ক'রে শ্রীক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগের আশায় সংসার ত্যাগ ক'রে তিনি বেরিয়েছিলেন। আর এক দিন কি দুই দিনের অপেক্ষা, তার পর তাঁর প্রাণবায়ু উড়ে গেলে স্বর্গদ্বারে ফেলে দিয়ে যুবক তার দেশে ফিরে যাবে।

সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণার বাহিরে সন্তাপহীন এই শ্রীক্ষেত্রের মাটিতে এমনি চোখ বুজবার অভিলাষ নিয়ে আসে অনেকেই, কেবল মহাভাগ্যবানেরই সে অভিলাষ পূর্ণ হয়। বিচিত্র এই দেবতা! তাঁর কাছে মানুষ সৌভাগ্যপ্রাপ্তির মানস করে না, একমাত্র প্রার্থনা এখানে মোক্ষ, মহামরণ, পূর্বজন্মের নাগপাশ থেকে মুক্তি!

বৃদ্ধের নিষ্প্রভ ক্লান্ত দৃষ্টি জগন্নাথের চিত্রপটের দিকে নিবদ্ধ ছিল। নেপথ্যে শোনা যাচ্ছিল সমুদ্রের তুমুল কলরোল।

1 বাহুড়া দশমী— আষাঢ় শুক্লাদশমী, যেদিন বাহুড়া অর্থাৎ উলটোরথ হয়।

সমগ্র হিন্দুজগতে জগন্নাথের প্রতি এমনি অবিচলিত বিশ্বাস। এই বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসকে আশ্রয় ক'রে বেড়ে ওঠা রাজশক্তির দৃঢ় ভিত্তিভূমি এই পুরুষোত্তমক্ষেত্র, দুটিকেই ধূলিসাৎ করবার জন্য তকী খাঁ আজ বদ্ধপরিকর। সে জানে জগন্নাথের মাহাত্ম্য যতদিন থাকবে এই রাজশক্তিও ততদিন অপরাজেয়। তাই শ্রীক্ষেত্র আক্রমণ করবার জন্য আজ তার চরম সঙ্কল্প। তকী খাঁকে সেই সর্বনাশা পণ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্যই তো আগন্তুক নিজে মুসলমান পর্যন্ত হলেন, তা হলে হয়তো বা খোর্ধা রক্ষা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথও রক্ষা পাবেন। কিন্তু তকী খাঁ মহা ধূর্ত, সে ঠিক বুঝে নিয়েছে যে তাঁর ধর্মান্তরগ্রহণ কেবল আত্মরক্ষার কৌশলমাত্র।

আগন্তুক চিন্তান্বিতভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন। ব্যর্থতা, পরাজয় ও বিষাদ থেকে দূরে যাবার যতই চেষ্টা করুন তিনি, সে সব যেন ছায়ার মত সর্বত্র তাঁর অনুসরণ করছে। বাহিরে এসে ফেনিল সমুদ্রতরঙ্গের শীকরসিক্ত শঙ্কাসংশয়মুক্ত উদ্দাম বায়ুতে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

'নীতি' সেরে 'সান পরিছা' যখন সাত-লহরী মঠের কাছে এলেন তখন রাত্রি গভীর হয়েছে। শুক্লাএকাদশীর অস্তগামী চাঁদ পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। আগন্তুককে মঠ থেকে বেরুতে দেখে কাছে এসে অনুযোগমিশ্রিত কণ্ঠে তিনি বললেন, "'ছামু'[1] ঐ দেউলে গিয়েছিলেন তা যদি কেউ লক্ষ্য ক'রে থাকে? শ্রীক্ষেত্রে জিরে ফুটলেও কটকে তকী খাঁর নাকে তার গন্ধ পৌঁছায়[2]। বিভীষণের তো অভাব নেই এখানে।"

1. ছামু— রাজা ও দেবতাকে সম্বোধন।

2. জিরে ফুটলেও নাকে গন্ধ পৌঁছায়— ওড়িয়া প্রবচন; অর্থাৎ টনক নড়ে।

সাত-লহরী মঠের গা ঘেঁষে ঘন ঝাউবন। তাঁরা দুইজনে তার ভিতরে প্রবেশ করলেন। অশ্রান্ত পবনে ঝাউবন সোঁ সোঁ দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। স্থানে স্থানে পাতার ফাঁক দিয়ে মেঘলা জ্যোৎস্না তিল তণ্ডুলের মত ছিটিয়ে প'ড়ে বনভূমিতে আলোছায়ার রহস্য রচনা করেছে। সব মিলে আগন্তুকের অবসাদ ও 'সান পরিছা'র উৎকণ্ঠা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তুলছিল।

শঙ্কিত কণ্ঠে 'সানপরিছা' বললেন, " 'ছামু' ইদানীং বার বার শ্রীক্ষেত্রে আসার খবর তকীর্খার কানে গেলেই তো হয়েছে।"

আগন্তুক তাঁর কাপালিকসুলভ দাড়ি ও গেরুয়া আলখাল্লার ছদ্মবেশ এখন একটি একটি ক'রে ভূতলে নিক্ষেপ ক'রে বললেন, "এ ছদ্মবেশে আর কতদিন চলবে হে মহাপাত্র? এবার সত্যের সম্মুখীন হওয়ার সময় এল।"

আলখাল্লা ত্যাগ করলে দেখা গেল তাঁর পরিধানে সাদা মসলিনের ঢিলা পাজামা ও সাটিনের চাপকান। কোমরে জরিমোড়া কটিবন্ধ ম্লান জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক ক'রে উঠল। মুখমণ্ডল থেকে ছদ্মশ্মশ্রু অপসারণের পর তাঁর প্রশস্ত কপাল, খড়্গের মত নাক, বাঁকা শিঙের মত গোঁফ ও চিবুকের নীচে মসৃণ সুবিন্যস্ত শ্মশ্রুতে তাঁর চেহারা স্পষ্ট ও বিশিষ্ট হয়ে দেখা দিল।

'সান পরিছা' সন্ধ্যার সময় সিংহদ্বার থেকে এ পর্যন্ত যে প্রশ্নটি এড়াবার চেষ্টা করছিলেন আগন্তুক এখন হঠাৎ সেই প্রশ্নটি করলেন—"তারপর, কি হল হে মহাপাত্র?"

'সান পরিছা' একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—"হল না।"

আগন্তুকের হঠাৎ কোনো ভাববৈলক্ষণ্য প্রকাশ পেল না। কিন্তু 'সান পরিছা' লক্ষ্য করলে দেখতে পেতেন তাঁর দুই চক্ষু মুহূর্তেকের জন্য জ্ব'লে উঠেই আবার নিবে গেল।

তিনি শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "বিশ্বনাথ বাজপেয়ী কি বললেন ?"

'সান পরিছা' ক্লান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "এক বাজপেয়ী স্বপক্ষে গেলে কি হবে, মুক্তিমণ্ডপে অধিকাংশের মত তাঁর বিপক্ষে গেল।"

সমস্ত ব্যাপারটি নিতান্ত অপ্রীতিকর হওয়ায় 'সান পরিছা' তার আদ্যোপান্ত বিবরণ দিতে কুণ্ঠিত হচ্ছিলেন। কিন্তু আগন্তুক জিজ্ঞাসা করলেন, "তা, বাধা দিলেন কারা ? হরেকৃষ্ণপুর 'শাসনে'র[1] বলদেব তর্কালঙ্কার স্বপক্ষে গেলেন না বিপক্ষে ?"

'সান পরিছা' তিক্ত কণ্ঠে বললেন, "তর্কালঙ্কার ঠাকুর বিরোধ না করলে বাজপেয়ীর কথাই তো থাকত।"

আগন্তুক বললেন, "হু', আমার অনুমান মিথ্যা হবার নয়। তুমি জান হরেকৃষ্ণপুর 'শাসন' কার দান ? না, তুমি জান না। বেণু ভ্রমরবরের পূর্বজগণ এ শাসন বসিয়েছিলেন। তাই এ 'শাসনে'র সমস্ত শাস্ত্রবাক্য বেণু ভ্রমরবরের ইঙ্গিতে উচ্চারিত হয়ে থাকে। কিন্তু বিশ্বনাথ বাজপেয়ী তো তর্কে হটবার পাত্র নন।"

'সান পরিছা' বললেন, "বাজপেয়ী বহু তর্ক করলেন, বহু শাস্ত্রবাক্য নিদর্শন দিলেন। আকবর বাদশাহের সময়ে যে টোডরমল্ল মানসিংহ ওড়িশায় এসেছিলেন তাঁরা বহু যবনীকে অন্তঃপুরে স্থান দিয়েছিলেন, পুনশ্চ তাদের কন্যা ও ভগিনীদের আকবর ও জাহাঙ্গীর প্রমুখ

1. শাসন— ব্রাহ্মণদিগকে সনন্দ দ্বারা প্রদত্ত নিষ্কর ভূমিসংবলিত গ্রাম।

মোগল বাদশাহের সঙ্গে সমর্যাদা বিবাহ দিয়েছিলেন— এ সব কথাই উঠেছিল। এ সব সত্ত্বেও শ্রীমন্দিরে তাঁদের প্রবেশে যদি কেউ আপত্তি না ক'রে থাকে তবে এখন মহারাজের প্রবেশাধিকারে বাধা দেওয়া হবে কেন? তাতে বলদেব যুক্তি দেখালেন: মানসিংহ টোডরমল্ল এঁরা এসেছিলেন বিজেতারূপে, তাঁদের সাতখুন মাফ। বাজপেয়ী ইতিহাসের নিদর্শন দিয়ে বললেন: সূর্যবংশী কপিলেন্দ্রের বিজাত পুত্র পুরুষোত্তম দেব তো আবার জগন্নাথের পরম সেবক ছিলেন। নিম্নবংশীয়ার গর্ভোদ্ভূত হয়েও তো তার জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করায় কোন বাধা হয় নি? বলদেব তর্কালঙ্কার তাতে অট্টহাস্য ক'রে গড় জেতার মত ভঙ্গীতে উচ্চ কণ্ঠে বললেন: আপনি কার সঙ্গে কার তুলনা করছেন বাজপেয়ী মহাশয়? কোথায় তিনি বীরশ্রী গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাট কলবর্গেশ্বর অভিরাএ ভূতভৈরব দুঃসহ দুঃশাসন অনীকরণে রাউতরাএ অতুলবলপরাক্রমে সংগ্রামসহস্রবাহু ধূমকেতু শ্রীশ্রীশ্রীপুরুষোত্তমদেব, আর কোথায়…"

'সান পরিছা' বিষ্ণু পশ্চিমকবাট মহাপাত্র বড় অস্বস্তির মধ্যে নীরব হলেন। বলদেব তর্কালঙ্কার তার পরে যা বলেছিলেন তা অনুমান করা আগন্তুকের পক্ষে আদৌ কষ্টসাধ্য ছিল না। কিন্তু অবিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "তার পর?"

'সান পরিছা' কাজে কাজেই ব'লে চললেন— "তার পর বাজপেয়ী আবার বললেন, যাক্ সে কথা, ম্লেচ্ছী গণিকা করমাবাঈয়ের খিচুড়ি ভোগে তো পরমেশ্বরের স্নেহাসক্তি সবজনবিদিত! তা ব'লে করমাবাঈয়ের খিচুড়ি ভোগে তো মহাপ্রভুর অঙ্গ অপবিত্র হয় নি। তর্কালঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন: গণিকারা সর্বথা ম্লেচ্ছী নয়, তা হলে করমাবাঈকে ম্লেচ্ছী বলব কেমন ক'রে? সে যে প্রভুর

শ্রীঅঙ্গ-খাটানী সেবাদাসী মাহারীদের[1] মতই ছিল না তার কি প্রমাণ আছে? বাজপেয়ী অসহায় কণ্ঠে তথাপি এক যুক্তি দেখালেন: কিন্তু গণিকারা ম্লেচ্ছ যবনভোগ্যা হবে না এমন কোনও নির্দেশ তর্কালঙ্কারের স্মৃতিশাস্ত্রে আছে কি? এই পরিহাসে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে তর্কালঙ্কার কানের কুণ্ডল অযথা আন্দোলিত ক'রে বললেন: কিন্তু যবনভোগ্যা গণিকারা যবনী ব'লে কোন ন্যায়শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে হে বাজপেয়ী মহাশয়? ধরণী বসুন্ধরাও যবনভোগ্যা হয়েছেন ও হচ্ছেন, তাই ব'লে ধরণী কি অস্পৃশ্যা হয়ে গেছেন? গণিকা, গঞ্জিকা, নদী ও মৃত্তিকায় কোনও স্পর্শদোষ নেই।

"মুক্তিমণ্ডপের ষোল 'শাসনে'র অন্য যে সব পণ্ডিতগণ ভাঙের নেশার আমাজের মধ্যে এই উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্ক শুনছিলেন তাঁরা এক এক টিপ নস্য সহকারে তর্কালঙ্কারের সমর্থনে চীৎকার ক'রে উঠলেন— "সাধু—সাধু—!" বাজপেয়ী এবার তত্ত্বের দিক ধরলেন; বললেন, জগন্নাথ সর্বাধার সবহেতুক সর্বময়, আবার তিনি পতিতপাবন দীনহীনমহানীচদয়ার্দ্রীকৃতমানস! শ্রীক্ষেত্র এমন মহিমময় যে এখানে ম্লেচ্ছ যবন তো যবন, গর্দভ পর্যন্ত চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করে—'অহো তৎক্ষেত্রমাহাত্ম্য গর্দভোঽপি চতুর্ভুজঃ' এমন শাস্ত্রবাক্য সত্ত্বে জগন্নাথে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা আরোপ সমীচীন কি? তর্কালঙ্কার উত্তর দিলেন: এ কথা অবশ্য সর্বথাস্বীকার্য, কিন্তু জগন্নাথ কর্তৃক পতিতাদের উদ্ধার আর পতিতাগণের দ্বারা তাঁর সেবা এক কথা নয়। কোনও ধর্মচ্যুত ব্যক্তি, বিশেষতঃ ম্লেচ্ছ যবন, রত্নসিংহাসনে বিরাজিত প্রভুকে স্পর্শ করা হিন্দুধর্ম কদাপি সহ্য করতে পারে না। সভাস্থ 'শাসনী' পণ্ডিতরা সমস্বরে বললেন—"অবশ্য অবশ্য"। বাজপেয়ী মহাশয়ের

1. মাহারী— জগন্নাথ মন্দিরের দেবদাসী।

বংশপরম্পরা ও প্রসিদ্ধি উৎকলবিদিত। তিনি সামান্য 'শাসনী' পণ্ডিতের নিকট এমন পর্যুদস্ত অপদস্থ হবেন ভাবেন নি। তিনি আহত অভিমানে নীরব হবার পরে বল্লভপুর 'শাসনে'র ভাগী পড়িহারী বললেন, এ সব শুষ্ক বিতণ্ডা ত্যাগ করুন তর্কালঙ্কার মহাশয়, আমি যা বলছি তার সমাধান দিন। কথা উঠছে, যবনীসহবাসে পুরুষের পতিত্ত দোষ ঘটে কিনা। ভাই পুরুষোত্তম দেবের যোল 'অঙ্কে' কল্যাণমল্ল কটক সুবার নায়েব-নাজিম হয়ে এসেছিলেন। হিন্দু হলেও তাঁর হিন্দুর আচার ছিল না! জাহাঙ্গীরাবাদ পরগণায় রক্ষিতা ওসমানীবাঈয়ের জন্য তিনি বহু নিষ্কর ভূসম্পত্তি বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলেন। বহুসম্ভোগসমর্থ পুরুষের পক্ষে তা অবশ্য দোষাবহ নয়। শাস্ত্রে উক্ত আছে বীজবিক্ষেপ পুরুষের ধর্ম। তবে যবনী-অঙ্গস্পর্শে কল্যাণমল্ল তো পতিত হন নি, তাঁর সামনে সিংহদ্বার তো বন্ধ ছিল না, রত্নসিংহাসনের সন্নিধানে গিয়ে তিনি তো দেবার্চনা করতেন! আর এখন মহারাজ রামচন্দ্র দেবের বেলা—। পড়িহারীর বক্তব্য শেষ হতে না হতে তর্কালঙ্কার দুই নাকে দুই টিপ নস্য নিয়ে ব'লে উঠলেন: আহাহাহা পড়িহারী মহাশয়, কল্যাণমল্ল কলমা প'ড়ে ওস্‌মানীবাঈকে বিবাহ করেছিলেন না রক্ষিতা ক'রে রেখেছিলেন? ঘোর হিন্দুবিদ্বেষী কল্যাণমল্ল পর্যন্ত কলমা প'ড়ে যবনী বিবাহ করেন নি ছাব মসনদের জন্য! তা, এ রাণী যদি রক্ষিতা ব'লে রাজা বলেন···

বিস্ফোরণধ্বনির মত কণ্ঠে, আগন্তুক গর্জে উঠলেন: "থাক্, ও সব বৃথা আলোচনা শুনে লাভ নেই মহাপাত্র।"

উদ্‌ভ্রান্ত পবনবেগে আলুলায়িত কেশরাশির মত ঝাউবীথির বনপাতার ফাঁকে ম্লান চন্দ্রের দিকে চেয়ে আগন্তুকের মনশ্চক্ষুতে ভেসে

উঠল বনহরিণীর চোখের মত একজনের সুর্মা আঁকা দুটি চোখে অবর্ণনীয় বেদনা, পাকা ডালিমের বিচির মত গোলাপী দুই স্ফুরিত অধরে অব্যক্ত আবেদন। মুহূর্তের মধ্যে গগন ভুবন সেই চোখের দৃষ্টিতে কুবলয়িত হয়ে উঠল।

কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে অনমনস্ক কণ্ঠে তিনি বললেন, "পতিত উদ্ধার পরে হবে, এখন জগন্নাথ উদ্ধার কি ক'রে হবে চিন্তা কর।"

বিষ্ণু মহাপাত্র আগন্তুকের কণ্ঠে হঠাৎ উদ্বেগের সুর লক্ষ্য করলেন, কিন্তু তার হেতু বুঝতে পারলেন না। হিন্দুবিদ্বেষী বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে জগন্নাথ যবন আক্রমণ থেকে একপ্রকার নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ ছিলেন। দিব্যসিংহের সাত অঙ্কে একরাম খাঁয়ের শ্রীক্ষেত্র আক্রমণের পর থেকে আর কোনো নায়েব-নাজিম শ্রীক্ষেত্রের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করেন নি। আওরঙ্গজেবের পরে যারা দিল্লীর মসনদে বসলেন তারা তার মত ক্রুর ধর্মান্ধ ছিলেন না। ওড়িশার নায়েব-নাজিম সুজা খাঁর সুদীর্ঘ শাসনকালেও জগন্নাথ সম্পূর্ণ নিরাপদে ছিলেন। সুজা খাঁ সুফী মুসলমান ছিলেন, জগন্নাথের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। দস্যু অথবা মুসলমান ফৌজদার, কেল্লাদার, রাহাজান প্রভৃতির লুণ্ঠন থেকে দূরান্তর থেকে আসা জগন্নাথের তীর্থযাত্রীদের নিরাপদ রাখবার জন্য সুজা খাঁ ডাক-চৌকির প্রবর্তন করেছিলেন। আওরঙ্গজেবের আমলের ঘৃণিত জিজিয়া করও তিনি শ্রীক্ষেত্র থেকে উঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেইজন্য জগন্নাথের উপর দুঃস্বপ্নপ্রায় ধারাবাহিক আক্রমণ ওড়িশাবাসী প্রায় ভুলতে বসেছিল! তাই আবার জগন্নাথের উপর আক্রমণের আশঙ্কার কথা সান পরিছা বিশ্বাস করতে পারলেন না, যদিও আবার মোগলের হাঙ্গামা লাগার ভয়ে শ্রীক্ষেত্রের অণুপরমাণুও তখন আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল।

তিনি বললেন, "জগন্নাথ এই অপরাজেয় জাতির আত্মা। তিনি প্রত্যেক ওড়িয়ার প্রাণে প্রতিষ্ঠিত, তাঁকে সেখান থেকে বিচ্যুত করবে কে? রক্তবাহু থেকে রাজু খাঁ-কালাপাহাড় ও একরাম্ খাঁ পর্যন্ত যত হিন্দুবিদ্বেষী জগন্নাথের উপরে আক্রমণ ক'রে গেছে সকলে আজ কালগর্ভে বিলীন হয়েছে; নীল শৈলের উপরে সুদর্শনলাঞ্ছিত পতাকা তেমনি উড়ছে।"

আগন্তুক দুই বাহু বক্ষোবদ্ধ ক'রে পরিহাসব্যঞ্জক কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "সংলাপ হিসাবে এ অতি উত্তম শোনাচ্ছে হে মহাপাত্র, কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ ওড়িশার নায়েব নাজিমের গদিতে আজ সুজা খাঁর বিজাত পুত্র তকী খাঁ বাহাদুর দিলেরজঙ্গ। হিন্দুধর্ম ও দেবায়তন বিধ্বংসে সে রাজু খাঁ-কালাপাহাড়কেও হার মানাতে কোমর বেঁধেছে। বালেশ্বর বন্দরে ফৌজদার থাকা কালে সুবর্ণরেখার দক্ষিণে একটিও হিন্দু মন্দির সে অক্ষত রাখে নি— সে খবর রাখ কি মহাপাত্র?"

'সান পরিছা' বললেন, "কিন্তু শাহজাহানাবাদ দিল্লীতে মোগল-বাদশাহ মহম্মদ ইব্রাহিম শাহের এখন অনিশ্চিত অস্থির অবস্থা। রাজপুতনা থেকে যাত্রীসংগ্রাহক গোমস্তারা ফিরেছে, তাদের মুখে শুনেছি দিল্লী দরবারে আমীর ওমরাহ উজির বখশীদের মধ্যে আত্ম-কলহে মোগলশক্তি অথর্ব হয়ে পড়েছে। মরাঠারা চৌথ সরদেশ-মুখি আদায়ের জন্য দিল্লী দরবারে পর্যন্ত হানা দিচ্ছে। মোগলের বিষদাঁত ভেঙে গেছে। আপনা বাঁচানোই তাদের পক্ষে অসম্ভব, তারা জগন্নাথ আক্রমণ করবে কোথা থেকে?"

আগন্তুক ঈষৎ উষ্ণ কণ্ঠে বললেন, "সিদ্ধিখোর যাত্রীগোমস্তারাই যখন তোমার পরামর্শদাতা তখন জগন্নাথের নিরাপত্তা বাস্তবিকই সঙ্কটাপন্ন ব'লে বুঝতে হবে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে

দিল্লীর বাদশাহ্‌দের চাইতে বিভিন্ন সুবার সুবাদাররা যে অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠেছে সে কথা কি ভুলে গেলে? বঙ্গ-বিহার-ওড়িশায় মোগলশক্তি এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। মুর্শিদাবাদের মসনদ্‌ বর্তমানে দিল্লীর শাজাহানবাদের ময়ূরসিংহাসনকেও নিষ্প্রভ ক'রে দিয়েছে। আফগানেরা মাথা নিচু ক'রে চুপ ক'রে আছে, মরাঠারা এপর্যন্ত বাংলা সুবায় দন্তস্ফুট করতে পারে নি। আবার দক্ষিণে প্রবলপরাক্রমী নিজাম-উল্‌-মুল্‌ক্‌ ফতেজঙ্গ্‌ ঘোর হিন্দুবিদ্বেষীরূপে পরিচিত। আওরঙ্গজেবের পর যে ঘৃণিত জিজিয়া কর কিছুদিনের জন্য লোপ পেয়েছিল সে আবার তা চারিদিকে বসিয়েছে। মরাঠারা পর্যন্ত তার কাছে যুক্তকরপুটে আছে। এদিকে কটকে নায়েব-নাজিম হিন্দুবিদ্বেষী তকী খাঁ। তার সঙ্গে সলা ক'রে নিজাম-উল্‌-মুল্‌ক্‌ ফতেজঙ্গ প্রথমে চিলিকা আক্রমণ ক'রে অধিকার ক'রে বসল। চিলিকা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টিকালী রঘুনাথপুরও গেল। প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রেও নিজাম-উল্‌-মুল্‌কের ফৌজকে বাধা দেওয়া সম্ভব হল না।"

এক গভীর দীর্ঘশ্বাস আগন্তুকের সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে বেরিয়ে এল। তার পর নিজেকে সংযত ক'রে তিনি বললেন, "এ আক্রমণের উদ্দেশ্য বুঝেছ তো?"

সান পরিছা বললেন, "চিলিকার 'নিম্‌কী মাহাল'[1] আয়ের এত বড় একটা সূত্র, পেলে নিজাম ছাড়বে কেন?"

আগন্তুক অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, "নিমক নয়, নিমক নয় সান পরিছা। চিলিকা এ পর্যন্ত জগন্নাথকে নিরাপদ আশ্রয়স্থলরূপে স্থান দিয়ে এসেছে, এবার জগন্নাথের উপর শেষ আক্রমণ করার আগে

1. নিম্‌কী মাহাল— নিমক মহল, যে মহল থেকে লবণ দরুন রাজস্ব আদায় হয়।

তাই নিজাম সে পথ বন্ধ ক'রে দিল। সেই জন্য তকী খাঁর তাতে পূর্ণ সমর্থন। তা না হ'লে সে সেই সময়ে খোর্ধার সৈন্যবাহিনীকে পিছন থেকে আক্রমণ করল কেন? ওঃ, বকশী বেণু ভ্রমরবর যদি সে সময়ে নীচ বিশ্বাসঘাতকতা না করত!"

তিনি আর বলতে পারলেন না। উত্তেজনা ও আবেগে তাঁর কণ্ঠরোধ হ'ল। প্রকৃতিস্থ হয়ে তিনি বললেন, "তার জন্য এখন থেকে প্রস্তুত হও হে মহাপাত্র। গত পঁচিশ বৎসরের নিরাপত্তার মধ্যে জগন্নাথকে রত্নবেদী থেকে তুলে গোপনে আনাগোনার কৌশল সবাই বিস্মৃত হয়েছে। সময় থাকতে প্রস্তুত না হ'লে কিন্তু জগন্নাথকে আবার চর্মরজ্জুতে বেঁধে জগন্নাথ সড়ক দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারে, অসম্ভব নয়!"

সমুদ্র হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। মেঘাবৃত আকাশে একখণ্ড নিশ্চল মেঘের অন্তরালে বিকলাঙ্গ চন্দ্রের মলিন স্বপ্নাতুর জ্যোৎস্নার নীচে সমুদ্র যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিল। ঝাউবনের উদ্দাম পবনও সহসা শান্ত হয়ে পড়েছিল।

ক্লান্তি ও অবসাদে আগন্তুক তাঁর কপালে কয়েকবার হাত বোলালেন। বাম হস্তের অনামিকায় হীরকখচিত অঙ্গুরীয় অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত ঝাউবনের ছায়ান্ধকারে ঝলকিত হল।

আঃ...দুই চক্ষে অগণিত রাত্রির নিদ্রা! ঝাউবনের পত্রমর্মরে দুই ক্লান্ত অক্ষিপল্লব মুদ্রিত হয়ে আসছিল। কিন্তু— সময় নেই, সময় নেই...সম্মুখে দুস্তর পথ।

আগন্তুক সাত-লহরী মঠের কাছে ফিরে এসে মঠের পিছনে বাঁধা ঘোড়া খুলে নিয়ে লম্ফ দিয়ে আরোহণ করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। ব'লে গেলেন— "চললাম হে মহাপাত্র, শীঘ্র আর তোমার সঙ্গে

সাক্ষাৎ না হতেও পারে, কিন্তু তুমি প্রস্তুত থেকো।”

আগন্তুক এবং তার পরে সান পরিছা ভিন্ন ভিন্ন দিকে ম্লান জ্যোৎস্নামাখা রাত্রির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তাঁরা চ'লে যাবার পর সেই অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় ঝাউবনের ভিতর থেকে একটি ছায়ামূর্তি বেরিয়ে মঠের অদূরে অপেক্ষমান 'বড় পরিছা' গৌরী রাজগুরুর নিকটস্থ হল। কিছুক্ষণ পূর্বে মঠের ভিতরে মুমূর্ষু বৃদ্ধের শয্যার পাশে নিজেকে যে বৃদ্ধের পুত্র পশ্চিম যাত্রী ব'লে পরিচয় দিয়েছিল এ সেই যুবক।

গৌরী রাজগুরু তাকে বললেন, “সব কথা তো নিজের কানে শুনলে। পিপিলীর ফৌজদার মুনিম খাঁ জঙ্গবাহাদুরকে সব কথা জানিয়ে দিয়ো। খোর্ধার রাজার শিরদাড়া ভেঙেছে, ফণা নুয়েছে, কিন্তু বিষদাঁত ভাঙে নি, তাই তিনি জগন্নাথের দোহাই দিয়ে ঘুরে ঘুরে কেমন বিদ্রোহ সৃষ্টি করছেন সব তো শুনলে। কিন্তু খাঁ সাহেবকে জানিয়ে দিয়ো গৌরী রাজগুরু যতদিন মন্দিরের 'বড় পরিছা' থাকবেন শ্রীক্ষেত্রে নায়েব-নাজিম তকী খাঁর স্বার্থও ততদিন সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে, রামচন্দ্রদেবের সমস্ত গতিবিধি তিনি বরাবর যথাসময়ে জানতে পারবেন।”

ছদ্মবেশী যুবক পিপিলীর ফৌজদারের একজন সিওয়ানবিশ বা গুপ্তচর। সে বললে, “রামচন্দর দেও কে? এ তো খোর্ধার রাজা হাফিজ্ কাদ্‌র্!”

গৌরী রাজগুরু বললেন, “সেই হে, একই কথা। বারবাটী[1]

1. বারবাটী— কটক শহরের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দুর্গ, বার বাটী জমি নিয়ে তৈরী। এক বাটী প্রায় কুড়ি একর।

কটকে নিজেকে মুসলমান ব'লে যতই কলমা পড়ুন বালিঅন্তা ঘাঁটি পার হলেই তিনি হয়ে যান রামচন্দ্রদেব। হুঁঃ, কোথায় গেলেন তেলেঙ্গা মুকুন্দের পুত্র প্রপৌত্র গজপতি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, আর আজ সুনাখলা গড়ের অজ্ঞাতকুলশীল কোন নরসিংহ জেনামণির নাতি রামচন্দ্রদেব মহারাজ হরেকৃষ্ণদেবের ভাইপো সেজে গজপতি সিংহাসনে স্পর্ধা করছে।"

ছদ্মবেশী যুবক ফিরে যাবার জন্য নিজের ঘোড়ার পিঠে ওঠবার সময়ে গৌরী রাজগুরু পিছন থেকে ডেকে বললেন, "হাঁ, খাঁ সাহেবকে বোলো আমার ইনামটা এখনও পেলাম না। ত্রিকাল সন্ধ্যায় আমি কিন্তু তাঁকে আশীর্বাদ করছি: সামান্য কটক সুবার নায়েব-নাজিম কেন, তিনি খোদ মুর্শিদাবাদের নবাব হোন।"

ছদ্মবেশী যুবক অদৃশ্য হল।

গৌরী রাজগুরু সেইদিকে ক্ষুধিত দৃষ্টিতে চেয়ে নিজের মুণ্ডিত মস্তকে বার বার হাত বোলাতে লাগলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

1

খোর্দার উআসের[1] অন্তঃপুরে অস্বাভাবিক নীরবতা। ছুঁচটি পড়লেও শোনা যায়। গড়ের তিন দিকে ঘন হয়ে বেড়ে ওঠা কাঁটাবাঁশ আর বেতবনের ভিতর থেকে একটি কপোতের কূজন ব্যতীত শব্দ নেই। অপরাহ্নের স্তিমিত আলোক সেই নির্বিঘ্ন পরিবেশকে আরো বিষণ্ণ ক'রে তুলেছিল।

রামচন্দ্রদেব ওরফে হাফিজ কাদ্‌র বিহারমণ্ডপে গজদন্তনির্মিত আসনে ব'সে একাই ন্যায়বল[2] খেলছিলেন। আসনের চারিপাশে রঙিন বনাত-আঁটা অন্য আসনগুলি শূন্য, আজ সে মণ্ডপে পারিষদগণ নেই।

কিন্তু রামচন্দ্রদেব খেলছিলেন কি খেলার ছলে বাম করতলে মস্তকভার ন্যস্ত ক'রে শতরঞ্জপট্টে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে অন্য চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন জানবার উপায় ছিল না। তার প্রশস্ত ললাট নিষ্প্রভ। কপালের উপর অবিন্যস্ত কেশরাশি ও গণ্ডদেশে রুক্ষ অযত্নবর্ধিত শ্মশ্রু তাঁর রূপ আরো মলিন ক'রে তুলেছিল। কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, কপালে সিন্দূর ও অঙ্গে গৈরিক উত্তরীয় তাঁর চেহারায় ভবঘুরে

1. উআস (উচ্চারণ অকারান্ত)— রাজবাটী।

2. ন্যায়বল— প্রাচীন ওড়িশায় প্রচলিত শতরঞ্জ বা দাবা খেলা।

কাপালিকের ভ্রম সৃষ্টি করছিল। বস্তুতঃ অজ্ঞ লোক তাঁকে অন্যত্র দেখলে কাপালিক ভাবা অসম্ভব ছিল না। সেদিন সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরের প্রাচীরপার্শ্বে তাঁকে দেখে তাই কেউ কেউ কাপালিক ব'লে অনুমান করেছিল।

ছকের উপর দুই দিকে দুই ঘোড়া ও তৃতীয় দিকে গজের ঘরে পড়ে রাজাটি বিপর্যস্ত হয়েছিল, রামচন্দ্রদেব মনে মনে রাজার চাল চিন্তা করছিলেন। কেবল একটি দিক খোলা ও নিরাপদ ছিল, অথচ রাজা সে দিকে চাললে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় চালেই কিস্তিমাত হওয়া অবধারিত। রামচন্দ্রদেব একটি আঙুলে রুক্ষ শ্মশ্রু জড়াতে জড়াতে রাজার পরের চাল চিন্তা করছিলেন।

কিন্তু কেউ নিরীক্ষা ক'রে দেখলে বুঝতে পারত যে রামচন্দ্রদেবের অভিনিবেশ খেলায় ছিল না। মাঝে মাঝে তিনি বলগুলি যে ভাবে অনাবশ্যক নাড়াচাড়া করছিলেন তাতে চাল দেওয়ায় তার মনোযোগের অভাবই সূচিত হচ্ছিল। অস্ফুট স্বরে তিনি মাঝে মাঝে ব'লে উঠছিলেন— "কিস্তিমাত এখনো হয় নি, এখনো হয় নি!... সেদিন যদি ঋসিকুল্যা নদীর মোহানার পথে চিলিকার ভিতরে পলায়নের জন্য অন্ততঃ একখানি 'মলাঙ্গী'[1] নৌকাও পেতাম তা হলে মালুদের ফৌজদার সেদিন এত সহজে কিস্তিমাত করতে পারত না। কিন্তু তা হ'ল না, হ'ল না! মালুদের ফৌজদারের একটা চালে সেদিন অতি সহজে কিস্তিমাত হয়ে গেল।"

তার পরে লৌহপিঞ্জরে বন্দী হয়ে রামচন্দ্রদেব নীত হয়েছিলেন কটকের বারবাটী দুর্গে।

1. মলাঙ্গী—যারা চিলিকার তীরের লবণের কেয়ারি থেকে নৌকায় ক'রে কারবারীদের কাছে লবণ নিয়ে যেত।

সেই গ্লানিকর তিক্ত স্মৃতি রামচন্দ্রদেবের মস্তিষ্কে উত্তপ্ত রক্ত প্রবাহিত করল। উত্তেজনায় দুই মুষ্টিতে মাথার চুল টানতে টানতে তিনি একটি গবাক্ষের কাছে উঠে গেলেন।

'রানীহংসপুরে'[1] রানীদের মহালগুলি শূন্য। রামচন্দ্রদেব জাতি-ভ্রষ্ট হয়ে বিজিয়াকে বিবাহ করা অবধি পাটরানী ললিতা মহাদেঈ[2] পুত্র জেনামণি[3] ভাগীরথীকুমারকে নিয়ে পিত্রালয়ে প্রস্থান করেছেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা তিনি আর খোর্ধার ভূমি স্পর্শ করবেন না। অন্য দুই রানীও তাঁদের কুমারগণকে নিয়ে আপন আপন পিত্রালয়ে চলে গেছেন। পরিত্যক্ত রানীহংসপুরের পশ্চিম অংশে বিজিয়ার জন্য একটি নূতন জগতী[4] নির্মিত হল, কিন্তু বিজিয়াও কটকে। প্রতি সপ্তাহে যাতে রামচন্দ্রদেব কটকে গিয়ে তকী খাঁর নিকটে বশংবদতার হাজিরা দেন সেইজন্য তকী খাঁ বিজিয়াকে কটকের লালবাগ দুর্গে বন্দিনীর মত রেখেছিলেন। এখানে রাজপ্রাসাদে বিজিয়ার শূন্য মহলের চন্দ্রশালার অনুচ্চ প্রাচীরের উপর কেবল একটি নিঃসঙ্গ ফিঙে পাখি চারিদিকে ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল।

গড়ের চতুর্দিকে 'মেঘনাদ' প্রাচীর ও তার পাশ বরাবর বেত ও কাঁটাবাঁশের ঝাড়— প্রতিরক্ষার কাজে বিরাজমান। সেগুলি যে কেবল আক্রমণকারীকে দূরে রাখত তাই নয়, কামানের গোলার আঘাতও সহ্য ক'রে দুর্গপ্রাচীর প্রায় অক্ষত রাখত। প্রাচীরের কেবল উত্তর দিকের একাংশ খান-ই-দৌরানের আক্রমণের সময়ে

1. রানীহংসপুর— রাজান্তঃপুরে রানীদের মহল।
2. মহাদেঈ— মহাদেবী, পট্টমহিষীর পদবী।
3. জেনামণি— রাজকুমারের পদবী।
4 জগতী— চন্দ্রশালা।

গোলার আঘাতে ধসে পড়েছিল। সে ভোই মুকুন্দদেবের সময়ের কথা!

সেই অবধি উত্তরের প্রাচীর পুনর্নির্মাণের চেষ্টা আর হয় নি। ভোই পুরুষোত্তমদেবের রাজত্বকালে মোগল ফৌজদার হাসিম খাঁর পুনঃপুনঃ আক্রমণের ফলে খোর্ধার রাজশক্তির কেন্দ্রস্থল এক ভ্রাম্যমাণ শিবিরে পরিণত হয়েছিল। দুর্গম পর্বতকন্দর থেকে সুবিস্তীর্ণ সমভূমি পেরিয়ে সুদূর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত গজপতি রাজগণ খোধার রাজধানীকে কক্ষপুটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন।

আজও সে দুর্যোগ কাটল না।

ওড়িশার শেষ স্বাধীনতা যেন শত পীড়ন ও আক্রমণের মধ্যেও লক্ষ লক্ষ নিরন্ন বুভুক্ষু অত্যাচারিত ওড়িয়ার প্রাণেই কেবল আত্মরক্ষা ক'রে টিঁকে ছিল। দুর্গপ্রাচীর সে ক্ষেত্রে নিরর্থক ও অবান্তর। তবু গড়ের প্রাকারের বুরুজে বুরুজে বরকন্দাজ ও বন্দুকধারী পাইকেরা স্থাণু মূর্তির মত দণ্ডায়মান। প্রাচীরগাত্রের পিত্তলনির্মিত তোপগুলির উপরে অপরাহ্নের আলো ঝলসে উঠছিল।

'মেঘনাদ' প্রাচীরের দক্ষিণ দিকে অরণ্যাকীর্ণ বরুণেই পর্বতের গায়ে বিসর্পিত হয়ে চলে গেছে পুরী যাবার পার্বত্য ঘাট-পথ। রথীপুর ও পিপলীর দূর পথে না গেলে এই গিরিসঙ্কটের পথে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে পুরী যাওয়া যায়। যুঝারসিংহ ও বরুণেই গড় থেকে যাত্রীরা সাধারণতঃ এই ঘাট-পথে পুরী যায়। তা ছাড়া মোগলের হাঙ্গামার সময়ে এই পথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। ঘাটের উচ্চতম স্থানে বরুণেই চূড়ার দিগ্‌দর্শন স্তম্ভ বরুণেই গড়ের নিঃসঙ্গ প্রহরীর মত দিগন্তরেখা ভেদ ক'রে অপরাজেয় অটলতায় দাঁড়িয়ে ছিল। স্তম্ভের উপরে আসন্ন সন্ধ্যার পটভূমিতে ছায়ামূর্তির মত

একটি পাইক চোখে দূরবীনের নল লাগিয়ে চারিদিক পর্যবেক্ষণ করছিল।

রামচন্দ্রদেব একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুনশ্চ হ্যামবলের সারপটের কাছে ফিরে এলেন। বলগুলি ইতঃস্তত সরিয়ে নূতন ক'রে দুই দিকে দুই গজ সাজিয়ে মাঝখানে রাজা বসালেন।

হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল টিকালী-রঘুনাথপুরের রণাঙ্গন। যুদ্ধে কি হ'ত বলা যায় না। কিন্তু সেদিন বিনা যুদ্ধে কিস্তিমাৎ করেছিল মালুদের ফৌজদার। রামচন্দ্রদেব লোহার খাঁচায় বন্দী হয়ে হস্তিপৃষ্ঠে আসীন হয়েছিলেন।

শতরঞ্জের ছকের উপরে গজ দুইটি রামচন্দ্রের মনশ্চক্ষুতে চিলিকার তীরবর্তী ভালেরী 'নাসি'র'[1] মদকোট গিরিসঙ্কটের রূপ নিল।

এই হ'ল মদকোট ছন্দ্রার ঘাট— আর এই হ'ল ভালেরী পাহাড়ের দুই দিকের দেওয়াল। সেই দেওয়ালের নীচে মদকোট গড় ছন্দ্রার গিরিসঙ্কটের চিরজাগ্রত প্রহরী। ভালেরী পাহাড়ের খোলে খোলে পাইকরা পাথর ছোঁড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে কাঁটাবাঁশের ঝাড়ের আড়ালে ওৎ পেতে ব'সে আছে। পাহাড়ের উপরে ব'সে 'নলি বাটুলি'ধারী[2] সিপাহীরা। ঘাট পথের চড়াই থেকে দেখা যায় অদূরে চিলিকার নীল জল সূর্যালোকে ঝলমল করছে। মালুদের দিক থেকে মোগল ফৌজদার বশীর খাঁ এল পথ আগলে বসতে। আধগড় ও জমাগড়ের পাইকরাও প্রস্তুত হয়ে আছে। ঘাটের প্রবেশপথে হাতীতে টানা রথের উপরে তোপ কামান সুসজ্জিত রয়েছে। অশ্বারোহী সেনা বর্শা ও খড়গ হাতে ঘাটের এক প্রান্ত

1. নাসি— স্থলভাগের ক্রমসূক্ষ্ম অগ্রভাগ, অন্তরীপ।
2 নলি-বাটুলি— গাদা বন্দুক ও গুলি।

থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘোড়ার পিঠে পাঁয়তারা কষছে। তাদের কাঁধে 'চড়ক নলি'[1], বুকে সাজোয়ার মত 'বদউ' ঢাল আঁটা। ঢালের সুতীক্ষ্ণ সূচীমুখ রৌদ্রে ঝকমক করছে। এই গিরিসঙ্কটে অতীতে খল্লিকোট, হুমা, গঞ্জাগড় ও পুরুণাগড়ের পাইকরা মোগল নাজিম বক্‌র্ খাঁকে নাকানি চোবানি খাইয়ে ছেড়েছিল। মোগল ফৌজ আরণ্য ও পার্বত্য যুদ্ধে অভ্যস্ত না থাকায় গিরিসঙ্কটের যুদ্ধে তাদের এভাবে পরাস্ত করা ওড়িয়া পাইকদের পক্ষে সহজ ছিল। সেইজন্য চিকাকোলের ফৌজদারের আক্রমণ থেকে খোর্ধার দক্ষিণ সীমা সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে এই গিরিসঙ্কটটিকে এক দুর্ভেদ্য দুর্গের মত ক'রে সংগঠিত করেছিলেন রামচন্দ্রদেব।

সে-সব ১৭২৮ সাল, অর্থাৎ রামচন্দ্রদেবের 4 অঙ্কের কথা।

2

টোডরমল্ল ও মানসিংহের সময় থেকে খোর্ধাকে পদানত করার জন্য মোগল ফৌজদার ও সেনাপতিদের আক্রমণ লেগে আছে। কিন্তু মারাঠাদের পরেই কেউ যদি প্রবল পরাক্রান্ত মোগলদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে লড়াই ক'রে থাকে তা হ'লে সে হল কেবল ওড়িয়া পাইকরা।

তার মধ্যে বহু বিশ্বাসঘাতকতা আছে, পিছন থেকে অনেক ছোরা মারা আছে। ওড়িয়া রাজারা কখনও বন্দী হয়েছেন কখনও বা মান বজায় রেখে নজরানা দিতে বাধ্য হয়েছেন; তথাপি খোর্ধাকে কেউ মোগল রাজশক্তির অনুগত বশংবদে পরিণত করতে পারে নি।

মানসিংহ কেবল যে বিশুদ্ধ জগন্নাথ-ভক্তিতেই খোর্ধার স্বাধীনতা

1. চড়ক নলি— বন্দুক।

স্বীকার করে নিয়েছিলেন তাও নয়, তাঁর মত আফগানবিজয়ী দুর্ধর্ষ সেনাপতি কটক পেরিয়ে দক্ষিণে সারঙ্গগড় পর্যন্তও যেতে পারেন নি। তাই থেকেই ওড়িয়া পাইকের বল তিনি বেশ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। এই দুর্জয় শক্তিকে নির্জিত করার চেষ্টায় শক্তিক্ষয় না করে এর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখলে ওড়িশায় বিদ্রোহী আফগানদের বিরুদ্ধে তা এক রক্ষাকবচস্বরূপ হতে পারবে এমন কথা মানসিংহ তাঁব দূরদৃষ্টির বলে স্পষ্ট অনুমান করেছিলেন।

আর জগন্নাথ হলেন ওড়িশার হিন্দু রাজশক্তির ইষ্টদেব এবং ওডিশার প্রকৃত রাজা, উৎকল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর সম্রাট্। সেইজন্য অনঙ্গভীমদেবের সময় থেকে উৎকল সিংহাসনে কোনও রাজার অভিষেকের বিধি ছিল না। তাই জগান্নাথক্ষেত্র সমেত খোর্ধা বাজ্যকে মোগলেব শ্যেন দৃষ্টি থেকে নিরাপদ রাখার জন্য খোধার স্বাধীনতা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে মানসিংহ তাকে এক বন্ধু রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করে গিয়েছিলেন। মোগল সম্রাট্ আকবর জীবিত থাকা পযন্ত খোর্ধা ও সেইসঙ্গে জগন্নাথ একপ্রকার নিরাপদ ছিলেন।

কিন্তু উদারপন্থী আকবরের মৃত্যুর পরে জাহাঙ্গীরের সময় থেকে আওরঙ্গজেব পযন্ত মানসিংহের সে ব্যবস্থাকে রহিত ক'রে খোর্ধার গজপতি সিংহাসন কবলিত করার জন্য বার বার চেষ্টা হয়েছিল। হানিম খাঁ, কল্যাণ সিংহ, মুনিম খাঁ ও দুধর্ষ খান-ই-দৌরান প্রমুখ বহু মোগল ফৌজদার বিভিন্ন সময়ে খোর্ধা আক্রমণ ক'রে খোর্ধার স্বাধীনতা হরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। খোর্ধা কতবার কত যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছে। কুশভদ্রা, দয়া, ভার্গবী নদীর জলস্রোত ওড়িয়া পাইকের রক্তে বহুবার লাল হয়েছে, কঙ্করময় বহু প্রান্তর শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তারি সঙ্গে সঙ্গে আবার ইতিহাসের

গদাঘাতে সে-সব যুদ্ধের বিজেতারাও ওড়িশা সুবা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

কাঁটাগাছের গোড়া থেকে যেমন চারা বেরোয় তেমনি করে খোর্ধার প্রচ্ছন্ন রাজশক্তি আবার ক্রমে মাথা তুলেছিল। মোগলের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় বহু লুকোচুরি খেলায় জগন্নাথ ও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে খোর্ধার রাজশক্তি অপরাজিত ছিল।

কিন্তু সে অসাধ্য সাধন করার পণ নিয়ে তকী খাঁ এখন কটকের নায়েব-নাজিমের গদিতে বসেছে। সে বুঝেছিল, জগন্নাথ অপরাজেয় ওড়িয়া জাতির কেবল আরাধ্য ইস্টদেব নন, তিনি ওড়িয়া জাতির রাজনৈতিক মুক্তির প্রেরণাময় উৎস। তার সেবকরূপে খোর্ধার গজপতি প্রভাব ও প্রতিষ্ঠায় যতই ন্যূন হয়ে পড়ে থাকুন, ওড়িশার সব কেন্দ্রা-কেন্দ্রিক রাজ্যে তো বটেই এমন কি মোগলবন্দি[1] অঞ্চলেরও দুর্গপতি, সামন্ত তথা জনসাধারণের তিনি সম্মানের পাত্র ছিলেন। জগন্নাথ ছিলেন ওড়িশার রাজনৈতিক ঐক্যের যোগসূত্র। সেইজন্য খোর্ধার গজপতিকে এবার সম্পূর্ন নির্জীব করার সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথকেও নিপাত করা ছিল তকী খাঁর অভিপ্রায়। অতীতের বহু অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝেছিল মোগল ফৌজ যতই পরাক্রান্ত হোক, আরণ্য ও পার্বত্য যুদ্ধে অভ্যস্ত গজপতি-পাইকসেনাকে পরাস্ত করা সহজ নয়। তাই এবার উত্তর দক্ষিণ দুই দিক থেকে একসঙ্গে আক্রমণ ক'রে সন্দংশে পিষ্ট করার মত খোর্ধার টুটি টিপে ধরার জন্য তকী খাঁ এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিল। উত্তর থেকে সাজবে খোদ তকী খাঁ, দক্ষিণ থেকে আসবে চিকাকোলের ফৌজদার জুল্‌ফিকর্ খাঁ নস্‌বৎ জঙ্‌। চিকাকোলের উত্তর সীমানায় টিকালী

1. মোগলবন্দি— ওড়িশার মোগলশাসিত অঞ্চল।

রঘুনাথপুর অধিকার ক'রে সেখান থেকে সোজা কুচ করে চলে আসবে কালুপাড়া পর্যন্ত। ইতিমধ্যে তকী খাঁ অধিকার করে বসবে খোর্ধা, তারপরে পুরুষোত্তম শ্রীক্ষেত্র। দুর্ধর্ষ খান-ই-দৌরানেরও যা অসাধ্য ছিল এবারে তকী খাঁ তাই সাধন করবার পণ করেছিল।

তকী খাঁর এই রণসজ্জার সংবাদ পেয়ে রামচন্দ্রদেবও তার মোহড়া নেবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। সঙ্গে সামান্য কয়েকজন অশ্বারোহী ও পদাতিক নিয়ে টিকালী থেকে তিনি কেবল পিছু হটতে হটতে আসবেন মদকোট ছত্রদ্বার ঘাট পর্যন্ত। চিকাকোলের ফৌজদার জুলফিকর খাঁ অনায়াস বিজয়ের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হয়ে নির্ভাবনায় কালুপাড়ার দিকে ধাবিত হ'লে পিছন থেকে তাকে আক্রমণ করবে মহেন্দ্রগড়ের বিজয়রাজুর তেলেঙ্গা সেনাবাহিনী, তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন কাশিমপেটার রাজুবলেন্দ্র। চিকাকোলের ফৌজ জয়ন্তগড় পেরিয়ে বাহুদা নদী যদি পার হতে পারে তা হলে জরড়া, সুরঙ্গী ও খেমণ্ডির দুর্গপতিগণ মহেন্দ্রগিরির নিকটে তাদের পথ রোধ করবেন। রামগিরি দুর্গের শিঙ্গারাজ সঙ্গে ব্যাঘ্রচর্মাবৃত ভীমকায় বন্ধ পাইকদের নিয়ে সেখানে তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। চিকাকোলের ফৌজ সেখান থেকে পার পেলেই তার পাবেই ছত্রদ্বার ঘাট। ছত্রদ্বারেই তখন হবে খোর্ধার হিন্দুশক্তি ও মোগল রাজশক্তির মধ্যে শেষ লড়াই। সেইজন্য রামচন্দ্রদেব সমস্ত রণকৌশল প্রয়োগ করে ছত্রদ্বার ঘাটে প্রতিরোধের ব্যূহ রচনা করেছিলেন। মর্দকোট গড় ও ছত্রদ্বার ঘাটের ভার ছিল বকশী বেণু ভ্রমরবরের উপর। গঞ্জাগড়ের কৃপাসিন্ধু মানসিংহ বেণু ভ্রমরবরের ভগিনীপতি, সামনে থেকে তিনি আগলাবেন ছত্রদ্বারের ব্যূহ। ওদিকে তার উত্তরে কালুপাড়ায় তকী খাঁর সেনাবাহিনীকে আটকাবেন জরিপড়া গড়ের হরিহর,

রায়সিংহ ও নরণগড়ের শত্রুঘ্ন বৈরীশল্য। তাদের সাহায্য করবেন বাণপুর রাজ্যের রাজা গোবিন্দ হরিচন্দন। ভুবনেশ্বরের নিকটস্থ শিশুপাল গড় থেকে আরম্ভ করে পদে পদে তকী থাকে প্রতিরোধ করা হবে এমনিভাবে।

রামচন্দ্রদেবের মাথায় রক্ত চ'ড়ে গিয়েছিল, ইতিহাসের সঙ্গে জুয়াখেলায় তিনি যেন শেষ বাজি ধরেছিলেন।

শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার ব্যূহ রচনা সম্ভব, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে কোন দেশের ইতিহাসে কখনো কোথাও তৈরি হয় নি। ছত্রদ্বার ঘাটেও সেদিন তা সম্ভব হয় নি। রামচন্দ্রদেব কিন্তু সে নিষ্ঠুর সত্যটি তখন পর্যন্ত অনুধাবন করতে পারেন নি।

টিকালীতে রামচন্দ্রদেব দেখলেন কাশিমকোটার বালুবলেন্দ্রের সেনাবাহিনী ব্যতীত সেখানে আর কারো দেখা নেই। মহেন্দ্রগড়ের বিজয়রাজও শেষ মুহূর্তে গা ঢাকা দিলেন। সামান্য প্রতিরোধের পর রামচন্দ্রদেব পিছু হটতে হটতে ফিরলেন। বাহুদা নদী পার হওয়া চিকাকোল ফৌজের পক্ষে সহজ ছিল না, কিন্তু জয়ন্তগড়ের দুর্গপতি হরিহর বিশ্বাসরায়ও শেষ মুহূর্তে দুর্গের মধ্যে কপাট বন্ধ করে বসে রইলেন। কেবল নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে সমূহ স্বার্থ ও স্বাধীনতা যেভাবে বিপন্ন হচ্ছিল তার প্রতি তাদের দৃষ্টি ছিল না। চিকাকোলের ফৌজদারের পদাতিক সৈন্য, ঘোড়সওয়ার, বরকন্দাজ, বর্শাধারী, গোলন্দাজের সংখ্যা ছিল মোট বিশ হাজার। কেবল বালুবলেন্দ্রের সৈন্য তার কী বা প্রতিরোধ করবে। তাকে শক্তিক্ষয় করা রামচন্দ্রদেবের উদ্দেশ্যও ছিল না। বিজয়রাজ তার তেলেঙ্গা সৈন্যবাহিনী নিয়ে যদি আসতেন তা হলে সকলে মিলে পিছন থেকে চিকাকোল ফৌজকে আক্রমণ করতেন।

কিন্তু তা হল না। বাহুবলেন্দ্র আপন সৈন্য নিয়ে কোনমতে প্রাণরক্ষা ক'রে কাশিমপেটা ফিরে গেলেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে মহেন্দ্রগিরিতে কেবল জরড়া ও খেমণ্ডির পাইকেরা জুলফিক্‌র্ খাঁর প্রবল কিন্তু বৃথা প্রতিরোধ করল। কিন্তু তার পর রামগিরি গড়ের শিঙ্গারাজুর কন্ধবাহিনী ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত হয়ে তীরধনু নিয়ে মহেন্দ্রগিরি ঘাট এমনভাবে রক্ষা করতে লাগল যে তা ভেদ করে অগ্রসর হওয়া জুলফিক্‌র্ খাঁয়ের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ল। শত শত কন্ধ প্রাণবলি দিল বটে কিন্তু জুলফিক্‌র্ খাঁয়েয় সৈন্যবাহিনীকেও অক্ষত ছেড়ে দিল না। সেই অবসরে রামচন্দ্রদেব প্রাণপণে ছুটলেন ছত্রদ্বারের দিকে। এখন চিকাকোল ফৌজকে পশ্চাদাক্রমণ ক'রে পরাস্ত করার চেষ্টা করা বৃথা। যেমন করে হোক ছাত্রদ্বার থেকে জুলফিক্‌র্ খাঁকে ফিরিয়ে দিতে না পারলে খোর্ধার সব শেষ।

সেইজন্য রাতদিন না মেনে রামচন্দ্রদেব ছুটছিলেন ছত্রদ্বারের দিকে। সঙ্গে কেবল দুই শত 'অসুআর' (অশ্বারোহী)। পদাতি পাইকরা যুদ্ধে, ক্ষুৎপিপাসায়, ক্লান্তিতে অর্ধেক মরে হেজে গিয়েছিল। যারা বেঁচেছিল 'জয় জগন্নাথ' ডাক দিয়ে তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছিল ছত্রদ্বারের দিকে।

সকলের দৃষ্টি ছত্রদ্বারের উপরে নিবদ্ধ।

ভোরের আকাশে তখনও ভাল করে আলো ফোটে নি। জুলফিক্‌র্ খাঁর ফৌজ ফুলটার কাছে পৌঁছেছে বলে রামচন্দ্রদেব কাল খবর পেয়েছিলেন। ঋষিকুল্যার কাছে পৌঁছাতে তাদের এক দিনের বেশি লাগার কথা নয়— কারণ মহেন্দ্রগিরির পরে তাদের পথে আর কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। কাজেই সন্ধ্যার আগেই ছত্রদ্বার ঘাট ধরা চাই। সেই লক্ষ্য করে রামচন্দ্রদেব 'অসুআর'দের সঙ্গে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছিলেন।

আর অল্পক্ষণ পরেই উষার পাংশুল আলোকস্নাত ঋষিমোহিনী ঋষিকুল্যার নীল বেণী উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠবে। তার পরে গঞ্জা. ছত্রদ্বার। তার পরে— !

ঋষিকুল্যার দক্ষিণ তীরে রাজপুর প্রান্তরে রামচন্দ্রদেব হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলেন। পূর্ব আকাশের স্বল্পালোকিত পটভূমিকায় শত শত নিশান প্রভাতের মন্দ সমীরণে আন্দোলিত হচ্ছে। নিরীক্ষণ করে দেখলেন সৈন্যছাউনির মত তাঁবুর সারি। ঋষিকুল্যার উত্তর তীরে অর্ধচন্দ্রাকারে সৈন্যব্যূহ রচিত।

কারা এরা? তকীখাঁর সেনাবাহিনী কি ছত্রদ্বার ভেদ ক'রে দক্ষিণে চলে এসেছে? বকশী বেণু ভ্রমরবর কি পরাস্ত হলেন? গঞ্জাগড়ের মানসিংহ কি আর প্রতিরোধ করলেন না? রামচন্দ্র-সুপরিকল্পিত প্রতিরক্ষার ব্যূহগুলি কি সব বালির কেল্লার মত ধ্বসে পড়ল?

একজন 'অসুআর' হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠল—"এ ফৌজ বকশীসামন্তের। মোগলের পতাকার রং সবুজ, কিন্তু এগুলির রঙ তো গেরুয়া।"

প্রভাতের প্রথম আলোকে বকশী বেণু ভ্রমরবরের সেনাবাহিনীর গৈরিক পতাকাগুলি আস্তে আস্তে উড়ছিল। তাই দেখে 'অসুআর'দের মনে সাহস ফিরে এল। কিন্তু রামচন্দ্রদেব অস্ফুট কণ্ঠে আতনাদ ক'রে উঠলেন। প্রভাত-সমীরান্দোলিত নিশানগুলি যেন তাঁর চরম পরাজয় ঘোষণা করছে!

বক্‌শী ছত্রদ্বার ছেড়ে এখানে কেন? মালুদের ফৌজদার ছত্রদ্বার ঘাট অধিকার করার এমন সুযোগ কি আর ছেড়ে দেবে? রাজপুর প্রান্তরে চিকাকোল ফৌজকে আটকানোও তো সম্ভব নয়। তাদের

সৈন্যসংখ্যা যতই হোক, তারা যতই সুসজ্জিত হোক, ছত্রদ্বার ঘাটে তাদের অক্লেশে পরাস্ত করা যেতে পারত। কিন্তু এখানে এই উন্মুক্ত বালু প্রান্তরে রামচন্দ্রদেবের সামান্য সেনা শিমুল তুলোর মত উড়ে যেতে মুহূর্তও বিলম্ব হবে না।

গঙ্গাগড় এখন আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়। সেখান থেকে বাণপুরের গোবিন্দ হরিচন্দনের সঙ্গে কোনও উপায়ে যোগাযোগ করতে পারলে তবু হয়তো বা চিকাকোলের ফৌজকে এখনও আটকানো যেতে পারে। রামচন্দ্রদেব "জয় জগন্নাথ! মা ভৈঃ!" ধ্বনি দিয়ে রাজপুর প্রান্তরের দিকে ঘোড়া ছোটালেন।

রামচন্দ্রদেবকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য বিপরীত দিক থেকে বকশী বেণু ভ্রমরবরও ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিলেন।

মধ্যপথে রামচন্দ্র বকশীর ঘোড়ার লাগামটা টেনে ধরতে বকশী থেমে গিয়ে ঘোড়ার পিঠের উপর ঝুঁকে পড়লেন।

রামচন্দ্রদেব বললেন, "এ কি করলে বকশী, ছত্রদ্বার ঘাট বিনা যুদ্ধে মালুদের ফৌজদারের হাতে ছেড়ে দিয়ে এলে? এখন পিছন থেকে চিকাকোলের ফৌজদার বিশহাজার সৈন্য নিয়ে ছুটে আসছে। এই প্রবল মোগলশক্তিকে তুমি আটকাতে পারবে তো?"

বকশী হঠাৎ কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। রামচন্দ্রদেবের দিকে চোখ তুলে সোজা তাকাবার নৈতিক সাহসটুকুও খুঁজে পেলেন না তিনি।

ঘোর বিশ্বাসঘাতকও এমন অসহায় সরল প্রশ্নের সম্মুখীন হ'লে তার কণ্ঠ আপনি রুদ্ধ হয়ে যায়, জিভ আড়ষ্ট হয়, চোখের দৃষ্টি সরে যায়।

রামচন্দ্র আবার অসহায় কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "এ তুমি কী করলে

বকশী ?”

বকশীর লাবণ্যহীন গ্রন্থিল মুখের রেখাগুলি কঠিন হয়ে উঠল; নরকপালের মত কেশহীন মুণ্ডিত কপালের নীচে কোটরগত দুই চক্ষুতে যেন দুইখানি শাণিত খড়গ একবার ঝলসে উঠল। পর মুহূর্তেই আত্মসংবরণ ক'রে বকশী অনুগতজনসুলভ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, “সামনে চিকাকোলের লশকর, পিছনে মালুদের লশকর, এই দুই দিক থেকে মার খেয়ে ছত্রদ্বার ঘাটের ভিতরে আমরা বাঁচতাম কি ?”

কিন্তু বকশী কি আগের এত সব পরিকল্পনা ও মন্ত্রণা ভুলে গেলেন? ঘাটের উত্তর দিকে যে সব কামান ছিল চিলিকার ধার থেকে ঘাটের উপর ওঠবার সময়ে মালুদ ফৌজদারের লশকরেরা তাতেই নিপাত হয়ে যেত। আর, ঘাটের পিছন দিকে চিলিকার ধারে ধারে সুসজ্জিত হয়ে ছিল বন্দুকধারী পাইকেরা, কাজেই ছত্রদ্বার ঘাটের সীমানায় পা দেওয়াও মালুদের ফৌজদারের পক্ষে সম্ভব হত না।

রামচন্দ্রদেব বুঝলেন আর নিষ্ফল তর্ক ক'রে লাভ নেই। বকশী কিন্তু খুব সাহস দিয়ে বলছিলেন: “ছামু কোনো চিন্তা করবেন না। এই রাজপুর থেকে আমরা অনায়াসে চিকাকোলের লশকরদের হটিয়ে দিতে পারব। আমাদের পিছনে আবার রয়েছেন গঞ্জাগড়ের কৃপাসিন্ধু মানসিংহ।”

ডুবন্ত মানুষ যেমন কুটোটিও আঁকড়ে ধরে তেমনি গঞ্জাগড়ের কৃপাসিন্ধু মানসিংহের নাম শুনে রামচন্দ্রদেব আবার আশান্বিত হয়ে উঠলেন। অতীতে গঞ্জাগড় দক্ষিণ থেকে আসা বহু আক্রমণকে প্রতিহত ক'রে এসেছে। কৃপাসিন্ধু মানসিংহ ইচ্ছা করলে অনায়াসে চিকাকোলের লশকরদের ঋষিকুল্যার অপর তীরে আটকে দিতে পারেন।

রামচন্দ্রদেব আদেশ দিলেন—"তুমি ঋষিকুল্যার উত্তর তীরে ফৌজ ওঠাও বকশী, আমি এগিয়ে যাচ্ছি গঙ্গাগড়।"

রামচন্দ্রদেব গঙ্গাগড়ের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। অন্য 'অসুআর'রা বকশীর সঙ্গে পিছনে থেকে গেল—ঋষিকুল্যার উত্তর তীরে প্রতিরক্ষা সংগঠনের জন্য। দূরে ধুলোর ঘূর্ণির মধ্যে রামচন্দ্রদেব ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সেই দিকে চেয়ে বকশীর মুখে কুটিল হাসির যে ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠেছিল তা মিলিয়ে আসছিল এক ভ্রুকুটির মধ্যে।

মাথার উপরে জ্যৈষ্ঠের রৌদ্র তখন অগ্নিবৃষ্টি করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। দিগন্তপ্রসারী বালুপ্রান্তরে তৃষিত মরীচিকা নীল নিষ্ঠুরতায় ঝলমল ক'রে উঠছিল।

3

ন্যায়বলের ছকের উপরে বড়গুলি রামচন্দ্রদেব হাত দিয়ে ঠেলে আবার ইতস্ততঃ ক'রে দিলেন, যেন দেহের কোনো স্পর্শকাতর ক্ষতস্থানে হঠাৎ কারও হাত লেগে গেছে।

রামচন্দ্রদেব উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন—"কে আছ, চেরদার—?"

শূন্য প্রকোষ্ঠে রামচন্দ্রদেবের উচ্চ কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে আবার নীরব হল। আঃ··· লোধুমিএগ খলিফারও আজ এখনো দেখা নেই। সে এলে দুই বাজি দাবা খেলেও অন্ততঃ এ সব যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি ও পশ্চাত্তাপ ভোলা যেত। রামচন্দ্রদেব ছকের উপরে গুটিগুলি আবার সাজাতে লাগলেন।

এবার একটা বড়ের মুখে রাজা। রাজা এই মরণগ্রাস থেকে বাঁচবে কি করে? নিজের পক্ষের পরাক্রান্ত ঘোড়াটাও এখন অচল।

রামচন্দ্রদেবের চোখে আবার ভেসে উঠল সেদিনের সেই চরম বিড়ম্বনার দৃশ্য।

সেই গঙ্গাগড়ও এমনি হঠাৎ অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছিল। রামচন্দ্রদেব সম্মুখ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ঘরের শত্রুর সঙ্গে যুঝবার শক্তি তাঁর কোথায়? কৃপাসিন্ধু মানসিংহকে তিনি অনুনয় ক'রে বলেছিলেন, "ভাই মান-উদ্ধারণ মানসিংহ, এ অসময়ে তুমি সহায় না হ'লে আর সহায় কে হবে? খোর্ধার সিংহাসন তো পরের কথা, মোগল আক্রমণ থেকে স্বয়ং জগন্নাথকে রক্ষা করবার জন্যই আজকের যুদ্ধ! খোর্ধার রাজারা চুলোয় যান, যে শরণপঞ্জর[1] জগন্নাথের অভয় ছায়ার তলে ওড়িশার আবালবৃদ্ধ-বনিতা বর্ধিত ও সুরক্ষিত, যিনি হিন্দুজগতের অম্লান মউড়মণি তাঁর মান কি রাখবে না, মানসিংহ?"

মানসিংহ কিন্তু নিতান্ত অনাসক্ত ও অবিচলিতভাবে রামচন্দ্রদেবের গঙ্গাগড়ের সিংহদ্বার অর্গলবদ্ধ ক'রে দিলেন। আর, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত রামচন্দ্রদেবের অসহায় চক্ষুর সম্মুখে গঙ্গাগড়ের দুর্গচুড়ে উঠল একটা সাদা নিশান— মোগলের সঙ্গে মানসিংহের সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব ঘোষণা ক'রে! নিষ্ফল ক্রোধে রামচন্দ্রদেবের সর্বাঙ্গ কম্পিত হ'ল। জীবনে এমন ক্ষণও আসে যখন মানুষের সমস্ত শৌর্য, বিচক্ষণতা ও প্রভুত্ব কোনও দুষ্ট শক্তির নীচ ষড়যন্ত্রে বুদ্‌বুদের মত মুহূর্তে লয় পায়। এমনি গ্লানিকর মুহূর্তে মানুষ হঠাৎ উপলব্ধি করে ক্রূর অদৃষ্টের কাছে সে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অসহায়। বল্মীক তখন গিরিশৃঙ্গকে উপহাস করে, পিপীলিকা হস্তীকে স্পর্ধা করে। গঙ্গাগড়ের

1. শরণপঞ্জর জগন্নাথ— সেই জগন্নাথ যাঁর কাছে শরণ নেওয়া পাখীর পক্ষে পঞ্জরে বা পিঞ্জরে শরণ নেওয়ার মতই নিরাপদ।

রুদ্ধ সিংহদ্বারের সম্মুখে রামচন্দ্রদেবের জীবনে সেদিন তেমনি এক বিড়ম্বিত মুহূর্ত এসেছিল।

রামচন্দ্রদেব অসহায় দৃষ্টিতে উপরের রৌদ্রদীপ্ত নিষ্ঠুর আকাশের দিকে চাইলেন। বিশ্বাসঘাতকতা ও বন্ধুদ্রোহ সেখানে সহস্র চক্ষু মেলে যেন তাঁর সর্বনাশ প্রত্যক্ষ করবার অপেক্ষায় ব'সে। রামচন্দ্রদেবের তৃষার্ত কণ্ঠ হতে বেরিয়ে এল—"নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।"

আর অপেক্ষার সময় নেই। চিলিকার পথে যদি কোনক্রমে বাণপুরে গিয়ে ওঠা যায়—!

ঋষিকুল্যা নদী ডান দিকে রেখে 'নাগ অইরি'র[1] বনের ভিতর দিয়ে রামচন্দ্রদেব চিলিকা অভিমুখে ঘোড়া ছোটালেন।

গত বৎসরের দুর্ভিক্ষের পর আবার এ বৎসরও দুর্ভিক্ষ হয় বুঝি। জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হতে চলল তবু এ পর্যন্ত মাটি ভিজল না। ক্ষেতগুলি সব ফেটে চৌচির হয়ে আছে। হাল চলে না। যেদিকে চোখ যায় সেই দিকেই কেবল রোদের তেজ আর মরীচিকা। অস্থিসার গরুগাই দলে দলে শুকনো ফাটা মাটি শুঁকে ফিরছে। ঘাস পাতা ভেবে যাতেই তারা মুখ ঠেকায় তাই যেন মাটি কাঁকর হয়ে যায়।

অন্য দিকে ঘের দেওয়া বাঁধের মাঝখানে লবণের কেয়ারিগুলি সব জনশূন্য! এক সময়ে এই কেয়ারিগুলিতে শত শত লোক কাজ করত, সমুদ্রের জল উনানে জ্বাল দিয়ে লবণ তৈরির এ ছিল এক প্রধান জায়গা। মলাঙ্গীদের[2] নৌকায় ক'রে এই লবণ গঞ্জাবন্দর থেকে

1. নাগ(-অ)অইরি— কাঁটাওযালা হলুদ রঙের তীব্র গন্ধযুক্ত বুনো ফুল, গন্ধে সাপ আসে না এই প্রসিদ্ধি।

2. মলাঙ্গী— যারা লবণের কেযারি থেকে নৌকায ক'রে কারবারীদের কাছে লবণ নিয়ে যেত।

উত্তরে পিপিলী, বালেশ্বর, ও দক্ষিণে দূর দূরান্তরে চালান হ'ত। গঙ্গার দেশী নুনের মহাজনরা এই নুনের কেয়ারিগুলিতে সোনা ফলাত। কিন্তু গঙ্গাতে ফিরিঙ্গীদের আধিপত্য স্থাপনের সময় থেকে, তা ছাড়া আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে একরাম্ খাঁ মালুদ ও বজ্রকোট প্রভৃতি স্থানে ঘাঁটি বসানোর পর থেকে মোগলদের লুঠতরাজের ভয়ে এখান থেকে লবণের কারবার একেবারে উঠে গিয়েছে। তার অবশেষ প'ড়ে আছে কেবল নোনা জল রাখবার হাঁ করা শূন্য গহ্বরগুলি, মাটির গায়ে অজস্র বিকট ক্ষতচিহ্নের মত। নুন-মারা চুলী আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাঙা হাঁড়ি যেন এক মহাশ্মশানের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

সেই শ্রান্ত পরিত্যক্ত উত্তপ্ত পথপ্রান্তরে দূর বালিয়াড়ির অপর পাশে কেয়ার ঝাড় আর বাঁশবনের অন্তরালে জর্জরিত জীবন-শেষে মহামরণের আহ্বানের মত চিলিকার নীল জলরাশি রামচন্দ্রদেবকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। কিন্তু রামচন্দ্রদেব যতই সেদিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন মরীচিকা ততই দূরে স'রে যাচ্ছিল।

রামচন্দ্রদেব নিদাঘ মধ্যাহ্নের সেই প্রচণ্ড রৌদ্রে কোন্ দিকে চলেছিলেন তা বুঝি নিজেও বুঝতে পারছিলেন না। তিনি কেবল এই ভেবে এগিয়ে যাচ্ছিলেন যে চিলিকার তীরে কোনও পাইক বসতিতে গিয়ে পড়তে পারলে আর কিছু না হোক পশ্চাদ্ধাবনরত মোগল লশকরদের হাত থেকে অন্ততঃ আত্মরক্ষা করতে পারবেন।

সেই দিক্‌চিহ্নহীন নিমকির ক্ষেত এবং বিভ্রান্তিকর বালুপ্রান্তরে দিগ্‌বলয়লগ্ন এক ক্ষুদ্র জনবসতি ক্রমে রামচন্দ্রদেবের অসহায় দৃষ্টিপথে উদিত হল। একটি অনতিউচ্চ মন্দিরচূড়ায় নীল-চক্রও দেখা গেল, কিন্তু তাতে নিশান ছিল না।

গ্রামখানির নাম মালকুদা। তার ও-পাশে এক বনাকীর্ণ পার্বত্য

'নাসি'[1] হাতীর শুঁড়ের মত চিলিকার জলরাশির উপর লম্বিত হয়ে রয়েছে। রামচন্দ্রদেবের মনে পড়ল দিব্যসিংহদেবের সাত অঙ্কে মোগলেরা যখন পুরুষোত্তম ক্ষেত্র আক্রমণ করেছিল তখন জগন্নাথ চিলিকার পথে এসে এইখানেই কোথাও আত্মগোপন করেছিলেন। অতীতে যতবার জগন্নাথ দক্ষিণে স্থানান্তরিত হয়েছেন, সর্বদা এইখানেই এসে থেকেছেন। সেইজন্য বহুকাল থেকে এখানে একটি দেবালয় নির্মাণ ক'রে জনকতক সেবক ও পাইক নিয়ে একটি গ্রাম স্থাপন করা হয়েছিল। দিব্যসিংহের পর থেকে এ পর্যন্ত জগন্নাথ প্রায় নিরুপদ্রব থাকায় মন্দিরটি পরিত্যক্ত হয়ে প'ড়ে ছিল, সেবকরাও অন্যত্র উঠে গিয়েছিল। তাদের পরিত্যক্ত ঘরগুলি ঝড়ে বাতাসে ক্রমে চিলিকার বালিতে মিশে গেলেও আগাছাভরা পোড়ো ভিটেগুলি এককালের জনবসতির আভাষ দিচ্ছিল। পাইকদের গেরিমাটি-লেপা ঘরগুলিও অধিকাংশ ক্রমে পরিত্যক্ত হয়েছিল। ঝড়ে বৃষ্টিতে মেরামতের অভাবে সেগুলি মরা হাতীর মত মুখ থুবড়ে প'ড়ে ছিল। তার মধ্যে মন্দিরের প্রাচীরের কাছে কয়েকটি ঘর কেবল অক্ষত অবস্থায় ছিল। অধিকাংশ পাইক-বসতির তখন এমনি অবস্থা। আত্মরক্ষা ও আক্রমণের মধ্যে বহু ঘর ক্রমে জনশূন্য, বহু গ্রাম পরিত্যক্ত।

গাঁয়ের পথ জনহীন চিলিকার বিভ্রান্ত বায়ুর দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। রামচন্দ্রদেব তখন পিপাসায় আকুল, জলের সন্ধানে একটি ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন। ঘরের দ্বার খোলা পড়ে ছিল। দেওয়ালে আলপনার দাগ, বর্ষা ও বেমেরামতিতে ক্ষতচিহ্নের মত দেখাচ্ছে।

ঘোড়ার উপর থেকে লম্ফ দিয়ে নেমে রামচন্দ্রদেব উচ্চ কণ্ঠে

1. নাসি— স্থলভাগের ক্রমসূক্ষ্ম অগ্রভাগ, অন্তরীপ।

ডাকলেন—"জল—জল দাও। কে আছ ঘরে?"

কোনও উত্তর না পেয়ে তিনি বারান্দার উপর উঠলেন। ভিতরে এক বৃদ্ধা শিথিল কর্কশ কণ্ঠে কার উদ্দেশে অভিসম্পাতের স্রোত ছুটিয়েছে:—"ওলো ও ছোট বউ, ও পোড়ারমুখী সর-অ[1], শালের কোঁড়ার মত ছেলেটাকে খেলি, ভাশুরদের খেলি, জায়েদের খেলি, শেষে বুড়ো শ্বশুরটাকেও খেলি, খালি আমায় বাকি রেখেছিস্ কি ভুগিয়ে ভুগিয়ে খাবি? এত খেয়েও তোর পেট ভরল না? আমায় তো যমে ভুলেছে, তুই আমায় খাবি কি লো সর্বখাকী! ওলো ও সর্বনাশী সর-অ—মর্—মর্ অলপ্পেয়ে। পইপই ক'রে বারণ করলাম লড়ায়ে যাস্‌নে। এখানে বকশী মারছে রাজাকে, রাজা মারছে বকশীকে, ভাইয়ের পায়ের গোছ কাটছে ভাই, পোতা মারছে বাপকে—মোগলের তলোয়ারের ঘায়ে মরছে সবাই। একে কি লড়াই বলে?... কেন সে তলোয়ারের মুখে গলা বাড়াবি রে? বসুন্ধরা প'ড়ে আছে, খাটো, ফলাও, খাও। অলপ্পেয়েরা মানলে না, মানলে না। সেই খিটখিটে বুড়োই তো ছোঁড়াগুলোকে মাতালে; বললে—তোরা পাইকের ঘরের ছেলে না বেহেরাণীর[2] বাচ্ছা রে সব? লড়াই লেগেছে, তূরী নাকাড়া বাজছে, এমন সময়ে কোন্ পাইকের ছেলেটা বউয়ের আঁচলের তলায় লুকোয় রে?...খাঁড়া উঁচিয়ে অলপ্পেয়ে বুড়ো ভর হওয়া মিনসের মত ঘর ঘর ঘুরে নেচে বেড়ালে। এখন মর্—মর্—ওলো সর্বনাশী সর্বখাকী রাঁড় সর-অ—"

রামচন্দ্রদেব একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অসহায়ভাবে অন্য দিকে

1. সর (উচ্চারণ অকারান্ত)—স্ত্রীলোকের নামবিশেষ, সর-অ অর্থে দুধের সর, বাপ-মায়ের দেওয়া বড় আদরের নাম।

2. বেহেরাণী—বেহেরা (পালকি ইত্যাদি বাহক)-রমণী।

তাকাতে গিয়ে দেখলেন মুখের উপর আড় ঘোমটা টেনে বাম বাহুতে জলভরা কলসী নিয়ে একটি রমণী বারান্দার উপরে ওঠার অপেক্ষায় নীরবে সসংকোচে নীচে দাঁড়িয়ে আছে। রামচন্দ্রদেবের তখন সংকোচ করার মত অবস্থা নয়, নীচে নেমে গিয়ে মাটিতে জানু পেতে ব'সে হাতদুটি মুখের কাছে অঞ্জলিবদ্ধ ক'রে চেঁচিয়ে উঠলেন—

"জল— জল—"

কুলবধূটি রামচন্দ্রদেবের অঞ্জলিতে কলসীর জল ঢেলে দিল। আকণ্ঠ জল পান ক'রে রামচন্দ্রদেব কৃতজ্ঞতাভরা দৃষ্টিতে জলদাত্রীর দিকে যখন চাইলেন, সে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় কলসী হাতে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরের ভিতর থেকে নিরবচ্ছিন্ন অভিসম্পাতের স্রোত সেই নিষ্ঠুর মধ্যাহ্নে তখনও বয়ে আসছিল।

গ্রীষ্মের তপ্ত হাওয়ায় রমণীর মাথার ঘোমটা স'রে গেল। মলিন বিষণ্ণ কপালের নীচে রৌদ্রতাপিত কুমুদদলের মত তার দুটি আয়ত চক্ষু সহানুভূতি ও সংবেদনশীলতায় কোমল হয়ে উঠেছিল।

সেই চোখ দুটিতে ছিল ছায়ামেদুর নিথর হ্রদের অতল গভীরতা, ম্লান নিরালা জ্যোৎস্না রাত্রির বেদনাবিধুরতা, আবার ব্যাধভীতা বনহরিণীর চকিত অসহায়তা। চিলিকার রৌদ্রদগ্ধ নির্জন বালিয়াড়ি সেই দুটি চোখে যেন রিক্ততার পরিপূর্ণ মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল।

জলদাত্রী হয়তো রামচন্দ্রদেবের সমবয়স্কা, কিন্তু নিটোল যৌবনের উজ্জ্বল কান্তির উপরে দুর্ভাগ্যের কালিমার একটি আস্তরণ কবে থেকে পড়েছে যেন। বাহু ও হাত দু'খানি নিরাভরণ সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা ছিল না। বিষণ্ণ কপালের উপরে দুই ভ্রূলতার মাঝখানে তিল ফুলের একটি নীল উলকি আঁকা।

—এই কি সেই সর্বনাশী সর-অ ?

রামচন্দ্রদেব ইন্দ্রিয়াসক্ত ব'লে একটা দুর্নাম ছিল। বহুনারী-সম্ভোগতৃষ্ণা তাঁর ছিল অতৃপ্ত। আজ কিন্তু এই রমণীর বেদনাক্ত লাবণ্য রামচন্দ্রদেবের প্রাণে ইন্দ্রিয়াসক্তির পরিবর্তে এনে দিল এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। তাতে কামনার উত্তাপ ছিল না, ছিল শ্রদ্ধার স্নিগ্ধতা। রামচন্দ্রদেব রমণীকে ঘরে উঠবার পথ ছেড়ে দিতে যেন ভুলে গিয়েছিলেন।

অগত্যা ভীরু কম্পিত কণ্ঠে সে বললে—

"পথ ছাড়ো।"

রামচন্দ্রদেব মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে অসহায় দৃষ্টিতে আবার চিলিকা-তীরের বালিয়াড়ির দিকে চেয়ে রইলেন। এখান থেকে ফেরার উপায় ছিল না। কি উদ্দেশ্যে বকশী ছত্রদ্বার ঘাট থেকে ফৌজ সরিয়ে নিলেন কে জানে, কিন্তু এখান থেকে ফিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আবার সংযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। গঞ্জাগড়ের মানসিংহ রামচন্দ্রদেবের মুখের উপর দুর্গদ্বার বন্ধ ক'রে দিয়ে ইতিমধ্যে মালদের ফৌজদারকে এত বড় খবরটা না দিয়ে কি আর চুপ ক'রে বসে আছেন? তা হ'লে বিশ্বাসঘাতকতার নিমকহারামী ইনাম মিলবে কি ক'রে? রামচন্দ্রদেবের সংবাদ পেয়ে ফৌজদারের লশকরেরা ডালকুত্তার মত গন্ধে গন্ধে তার পিছনে ধাওয়া করা তো অসম্ভব নয়। চিলিকাই এখন তাঁর পলায়ন ও আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়।

রামচন্দ্রদেব এইপ্রকার নানা চিন্তা করছেন এমন সময় সেই নারী কবাটের আড়াল থেকে মুখের একাংশ বার ক'রে জিজ্ঞাসা করলে: "তুমি কে, পাইক না ডাকাত? যদি ডাকাত হও তো চ'লে যাও, আমরা বড়ই নিরাশ্রয়।"

রামচন্দ্রদেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিলেন, "খোর্ধার রাজার পাইক আমি।"

নারী বললে, "রাজা না দক্ষিণে সে কোন্ টিকালীতে লড়াইয়ে 'বিজে'[1] করেছেন, আর তুমি তাঁকে ছেড়ে এই তেপান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছ কি ক'রে ? রাজা কি হেরে গেছেন ? তুমি কি রাজাকে ছেড়ে পালিয়ে এসেছ ?"

রামচন্দ্রদেব কি বলবেন ভেবে পেলেন না। ঢোক গিলে বললেন, "না, রাজা হারেন নি। রাজা ডেরা গেড়ে আছেন বাণপুরে। পথে জেগে ব'সে আছে মালুদের ফৌজদার বশীর খাঁ। চিলিকা দিয়ে রাজার কাছে জরুরি খবর নিয়ে যাবার জন্য নৌকা খুঁজতে খুঁজতে আমি এখানে এসে পড়েছি।"

সে আশ্বস্ত হয়ে বলল, "তা হলে পাইক তুমি, ডাকাত নও। তবে দিনের বেলা ঘাট থেকে নৌকা খুলবে কি করে ? রম্ভার 'নাসি' (অন্তর্বীপ) থেকে চিলিকার ধার ববাবর মালুদের ফৌজদারের নৌকো পাঁয়তারা কষে বেড়াচ্ছে। গঞ্জাগড়ের রাজা আবার ঢেঁটরা পিটিয়ে দিয়ে গেছে যে ঘাট থেকে কেউ নৌকো খুলতে পারবে না।"

তা হলে চিলিকার পথও বন্ধ !

আতঙ্কিত কণ্ঠে রামচন্দ্রদেব যেন আপন মনেই বললেন: "তা হ'লে? —তাহ'লে ?

রমণী কবাটের আড়াল থেকে রামচন্দ্রদেবের দিকে চেয়ে ভাবছিল —আহা, কোন্ হতভাগিনীর কত চোখের জল ফেলিয়ে এই তেপান্তরে এ ঘুরে মরছে। আবার ঘরের মুখ দেখবে না তলোয়ারের মুখে গলাটা দেবে কে জানে সে কথা ?··· হায়, তারও স্বামী না জানি

1. 'বিজে' করেছেন— বিজয় করেছেন, অর্থাৎ গেছেন।

এমনি কোন্ তেপান্তরে এক ফোঁটা জলের জন্য এমন হা-হুতাশ করে বেড়িয়েছে!

সব সংকোচ ভুলে সে বারান্দা থেকে নেমে এসে বলল, "তুমি পাইক না? আমাদেরও তো পাইকের ঘর। কিছু মুখে পড়ে নি হয়তো। এসো, ভিতরে এসো। এই ঝাঁ ঝাঁ রোদে কতক্ষণ এমনি দাঁড়িয়ে থাকবে?"

ভিতরে বৃদ্ধার অভিসম্পাতের তখনও বিরাম ছিল না— "খালি ভাইয়ের গলায় ভাইয়ের ছুরি! দেশ মোগলে খাবে না তো খাবে কে?..."

রামচন্দ্রদেব শুধোলেন, "ভিতরে ও কে?"

নিস্পৃহ গলায় রমণী উত্তর দিল, "উনি আমার শাশুড়ী, লড়াইয়ে তাঁর তিন ছেলে মরার পর থেকে পাগল হয়ে গেছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমায় এমনি গালি দিয়ে তিনি মনের জ্বালা মেটান। কালা ছিলেন, এখন অন্ধও হয়ে গেছেন। তুমি এসেছ তা কি আর উনি জানেন?"

রামচন্দ্রদেব বারান্দার উপর উঠছেন এমন সময়ে নির্জন পথে হঠাৎ অশ্বপদশব্দ! আট-দশজন ঘোড়সওয়ার একসঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে! রামচন্দ্রদেব উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন। মালুদের ফৌজদারের লশকর তাঁকে বন্দী করতে আসছে নাকি?

রামচন্দ্রদেব লম্ফ দিয়ে ঘরের ভিতরে অদৃশ্য হ'তে না হ'তে ছ-সাত জন মোগল অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে এসে উপস্থিত হল।

অদূরে এক কাজুবাদাম গাছের ছায়ায় একটা ঘোড়া বাঁধা দেখে একজন প্রশ্ন করলে, "এ ঘোড়ার মালিক কোথায়?"

গলায় সাহসের সুর এনে নারী বলল, "কোন্ ঘোড়া ? আ গেল যা, এ ঘোড়া কার না কার আমরা তার কি জানি! কত মোগল লশকর এদিকে দৌড়ঝাপ করছে, তাদের কারো হবে।"

অশ্বারোহী ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমে বললে, "চালাকি রাখ্! খোর্ধার রাজার এ ঘোড়া— আমরা ঠিক চিনি। বল্ সে কোথায় লুকিয়েছে!"

নারী কম্পিত কণ্ঠে বলল, "রাজা ? কোন্ রাজা ?"

অশ্লীল ভঙ্গীতে চীৎকার ক'রে অশ্বারোহী বললে, "বল্ রাজাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্! নইলে ইজ্জত থাকবে না।"

আর একজন ঘোড়সওয়ার হেঁড়ে গলায় বললে, "আরে, রাজা না মেলে তো রাণী তো মিলেছে! তুলে আন ঘোড়ার উপরে।"

ঘোড়সওয়ারদের ইতর পরিহাসে গাঁয়ের নির্জন পথ অশ্লীলতায় মুখরিত হ'ল।

রামচন্দ্রদেব খড়্গ উঁচিয়ে রাস্তায় লাফ দিয়ে প'ড়ে চীৎকার ক'রে বললেন, "খবরদার। খণ্ডায়ত[1] পাইকের ঘরের বিধবা কুলবধূ সে, হোমশিখার মত। ম্লেচ্ছ ওকে স্পর্শ করতে পারবে না।"

রামচন্দ্রদেব লম্ফ দিয়ে নীচে নামবার সময়ে একজন অশ্বারোহী তাঁকে লক্ষ্য ক'রে বর্শা ছুড়েছিল, কিন্তু সেই রমণী নিমেষের মধ্যে সামনে এগিয়ে এসে রামচন্দ্রদেবকে আড়াল ক'রে দাঁড়াল। বর্শার আঘাতে রক্তাপ্লুত দেহে আর্তনাদ ক'রে মাটিতে প'ড়ে গেল।

রামচন্দ্রদেব তরবারি তুলেছিলেন, কিন্তু যুগপৎ বহু তরবারির আঘাতে তাঁর তরবারি হস্তচ্যুত হয়ে প'ড়ে গেল। তিনি অসহায়-ভাবে মাথা নিচু ক'রে বললেন, "এবার আমায় বন্দী করতে পারো।"

1. খণ্ডায়ত— জাতিবিশেষ, তাদের কাজ শান্তির সময়ে কৃষিকর্ম, যুদ্ধের সময়ে রাজসেনাদলে যোগদান।

4

রামচন্দ্রদেব ন্যায়বলপট্টের উপর একটি বটিকা মাত্র চেলে রাজাকে কিস্তিমাত ক'রে দিলেন। তার পর আপন মনেই মৃদু স্বরে ব'লে উঠলেন : তবু কিন্তু কিস্তিমাত হয় নি।—যাই হোক, সেদিন বকশী ছত্রদ্বার ঘাট থেকে ফৌজ সরিয়ে এনেছিলেন কেন ?—কেন ? রাজপুর প্রান্তরেই যদি চিকাকোলের ফৌজদারকে আটকানো বকশীর অভিপ্রায় হ'ত, তা হলে কই রাজপুরে তিনি তো লড়লেন না!

কিন্তু রামচন্দ্রদেব বন্দী হবার পরে চিকাকোলের ফৌজদার তো সসৈন্য সেখান থেকে ফিরে গিয়েছিল। বকশী আর লড়বেন কার সঙ্গে ? তাও তো বটে।

তবু সে-সব যুক্তিতে রামচন্দ্রদেবের মন সায় দিচ্ছিল না। বকশীর সেদিন ছত্রদ্বার ছেড়ে পলায়নের রহস্য তাঁর চিন্তাকে বার বার আলোড়িত করছিল। বকশীর গ্রন্থিল মুখ, মুণ্ডিত মস্তক ও খলের মত কুটিল দুই চক্ষু রামচন্দ্রদেব শত চেষ্টা করেও মনশ্চক্ষুর সামনে থেকে দূর করতে পারছিলেন না।

বকশী বেণু ভ্রমরবর কি বিশ্বাসঘাতক ?

শতরঞ্জের বুকের উপর যেন বকশীর ক্রূর কুটিল ভয়ংকর দুইটি চক্ষু এক বিভ্রান্তিকর জিজ্ঞাসাচিহ্নের মত ফুটে উঠল।

—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

1

মহাকার্তিক এসে গেল।

শ্রীক্ষেত্রে এখন থেকে দোলযাত্রা পর্যন্ত দূরদেশী যাত্রীদের ভিড় লেগে থাকে, কিন্তু জিজিয়ার হুজুম আর মোগলগোলের ভয়ে বড়দাণ্ড এ বৎসর জনশূন্য।

সর্বত্র মন্দির ধ্বংসও আবার এক দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়েছে। হাতের কাছে যেখানে যত মন্দির আছে সব ভেঙে সেই পাথরে পিপিলী, কটক ও অন্যান্য জায়গায় মসজিদ তৈরি চলেছে। লোকমুখে শোনা যায় পিপিলীর মসজিদের মত এত বড় মসজিদ নাকি মোগল-বন্দিতে[1] আর কখনো তৈরি হয় নি।

আওরঙ্গজেবের সময় থেকে মন্দির ভাঙা এক ধর্মকার্যও ছিল যেমন তেমনি এক রাষ্ট্রীয় কর্তব্যও ছিল। একরাম্ খাঁ নায়েব নাজিম থাকা কালে সে কটকে অনঙ্গভীমদেবের সময়ের তৈরী জগন্নাথ মন্দির ভেঙে প্রস্তরস্তূপে পরিণত করেছিল। সেই পাথরে তৈরী হয়েছিল কটকের জুমা মসজিদ। সুজা খাঁ ১৬৩৫ শকাব্দে সেই মন্দিরের প্রাচীরের পাথরে তৈরি করেছিলেন কটকের কদম-রসুল[2]।

1. মোগলবন্দি— ওড়িশার মোগলশাসিত অঞ্চল।

2. কদম-রসুল— কটকের সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম পীঠস্থান, সেখানে রসুল বা হজরৎ মোহম্মদের কদম অর্থাৎ পদচিহ্ন আছে এই প্রসিদ্ধি।

সুজা খাঁ কিন্তু খুব বেশী হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না। হিন্দুদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অন্তরঙ্গ। সেইজন্য মুর্শিদাবাদ থেকে কটকে আসবার সময়ে রায় আলমচাঁদ ও ফতেচাঁদ জগৎশেঠ প্রমুখ বিশিষ্ট হিন্দুদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা ছিলেন সুজা খাঁর বন্ধু ও মন্ত্রণাদাতা। তাই সুজা খাঁর নায়েব-নাজিমির আমলে ওড়িশার মন্দিরগুলি মুসলমানদের কালাপাহাড়ী আক্রমণ থেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল। কিন্তু সুজাখাঁর জারজপুত্র তকী খাঁ কটকের নায়েব-নাজিম হয়ে আসার দিন থেকে আবার মন্দির ভাঙা আরম্ভ হয়েছিল। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে তাই এক অশরীরী আতঙ্কে ছম ছম করছিল।

এই আতঙ্কের সঙ্গে আবার দুর্ভিক্ষ। জল ভাল হওয়া সত্ত্বেও চাষীরা জমি পতিত রেখে দিয়েছিল। ফসল করলেও তো লুটপাট ক'রে সব উজাড় ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, তার উপরে খাজনাও যা বসেছে তাতে প্রজারা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। কি হবে জমি চাষ ক'রে ?

খোর্ধা কেল্লার উপর খান-ই-দৌরানের সময় থেকে বার্ষিক ছয় লক্ষ পনেরো হাজার ছয়শ' ষোল টাকা 'পেস্‌কস' বা কর নির্দিষ্ট হয়েছিল। কাগজপত্রে তাই লেখা হলেও খোধার রাজা প্রতি বৎসর তা দেওয়া ঘোর অসম্মানজনক মনে করছেন। সেইজন্য প্রজাদের মেরে ধ'রে কর আদায়ের জন্য উকিল সৈয়দ বেগ ওরফে লোধু মিঞা সঙ্গে লশকর নিয়ে খোধা গড়ে ব'সে আছে। পূর্বে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধের জন্য মারধর লুঠতরাজ ক'রে 'পেস্‌কস্' আদায়ের জন্য দিল্লী থেকে তাগাদা আসত এখন কিন্তু তাগাদা আসছে মুর্শিদাবাদ থেকে।

প্রজারা কর দিতে না পেরে তাই ভিটেমাটি ছেড়ে, জন্মস্থানের মায়া মমতা ভুলে এখানে ওখানে চ'লে যাচ্ছিল। ফিরিঙ্গীদের বালেশ্বর পিপিলী ও গঙ্গাবন্দরের দিকে যাচ্ছিল তাঁতী কারিগর ও হাটুরে শ্রেণীর

লোকেরা, অন্যেরা কোনমতে প্রাণ ও মান বাঁচিয়ে দুর্গ-প্রধানদের শাসিত এলাকায় পালাচ্ছিল।

এদিকে রামচন্দ্রদেব কটক বারবাটী কেল্লায় বন্দী থাকবার সময় কলমা পড়ে যবনী বিবাহ ক'রে হাফিজ্ কাদ্‌র ইয়ার জঙ্গ্ হওয়া ইস্তক দারুভূতোমুরারিব ন্যায় খোর্ধা পাথরগড়ে ব'সে আছেন। পাইক-দের অাগেকাব সে তেজ আর নেই। রাজা, জগন্নাথের রাজসেবক হয়ে থাকা পযন্ত পাইকদের চোখে তিনি রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও প্রাণশক্তির প্রতীক ছিলেন। কিন্তু ধর্মান্তরের পর থেকে তাঁর প্রতি পাইকদের পূর্ব শ্রদ্ধা সম্ভ্রম ও বিশ্বাস লোপ পেয়েছিল। তাদের দৃষ্টিতে বকশী বেণু ভ্রমরবর এখন একমাত্র ভরসার স্থল। কিন্তু তাই ব'লে বকশীও রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে হাত তুলতে হঠাৎ ভরসা পাচ্ছিলেন না। রামচন্দ্রের শ্যালক নায়েব-নাজিম তকী খাঁকে তাব প্রাণে ভয়।

2

পুরীর বালিসাহীতে পুবাতন রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপের মধ্যে হনুমান আখড়া মঠ।

বেণু ভ্রমরবর পুরী এলে এইখানে ডেরা বাঁধেন। থাকবার অন্য জায়গা তাঁর ছিল না তা নয়, তবে এই প্রাসাদের ভগ্নাবশেষকে আঁকড়ে ধ'রে অতীতের গজপতিদের কীর্তিসমৃদ্ধ গৌরবোজ্জ্বল পরম্পরার তিনিই যেন একমাত্র উত্তরাধিকারী এমনি এক ধারণা সৃষ্টি করাই তাঁর এখানে থাকবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

মহারাজ হরেকৃষ্ণদেবের দেওয়ান ভগী ভ্রমরবরের বিজাত পুত্র বেণু রাউতকে ভ্রমরবর বংশাবলীতে কেউ অবশ্য স্থান দেয় নি। তবু বেণু রাউতের প্রচারের ভাবখানা ছিল যেন তিনিই খোর্ধা

সিংহাসনের প্রকৃত, অধিকারী, কেবল মানুষ ও নিয়তির ষড়যন্ত্রে তা থেকে তিনি সাময়িকভাবে বঞ্চিত।

অতৃপ্ত উৎকাঙ্ক্ষার যন্ত্রণার চাইতে অধিক নিগ্রহ বোধ হয় আর নেই। টিকালীর যুদ্ধে রামচন্দ্রদেবকে শত্রুর মুখে ঠেলে দিয়ে বকশী ভেবেছিলেন তকীখাঁর হাত থেকে রামচন্দ্রদেবের এবার আর নিস্তার নেই, খোর্ধার গদি এবার নির্বিবাদে তাঁর মুঠোয় এল ব'লে! কিন্তু রামচন্দ্রদেব তকীর্খার ভগিনীপতি হয়ে আবার তারই জোরে খোর্ধায় ফিরবেন এ কথা কে ভেবেছিল?

হনুমান আখড়া মঠের 'গম্ভীরায়[1] ব'সে মালাজপ করতে করতে বকশী এখন আশাভঙ্গের অকৃতার্থতাবোধকে প্রশমিত করবার বার বার ব্যর্থ প্রয়াস করছিলেন।

গঙ্গবংশী রাজাদের সময়ে নির্মিত বালিসাহীর এই প্রাচীন 'নঅর'[2] অরণ্যনিহিত প্রাচীন ইতিহাসের মতই কাঁটালতা আর আগাছার বনে ভাঙা ইটপাথরের স্তূপের মধ্যে উপুড় পয়ে প'ড়ে আছে। পুব দিকের এক সারি অট্টালিকা ব্যতীত প্রসাদের বাকী সমস্তটাই এখন মরা হাতীর মত ভূমিশায়ী। প্রাসাদ-প্রাচীরের বেষ্টনীর ভিতরে কবেকার শ্বেতপাথরের ঘাট-বাঁধানো পদ্মপুকুরটি কোন বিগত সুদিনের স্মৃতির মত ঝিলমিলে রোদে বিছানো, পড়ে রয়েছে। কিন্তু তাও দামে পাতায় ভরা। সেই আস্তরণ ভেদ ক'রে কোথাও বা একটি লাল শালুক মাথা তুলেছে। পুষ্করিণীর উত্তর কোণে শ্যামাকালীর মন্দির, মন্দিরটি এখন হনুমান আখড়ায় পরিণত হয়েছে। উত্তর ভারতের এক সাধু সীতারামজী এই আখড়াটি স্থাপনা করেছিলেন। মঠের

1. গম্ভীরা— একান্তগৃহ।
2. নঅর বা নবর (উচ্চারণ অকারান্ত)— রাজবাটী, প্রাসাদ।

নিজস্ব সম্পত্তি কিছু নেই, অন্যান্য মঠের প্রদত্ত সাহায্যে আখড়াটি চলে। সীতারামজীর দেহান্তের পর লছমনজী এই আখড়ার অধিকারী পদে আছেন।

আধ্যাত্মিক সাধন ভজন অপেক্ষা শরীরচর্চাই পুরীর আখড়াগুলির প্রধান অনুষ্ঠেয়। কালাপাহাড়ের আক্রমণের পর পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের উপরে আফগান ও মোগলদের পুনঃপুনঃ আক্রমণ হওয়ার সময় থেকে পুরুষোত্তমে এমনি সব আখড়া ও 'জেগাঘরের' উদ্ভব হয়েছিল। আখড়ার চেলারা মল্লযুদ্ধ, ঢাল-তরোয়াল খেলা, মুগুর ঘোরানো ও শাবল ছোঁড়া প্রভৃতি নিয়মিত অভ্যাস করে। শ্রীক্ষেত্রের উপর আক্রমণের সময় বহুবার এরাই কেবল তার প্রতিরোধ করতে পেরেছিল। এমনি বিভিন্ন আখড়া বকশী বেণু ভ্রমরবরের এক-একটি প্রধান আড্ডা। এই আখড়াগুলির মারফতে তিনি শ্রীক্ষেত্রে আপন এক্তিয়ার বজায় রেখেছিলেন। সেইজন্য রাজকোষ থেকে এগুলিকে তিনি প্রভূত আর্থিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থাও করেছিলেন।

বকশী যখন গম্ভীরায় ব'সে নাম জপ করছিলেন সেই সময় আখড়ায় সাহসী যুবকেরা শরীর সাধনায় ব্যাপৃত ছিল। লছমনজী শ্যামাকালী মন্দিরের শৈবাল-আস্তীর্ণ অলিন্দে একটি কম্বলের আসনে ব'সে দুইটি যুবকের মল্লযুদ্ধ দেখছিলেন, তাদের অঙ্গকৌশলের উপর তাঁর তীক্ষ্ণ সমালোচকের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল।

জগু পড়িআরি ও চেম-অ লেঙ্কা মালকুস্তিতে কেউ কারও কম নয়। ত্রিকচ্ছ পরিহিত দুইটি কালো নগ্ন মূর্তি দুইখানি মসৃণ মুগুনি[1] পাথরের মত মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছিল। চেম-অ যখন উপুড় হয়ে পড়ছিল

1. মুগুরি পাথর— সবুজ আভাযুক্ত একপ্রকার কালো ভারী অতি কঠিন ও মসৃণ পাথর যা থেকে দেবমূর্তি খোদাই করা হয়।

জগু পড়িআরী তার উপর চ'ড়ে ব'সে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে, দু'হাতের কনুই মাটিতে ঠেকনা দিয়ে চেমর দুই বগলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তাকে উলটিয়ে চিৎ ক'রে ফেলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু অমনি উপুড় হয়ে প'ড়ে থাকতে থাকতে এক সময়ে চেম-অ নিজের শরীরটাকে অজগরের মত হঠাৎ এমনভাবে আফসাচ্ছিল যে উলটে জগু পড়িআরীই ছিটকে উঠে মাটি কামড়ে পড়ছিল। তাদের চারিদিকে দাঁড়িয়ে অন্য চেলারা যারা কুস্তি দেখছিল তারা তখন হাততালি দিয়ে গলা ছেড়ে বাহবা দিচ্ছিল। জগু পড়িআরী গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পা ফাঁক ক'রে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত ছড়িয়ে আবার পাঁয়তারা কষতে শুরু করছিল। দুই হনুমানের মত তাদের হুম হাম শব্দে আখড়া থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল।

দেউলের মুখশালায় লেঙ্গট প'রে নরিসিংহারী একটা উঁচু শিলের উপর ডন-বৈঠক মারার ভঙ্গীতে ভাঙ বাটছিল। এর পরে নরেন্দ্র সরোবরে স্নানের ফূর্তিটা জমবে ভাল! পা থেকে বুক পর্যন্ত সমস্ত মাংসপেশী খেলিয়ে দুলিয়ে নরিসিংহারী শিলের উপরে নোড়া ঠেলতে ঠেলতে উপেন্দ্র ভঞ্জের[1] চৌপদীর এক-একটি পদ গেয়ে উঠছিল :—

“পরমানন্দঙ্কু পচারিবু দূতী প্রীতিহীরা বন্ধা নেলে
কলণ্ঠব লাগি 'মা যুব, বয়স যেতেক সে ভোগ কলে
এথি উত্তারু যে ন দিঅন্তি মোর ধন
সাক্ষী গোইকবি অছি পঞ্চমন ন কহে কিম্পা পিশুন।”

1. উপেন্দ্র ভঞ্জ— ওড়িশার অষ্টাদশ শতাব্দীর মহাকবি, স্বকীয়া প্রীতিজনিত আদিরস ও অলোকসামান্য কাব্যালংকারচ্ছটার জন্য প্রসিদ্ধ।

[পরমানন্দেরে বলিবি রে দূতী   প্রীতি-হীরা বাঁধা নিল
কুসীদস্বরূপে এ মোর যৌবন   যতেক সে ভোগ কৈল
তার পর কেন না ফেরায় মোর ধন
সাক্ষী হয়ে মোর আছে পঞ্চমন   কিছু না কহে শঠ সে কিসের কারণ?]

ভাঙ-বাটা শিলের কাছে একটা খাঁচায় কয়েকটা 'গোবরা' পাখী ভারী কিচির মিচির জুড়েছিল। সিংহারীর পদকীর্তন শুনে বিদগ্ধ কেউ কেউ ভাঙখোর গলায় তারিফ ক'রে উঠেছিল—"সাবাস রে মিতে।"

ভাঙ-বাটা মরীচ জল কয় ফোটা মুখে ফেলে নরিসিংহারী আবার গেয়ে উঠল—

"আসিলে যবন শমনপুবক্
যিব সে বাড়ুডি জাণ রে—"
[আসিল যবন শমনপুরেকে
যাবে সে বাহুড়ি জেনো রে—]

মালকুস্তির আখড়ায় জগু পাটিআরী ততক্ষণ চেম-স লেঙ্কাকে চিৎ ক'রে দিয়েছে, দর্শকদের করতালিতে আখড় প্রকম্পিত।

ক্ষয়িষ্ণু কালের এই আত্মবিস্মৃত ক্রীড়নকেরা জানত না যে তাদেরই পৃষ্ঠপোষক বেণুভ্রমররর আখড়াতেই একান্ত গৃহে ব'সে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যবনকে আমন্ত্রণ ক'রে আনার উপায় চিন্তায় ব্যাপৃত। ওড়িশার দিকে দিকে মন্দির ও দেবায়তন যখন কালাপাহাড়ী আক্রমণে ধূলিসাৎ হচ্ছিল তখন তারা অনুভব করতে পারছিল না সে নিপীড়ন ও নির্যাতনের গ্লানি। আখড়ায় ভাঙের মৌজ আর মালকুস্তিতে তারা ভুলে ছিল নিজেদের।

ইতিহাসে যখন অবক্ষয়ের কাল আসে বাহিরের সমস্ত অনুষ্ঠানে তখন এমনি গুণগত পরিবর্তন ঘটে। হনুমান আখড়ার মঠের

অধিকারী বা চেলাচামুণ্ডা তাই সে পর্যন্ত আসন্ন সর্বনাশের কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছিল না বা দেখার চেষ্টাও করছিল না।

পূর্বোক্ত জীর্ণ অট্টালিকার অন্ধকার গুম্ফার ন্যায় তিন প্রস্থ 'গম্ভীরা' ঘর অতিক্রম করলে একটি অলিন্দে এসে পড়া যায়। অলিন্দের চতুর্দিকে শেওলাপড়া দেওয়ালে নিম অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছের চারা বেড়ে উঠেছিল। গাছের শিকড়ের দাপটে দেওয়াল কোথাও কোথাও চৌচির হয়ে ফেটে গেছে। দেওয়াল থেকে চুন পলেস্তারা উঠে গিয়ে পাতলা ইটগুলি নরকপালের দন্তপঙ্‌ক্তির মত দেখাচ্ছিল।

অলিন্দের পশ্চিমে একটি বাঁধানো পুষ্করিণী। তাতে সোপানশ্রেণী নেমে গেছে। কবে এখানে অন্তঃপুরিকাগণ গা ধুতে নামতেন। এখন তার ভিতরে খুঁজলে কয়েকটা নরকপাল পাওয়া অসম্ভব নয়। অতীতে সেখানে কত আত্মহত্যা হয়েছে, কত শত্রুর শব তার গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়েছে কে তার হিসাব দেবে? তবু আজ তার জল স্বচ্ছ, শুদ্ধ।

পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ে এক ফালি বারান্দা। বারান্দার পাশে এক সারি ঘরের মধ্যে এক 'গম্ভীরা' ঘরে একটি পুরাতন পালঙ্কের উপরে বনাতের বিছানা ও তাকিয়া প'ড়ে আছে। সেই বিছানার উপর একটি কম্বলের আসনে ব'সে বকশী বেণুভ্রমরবর মালা জপ করছিলেন। পারত্রিক ধ্যানে অভিনিবেশের জন্য মালাজপ যেমন উপযোগী ঐহিক দুষ্ট চিন্তায় একাগ্রতার জন্যও তা তেমনি প্রশস্ত! তাই মালা জপ করতে ব'সে বকশী যা চিন্তা করছিলেন তা খোর্ধার সিংহাসনকে কেন্দ্র ক'রে।

তাঁর শুষ্কচর্মাবৃত শিথিল মুখমণ্ডল, মুণ্ডিত মস্তক, মাংসপেশীপুষ্ট মেদবর্জিত দেহ গম্ভীরার ছায়ান্ধকারের মধ্যে অতি পৈশাচিক দেখাচ্ছিল

কিন্তু বকশী নয়ন মুদ্রিত করা মাত্র যেন ভেসে উঠছিল সেদিন রাত্রির শেষ প্রহরে রথীপুর গড়ের সেই স্বপ্নবিভীষিকা। আজ পর্যন্ত বহু চিন্তা ক'রেও তিনি সে ভয়ংকর স্বপ্নের রহস্য ভেদ করতে পারলেন না। মণিবক্রেশ্বর মন্দিরের সিদ্ধ হরিদাসকে সেই স্বপ্নের কথা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি, কিন্তু স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে সিদ্ধপুরুষ নিরুত্তরে নীরবে হেসেছিলেন শুধু।

"এ স্বপ্নের অর্থ কি স্বামী?" ব্যগ্রভাবে বেণুভ্রমরবর জিজ্ঞাসা করেছিলেন একবার নয়, বার বার।

কিন্তু হরিদাসের ওষ্ঠে সেই রহস্যময় স্মিতহাস ছাড়া আর কোনো উত্তর ছিল না। অবশেষে বহু জিজ্ঞাসার পরে সিদ্ধপুরুষ সকুণ্ঠে কেবল বলেছিলেন: "রাজ্যলাভ, অথবা প্রাণহানি।"

এ আর কোন নূতন কথা? খড়্গ ও মুকুট, শ্মশান ও সিংহাসন —এই দুই পরিণামের মধ্যেই তো তাদের মত রাজপুরুষদের জীবন চিরকাল আবর্তিত।

জপের আসনে ব'সে বকশী হঠাৎ শরাহতের মত দুই ত্রস্ত চক্ষু মেলে চারিদিকে চাইলেন। গম্ভীরার ছায়ান্ধকারের মধ্যে সেই স্বপ্নের বিভীষিকা আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।

বহু খড়্গের ঝলকিত সংঘাত থেকে ঝ'রে পড়েছে অসংখ্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, ক্রমে সে সকল স্ফুলিঙ্গ দানা বেঁধে উঠছে অজস্র রক্তবিন্দুতে—সেই রক্তকরাল পটভূমিতে এক অস্থির সিংহাসন। সিংহাসনের চারটি পাদ চারটি নরকপালের উপরে স্থাপিত। সেইসব নিষ্প্রাণ নরকরোটির অক্ষিকোটরের মধ্যে অক্ষিতারাগুলি কিন্তু জীবন্ত —অতি অনাসক্ত দৃষ্টিতে সেই খড়্গযুদ্ধ নিরীক্ষণ করছে। সিংহাসনের উপর রত্নখচিত আসনে স্থাপিত অষ্টমণিময় রাজমুকুট। সিংহাসনের

দুই পাশে মুকুটের প্রহরীর মত দুই সদন্ত হস্তী। তাদের শুঁড় থেকে সদ্য-নিঃসৃত রুধিরধারা সিংহাসনের উপর ঝ'রে পড়ছে অভিষেক-বারির মত। মুণ্ডহীন এক কবন্ধ হঠাৎ তরবারি হাতে খড়গের ব্যূহ ভেদ ক'রে সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হল, তার পদাঘাতে মুকুটসমেত সিংহাসন কোথায় অন্তর্হিত হল। তার পর কেবল মহাশ্মশানে সেই কবন্ধ তরবারি ঘুরিয়ে চারিদিকে নৃত্য করে বেড়াতে লাগল।

রথীপুর গড়ে সেই ভয়ংকর রাত্রি! স্বপ্নভঙ্গে বকশী বেণুভ্রমরবর আর্তনাদ ক'রে পালঙ্কের উপর থেকে লম্ফ দিয়ে পড়েছিলেন। সর্ব-শরীরে কালঘাম ছুটছিল। শয়নকক্ষে নিশিপ্রদীপ নির্বাপিতপ্রায়। বাহিরে বায়ুসঞ্চালনহীন নিরুদ্ধ রাত্রি। "দুর্গা! দুর্গা!" ব'লে বেণুভ্রমরবর কক্ষ হতে বেরিয়ে এসেছিলেন। গড়ের প্রাচীরের উপর সান্ত্রীদের সপাদুকা পদশব্দ ভিন্ন শব্দ ছিল না। অদূরে গঙ্গবতীকূলে মণিবক্রেশ্বরের মন্দিরচূড়া একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলোকে ছায়াচিত্রের মত দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। বেণুভ্রমরবর যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে মণিবক্রেশ্বরের উদ্দেশে ঊর্ধ্বমুখে নমস্কার করতে গিয়ে দেখতে পেলেন আকাশে কুটিল খড়গের মত এক ধূমকেতু। গত কয়েকদিন যাবৎ শেষ রাত্রিতে এই অদ্ভুত ধূমকেতুর উদয় হচ্ছে তা তিনি সান্ত্রীদের নিকট শুনেছিলেন, আজ স্বচক্ষে দেখলেন। ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের পর মৌন আকাশের গায়ে ভীমদর্শন ধূমকেতু দেখে অনাগত অমঙ্গল আশঙ্কায় বকশী ঘোর আতঙ্কিত হলেন।

ক্রমে প্রভাতের পক্ষিকুল অধীর কূজনে চতুর্দিকের কঙ্করিল ভূমি সচকিত ক'রে তুলল। রথীপুর গড়ের চারিদিকে পরিখার মত ঘিরে বয়ে যাওয়া গঙ্গবতীর পাংশুল জলবেণীর উপরে ঊষার রক্তিম ছটা ফুটে উঠল। ধূমকেতু ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে আকাশে মিলাল। কিন্তু

বেণুভ্রমরবরের আতঙ্কিত দৃষ্টিতে সেই ভয়ংকর কবন্ধ কেবল একখানি খড়গ হাতে অন্তরীক্ষ হ'তে যেন বকশীকে লক্ষ্য ক'রে ধাবমান হল।

হনুমান আখড়ার গম্ভীরায় ব'সে সন্ত্রস্ত নয়নে বকশী চারিদিকে চাইতে লাগলেন— সেই ভীমদর্শন কবন্ধ কি তার অন্বেষণে অবশেষে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে ?

তারপর হয়তো শতাধিক বারের মত আবার নিজেকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বললেন এ সব কেবল উদবেজিত মনের ভ্রান্তিমাত্র।

বাইরে আখড়া থেকে জয় রাম হুঙ্কারের সঙ্গে চৌপদী কীর্তনের মূর্ছনা ভেসে আসছিল। জাগ্রৎ জীবনের সেই সব নির্ভরযোগ্য নিদর্শনে বকশী মনে মনে আশ্বস্ত হয়ে আবার মালা জপ করতে বসলেন।

আবার খোর্দার সিংহাসনের চিন্তা।

সেদিন মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহের চক্রান্তে আগঙ্গাগোদাবরী উৎকলের শেষ স্বাধীন গজপতি রাজা মুকুন্দদেবের প্রকৃত উত্তরাধিকারিগণ খোর্দা থেকে আলি ও সারঙ্গগড়ে নির্বাসিত হয়ে গেলেন। কোথা থেকে দনেই বিদ্যাধরের পুত্র রমেই রাউতরা যেন উড়ে এসে রামচন্দ্রদেব (প্রথম) হয়ে খোর্দার সিংহাসন জুড়ে বসলেন। এই রামচন্দ্রদেব খোর্দার সিংহাসনের যথার্থ উত্তরাধিকারী বলে নাকি মানসিংহ জগন্নাথের স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন। কিন্তু সে সব পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকদের গালগল্প। ঘোর কুচক্রী মানসিংহ রামচন্দ্রদেবকে খোর্দার সিংহাসনে বসিয়ে এক ঢিলে তিন তিনটি পাখী

শিকার করে গেলেন। ওড়িশায় মোগল রাজশক্তি ও পরাক্রান্ত আফগানদের মধ্যে স্বাধীন খোর্ধাকে আড়ালস্বরূপ রচনা ক'রে তিনি সৃষ্টি ক'রে দিয়ে গেলেন এক তৃতীয় শক্তি; পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা স্বীকার ক'রে তিনি ওড়িশার হিন্দু জনমতকে আপনার অনুকূল ক'রে নিলেন, আবার সেইসঙ্গে গজপতি মুকুন্দদেবের উত্তরাধিকারীদের খোর্ধার সিংহাসন থেকে নির্বাসিত ক'রে গজপতি পরম্পরার প্রতি ওড়িশার দুর্গপতি ও সামন্তগণের বিশ্বস্ততার উৎসমুখ রুদ্ধ ক'রে দিয়ে গেলেন।

জ্যেষ্ঠ অংশ আলি কোথায় মুখ গুঁজে প'ড়ে থেকে শেষে সামান্য জমিদারিতে পরিণত হয়েছে। কনিষ্ঠ অংশ ছিল সারঙ্গগড়। সেই ছ'কড়ি ভ্রমরবরের বংশধরেরা এখনও সারঙ্গগড় আঁকড়ে প'ড়ে আছেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা অন্ধারুআ, দারুঠেঙ, হরিডামডা, বারঙ্গ, পটিআ, কলাবারাঙ্গ ও দাড়া প্রভৃতি গড়গুলিতে নানা অংশে বিভক্ত হয়ে ক্রমে ইতিহাসহীন অনামধেয়তার মধ্যে লুপ্ত হয়ে এসেছেন। তবু সারঙ্গগড়, খোর্ধা ও কটকের মধ্যে অবস্থিত হওয়ার কারণে সারঙ্গ-গড়ের দুর্গপতিরা এক ভৌগোলিক প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। তাঁরা কখনও কটকের মোগল নায়েব-নাজিমদের পক্ষে থেকে খোর্ধার বিরুদ্ধে তাদের সামরিক সাহায্য দিতেন, আবার কখনও খোর্ধার দিকে থেকে নায়েব-নাজিমদের বিব্রত করতেন। কিন্তু এসবের মধ্যে সারঙ্গগড়ের অবচেতনে খোর্ধা রাজবংশের বিরুদ্ধে ঈর্ষা ও গাত্রদাহের ছাইচাপা আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল। সারঙ্গগড়ের সঙ্গে খোর্ধাকে মিলিয়ে আবার আগঙ্গাগোদাবরী বিস্তৃত উৎকল সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন সারঙ্গগড়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় যে জাগত না তা নয়, কিন্তু মোগল-শক্তি মহাকালের মত সে সব দিবাস্বপ্নকে উপহাস করত।

অতীতে যখন খান ই-দৌরান খোর্ধা আক্রমণ করেন, তখন সারঙ্গগড়ের দুর্গপতি নীল ভ্রমরবরের জ্যেষ্ঠপুত্র কপালী ভ্রমরবর খোর্ধার মহারাজ মুকুন্দদেবের পশ্চাৎ থেকে ছুরিকাঘাত করে সাহায্য করায়, খান-ই-দৌরান তাঁকে খোর্ধার সিংহাসনে বসালেন। এতকাল পরে যেন সারঙ্গগডের বহুপোষিত স্বপ্ন সফল হ'ল। কিন্তু আবার তা বুদ্‌বুদের মত মিলিয়ে যেতেও বিলম্ব হ'ল না। খান-ই-দৌরান ওড়িশা ত্যাগ করা মাত্রই মহারাজ মুকুন্দদেব আবার খোর্ধায় ফিরে এলেন। মাথা বাঁচাবার জন্য বিশ্বাসঘাতক কপালী ভ্রমরবর ঢেঙ্কানালে পলায়ন ক'রে সেখানে 'আবাহন' (শত্রুপক্ষের দ্বারা গোপনে নিহত) হলেন। কিন্তু কপালীর ছোট ভাই শ্রীনাথ হরিচন্দন বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে মহারাজ মুকুন্দদেবকে সাহায্য করায় তিনি তাঁকে শিশুপাল, ধৌলী ও রথীপুর গডের দুর্গপতি নিযুক্ত করলেন। শ্রীনাথ হরিচন্দনের জ্যেষ্ঠপুত্র ভগীভ্রমরবর মহারাজ হরেকৃষ্ণদেবের আমলে খোর্ধার দেওয়ান হয়েছিলেন। তার বিজাতপুত্র বেণু রাউত, যিনি একদা জগন্নাথ মন্দিরের প্রাচীরপার্শ্বে মহাপ্রসাদকণিকা কুড়িয়ে বেড়াতেন, তারই মাথায় খেয়ালী মহারাজা গোপীনাথদেব হঠাৎ একদিন বকশীর শিরোপা বেঁধে দিলেন। একটা বুনো দাঁতাল হাতীকে বেণু রাউত একা বশ করার জন্য তা ছিল মহারাজ গোপীনাথদেবের রাজপুরস্কার।

এরপর খোর্ধার সিংহাসন প্রায় নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছিল— কেবল ছুরি বাড়ালেই রাজমুকুট। খোর্ধার রাজসিংহাসন থেকে বিতাড়িত অতীতের ভ্রমরবরগণ বুঝি মধ্যস্বর্গে থেকে সেই মঙ্গল মুহূর্তের প্রত্যাশায় বকশী বেণুভ্রমরবরের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে ব'সে ছিলেন।

বকশীর ধ্যান হঠাৎ ভঙ্গ হ'ল। সেই কবন্ধের ছায়ামূর্তি এবার যেন আক্রমণের জন্য তাঁর উপরে লম্ফপ্রদান করল! বকশীর সর্বাঙ্গ শিহরিত হ'ল।

কিন্তু এ ছায়ামূর্তি তাঁর পরমহিতৈষী মহারাজ গোপীনাথদেবের নয়তো? স্কন্ধের উপরে মস্তকটি কেবল স্থাপন করলেই পূর্ণাঙ্গ হ'ত যে মূর্তি সে তো গোপীনাথদেবেরই। সেই সুগৌর নধর দেহ, সেই দেহ থেকে কর্পূর-চন্দনের সুগন্ধ যেন মন্দ মন্দ ভেসে আসছে… সেই সুগোল পেশল দুই বাহু…গলায় মাণিক্য বৈদূর্য ও ইন্দ্রনীলখচিত সেই আলম্বিত মাল্য… পরিধানে সেই 'ক্ষীরোদ্রি'[1] পট্টবাস··

1639 খ্রীস্টাব্দে মহারাজ হরেকৃষ্ণদেবের পর গোপীনাথদেব খোর্ধার সিংহাসনে বসেন, কিন্তু শাসনদণ্ড অপেক্ষা কুসুমবৃন্ত ধারণ করাই তিনি উত্তম জ্ঞান করতেন। দিনে কবি ও পণ্ডিতগণ-পরিবৃত হয়ে 'বন্ধকাব্য'[2] ও কামশাস্ত্র চর্চা, রাত্রে মোহিনীতন্ত্রমতে দেবীসাধনা ও তার পরে ধর্মাচারের নামে স্বৈরাচার —এই সবের মধ্যে তাঁর কাল অতিবাহিত হ'ত। মোহিনী তন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করলে তিনি নাকি মোগল পাঠান সবাইকে অঙ্গুলি হেলনে বশীভূত করতে পারবেন! অষ্টোত্তরসহস্র অক্ষতকুমারী সম্ভোগে অচ্যুত[3] হ'লে সেই সিদ্ধিলাভ হয়। দেবী যে মোহিনীমূর্তিতে মহিষাসুর বধ করেছিলেন সেই মোহিনীমূর্তি ধ'রে সাধকের সম্মুখে দেখা দিয়ে তাকে বরদান করেন। গোপীনাথদেব মোগল নিধনের জন্য অবশেষে তন্ত্রসাধনার সেই দীক্ষা নিয়েছিলেন।

1. ক্ষীরোদ্রি— সাদা পাট কাপড়।

2. বন্ধ কাব্য— দেহাশ্রিত আদিরসাত্মক কাব্য, শৃঙ্গারবন্ধ অর্থাৎ রতিকালে দেহাবয়বের সংস্থানবৈচিত্র্য এর প্রধান বিষয়।

3. অচ্যুত— (তন্ত্রে) স্ত্রীসম্ভোগসত্ত্বে ব্রহ্মচর্যে স্থির, অচ্যুত।

সেদিন অখ্যাত অজ্ঞাতকুলশীল বেণু রাউতকে কে বা জানত! পূর্ব মহারাজার সময়ে দেওয়ান ভগীভ্রমরবর তাঁর এই বিজাত পুত্রকে জগন্নাথ মন্দিরের দেউলজাগা কর্মে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু বেণু রাউতের নভশ্চুম্বী উৎকাঙ্ক্ষা ও অহমিকা তাতে তুষ্ট হবার নয়। এই সময়ে বাণপুরের রাজা একটি বুনো দাঁতাল হাতী জঙ্গল থেকে ধ'রে এনে গোপীনাথদেবকে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে হাতী ছিল মহা দুর্দান্ত। দুই দুই জন মাহুত সে হাতী বশ করতে গিয়ে তার পায়ের তলায় প্রাণ দিল। মাহুত দেখলেই সে হাতী শুঁড় বাড়িয়ে এমন ভাবে ছুটে আসত যে তার কাছে যেতে কোনও প্রবীণ বিচক্ষণ মাহুত অথবা মল্লের সাহসেও কুলাত না। বুনো হাতীর ভয়ে বড়দাণ্ডে লোক চলাচল ক'মে গেল।

হঠাৎ একদিন বেণু রাউত এগিয়ে গেল এই দুর্দান্ত হাতীকে বশ করতে। গেলে যাবে প্রাণ, বাঁচলে রাজদৃষ্টি পড়বে।

বেণু রাউত হাতীর দিকে এগল। আশেপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের মুখ থেকে ঠাট্টা তামাশা থেকে শুরু ক'রে হিতপরামর্শ সবই শোনা যেতে লাগল: 'বেইপো'র প্রাণের ভয় নেই রে। আরে বেণুআ, জীবনের মায়া নেই নাকি রে তোর? ...কত মাহুত কত মালবৃস্তিওলা পালোয়ান গেল এখন এল এই 'বেইপো' হাড়গিলে... আরে, হাতীর পায়ের তলায় পিষে যাবি রে... ইত্যাদি। এ সবে কর্ণপাত না ক'রে বেণু রাউত হাতে একটি ছোট বর্শা নিয়ে আর কোমরে বাঁকা ছুরি গুঁজে হাতীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল 'জয় জগন্নাথ' ব'লে। গোপীনাথ এক অট্টালী-চূড়ায় ব'সে এই নিষ্ঠুর দৃশ্য উপভোগ করছিলেন।

বেণুকে দেখে হাতী তার দিকে ফিরতেই বেণু লঘুপদে হাতীর পিছনের দিকে স'রে গেল। হাতী আবার ঘুরে তার দিকে ফিরতেই

বেণুও আবার তার পিছনের দিকে স'রে গেল। বহুক্ষণ ধ'রে এমনি ছক্কায় পাঞ্জায় তাগবাগ লুকোচুরি পাঁয়তারা চলবার পর হাতী একটু চুপ ক'রে দাঁড়াল। এর পরের আক্রমণ সে কিভাবে করবে ভাবতে ভাবতেই বেণু এদিকে চট্ ক'রে তার লেজ ধ'রে চক্ষের নিমেষে লাফ দিয়ে হাতীর পিঠের উপর উঠে গেল।

দর্শকেরা বিস্ময়ে উৎকণ্ঠায় হতবাক! মন্দিরে মহাপ্রসাদ খুঁটে বেড়ানো হাড়গিলে চেহারার এই বেণু রাউত এমন দুর্দান্ত দাঁতাল হাতীকে এমনি ভাবে বশ করতে পারবে কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। বুনো হাতী গর্জন ক'রে বেণুকে ধরবার জন্য পিঠের উপরে শুঁড় বাড়ায় আর বেণু ছুরি মেরে মেরে তার শুঁড় রক্তারক্তি ক'রে দেয়। শেষে বেণুকে পিঠ থেকে ফেলে দেবার চেষ্টায় হাতী পাগলের মত এদিক ওদিক ছুটে বেড়াতে লাগল। তখন বেণু হাতের বর্শা দিয়ে হাতীর কানের গোড়ায় ঘা মেরে মেরে শেষে সেই দুর্দান্ত পশুকে বাধ্য শিশুটির মত মাটিতে বসিয়ে দিল।

সেই দিন থেকে অখ্যাত বেণু রাউত মহারাজ গোপীনাথদেবের 'লাগুতিগহণে'র[1] একজন হয়ে উঠল। তারপর যথাসময়ে গোপীনাথদেব বেণুর মাথায় বকশীর শিরোপা পরালেন। বেণু এইভাবে রূপান্তরিত ও গুণান্তরিত হয়ে হ'ল বকশী বেণুভ্রমরবর রায়, মহারাজ গোপীনাথদেবের অতি বিশ্বস্ত ও অনুগত পারিষদ। বকশীকে না হলে তার এক দণ্ড চলত না। কবিসমাজে 'বন্ধুত্ব' চর্চা থেকে পঞ্চমকার সাধনার ভৈরবীচক্রে বসা পর্যন্ত সর্বথা বকশী বেণুভ্রমরবরই তখন ছিলেন মহারাজ গোপীনাথদেবের নিত্য সহচর।

1. লাগুতি গহণ— যারা রাজা বা রানীর সর্বদা কাছে লেগে থাকে, অনুচর পারিষদ প্রভৃতি।

এদিকে রাজ্যে মোগল কর্মচারীদের অকথনীয় অত্যাচার : বর্শা-তলোয়ারের ভয় দেখিয়ে খাজনা আদায়ের নামে লুঠতরাজ চলেছে। ঐভাবে আদায় না করলে মহারাজ গোপীনাথদেবের নিকট থেকে কর বা নজরানা আদায়ের উপায় ছিল না। আবার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে : গৃহস্থ ঘরের বউ ঝিদের ইজ্জতও থাকছে না। মোহিনীতন্ত্রে গোপীনাথদেবের লতাসাধনার জন্য তাদের নিয়ে আসা হ'ত তাঁর ভৈরবীচক্রে। সর্বত্র ত্রাহি ত্রাহি রব!

সেদিন—

গোপীনাথদেবের বিহার-মণ্ডপে কবিসভা বসেছে। ধুমুসরের রাজ্যচ্যুত রাজপুত্র কবি উপেন্দ্র ভঞ্জ গোপীনাথদেবের অতিথি হয়ে এসেছেন। তাঁর কাব্যযশ সে সময়ে সামন্ত রাজগণের বিহার-মণ্ডপে কুমুদ জ্যোৎস্নার ন্যায় বিকীর্ণ। কবিসভায় সেদিন ছিলেন গোপীনাথদেবের সভাকবি হলদিআ নিবাসী নীলকণ্ঠ হরিচন্দন, রথীপুরের নরেন্দ্র বিদ্যাধর, মুকুন্দপ্রসাদের গোবিন্দদাস ও আরও অনেকে। ভঞ্জকবি সেদিন স্বরচিত 'বঙ্ককাব্য' থেকে 'ছান্দ'[1] গেয়ে একটি সমস্যার উপস্থাপন ক'রে গোপীনাথদেবের কবিমণ্ডলীকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন :—

"রসারে সার সুবস সুরসী। সংসারশিরী সুরস সরসী॥
একাক্ষরে কে ঋতু সময়রে। প্রিয়ারতি রীতি ভাবনা করে॥"

1. ছান্দ— পদ্য, যা রাগিণীসংযোগে গাইতে হয়

[এ রসারে সার সুরস সুরসী। সংসারশ্রী সুরস সরসী ॥
ঋতুর কালে কে একাক্ষরে। প্রিয়ারতিরীতি ভাবনা করে ॥]

কিন্তু এ সব কাব্যচর্চার রসাস্বাদন করার ধৈর্য অথবা রুচি বকশীর ছিল না। মহারাজের অদূরে ব'সে তিনি চিন্তা করছিলেন কত সহজে আর কি উপায়ে নবনীপিণ্ডের মত এই নিটোল নির্বোধটিকে নিঃশেষ ক'রে ফেলা যেতে পারে। আর, কাব্যরুচির দিক থেকেও তাঁর ধারণা ছিল যে সূর্যবংশী সম্রাট্‌গণের সময়ে কাব্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণশক্তি ছিল এ সব কাব্যে তার ক্ষীণ রেশটুকুও পাওয়া যায় না। নির্বীর্য জাতির পরাভূত পৌরুষ আজ কেবল কামযুদ্ধের স্মরশরাঘাতে লীলাসঙ্গিনীকে ক্ষতবিক্ষত করেই যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করছে, গুণহীন অসার কাব্যচর্বণের মধ্যে তেমনই এক গৌণমনোবৃত্তিসম্পন্ন সমাজের রসতৃষ্ণা নিবৃত্ত হচ্ছে। দুর্ভিক্ষের পীড়নে মানুষ মানুষের মাংস খাচ্ছে; কিশোরীর শঙ্কিত বক্ষে যৌবনকোরক প্রস্ফুটিত না হতেই কীটদষ্ট ফলের মত শুষ্ক মলিন হয়ে যাচ্ছে, আর এই কবিকুলের কাব্যে তাদের নিটোল স্তনে কেবল করক্ষতচিহ্ন।

বকশী বিক্ষিপ্তভাবে এমনি চিন্তা করছেন এমন সময়ে দেওয়ান কৃষ্ণ নরীন্দ্র হঠাৎ রসভঙ্গ ক'রে গোপীনাথদেবের কানের কাছে বললেন, "সুজা খাঁর উকিল সৈয়দ বেগ্ দুয়ার আগলে ব'সে আছে! তিন বৎসর হল খোর্ধা কেল্লা থেকে সে কানা কড়িটিও পায় নি!"

গোপীনাথদেব তা শুনেও হয়তো শুনতে পেলেন না। কবি ও পণ্ডিতদের তখন তিনি পাটের জোড়, মকরকুণ্ডল ও যথোচিত বিদায় দক্ষিণা দেবার ব্যবস্থা দিচ্ছিলেন। দেওয়ান আবার বললেন, "সৈয়দ বেগের কি হবে?"

গোপীনাথদেব অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, "খোর্ধার মহারাজা কাউকে

'পেস্‌কস্‌' গনেন না। এ '.মাগলবন্দি' নয় কিংবা আলি কিংবা সাবঙ্গগড়েব মত নজবানা গুনেও আমরা বছব বছব সিংহাসনেব পাট্টা নিই না!"

এত লোকেব সমক্ষে সাবঙ্গগড়ের প্রতি তিনি যে তাচ্ছিল্যেব ইঙ্গিত করলেন বকশী বেণুভ্রমববাবেব অন্তস্থলে তা জিঘাংসাব সুপ্ত অগ্নিশিখাকে দাবাগ্নির মত জ্বালিযে তুলল। এই পবমহিতৈষী গোপীনাথদেবেব দয়া ও অনুকম্পাতেই অজ্ঞাত অখ্যাত বেণু বাউত যে খোধাব বকশী বেণভ্রমববব হতে পেবেছেন তা গোপীনাথদেবেব প্রতি কৃতজ্ঞতাব পবিবর্তে আজ বকশাব অন্তরে ঈর্ষা ও গ্লানিব উদ্রেক কবল।

গোপীনাথদেব বিবেচনাহীন অপবিণামদর্শীব মত আস্ফালন কবছিলেন: "সুজা খাঁব নিজেবই রক্ষণ অসম্ভব। মুর্শিদাবাদে নবাব জাফব খাঁ নাসিবী মৃত্যুশয্যায। নাতি সবফবাজ খাঁযেব নামে বঙ্গ বিহাব ওড়িশা সুবাব সনদ লিখিযে নেবাব জন্য তাব হাতেব লোকেবা দিল্লী শাজাহানাবাদে বসে কল টিপছে। মুর্শিদাবাদ মসনদেব উপর সুজা খাঁব চোখ, তাই নিযে শ্বশুব জামাই পিতা পুত্রে সংঘর্ষ। আমি বলছি নওয়াজী, তাকে 'না' বলে দাও, 'না' বলে দাও। সৈযদ বেগকে বলে দাও খোধাব মহাবাজ বাড়াকে পেসকস গণেন না।"

দেওয়ান কৃষ্ণ নবীন্দ্রব মুখ গম্ভীর হ'ল। তিনি বুঝছিলেন এ দাযিত্বহীন আস্ফালনেব পবিণাম কি। সৈযদ বেগেব কাছে এ কথা শুনে সেই ছুতো নিয়ে সুজা খাঁ যদি খোর্ধা আক্রমণ কবে তা হ'লে আর রক্ষা নেই।

চিন্তান্বিতভাবে দেওযান কৃষ্ণ নবীন্দ্র বিহাব মণ্ডপ থেকে বেবিযে এলেন। তাঁব কপালেব বলিবেখাগুলি আবো গভীব হল।

বকশী বেণুভ্রমববব অলিন্দেব ধাবে আলসেতে ভব দিয়ে শূন্য

দৃষ্টিতে বরুণেই চূড়ার দিগ্‌দর্শন স্তম্ভের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, কৃষ্ণ নরীন্দ্র কখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন লক্ষ্য করেন নি। দেওয়ানজীর দীর্ঘশ্বাসে ভ্রমরবরের ধ্যানভঙ্গ হল, অর্থপূর্ণভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি খবর দেওয়ানজী?"

"লক্ষণ ভাল নয়।"

"কিন্তু উপচার কি?"

"জগন্নাথ জানেন।"

"জগন্নাথ তো সেই একই নৌকায়।"

"তা নিশ্চয়, কিন্তু উপায় কি?"

তখন ভ্রমরবর বললেন, "এতকাল যে উপায় হয়ে এসেছে এখনও তাই হ'লে ক্ষতি কি? সে উপচার তো বহুপরীক্ষিত, অব্যর্থ।" তাঁর দুই চোখে দু'খানা শান দেওয়া ছুরি যেন চকচক করে উঠল।

কৃষ্ণ নরীন্দ্রের মনশ্চক্ষুতে ভেসে উঠল ওড়িশার অভিশপ্ত ইতিহাসে সিংহাসনের জন্য বহু রক্তলাঞ্ছিত দৃশ্য, স্মরণে এল বহু বিশ্বাসঘাতকতা ও পশ্চাৎ হতে ছুরিকাঘাতের কাহিনী। তিনি নীরবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

বৃদ্ধ ভ্রমরবরের মাথায় রক্ত চড়েছিল, তিনি বললেন, "নীরব কেন? কথাটা মনঃপূত হল না?"

এবার কৃষ্ণ নরীন্দ্র উত্তর দিলেন, "সূর্যবংশের পতন হয়ে থেকে অবধি ওড়িশার ইতিহাসে সে উপচারের প্রয়োগ তো বারংবার হয়ে এসেছে, কিন্তু তাতে ব্যাধির নিত্য নূতন উপসর্গ দেখা দেওয়া ভিন্ন ব্যাধির উপশম হয়েছে কি?"

"সে অতীতের কথা বাদ দাও, এখনকার কথা হচ্ছে। তোমার এতে কোনো ক্ষতি হবে না, বরং লাভ হতে পারে। আর, তা না হ'লে

সুজা খাঁ যদি রাজাকে নিয়ে টানাটানি করে তবে দেওয়ান কি হেঁচড়ানো থেকে বাদ যাবে ?"

কৃষ্ণ নরীন্দ্র চিন্তাকুল কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "না। কিন্তু নায়েব-নাজিম সুজা খাঁর উকিল সৈয়দ বেগ্ সঙ্গে লশকর ফৌজ নিয়ে ব'সে রয়েছে যে ; সে যদি গোপীনাথদেবের পক্ষ নেয় ?"

বেণুভ্রমরবর কৃষ্ণ নরীন্দ্রের কাছে স'রে এসে কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব নামিয়ে বললেন, "আমি জানি, এতে সৈয়দ বেগের আপত্তি নেই। সে বুঝেছে যে রাজা ক্রমে অবাধ্য হয়ে উঠেছেন।"

কৃষ্ণ নরীন্দ্র নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তা হলে আমার আর বক্তব্য কি ? শুভস্য শীঘ্রম্ !"

সেদিন নিশার্ধে—

খোর্ধার যুঝারসিংহ ও বরুণেই গড়ের উপর দিয়ে এক-একটি দিন যাচ্ছে যেন এক-একটি যুগ। উৎকণ্ঠাকণ্টকিত মুহূর্তগুলি ন'ড়ে বসতে চায় না। তবু সবাই নিদ্রায় অচেতন, 'রানীহংসপুরে' সমস্ত দীপ নির্বাপিত।

কেবল বহির্বাটীতে মহারাজ গোপীনাথদেবের সাধন-'গম্ভীরা'র[1] ভিতরে যে দীপটি জ্বলছিল তার ক্ষীণ আলোকের একটি রেখা অসিধারের মত অন্ধকারের গর্ভ চিরে বাহিরে এসে পড়েছিল। 'গম্ভীরা'র ভিতর থেকে ধুনা অগুরু ও নবকুসুমের গন্ধে রাত্রির মূর্ছিত বাতাবরণ স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল।

1. গম্ভীরা— গর্ভগৃহ, একান্তগৃহ।

'গম্ভীরা'র প্রাচীরবেষ্টিত চত্বরে চন্দনপঙ্কে মোহিনীযন্ত্র অঙ্কন ক'রে গোপীনাথদেব জপে বসেছিলেন। যন্ত্রের উপরে পাদ্য চন্দন গন্ধপুষ্প ও তাম্বুল প্রভৃতি পূজার্ঘ নিবেদিত হয়েছিল। গোপীনাথদেবের সম্মুখে উত্তরসাধিকা নগ্না পীনপয়োধরা নবযুবতী ঘৃতদীপের অনুজ্জ্বল আলোকে লজ্জানত দৃষ্টি স্তনাগ্রে নিবদ্ধ ক'রে মন্ত্রমুগ্ধের মত ব'সে ছিল। রাজানুচরেরা কোন গৃহস্থের অন্তঃপুর থেকে আজকের এই গুহ্য সাধনার জন্য অপহরণ ক'রে এনেছিল এই হতভাগিনীকে কে জানে।

গোপীনাথদেবের পরিধানে রক্তাম্বর, প্রশস্তবক্ষে রুদ্রাক্ষের মালা, বাম বাহুতে অষ্টধাতুনির্মিত কবচ ও কপালে রক্তচন্দনের তিলক। কি এক অলৌকিকতায় রহস্যময় হয়ে উঠেছিল সেই মূর্তি।

অন্যান্য দিন বকশী বেণুভ্রমরবরও এই চক্রে উপস্থিত থাকেন, কিন্তু আজ তিনি অনুপস্থিত।

কয়েকটি শূন্য সুরাপাত্র গোপীনাথদেবের সম্মুখে প'ড়ে ছিল। মোহিনী সাধনা পঞ্চ মকার সাধনা। পঞ্চ-মকারের মধ্যে প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করা এই সাধনার রহস্য। প্রবৃত্তিকে জয় ক'রে চিত্ত দৃঢ় করার পরে বীরভদ্র হয়ে সাধক এতে সিদ্ধিলাভ করে।

গোপীনাথদেব অঙ্গন্যাস ও করন্যাস ক'রে যুবতীর অনাবৃত দেহে পুষ্পদল নিক্ষেপ করে মন্ত্রপাঠ করলেন :

"পদ্মাননাং শ্যামবর্ণাং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম
কোমলাঙ্গীং স্মেরমুখীং রক্তোৎপলদলেক্ষণাম্
ও হ্রীং আগচ্ছ পদ্মিনী স্বাহা··"

পুষ্পদলের কোমল স্পর্শে যুবতীর পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় নিশ্চল দেহ বাতকম্পিত কিশলয়ের মত স্পন্দিত হচ্ছিল। কিন্তু গোপীনাথ-

দেবের চিত্তবিকারের ক্ষীণতম আভাসও ছিল না। তিনি নিজেও তখন যেন এক অনুভূতিহীন পাষাণ-বিগ্রহে পরিণত হয়েছিলেন।

হঠাৎ কার প্রবল করাঘাতে 'গম্ভীরা'র দ্বার খুলে গেল। গোপীনাথদেব কারণারুণ নয়ন উন্মীলন ক'রে দেখলেন সম্মুখে নগ্ন তরবারি হাতে বকশী বেণুভ্রমরবর। এই ভয়ংকর আবির্ভাবে যুবতী কখন 'গম্ভীরা'র অন্ধকার কোণে আত্মগোপন করেছে। গোপীনাথদেব বিস্মিত কিংকর্তব্যবিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

কয়টি স্তম্ভিত মুহূর্ত!

তারপর গোপীনাথদেব অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, "ভৈরবীচক্রে খড়্গ ধারণের প্রয়োজন নেই বকশী। চিত্তসংযমের খড়্গেই মায়ার রক্ত প্রবৃত্তির বন্ধন ছিন্ন করতে হয় এখানে।"

বকশীর দুই চক্ষু হিংস্র ঔজ্জ্বল্যে অগ্নিকণার মত জ্বলে উঠল। গোপীনাথদেব অবস্থা হৃদয়ঙ্গম ক'রে বকশীর উপর লম্ফ দেবার পূর্বেই বকশীর খড়্গাঘাতে তার ছিন্ন মস্তক মাহিনীযন্ত্রের উপর চরম বলিদানের মত লুটিয়ে পড়ল।

কিন্তু গোপীনাথদেবকে হত্যা করেই বা বকশী খোর্ধার সিংহাসন লাভ করলেন কোথায়? পরদিন সকালে সঙ্গে কয়েকজন পাত্র ও সামন্তদের নিয়ে বকশী বেণু ভ্রমরবর অভিষেক মণ্ডপে যাবার পথে দেখেন পথে খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে সৈয়দ বেগ্!

যার সহায়তায় ও আনুকূল্যে ভ্রমরবর গত রাত্রে রাজহত্যা করেছেন আজ সকালেই আবার তাকেই এমন প্রতিকূল ভূমিকায় দেখে বকশী স্তম্ভিত হলেন। এ যে তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি।

কিন্তু সৈযদ বেগ্ বুঝেছিল বকশীব মত এমন সাংঘাতিক বিশ্বাসঘাতক অনাযাসে মোগলেব বিরুদ্ধেও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পাবে। গোপীনাথদেবকে খোর্ধাব সিংহাসন থেকে অপসাবিত কববাব জন্য বকশীব মত অস্ত্রেব প্রয়োজন ছিল, কিন্তু উদ্দেশ্যসাধনের সঙ্গে সঙ্গেই সে প্রয়োজন ফুবিযেছে। ভবিষ্যৎকে সে অস্ত্রেব জিম্মায বাখা চলে না। তাই বকেযা পেসকস আদাযেব জন্য চুক্তি ক'বে ইতিমধ্যেই গোপীনাথদেবেব ছোট ভাই বামচন্দ্রদেবকে সিংহাসনে বসিযে দিযেছিল। তা ছাড়া ভগী ভ্রমববেব বিজাতপুত্র বেণু ভ্রমববকে খোর্ধাব মহাবাজ ব'লে স্বীকাব কবতে অধিকাংশ সামন্ত ও দুর্গপতি প্রস্তুত ছিলেন না।

সিংহাসনেব উপব থেকে বামচন্দ্রদেব কিংকর্তব্যবিমূঢ় বেণু ভ্রমববকে সম্বোধন ক'বে বললেন, "আসুন বকশী, আপনাব কদাপি কোনো অনিষ্ট হবে না, আমি আপনাকে ক্ষমা কবেছি।"

বকশী বাধ্য অনুগতেব মত, বামচন্দ্রদেবেব পদতলে নিজেব তবববি বেখে দিযে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কবলেন। দেওযান কৃষ্ণ নবীন্দ্র রামচন্দ্রদেবেব সিংহাসনেব পিছন থেকে বকশীব দিকে চেযে অপবাধীব মত দাঁড়িযেছিলেন। চোখেব নীবব ভাষায তিনি যেন ভ্রমরববেব উদ্দেশে বলতে চাইছিলেন: "এ চালটা খাটল না। অপেক্ষা কবো, অন্য সুযোগ আসবে।" কিন্তু তাব দিকে তাকাবাব সমস্ত সাহস বকশী যেন তখন হাবিয়েছিলেন।

সেই বহুপ্রতীক্ষিত সুযোগ আবার এসেছিল: বামচন্দ্রদেব টিকালী যুদ্ধে যাবাব পথে যখন ছনদ্বাব ঘাটেব প্রতিবক্ষাব ভার বকশী

বেণুভ্রমরবরের হাতে দিয়ে গেলেন। ঠিক যা বকশী চাইছিলেন। রামচন্দ্রের নির্দেশমত বকশী ছত্রদ্বার ঘাট আগলে থাকলে সামনে থেকে আসা চিকাকোল ফৌজের একটি লশকরও রক্ষা পেত না। মালুদের ফৌজদার পিছন থেকে আক্রমণ করলে তারও অস্তিত্ব সেদিন লোপ পেত। কিন্তু বকশী সেদিন সব জেনে শুনেই ছত্রদ্বার ঘাট থেকে ফৌজ সরিয়ে নিযে এসেছিলেন। অসহায় রামচন্দ্রদেবকে মোগলের তলোয়ারের মুখে ঠেলে দিয়ে বকশী ভেবেছিলেন এইবার খোর্ধার সিংহাসন হাতের মুঠোয় এল আর সন্দেহ নেই কিন্তু তিনি কি তাঁর অতি উদ্ভট স্বপ্নেব মধ্যেও কখনো ভেবেছিলেন যে বিদ্রোহী বামচন্দ্রদেব শূলে না গিয়ে কটক থেকে ফিরবেন নায়েব-নাজিম তকী খাঁর ভগিনীপতি হয়ে ?

অবিবেচক অদৃষ্টেব অভিশাপে বকশীব সব আশা ও উৎকাঙ্ক্ষা আবার ধূলিসাৎ হল।

অবশ্য পাইক দুর্গপতি ও সামন্ত রাজারা অধিকাংশই এখন জাতিচ্যুত বিধর্মী রামচন্দ্রদেব ওরফে হাফিজ্ কাদর্‌কে গজপতি ব'লে স্বীকাব করতে প্রস্তুত নন, মাত্র চোখের ইশারাতেই রামচন্দ্রদেবের ইহলীলা শেষ হতে পারে। কিন্তু প্রবল পবাক্রান্ত নায়েব-নাজিম তকী খাঁর ভগিনীপতি সামন্ত হাফিজ্-কাদর বেগ ইয়ার জঙ্গের দেহে অঙ্গুলি স্পর্শ করবার হিম্মৎই বা কার আছে? অতএব শ্যালক-ভগ্নী-পতির মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি ক'রে পরস্পরকে পরস্পরের শত্রু ক'রে না তুলতে পারা পর্যন্ত খোর্ধার সিংহাসন থেকে রামচন্দ্রদেবকে হঠাবার আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না। বকশী বেণু ভ্রমরবর এখন সেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন।

বালিসাহীর হনুমান আখড়া মঠে বসে মালাজপ করতে করতে বকশী সেই সব কূট কৌশল চিন্তা করছিলেন। জগন্নাথও হয়তো এসব টানা হেঁচড়া থেকে বাদ যাবেন না। কিন্তু একদিকে খোর্ধার সিংহাসন, অন্য দিকে আর সব।

বকশী হঠাৎ চমকে উঠলেন।

'গম্ভীরা'র ভিতরের ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার যেন নাড়া পেল আরো অন্ধকার এক ছায়াপাতে। বকশীর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল।

উকিল জই পট্টনায়ক বকশীর আমন্ত্রণ অপেক্ষায় 'গম্ভীরা'র বাহিরে দাঁড়িয়ে মুখের ঘাম মুছছিলেন মাত্র। কটকের নায়েব-নাজিম তকী খাঁর দরবারে জই পট্টনায়ক খোর্ধার উকিল হিসাবে আছেন। প্রৌঢ় বয়স, কিন্তু তার চৌকো মুখে অসীম সামর্থ্যের আভাস। মাথায় টাক, গলায় তুলসীর মালা, ঢিপ হয়ে ওঠা কপালে হরি মন্দিরের তিলক ফোঁটা। পট্টনায়কের চেহারায় যা প্রথমেই চোখে পড়ে সে তাঁর ঘন ভ্রূর নীচে দু'টো গোল ক্ষুদ্র চক্ষু। আপাত নিরীহতার আড়ালে সমস্ত শঠতা ক্রূরতা ও ষড়যন্ত্র যেন পুঞ্জীভূত হয়েছিল সেই চোখে।

জই পট্টনায়ক এই মাত্র সোজা কটক থেকে এসে পৌঁছেছেন। গায়ে ছিটের অাংরাখা স্থানে স্থানে ঘামে ভিজে কালো দেখাচ্ছে।

তাকে দেখে প্রকৃতিস্থ হয়ে বকশী বললেন, "ভিতরে এসো।"

জই পট্টনায়ক ভিতরে এসে ভ্রমরবরের আসনের অদূরে একখানা চৌকিতে বসা মাত্র ভ্রমরবর জিজ্ঞাসা করলেন, "কটকের আর সব খবর কি?"

পট্টনায়ক গলা নামিয়ে বললেন, "একটা জরুরি খবর নিয়ে এসেছি। চিকাকোল থেকে দুই বছরের বকেয়া পেস্‌কস্‌ তিন লক্ষ

টাকা নিয়ে ফৌজদারের দেওয়ান নরসা রাজু কটকে আসছে।"

এ আর কি এমন জরুরি খবর? চিকাকোল থেকে এমন লক্ষ লক্ষ টাকা কটকের পথে জগৎশেঠের মারফতে দিল্লী শাজাহানাবাদে পাঠানো হয়ে থাকে। তা ছাড়া চিকাকোলের পেসকসের সঙ্গে ভ্রমরবরের সম্পর্কই বা কি? তিনি শুনতে চাইছিলেন কটকের লালবাগ দুর্গের হাল-হকিকত, রাজনৈতিক মৌসুম, মুর্শিদাবাদ নবাবের পুত্র সরফরাজ খাঁর সঙ্গে সুজা খাঁর দ্বন্দ্ব কতদূর এগিয়েছে, মুর্শিদাবাদের মসনদের জন্য পিতাপুত্রের লড়াই লাগছে কি না, মারাঠা বর্গীরা ওড়িশার সীমানা থেকে কত দূরে উঁকি মারছে, সর্বোপরি রামচন্দ্রদেব সম্বন্ধে তকী খাঁর সাম্প্রতিক মেজাজটা কি প্রকারের— এমনি সব কূটনৈতিক সংবাদ। বিশেষ করে এই শেষ সংবাদটির জন্যই না দেওয়ান কৃষ্ণ নরেন্দ্র খাঁর বকশী এবং ভ্রমরবর জই পট্টনায়ককে কটকে নিযুক্ত করেছেন— কোন ছিদ্র ধ'রে মহারাজ রামচন্দ্রদেব ও তকী খাঁর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত করবেন এই অভিপ্রায়ে। যতদিন যাবৎ খোর্ধা আক্রমণ ও জগন্নাথ মন্দির লুণ্ঠন না করে তকী খাঁর লশকরবাও তো চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কিন্তু সুজা খাঁর আমল থেকে নায়েব নাজিমের দরবারে শিকড় গেড়ে বসা রায় রায়ান আলমচাঁদ ও জগৎশেঠ প্রমুখ হিন্দুদের প্রভাবে তকী খাঁ জগন্নাথের উপর হাত তোলা থেকে নিরস্ত রয়েছে।

অপ্রসন্ন স্বরে বকশী বললেন, "চিকাকোলের পেস্কসের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক?"

জই পট্টনায়ক দুই চোখে এক ধূর্ত হাসির ঝলক খেলিয়ে বললেন, "সম্পর্কটা বুঝলেন না? খোর্ধা রাজ্যের ভিতর দিয়ে চিকাকোলের দেওয়ান নরসা রাজু যাতে টাকা নিয়ে নিরাপদে যেতে পারে সেজন্য

খোদ তকী খাঁ আমার মারফতে মহারাজের কাছে তাগাদা পাঠিয়েছে।"

বকশীর ধৈর্যচ্যুতি হ'ল। অসহিষ্ণু কণ্ঠে তিনি বললেন, "সে ব্যবস্থা করার মাথাব্যথা তো মহারাজের, আমাদের কি?"

বকশীর কথায় জই পট্টনায়কের রাশভারী মুখে স্মিত হাসির যে কুঞ্চিত রেখা ফুটে উঠল তাতে যেন ছিল বকশীর প্রতি এক প্রচ্ছন্ন জিজ্ঞাসা: এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি খোর্ধার সিংহাসনে হাত বাড়াও?

প্রকাশ্যে বললেন, "খোর্ধার চতুঃসীমার মধ্যে টাকাটা যদি রাহাজানি হয় তা হলে?"

বকশী এবার কথাটা ধরতে পারলেন!

বকশীর চোখ ক্রুদ্ধ সরীসৃপের মত জ্বলে উঠল। তা আরও প্রজ্বলিত করবার জন্য পট্টনায়ক বললেন, "তিন লক্ষ টাকা তো কম নয়! টাকার জন্য দিল্লী থেকে মুর্শিদাবাদে ঘন ঘন তাগাদা আসছে। এমন সময়ে তিন লক্ষ টাকা বাটপাড়ি হয়ে গেলে তকী খাঁ আর ধৈর্য ধ'রে থাকতে পারবে কি?"

বকশী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, "চিকাকোল থেকে টাকা নিয়ে দেওয়ান নরসা রাজ কবে রওনা হবে? সঙ্গে তার কতজন আন্দাজ লশকর থাকবে?"

জই পট্টনায়ক নিম্নস্বরে উত্তর দিলেন, "সিওয়ানবিসদের কাছ থেকে সে খবরও জোগাড় করেছি। মাঘ মাসে নরসা রাজ চিকাকোল ছাড়বে, সঙ্গে পঞ্চাশ জন আন্দাজ 'অসুআর' থাকবে, তার বেশী না। সোমপেণ্ঠ পর্যন্ত চিকাকোল সুবা, তার পরে পড়বে খোর্ধা রাজ্যের সীমানা, কাজেই আর বিপদ কি? নরসা রাজ একরকম নিশ্চিন্ত।"

বকশী পালঙ্ক থেকে নেমে গিয়ে জই পট্টনায়ককে জড়িয়ে ধ'রে বললেন, "তুমি সিধে কটক রওনা হও। মহারাজকে এ সংবাদ দেবার

আর আবশ্যক নেই। তকী খাঁকে কিন্তু বলবে যথা সময়ে যথা স্থানে খবর দিয়েছ। তোমার এ উপকার আমরা কদাপি ভুলব না।"

জই পট্টনায়ক বিদায় নেওয়ার পরে বকশী কাগজ কলম নিয়ে বাণপুর গড়ে মহারানী ললিতা মহাদেঈকে পত্র লিখলেন :—

"মহারাজা রামচন্দ্রদেব ওরফে ম্লেচ্ছ হাফিজ্ কাদর্-এর আট অঙ্ক ধনু পাঁচ দিন পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বালিসাহী রাজবাটি হইতে খোর্ধা মহারানী ললিতা মহাদেঈকে বকশী বেণুভ্রমরবর দেবর লিখিবার কারণ এই যে আগামী মাঘ মাসে চিকাকোল ফৌজদারের দেওয়ান নরসা রাজু দুই বৎসরের বকেয়া পেসকস্ তিন লক্ষ টঙ্কা সঙ্গেতে লইয়া কটক রওনা হইবে। তাহার সহিত অনুমান পঞ্চাশ 'অস্‌আরে'র অধিক থাকিবে না। খোর্ধার সীমার মধ্যে এ টঙ্কা লুণ্ঠন হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে তকী খাঁ বুঝিবে তাহা মহারাজা লুঠ করিয়া লইলেন। তাহাতে আমাদিগের লাভ। তকী খাঁ খোর্ধা আক্রমণ করিলে একটি পাইক শিশুও তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইবে না। তৎকালে তকী খাঁর সহিত সন্ধি করিয়া ভাগীরথীকুমারকে সিংহাসনে বসানো যাইবে। নচেৎ খোর্ধা হইতে ম্লেচ্ছ রাজত্ব লোপ হইবার আশা নাহি এইরূপ জানিবেন। 'মণিমা' বরুণেই প্রাসাদ ত্যাগ করা অবধি খোর্ধা হতশ্রী হইয়াছে। পাথরগড় 'ডআসে' অধুনা রিজিয়া বিবির অখণ্ড রাজত্ব। দিনকে তিনি রাত্রি কহিলে মহারাজা তাহাই বুঝিতেছেন। 'মণিমা' এ পত্র পাইয়া বাণপুরে সোলরী ঘাটে পাইকদিগকে জাগ্রৎ রাখিবেন। আমি এখান হইতে এক শত কি দুই শত বিশ্বাসী লশকর পাঠাইব। সেই ঘাটে

দেওয়ান নরসা রাজুর উপর বাটপাড়ি করিয়া তাহারা টঙ্কা লুঠিয়া লইবে। মকর পনেরো দিন লাগায়েৎ নরসা রাজু বাণপুর ধরিবে।

এই পত্রবাহককে কাটারি-পাগড়ি 'সন্তক'[1] দেওয়া গেল।"

এক নিশ্বাসে পত্রটি লিখে বেণুভ্রমরবর তার উপরে গালার মোহর মারলেন। তারপর পত্রটি এক বিশ্বাসী লোকের হাতে সঙ্গে সঙ্গে বাণপুর পাঠিয়ে দিলেন।

পাঠাবার পর জগন্নাথের উদ্দেশে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বকশী অস্ফুট কণ্ঠে 'গুহারি' জানালেন: "এই তো শেষ সুযোগ, প্রভু! এ ছাড়লে আর কি এমন সুযোগ মিলবে? তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কর হে জগন্নাথ!"

3

অপরাহ্নের শীতল ছায়া বরুণেই পর্বতের চূড়া থেকে নীচে প্রান্তরে নিঃশব্দে নেমে আসছিল। ক্রমে এক বিষণ্ণ শীতল নৈরাশ্য বাদুড়ের পালের মত চারিদিক থেকে ডানা ঝটপট ক'রে যেন নীচে নামছিল। গড়ের প্রাচীরের গায়ে কাঁটাবাঁশের ঝাড়ের ভিতর থেকে কি এক পাখী অশান্ত কণ্ঠে অনেকক্ষণ চীৎকার ক'রে সেইমাত্র নীরব হয়েছে। বরুণেই গড়ের মঠ-মন্দির থেকে কাঁসর ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছে।

রামচন্দ্রদেব তন্দ্রাঘোরে আধ ঘুম আধ জাগরণে রিজিয়া বেগমের স্বপ্ন দেখছিলেন। নিঃসঙ্গ পক্ষীর বেদনার্ত চীৎকারের মত রিজিয়া বেগমের স্মৃতি রামচন্দ্রদেবকে নিঃসঙ্গ অসতর্ক মুহূর্তে অনেক সময়ে

1. সন্তক (উচ্চারণ অকারান্ত)— অভিজ্ঞান, নিদর্শন।

অভিভূত করে। রিজিয়া যেন কোন বিস্মৃত সঙ্গীতের মূর্ছনা। তার আলোড়ন অবচেতনার অতল গহ্বরে।

রিজিয়ার স্মৃতির সঙ্গে রামচন্দ্রদেবের চিন্তা ও দুশ্চিন্তাকে যা বার বার আলোড়িত করছিল তা সেই অসমাহিত প্রশ্ন: বকশী বেণুভ্রমরবর কি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন? আপন অন্নদাতা পরম-হিতৈষী মহাবাহু গোপীনাথদেবের হত্যাকারী বকশী বেণুভ্রমরবর বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কি করতে পারেন? রামচন্দ্রদেবের এক শিশুসুলভ বিশ্বাস এই ছিল যে খোর্ধা রাজ্যের কল্যাণ কামনায়ই দুর্বল ইন্দ্রিয়াসক্ত গোপীনাথদেবকে সরিয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র-দেবকে সিংহাসনে বসানোই বকশীর রাজহত্যার উদ্দেশ্য ছিল। দেওয়ান কৃষ্ণ নবীন্দ্রও এমনি বিশ্বাস রামচন্দ্রদেবের মনে অনুপ্রবিষ্ট করে দিয়েছিলেন। তাই সেদিন টিকালীর যুদ্ধের সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে বকশীর ছত্রার ঘাট ছেড়ে চ'লে আসা বিশ্বাসঘাতকতা কি সমরকৌশল রামচন্দ্রদেব তখনও তা স্থির করতে পারছিলেন না।

পাথরগড় রাজবাটী ঘিরে চারিদিকে নিঃসঙ্গ শূন্যতা! রামচন্দ্র ধর্মান্তরিত হওয়া অবধি আত্মীয় স্বজন ও অধিকাংশ পাত্র ও সামন্ত তাঁকে প্রায় অপাঙ্‌ক্তেয় করেছিলেন, তার প্রতি প্রজাকুলের পূর্ব অনুরক্তিও হ্রাস পেয়েছিল। ওড়িশার মউড়মণি জগন্নাথের সেবক গজপতি রাজা কখনও মুসলমান হ'তে পারেন এ চিন্তাটুকুও জগন্নাথ ভক্ত প্রজাকুলের পক্ষে নিতান্ত পীড়াদায়ক ছিল।

কিন্তু রামচন্দ্রদেব কাকে কী ক'রে বোঝাবেন যে তিনি যদি পতিত হয়ে থাকেন তো সে কেবল হিন্দুবিদ্বেষী নায়েব-নাজিম তকী খাঁর শ্যেনদৃষ্টি থেকে জগন্নাথকে আড়াল করবার জন্যই! টিকালী যুদ্ধের পর থেকে রামচন্দ্রদেব বুঝেছিলেন দীর্ঘ দুই শতাব্দীব্যাপী আক্রমণ

ও আত্মরক্ষা, রক্তক্ষয় ও বিপযয়, ব্যর্থতা ও বিড়ম্বনার পরে ওড়িয়া জাতি আত্মশক্তিহীন হযে পড়েছে। কেবল আফগানদের সময় থেকে কেন, কিংবদন্তী-কথিত 'যবন' রক্তবাহুর সময় থেকে ওড়িশার উপরে যত আক্রমণ হয়ে গেছে, জগন্নাথকে লাঞ্ছিত না করা পযন্ত কারও আক্রমণতৃষ্ণা মেটে তৃপ্ত হয় নি। এখন তকী খাঁ যদি আবার জগন্নাথের দিকে হাত বাড়ায তাকে রক্ষা করার কোনো উপায় নেই।

কিন্তু এক অদমনীয় জাতির আত্মারূপে যে জগন্নাথ এতকাল অবিজিত থেকে এসেছেন এখন তকী খাঁর হাতে তাকে নিগৃহীত হতে দেবার চিন্তা পযন্ত রামচন্দ্রদেবের পক্ষে অসহ্য ছিল।

ধমান্তরের পর লকলে তাকে বজন করলেও সেজন্য তার চিন্তা ছিল না। তার উপর তকী খাঁর বিশ্বাস অটুট থাকা পযন্ত জগন্নাথের উপরে কোনো আক্রমণের আশঙ্কা নেই। রামচন্দ্রদেব তকী খাঁকে এক মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলেন: জগন্নাথের যে ব্রহ্মপিণ্ড কালাপাহাড়ও স্পর্শ করতে পারে নি যথাসময়ে সেই দুলভমণিময় পিণ্ড তিনি তকী খাঁর হাতে সমপণ করবেন। তাই তকী খাঁ খোর্ধা ও জগন্নাথ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থেকে ওড়িশার অবাধ্য জমিদার ও দুগপতিদের বশীভূত করা ও অন্যান্য মন্দির ধ্বংসে মনোনিবেশ করেছিল।

জগন্নাথ এ পযন্ত অবশ্য নিরাপদ ছিলেন। দক্ষিণ সীমায় টিকালী রঘুনাথপুর খোর্ধা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চিকাকোলের সামিল হওয়ার পর থেকে খোর্ধার উপরে অন্ততঃ মোগল আক্রমণের আর আশঙ্কা ছিল না।

আগঙ্গাগোদাবরী উৎকল সাম্রাজ্য ক্ষীণ হতে হতে এখন কেবল খোর্ধাটুকু নিয়ে প'ড়ে আছে। উৎকলের যে গজপতিদের নাম শুনলে একদিন গৌড় থেকে গোলকুণ্ডা পর্যন্ত পরাক্রান্ত সুলতানদের হৃৎকম্প হ'ত এখন সে উৎকল নেই, সে গজপতিগণ নেই, সে পাইক বাহিনী নেই! তবু এই খোর্ধাভূমি অধিকার করতে গিয়ে আফগান সুবাদার দাউদ খাঁ থেকে মোগল ফৌজদার খান-ই-দৌরান পর্যন্ত বড় বড় জবরদস্ত সেনাপতিরা ঘোল খেয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেজন্য ওড়িশাকে বড় দুর্মূল্য দিতে হয়েছিল। দেড়শো বছরেরও বেশী ক্রমাগত লড়াই ক'রে দেশ শ্মশানে পরিণত হয়েছিল, ক্ষেতে চাষ নেই, গ্রামকে গ্রাম উজাড়, ঘরে ঘরে বিধবার আকুল ক্রন্দন। একটা জাতি আর কতকাল লড়বে ?

রামচন্দ্রদেব মেচ্ছ হোন পতিত হোন, ওড়িশায় শান্তি আসুক, জগন্নাথ অন্ততঃ নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে থাকুন। ইতিহাসের কোন এক সুপ্রভাতে এক দীর্ঘ অমানিশার অন্তে খোর্ধা আবার নবসূর্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে— কে জানে হয়তো এমনি এক মন্ত্রমুগ্ধ ভাবনা শত সঙ্কটের মধ্যে রামচন্দ্রদেবকে আশাবাদী ক'রে রেখেছিল।

দক্ষিণে হিন্দু মরাঠাশক্তি জেগে উঠেছে। চৌথ আদায়ের জন্য তারা দিল্লীর দরজায় পর্যন্ত গিয়ে হানা দিচ্ছে। দিল্লী শাজাহানাবাদে মোগলের দিনও ফুরিয়ে এসেছে। অন্তর্দ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে মোগল রাজশক্তি আর কতকাল তিষ্ঠাতে পারে ?

ওড়িশার পক্ষে বিপদ এখন দিল্লী তত নয় যত মুর্শিদাবাদ, বঙ্গ-বিহার-ওড়িশা সুবার রাজধানী। কিন্তু মসনদের জন্য সেখানেও গৃহবিবাদ শুরু হয়েছে। সুজা খাঁ কটকের নায়েব-নাজিমের গদিতে তার বিজাত পুত্র তকী খাঁকে বসিয়ে নিজে মুর্শিদাবাদের মসনদ

অধিকার করল। এর পর বিহার-আজিমাবাদের নায়েব-নাজিমি আপন পুত্র সরফরাজ খাঁকে দিলেই গোল মিটে যেত। কিন্তু পিতা-পুত্রের মধ্যে মনোমালিন্যবশতঃ আজিমাবাদের নায়েবি পড়ল সুজা খাঁর অনুগৃহীত আলিবর্দি খাঁয়ের হাতে। সেই কারণে মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্র ক'রে পিতা-পুত্র ভাই-ভাইয়ের মধ্যে কলহ বিষম হয়ে উঠেছে। মুর্শিদাবাদের অধঃপতনের দিন আসন্ন। এমনি পরিস্থিতিতে খোর্ধার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার ক'রে উৎকল থেকে মোগলশক্তিকে বিতাড়িত করা রামচন্দ্রদেবের এক বহুপোষিত সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু তার জন্য সর্ব প্রথমে আবশ্যক ছিল ওড়িশায় কিছুদিনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন শান্তি।

রামচন্দ্রদেব দেহে শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত লড়তেও প্রস্তুত। কিন্তু অদৃষ্টবৈগুণ্যে এখন ওড়িশার শত্রু মোগল নায়েব-নাজিমরা তত নয় যত ঘরভেদী বিশ্বাসঘাতকের দল! আজ তাই বকশী বেণুভ্রমরবর, দেওয়ান কৃষ্ণ নরীন্দ্র, অধিকাংশ মুখ্য দুর্গপতি গড়নায়ক কাউকে বিশ্বাস করবার উপায় নেই। নিজের ছায়াকেও বিশ্বাস করা যেন এখন রামচন্দ্রদেবের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কোন অসতর্ক মুহূর্তে কে পিছন থেকে ছুরি বসাবে তার স্থিরতা নেই।

তাও যদি ওড়িশার ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতকতার জয় হ'ত। কিন্তু এক বিশ্বাসঘাতকতা একটির পর একটি আরও বিশ্বাসঘাতকতার এক বিষচক্র সৃষ্টি ক'রে তার আবর্তে বিশ্বাসঘাতকদেরও গ্রাস ক'রে চলেছে।

এমন অবস্থায় নায়েব-নাজিম তকী খাঁর সদিচ্ছাই ছিল রামচন্দ্রদেবের পক্ষে একমাত্র রক্ষাকবচ। কিন্তু তিনি জানেন যে তকী খাঁ কেবল সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। রামচন্দ্র যবনী বিবাহ করার পর রায় রায়ান আলমচাঁদ, জগৎশেঠ ফতেচাঁদের মত তকী খাঁর দরবারে

একজন দরবারী হয়ে থাকবেন বলে মনে ভেবেছিল তকী খাঁ। খোর্ধার সিংহাসন এমনি ক'রে খালি প'ড়ে থাকলে খোর্ধাকে কটকের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে মোগল-শাসিত ওড়িশা সুবা উত্তরে সুবর্ণরেখা নদী থেকে দক্ষিণে চিকাকোল পর্যন্ত বিস্তৃত করা তকী খাঁর অভিপ্রায় ছিল। সেইজন্য রামচন্দ্রদেবকে কলমা পড়িয়ে নিজ ভগিনী রিজিয়ার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে মুসলমান করায় তকী খাঁ কেবল এক ধর্মীয় দায়িত্ব নয়, এক কূট রাজনৈতিক কর্তব্যও সম্পন্ন করেছিল। তাই রিজিয়ার মত এক নিষ্পাপ বালিকাকে কূটনীতির যূপকাষ্ঠে বলি দিতেও সে কুণ্ঠিত হয় নি।

কিন্তু রামচন্দ্রদেব রায় রায়ান আলমচাঁদ জগৎশেঠদের মত তুচ্ছ লোভে লালবাগ কেল্লার স্বর্ণপিঞ্জরে বসে থাকার লোক ছিলেন না। তিনি খোর্ধা ফিরে এলেন। তাঁর উদ্দেশ্য তকী খাঁর বুঝতে বাকি রইল না। সেই অবধি তকী খাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্বদা রামচন্দ্রদেবের পিছন পিছন গুপ্তঘাতকের শাণিত ছুরিকার মত উদ্যত রয়েছে। এদিকে বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তে খোর্ধার সিংহাসনও রামচন্দ্রদেবের পক্ষে কণ্টকাসনে পরিণত হয়েছে।

অবশেষে মহারানী ললিতা মহাদেঈও সেই বিশ্বাসঘাতকদের দলে যোগ দিয়েছেন। যবনী রিজিয়া বিবি খোর্ধার রানী হবে, তার ছেলে খোর্ধার রাজসিংহাসনের দাবিদার হবে এমন কল্পনামাত্রও ললিতা মহাদেঈকে দলিতা সর্পিনীর মত ভয়ংকরী ক'রে তুলেছিল। রামচন্দ্রদেব খোর্ধায় ফিরে আসার আগেই তিনি হাতের চুড়ি-শাঁখা[1] ভেঙে আপন বৈধব্য ঘোষণা ক'রে পিত্রালয়ে প্রস্থান করেছিলেন।

1. চুড়ি-শাঁখা— কাচের চুড়ি ও গালার শাঁখা ওড়িয়া নারীর আয়তির চিহ্ন।

তাঁর পণ : ভাগীরথীকুমারকে সিংহাসনে অভিষিক্ত না করা পর্যন্ত তিনি আর খোর্ধার ভূমি স্পর্শ করবেন না।

নিঃসঙ্গ একক নক্ষত্রের মত রামচন্দ্রদেব আজ সম্পূর্ণ একাকী। যে খোর্ধাভূমির শান্তি ও সুরক্ষা আর যে জগন্নাথের মানরক্ষার জন্য তিনি ধর্ম সমাজ সংস্কার সব-কিছুতে জলাঞ্জলি দিয়েছেন সেই খোর্ধার প্রাণভূমি থেকে তিনি যেমন নির্বাসিত জগন্নাথের সিংহদ্বার হতেও তেমনি বিতাড়িত! ভবিতব্যের এ বচক্রান্তে সব হারিয়ে ব'সে আছেন তিনি। তবু সব আবার একবার নতুন ক'রে আরম্ভ করবার যে একান্ত অধিকার প্রত্যেক মানুষের, তার থেকে তিনি তো বঞ্চিত হন নি। স্বয়ং জগন্নাথও তা থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারেন না, কারণ সেই তো মানুষের মুক্তি সাধনা।

রামচন্দ্রদেব কল্পনা করছিলেন দুর্গম অন্ধকার পথ, তার মধ্যে একটি ক্ষীণ দীপবর্তিকা হাতে তিনি একাকী অগ্রসর। হঠাৎ প্রবল বায়ু-বেগে সেই আলোকশিখাটুকু নির্বাপিত হল, পিছনে আশ্রয় নেই, সামনে অবলম্বন নেই! যাত্রার কি সেইখানে নিবৃত্তি? ফিরবেন তিনি? কোথায় ফিরবেন? অগ্রসর হবেন? কোথায়, একাকী সেই নীরন্ধ্র অন্ধকারে?

ক্লান্তিতে তাঁর চোখের পাতা বুজে আসছিল। ভেসে উঠছিল টিকালী যুদ্ধে বন্দী হবার পরে বিড়ম্বনার সেই লাঞ্ছিত মুহূর্তগুলির স্মৃতি।

কটক-বারবাটী দুর্গের নবপ্রস্থ প্রাসাদের অষ্টম প্রস্থে রামচন্দ্রদেবের কারাগৃহ। টিকালী যুদ্ধে গঞ্জাগড়ের কাছে চিলিকার উপকূলে বন্দী হবার পরে লোহার খাঁচায় পুরে তাঁকে এখানে পাঠানো হয়েছিল।

কটকের নায়েব-নাজিমরা আগে যখন বারবাটী দুর্গে বাস করতেন তখন এই অষ্টম প্রস্থে ছিল অন্দরমহল। নবম প্রস্থের প্রবেশপথে, গড়ের ঠিক মধ্যস্থলে, এক বিরাট শঙ্কুস্তম্ভের গগনভেদী চূড়া। এই চূড়ার উপরে দাঁড়িয়ে গড়রক্ষীরা দূরবীনে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করত। মহানদীর উত্তর তীরে শত্রু দেখা দিলে এই স্তম্ভ থেকে তা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যেত। অন্য প্রস্থগুলিতে অতিথিশালা, দরবার-গৃহ, রন্ধনশালা, গড়রক্ষী ও সেনাদলের বাসগৃহ, শস্ত্রাগার, তারপর হস্তীশালা অশ্বশালা প্রভৃতি ছিল। কিন্তু নায়েব-নাজিম আগা খাঁ জামান কাফেরের তৈরী ছাদের তলায় থাকবে না ব'লে লালবাগে নিজে থাকবার জন্য একটি নূতন দুর্গ তৈরি করিয়েছিল। সেই থেকে লালবাগ নায়েব-নাজিমদের বাসস্থলে পরিণত হয়েছিল, আর বারবাটী দুর্গ প্রধানতঃ বন্দীশালা ও সৈন্যশিবির হিসাবেই ব্যবহৃত হচ্ছিল। তা ছাড়া লালবাগের অন্তঃপুরবাসিনীদের মধ্যে যাদের প্রতি নায়েব নাজিমরা ক্রমে বীতরাগ হয়ে উঠত তারাও এই দুর্গের নবম প্রস্থের মহলগুলিতে স্থানান্তরিত হয়ে অতীত সৌভাগ্যের স্মৃতি সম্বল ক'রে প'ড়ে থাকত। এখন সুজা খাঁর আমলের কয়েকজন বেগমও তাঁদের 'লাগুতিগহণ' নিয়ে এখানে ছিলেন।

রামচন্দ্রদেব যে প্রস্থে বন্দী হয়ে ছিলেন সেটি বন্দীশালারূপেই ব্যবহৃত হ'ত। শতাধিক জমিদার ইজারাদার ও অবাধ্য দুর্গপতি

যথাসময়ে খাজনা উসুল না দেওয়ার অভিযোগে সেই কারাগারে বন্দী ছিলেন। মাঝে মাঝে তাদের আর্ত চীৎকারে বারবাটির শান্ত বাতাবরণ শিহরিত হ'ত। শোনা যায়, নায়েব-নাজিম ও খান-ই-দৌরানের আমলে এই কারাগারে সাতশো ওড়িয়া জমিদারকে হত্যা করা হয়েছিল। এখনকার এই বন্দীদের মধ্যেও কেউ যে আবার বাহিরের মুক্ত দিবালোক দেখতে পাবেন এমন বিশ্বাস তাদের ছিল না। বন্দী রামচন্দ্রদেবও সেই পরিণামের প্রতীক্ষা করছিলেন। চরম পরিণামের সম্মুখীন হলে মনে আসে যে আত্মসমর্পণের স্থির প্রশান্তি তাই তাকে তখন ক'রে তুলেছিল সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন।

তাঁর কারাকক্ষের একটি অপ্রশস্ত গবাক্ষপথে এক টুকরো আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন রামচন্দ্রদেব। গোলাম-গর্দিশ খোজা-ক্রীতদাসদের হট্টগোল, কখনো বা লশকরদের মাতলামির কোলাহলে বারবাটির নিরানন্দ পরিবেশ বিক্ষিপ্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

কারাকক্ষের ভিতরে শীতল ছায়ান্ধকার। উত্তর দিকের দেওয়ালের গবাক্ষপথে অপরাহ্নের ক্ষীণালোক এসে অভ্যন্তর ঈষৎ আলোকিত করছিল। সেই স্বল্পালোকে দেখা যাচ্ছিল প্রস্তর-নির্মিত দেওয়াল ও স্তম্ভে ক্ষোদিত ওড়িয়া শিল্পীর বহুসূচীর নানা শিল্পকর্ম। স্তম্ভের গায়ে লাস্যময়ী অলসকন্যাগণের মূর্তি সেই নিষ্প্রাণ পরিবেশে অতি বিসদৃশ বিস্তৃত মনে হচ্ছিল। একটি চারপাইয়ের উপর সম্ভবতঃ কেবল রামচন্দ্রদেবের খাতিরেই জরিদার জাজিম বিছানো। চারপাইয়ের কাছে একটি পাথরের মেজ, তার উপরে একটি জলপূর্ণ বদনা ও একটি থালায় রুটির শুষ্ক ভুক্তাবশেষ প'ড়ে ছিল।

গবাক্ষের বাহিরে দেখা যাচ্ছিল জেনানা মহলের গোলাপ বাগিচা বা গুলিস্তাঁ। কিন্তু জেনানামহল এখান থেকে উঠে যাবার পর থেকে

রীতিমত পরিচর্যার অভাবে সেই সুরক্ষিত গুলিস্তাঁ এখন গুল্মাকীর্ণ, পয়ঃপ্রণালী ও ফোয়ারা জলহীন। তবু সেই পরিত্যক্ত বিশুষ্ক পরিবেশের মধ্যে কয়েকটি গোলাপ ও গুল-ই-মখমল্ গাছ অগনতি ফুল ও কুঁড়িতে ভরা। কারাগারের বাহিরে আফগানী সান্ত্রীরা জুতো মচমচ ক'রে পাহারায় রত।

বাহিরের আকাশ ক্রমে মলিন হয়ে আসছে। গুলিস্তাঁর গোলাপ ও গুল্মের উপর গোধূলির ছায়া ঘনিয়ে আসছে। রামচন্দ্রদেব তবু স্থাণুর ন্যায় গবাক্ষের কাছে দাঁড়িয়ে। অতীতের বহু ঐতিহাসিক স্মৃতি তার শূন্যদৃষ্টির সামনে জলভারহীন মেঘের মত একে একে ভেসে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

সে কোন স্মরণাতীত অতীতে সেদিন মহানদীর দক্ষিণ তীরবর্তী বনবাসী গ্রামের নাম ছিল কোদিণ্ডা দণ্ডপাট। সেখানে একদিন এক বক শ্যেন পক্ষীকে নির্জিত করেছিল। এই অসম্ভব ব্যাপারে মহারাজ অনঙ্গভীমদেব কী শুভ লক্ষণ দেখলেন, সেইখানে তিনি বারবাটী দুর্গের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন।

সে কি ইতিহাসের কোনো ইঙ্গিত?

সেই দিন থেকে কিন্তু বহু বক সেখানে বহু শ্যেনকে কবলিত ক'রে গেছে। নইলে খোর্ধার মহারাজা রামচন্দ্রদেব এখানে সামান্য কয়েদীর মত শুখনা রুটি চেবাবেন কেন?

কিন্তু যাকে দেখবার জন্য রামচন্দ্রদেব অলস কৌতূহলে সেখানে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন তিনি এখনও এলেন না।

তিনি কি আজ অপরাহ্ণে সেই গুল্মাকীর্ণ গুলিস্তায় আসতে ভুলে গেলেন? তিনি কি জানতে পেরেছেন রামচন্দ্রদেব তাঁর কারা-প্রকোষ্ঠের গবাক্ষপথে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে তাঁকে লক্ষ্য করেন? সেই

জন্য সংকোচে কি বাগিচায় আসা তিনি ত্যাগ করলেন ?

বাহিরের দিকে চেয়ে রামচন্দ্রদেব এমনি নানা চিন্তা করছিলেন। তার ঘটনাহীন নিঃসঙ্গ অনিশ্চিত কারাজীবনে এই কয়টি মুহূর্তের বৈচিত্র্য এখন একমাত্র সম্বল।

অলঙ্ঘ্য ভবিতব্যের মত যে নারী একদিন রামচন্দ্রদেবের জীবনকে সর্বতোভাবে আচ্ছন্ন ক'রেছিল সেদিন তার কালো নয়নের বারবার অপস্রয়মান একটি ক্ষীণ প্রান্ত রামচন্দ্রদেবকে সেই বোরকাধারিণীর প্রতি কৌতূহলী ক'রে তুলেছিল, কিন্তু সেই নিষ্প্রাণ পীড়াদায়ক পরিবেশের মধ্যে রামচন্দ্রদেব তাকে সশরীরে দেখবেন ব'লে তার অতি উদ্ভট স্বপ্নেও একবার কল্পনা ক'রেন নি।

সেই নারী এক অশরীরী ছায়া না [illegible] মস্তিষ্কের বিকার অথবা জাগ্রৎ স্বপ্ন রামচন্দ্রদেব স্থির ক'রতে পারছিলেন না। কারারুদ্ধ জীবনের অনেক দিন পর আকস্মিকভাবে একদিন ঘটেছিল সে ঘটনা।

গড়াগড়ের [illegible] প্রান্তরের সেই গায়ে সেদিন [illegible]। যুদ্ধবন্দী [illegible] রামচন্দ্রদেব কখনও ভুলতে পারেন নি। [illegible] রামচন্দ্রদেব কারাগারের মধ্যে নিঃসঙ্গভাবে পদচারণা ক'রে [illegible] তাকে ভবিষ্যতের নানা দুশ্চিন্তা ভুলিয়ে দিয়েছিল। এমনি সময়ে কারাগৃহের সম্মুখস্থ গুল্মাকীর্ণ বাগিচায় আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হয়েছিল একটি বোরকাঢাকা নারী মূর্তি। গুল্মঝাড়ের একটি অযত্নবর্ধিত গোলাপের ঝোপের কাছে আসবার সময়ে মুখের উপর থেকে বোরকার একাংশ শ্লথ হয়ে খ'সে পড়েছিল। তার বঙ্কিম কপোলের দুই পাশে দুই কানের মণিমুক্তাখচিত দুল অপরাহ্ন-আলোকে ঝিকমিক ক'রে

উঠেছিল। বোরকার নীচে অপ্রশস্ত কপাল মেঘের আড়ালে যেন এক ফালি জ্যোৎস্নার মত উদয় হয়েছিল। অশান্ত বুলবুলের মত সেই নারীমূর্তি বাগিচার এক গোলাপের ঝোপ থেকে আর এক ঝোপে লঘু ছন্দে ঘুরে ঘুরে গোলাপের ডালগুলি নুইয়ে নুইয়ে পুষ্প আঘ্রাণ করছিল, থেকে থেকে বুলিয়ে নিচ্ছিল গালের উপর।

ক্রমে এ প্রায় এক নিত্যনৈমিত্তিক দৃশ্যে পরিণত হয়েছিল। কৌতূহল পরিণত হয়েছিল উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষায়। কারাগৃহের মধ্যে রামচন্দ্রদেব সারাদিন সেই দৃশ্যের অপেক্ষায় কাটানো অবশেষে যেন এক অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল।

প্রত্যহ সেই এক নির্দিষ্ট সময়ে সেই এক দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ...কিন্তু কে এই রহস্যময়ী ছায়ামূর্তি?.. জেনানার অন্তঃপুরবাসিনী? ..কোন অতৃপ্ত অত্যাচারিত আত্মার প্রেতমূর্তি? ..উত্তপ্ত মস্তিষ্কের দিবাস্বপ্ন?

সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখলে কেউ লক্ষ্য করতে পারত গবাক্ষপথে রামচন্দ্রদেব যখন সেই নারীমূর্তির দিকে চেয়ে থাকতেন সেই সময়ে এক জলশূন্য ফোয়ারার আড়াল থেকে একটি শুভ্রমূর্তি সে দুই জনের দিকেই চেয়ে তাদের বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে। ক্রমে অপরাহ্নের ছায়া ঘনীভূত হয়ে আসত। চিরাগীরা বিভিন্ন প্রস্থের অলিন্দ ও কারাপ্রকোষ্ঠগুলির ভিতর চিরাগ জ্বালবার জন্য জুতা মচমচ করে এসে ঢুকত। দুর্গের দ্বিতীয় প্রস্থে ফতেখাঁ মসজিদ থেকে আজান ধ্বনিতে নিস্তরঙ্গ সন্ধ্যা আলোড়িত হত। সেই নারীমূর্তি তখন জেনানার পথে অদৃশ্য হত।

আজ হয়তো তিনি আর এলেন না। কিন্তু কেন? নিয়মিত রীতিতে চিরাগী এসে চিরাগদানে মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে গেল।

আলোকত্রস্ত কয়েকটা চামচিকা কারাগৃহের অন্ধকার ছাদের নীচে ডানা ঝটপট করে উড়ে বেড়াতে লাগল। কিন্তু তারপর আর-সব দিনের মত কারাদ্বার বন্ধের শব্দ তো কই হলো না। 'সেলাম আলায়কুম" ব'লে অপ্রত্যাশিত ভাবে জনৈক বৃদ্ধ মুসলমান খোজা এসে প্রবেশ করলেন।

তার নাম জবরদস্ত খাঁ, নায়েব-নাজিমের অতি বিশ্বস্ত। সুজা খাঁর আমল থেকে তিনি নায়েব নাজিমের অন্তঃপুরে রয়েছেন। অন্তঃপুর-বাসিনী বেগমরাও জবরদস্ত খাঁকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করে থাকেন। জবরদস্ত্ খাঁ নও মুসলমান অর্থাৎ ধর্মান্তরিত হলেও মোগলদের মতই তার মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। মুখে দাড়ি গোঁফের ক্ষীণ সঙ্কেত ছিল, তা সবই পেকে সাদা হয়ে গিয়েছিল। গায়ে লাল মখমলের কাবা। ডান দিকে রুপার তারের বোতাম দড়ি ঝুলছে। কোমরবন্দে হাতীর দাঁতের বাঁট লাগানো একখানি ছুরি গোঁজা। মাথায় সাধারণ একটি টুপি।

রামচন্দ্রদেব অসময়ে তাকে দেখে বিস্মিত হলেন। জবরদস্ত্ খাঁ দন্তহীন অমায়িক হাসি হেসে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, "গরীব-নওয়াজকা মিজাজ কৈসে হৈ?"

সম্ভাষণের এ সকল মখমলী মোগলাই রীতির সঙ্গে রামচন্দ্রদেব ইতিমধ্যে যথেষ্ট পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন। অপ্রসন্ন কণ্ঠে প্রতি-সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, "সুক্রিয়া, তারীফ ফর্মাইয়ে।"

জবরদস্ত্ খাঁ কিঞ্চিৎ বিব্রতভাবে পায়চারি করতে করতে বললেন, "হুজুরের সঙ্গে মুলাকাত করব রোজই ভাবি, কিন্তু কাজের ভিড়ে ফুরসৎ পাই না। লেকিন আজ হুজুরের ফরমায়েস হ'ল—যাও মিঞা, হমারে বিরাদর খোর্দাকা বাদশাহ সে মিল্‌কর্ আও। আমি বললাম, যো হুকুম খোদাবন্দ্।"

কেবল ডান হাতের আঙুলগুলি ছাড়া সে মূর্তির আর কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। কিন্তু সুগঠিত করপৃষ্ঠ ও অশোকমঞ্জরীর মত সেই আঙুলগুলিতে দিব্য নারীত্বের আভাস।

রামচন্দ্রদেব স্বপ্ন না জাগ্রত বুঝতে পারছিলেন না।

জবরদস্ত খাঁ সেই নারীমূর্তির মুখের উপর থেকে বোরকাটি তুলে ধরলেন। মেঘের আড়াল থেকে যেন এক ফালি জ্যোৎস্নার মত একটি স্নিগ্ধ কপাল ভেসে উঠল। দুটি ভ্রূলতার নীচে সুর্মাটানা দুটি মুদিত নয়ন। রামচন্দ্রদেব স্বপ্ন দেখছেন না তো? গুল্মাকীর্ণ গোলাপ বাগিচায় যে নারীমূর্তি প্রতি অপরাহ্নে রামচন্দ্রদেবের চোখে দিবাস্বপ্নের ইন্দ্রজাল বুনে ভেসে বেড়ায় এ তো সেই রহস্যময়ী। কিন্তু এখানে—এ কারাগারে কেন?

বোরকা আবার তাঁর কপালের উপরে উঠে গেল। আতর-ই-জাহাঙ্গিরীর সুবাসে কারাকক্ষের বদ্ধ বায়ু আমোদিত হল।

জবরদস্ত খাঁ বললেন, "হুজুর, নবাবজাদার মনসা আপনি একে নিকা করলে খোর্ধা কটক দেবাদারিতে এক হয়ে যাবে। ইনি হলেন মুর্শিদাবাদের নবাব সুজা খাঁর দুহিতা, নায়েব নাজিম তকী খাঁর বহেন।"

এই অদ্ভুত প্রস্তাবে রামচন্দ্রদেব বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। নিকা বা বিবাহের প্রস্তাব স্থির হয়ে গেলে কন্যাপক্ষ স্বীকৃতির চিহ্ন স্বরূপ পান দিয়ে থাকে। এখানে কন্যাপক্ষ মাত্র জবরদস্ত্ খাঁ। মলমলের কাবার জেবের ভিতর থেকে তিনি একখানি পান পাত্তা বার ক'রে তা রামচন্দ্রদেবের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "জনাব, ভেবে দেখুন, নবাব সুজা খাঁ আজ বাংলা, বিহার, ওড়িশা সুবার মালিক। গুজশ্‌তা খোর্ধা আর কটকের ভিতরে অনেক জঙ্গ্ লেগেছে। দুই

পক্ষে বহুত খানেখরাব (ক্ষতি) হয়েছে। তাতে খোর্ধা মুলুকের লোকসান হয়েছে বেশী। আজ কিন্তু নায়েব-নাজিমের ইচ্ছা সে সব ইতিহাসের শেষ হোক, খোর্ধা আর কটকের মধ্যে বেরাদরি আসুক, ওড়িশা সুবায় অমন্ (শান্তি) জাহির হোক। সেই জন্য তাঁর ইচ্ছা হুজুরকে ভগ্নীপতি করা।"

রামচন্দ্রদেবের হাত থেকে পানপাত্তা স্খলিত হয়ে প'ড়ে গেল। এই অপ্রত্যাশিত অসম্ভব প্রস্তাবের প্রচ্ছন্ন হুমকিতে তিনি স্তব্ধ হলেন।

জবরদস্ত খাঁ যেমন আকস্মিকভাবে এসেছিলেন তেমনি হঠাৎ চলে গেলেন, কেবল আর একবার ব'লে গেলেন, "হুজুর ভেবে দেখবেন, শাহেনশাহ্ নবাবজাদার দোস্তিতে বাড়ানো হাত—একবার সরিয়ে দিলে..."

জবরদস্ত্ খাঁ চ'লে যাবার পর বোরকার অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে নিথর জলরাশিতে একটি ক্ষীণ তরঙ্গের মত শিহরণ উঠে আবার মিলিয়ে গেল। রামচন্দ্রদেবও বেরাদরির এই প্রস্তাবের নিহিতার্থ চিন্তা ক'রে অস্থির হলেন।

খোর্ধা এখন তকী খাঁর অনুগ্রহেই যে টিঁকে আছে সে কথা আর কেউ বুঝুক বা না বুঝুক রামচন্দ্রদেব সুস্পষ্টই বুঝেছিলেন। তকী খাঁকে প্রতিরোধ করার মত বল যে পাইকের তখনও ছিল না তা নয়, কিন্তু বাইরের শত্রু তখন তত বিপজ্জনক ছিল না যত ছিল ঘরের শত্রু। খোর্ধার স্বাধীনতার সঙ্গে শ্রীজগন্নাথও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। খোর্ধার বল তখনও ভাঙে নি ব'লেই নায়েব-নাজিমরা জগন্নাথের মন্দির অক্ষত রেখেছিল, কিন্তু একবার যদি খোর্ধা খাস হয়ে যায় তাহলেই শ্রীমন্দির ভেঙে তারই পাথর দিয়ে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে একটা মসজিদ তৈরী করিয়ে ফেলতে তকী খাঁর কতক্ষণ লাগবে।

বোরকা-আবৃতা ধীরে ধীরে মুখের উপর থেকে বোরকার অবগুণ্ঠন নামিয়ে দিলেন। রৌদ্রপ্রদীপ্ত নীলপদ্মদলের মত বেদনাবিদ্ধ দুটি চোখ রামচন্দ্রদেবের দিকে চেয়ে নীরব ভাষায় যেন বলছিল, "আমায় বিশ্বাস কর, আমি এ চক্রান্তের মধ্যে নেই, আমি নিরপরাধিনী।"

শিশিরবিন্দুর মত নিষ্পাপ উজ্জ্বল সেই চোখ দুটি মুহূর্তের মধ্যে রামচন্দ্রদেবকে কেমন সম্মোহিত করল। তাঁর স্মৃতিপথে হঠাৎ ভেসে উঠল সেদিন চিলিকা তীরের সেই তেপান্তর গ্রামে জলদাত্রী আশ্রয়দাত্রী হতভাগিনী সরব দুটি চোখের বেদনাবিদ্ধ দৃষ্টি।

রামচন্দ্রদেব আবিষ্ট কণ্ঠে শুধালেন, "তুমি কে?"

নারী অকম্প্র কণ্ঠে উত্তর দিল, "আমি জবা, মা আমায় এই নামে ডাকতেন, কিন্তু এঁরা আমার নাম রেখেছেন রিজিয়া।"

রামচন্দ্রদেব বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু তুমি না নবাব সুজা খাঁর কন্যা? নায়েব-নাজিম তকী খাঁর ভগ্নী?"

বিষণ্ণ সুরে জবা উত্তর দিল, "মা আমার ছিলেন মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ খেমটাওয়ালী কাঞ্চন মুর্শিদাবাদী। নবাব সুজা খাঁর হারেমে তিনি কি করে এসেছিলেন আমি তা জানি না। তবে মা আমার নাম রেখেছিলেন জবা। মা বরাবর বলতেন আমি হিন্দুর মেয়ে জবা।"

অনেক— অনেক দিন পর জবা বা রিজিয়া বহু বৎসরের সঞ্চিত কথা বলবার জন্য কাছে হঠাৎ যেন পেয়েছিল একজন মনের মানুষ। তার সঙ্কোচ ছিল না, জড়তা ছিল না, স্বচ্ছ নিষ্পাপ দুই চোখ রামচন্দ্রদেবের উপর নিবদ্ধ ক'রে সে বলে চলেছিল, "মা আমার কবর নিয়েছিলেন এই কটকে, কদমরসুলে। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁর কাছে কাছে ছিলাম। তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল তিনি দেখবেন পুরুষোত্তম জগন্নাথ। জগন্নাথ জগন্নাথ বলে তিনি শেষ নিশ্বাস ফেলেছিলেন।"

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে জবা তাব চোখদুটি নত কবল। তাবপব আবাব চোখ তুলে বলল, "তুমি সেই জগন্নাথেব দেশেব নবাব না? হাবেমে আমি তো তাই শুনেছি।"

বাইবে জববদস্ত খাঁব জুতাব শব্দ শোনা গেল। এবাব জবা আব মুখেব উপব বোবকা তুলে দিল না। কিন্তু বামচন্দ্রদেবেব শবীব জ্যাবদ্ধ ধনুকেব মত কঠিন হযে উঠল।

এবপব একদিন হঠাৎ বিজিযা বা জবাব সঙ্গে বামচন্দ্রদেবেব বেশ মহা-সমাবোহ কবে বিবাহেব পূর্বদিনেব অধিবাস সম্পন্ন হযে গেল। বামচন্দ্রদেব ও বিজিযাকে কলমা পড়াবাব পবে কাজী বিবাহেব খাতায় উভযেব নাম চড়িয়ে দিলে। এখন থেকে বামচন্দ্রদেব হলেন হাফিজ কাদিব বেগ, আব সুন্দবী জবা ওবফে বিজিযা বিবি হলেন খোর্ধাব বেগম।

মহাবাজ বামচন্দ্রদেব জাতিভ্রষ্ট হয়ে যবনী বিবাহ কবে জগন্নাথদ্রোহী হলেন এ দুর্গতি ওড়িশাব কেউ নিঃশব্দে সহ্য ও বহন কবে নি। সর্বত্র হায হায পড়ে গেল।

এব পব খোর্ধায় ফিবে যাওযায় কোনো প্রতিবন্ধক ছিল না। কিন্তু হাফিজ কাদেব বেগ বিজিয়া বিবিকে সঙ্গে নিযে কখন কি ক'বে খোর্ধা ফিববেন তাই বামচন্দ্রদেবেব পক্ষে এক বর্তিকত সমস্যা হযে দাঁড়িযেছিল, বামচন্দ্রদেব বাববাটী দুর্গে তকী খাঁব ভগ্নীপতি হযে অন্য এক বন্ধনে বন্দী হয়ে ব'সেছিলেন।

সেদিন মুসলমানদেব উৎসবমুখব শব্-এ ববাত পর্ব। আব সেদিন রামচন্দ্রদেব ও বিজিয়া বেগমেব প্রথম মধুযামিনী।

ইসলাম সমাজ ভারতে হিন্দু সংস্কৃতি ও আচারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে কিছু কিছু হিন্দু পাল-পার্বণের উৎসবরীতি গ্রহণ বা অনুসরণ করেছিল। শব্-এ-বরাত পর্ব পালনে তার এক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ইসলামী শাবান মাসের কৃষ্ণ-চতুর্দশী রাত্রিতে এই পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এটি হিন্দুদের দীপাবলী অমাবস্যার মত ইসলামী মহা নিশা। এর নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে জীব ব্রহ্মের মধ্যে লীন হয়। বিধান অনুসারে, সেদিন সারা রাত্রি জাগ্রত থেকে কোরান পাঠ করা কর্তব্য। এই রাত্রে মানুষের ভাগ্য ও ভবিতব্যের ফয়সালা জিন্নত্ বা স্বর্গে হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতে কালক্রমে এই শব-এ-বরাত পর্বটি দীপাবলী পর্বের মত আলোকমালা বিভূষিত আতশবাজি শব্দিত এক কোলাহল-মুখর নৈশ উৎসবে পরিণত হয়েছে।

আবার আজ এই শব্ এ-বরাতেই ওকী খাঁর ভগ্নী সুজা খাঁর কন্যা বিজিয়ার রশম্-এ নামঙর। তাই বাবরাটি দুর্গ আজ আলোক-সজ্জায় সজ্জিত হয়েছে। দুর্গের মাঝখানে ফতেখা মসজিদের মিনারগুলির চূড়া দীপমালায় সজ্জিত হয়ে দূর থেকে এক-একটি আলোর ছাতার মত দেখাচ্ছিল। দুর্গের প্রতি চত্বরে আলোকসজ্জা হওয়ায় মনে হচ্ছিল যেন আলোর সোপানশ্রেণী উঠে গেছে আকাশে। দুর্গপ্রাচীর দীপমালায় ভূষিত হয়ে সৃষ্টি করেছিল রূপকথার স্বপ্নলোক। আতশবাজির বাহার দেখতে দুর্গের বাহিরে শহরের জনতা এসে ভিড় করেছিল। সব দিকে কিন্তু এক প্রচ্ছন্ন হাহাকার : জগন্নাথের সেবক শিরোমণি শেষে জাতিভ্রষ্ট হয়ে সুজা খাঁর জারজ কন্যাকে বিবাহ করলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হয়েছে। দীপাবলী নিবে এসেছে। এখানে ওখানে কয়েকটি প্রদীপ শুধু উৎসবসন্ধ্যার গতায় অবশেষের

মত এখনও জ্বলছে।

রিজিয়া বিবিকে বিবাহ করার পর রামচন্দ্রদেব ওরফে হাফিজ কাদের্ নবম প্রকোষ্ঠ অন্দরমহলে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। বাসর রাত্রির রঙমহল ইরানী গালিচা, সমরখন্দের বেশমী তাকিয়া, মুর্শিদাবাদের পর্দা ও ফুলদানী ধপদানী চিরাগদানী প্রভৃতিতে সুসজ্জিত হয়েছিল। রিজিয়া সেই প্রকোষ্ঠে একটি গালিচার উপর বসে মাথা ঝুঁকিয়ে কোরান শরীফ্ পাঠ করছিলেন। শেষ রাত্রির শীতল বাতাস ঝরোকার মর্মরজালিপথে এসে পর্দাগুলিকে বাউল-দরবেশের মত নাচিয়ে দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল, রিজিয়া তখন অঙ্গের কালো কাশ্মীরী শালটি ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিচ্ছিলেন।

লশকরদের প্রকোষ্ঠে তখনও শব্-এ-বরাতের মহফিল্ শেষ হয় নি। সেখান থেকে তখনও আসছিল শরাবী গজলের আমেজ, খেমটা-ওয়ালীদের পায়ের ঘুঙুরের আওয়াজ। রামচন্দ্রদেব উত্তর দিকের একটি সুদৃশ্য খিলানের নীচে ঝরোকার জালি দিয়ে অদূরে মহানদীর দিকে চেয়ে চিত্রাপিতবৎ দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাব উন্মাদনাকম্পিত হাতে শিরাজির পেয়ালা। মহানদীর অন্ধকার জলরাশির মধ্যে একটি নিঃসঙ্গ উজ্জ্বল নক্ষত্রের ছায়া ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। রামচন্দ্র-দেবের মনে হচ্ছিল যেন কি দুর্লভ ধন হাতে পেয়েও তিনি হারাতে বসেছেন।

এক নিশ্বাসে হাতের পেয়ালা তিনি নিঃশেষ করে দিলেন। শূন্য পেয়ালা তাঁর কম্পিত হস্ত থেকে স্খলিত হয়ে সেই মূর্ছিত পরিবেশের নির্বিঘ্ন মর্মস্থল কম্পিত করল।

রিজিয়া ধীরে আসন থেকে উঠে রামচন্দ্রদেবের কাছে এসে দাঁড়ালেন। কূটনীতির যূপে এই নিরীহ বলিটির দিকে চেয়ে গভীর

সমবেদনায় রামচন্দ্রদেবের অন্তঃস্থল আর্দ্র হয়ে উঠল। তিনি নীরবে রিজিয়ার মেহেদী-রাঙা হাত নিজের দু'খানি হাতে তুলে নিলেন। মহানদীর জলে মিলিয়ে গিয়েছিল যে তারার ছায়া সে যেন জেগে উঠল রিজিয়ার দুই চোখে।

রিজিয়া রামচন্দ্রদেবের কানে কানে চুপি চুপি বললেন, "আজ না ক'নেকে কবাইন (যৌতুক) দিতে হয়? আমায় কি দেবে?"

রামচন্দ্রদেব রিজিয়ার দুটি চোখের অতল গভীরতার দিকে চেয়ে বললেন, "ইহকাল, পরকাল, যা কিছু রইল তা তো এখন তোমার, জবা!"

রিজিয়া সেই দুই চোখে কৌতুকের তরঙ্গ তুলে বললেন, "তিন সত্যি কর—!"

রামচন্দ্রদেব রিজিয়াকে বক্ষে আবদ্ধ করতে করতে স্মিত হেসে বললেন, "সত্য সত্য সত্য— এই তিন সত্য করলাম।"

রিজিয়া জ্যাবদ্ধ ধনুকের মত নিজেকে হঠাৎ কঠিন ক'রে কোমর থেকে কাঁধ পর্যন্ত রামচন্দ্রদেবের বাহুপাশ থেকে মুক্ত ক'রে বললেন, "আমাকে জগন্নাথ দেখাতে পারবে, মহারাজ? মা আমায় সর্বদা বলতেন জগন্নাথকে একবার পেলে নাকি জীবনে সব না-পাওয়ার আফসোস মিটে যায়! জগন্নাথ রাত্রির অন্ধকারের মত, তাঁর মধ্যে সব পাওয়া না পাওয়া, সব দুঃখ সব আনন্দ, সব হাসি সব কান্না একাকার হয়ে যায়! আহা, মা আমার জগন্নাথ জগন্নাথ বলতে বলতে মাটি নিল, একবার কিন্তু জগন্নাথকে দেখতে পেল না।"

রামচন্দ্রদেবের বাহুবন্ধন শিথিল হল।

শব্-এ-বরাতের শেষ যবনিকার মত এক ধূসর কুয়াশা তখন নেমে আসছে মহানদীর উপর।

পাথরগড় 'উআসে'র নিশুতির মধ্যে যে তন্দ্রাঘোরে রামচন্দ্রদেব সেই উপকথার রাত্রির মত রশম্-এ-নামজদের স্মৃতিরোমন্থন করছিলেন তা কার খড়মের শব্দে সহসা ভেঙে গেল। তিনি উঠে সোজা হয়ে বসলেন।

খোর্ধা রাজবংশের কুলপুরোহিত গোদাবরীবর্ধন লক্ষ্মী পরমগুরু মহাপাত্র ব্যতীত আর তো কেউ এ ঘোর দুর্দিনেও এমন দৃপ্ত পদশব্দে 'উআসে'র নীরব গাম্ভীর্য আহত করতে সাহস করবে না। এমন কি তকী খাঁর উকিল সৈয়দ বেগ্ও আসবার সময় সসম্ভ্রম দূরত্বে পাদুকা উন্মোচন ক'রে আসে।

লক্ষ্মী পরমগুরুর পাদুকাশব্দে রামচন্দ্রদেবের বিষাদ অপনীত হ'ল। সান্ত্বনাহীন সহায়হীন স্বজনবর্জিত সংসারে এই পরমগুরুই তাঁর এখন একমাত্র নিশ্চিত অবলম্বন ও সান্ত্বনা। কেবল তিনিই রামচন্দ্রদেবের মর্মান্তরকে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে সহ্য করেছেন। কেবল তিনিই বুঝেছেন খোর্ধার শান্তি ও জগন্নাথের মানরক্ষার জন্য রামচন্দ্রদেব নিজেকে পতিত অপবাদে ক্রয় করেছেন। তা ছাড়া এই লক্ষ্মী পরমগুরু সেদিন তকী খাঁর বন্ধন থেকে রামচন্দ্রদেবকে মুক্ত ক'রে না আনলে আজও তিনি কটকেই অবরুদ্ধ থাকতেন।

রামচন্দ্রদেব রিজিয়াকে বিবাহ ক'রে শাহী মেহমান হিসাবে বারবাটী মঞ্জিলে যখন একপ্রকার রাজনৈতিক বন্দীর মত ছিলেন তখন তার জন্য খোর্ধা রাজ্যে কেউ ক'ড়ে আঙুলটিও তোলে নি। খোর্ধা যখন খাস দখলে যেতে বসেছে তখনও খোর্ধার সিংহাসনের বিভিন্ন প্রার্থী ও দাবিদারদের মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র লেগে ছিল। তখন রামচন্দ্রদেবকে মুক্ত ক'রে আনা তো দূরের কথা, তিনি মরলেন কি বাঁচলেন সে সংবাদটুকুও নেবার জন্য কটকে কারও পা

পড়ে নি। ওদিকে রামচন্দ্রদেব হাফিজ্ কাদ্‌র্ বেগ্ হয়ে বারবাটি দুর্গের সোনার খাঁচায় ব'সে ছিলেন। বুঝেছিলেন খোর্ধার পথ তাঁর চিরদিনের মত রুদ্ধ হয়ে গেল।

সেদিন দেওয়ান-ই-খাসে তকী খাঁর দরবার শুরু হয়েছে। উজীর, ওমরাহ, মহতাসিব, কাজী, মীর-ই-আতশ্, সিওয়ানবিস, ওয়াকিয়া-নবিস ও ফৌজদার প্রভৃতি রাজপুরুষগণ তকী খাঁর সোনার জাজিম ঢাকা মসনদ বেদীর নীচে নিজ নিজ আসনে আসীন। খাদিমরা ময়ূরপুচ্ছ ও খসখসে বোনা বিশাল বিশাল পাখা নিয়ে তকী খাঁকে বীজন করছে। শরাবের নেশায় তকী খাঁ একটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছেন। সেই লাঞ্ছনার দরবারে নিরুপায় রামচন্দ্রদেব একটি কোণে অনুগত দরবারীর মত ব'সে আছেন।

তকী খাঁ তুর্ক নয়, ধর্মান্তরিত নও-মুসলমান। তাই তকী খাঁর মধ্যে মোগলের সুমার্জিত রসবোধ ছিল না। তার কাঠ নীরস চরিত্রের সঙ্গে মিলেছিল তার ধর্মান্ধতা। তবু তকী খাঁ রসিকতার চেষ্টা করছিল, তাতেই সকলে যে ভাবে হাস্যরোল তুলছিল তাতে মনে হতে পারে আজ পর্যন্ত এমন অপূর্ব রসিকতা তারা কেউ কখনও শোনে নি।

হায়, ক্ষমতার দরবারে দৈন্য যেমন ঐশ্বর্য বলে পরিচিত হয়, আত্মগ্লানি যেমন আত্মশ্লাঘায় পরিণত হয়, পদলেহন যেমন পরম পৌরুষ ব'লে অনুমিত হয়— দরবারীদের এমনি হাসি না শুনলে, কথায় কথায় কুর্নিশের সে কায়দা না দেখলে তার ধারণা করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। রামচন্দ্রদেব তখনও সে বিচিত্র রূপান্তরের কৌশল আয়ত্ত করতে সক্ষম হন নি।

দরবারীদের নির্বোধ হাস্যরোলে যোগ না দিয়ে পাষাণ মূর্তির মত তিনি নিজের আসনে বসেছিলেন। তাঁর এই বে-আদবি লক্ষ ক'রে পাশ থেকে বৃদ্ধ জগৎশেঠ ফতেচাঁদ অনুচ্চ স্বরে বললেন, "হাসুন, হাসুন রাজাবাহাদুর!" তারপর দরবারী কায়দায় তালিম দেবার জন্য একটি ফারসী বয়েৎ আওড়ালেন :—

"অগর্ শা রোজ রা গোয়েদ শাব অস্ত্ ইন্
বেবায়দ্ গুফ্ত্ মা ওআ পরবীন"

শাহ্ যদি দিনকে রাত বলেন তাহলে উত্তর দিতে হবে—তাই তো, ঐ যে চাঁদ তারা দেখা যায়!

তখনও দরবারীদের হাসি বন্ধ হয় নি, তা ছাড়া তকী খাঁকে কে কত উচ্চকণ্ঠে 'কেরামৎ' জানাতে পারে সে প্রতিযোগেরও শেষ হয়নি!

এই গ্লানিকর পরিবেশের মধ্যে লালবাগ কেল্লার প্রস্তর গৃহতল সেদিন লক্ষ্মীপরমগুরুর খড়মের শব্দে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। একজন খোজা কুর্নিশ ক'রে নিবেদন জানাল কোনও এক কাফের দরবেশ শাহেনশার মেহেরবানিকে তসলীম জানাতে এসেছে।

দরবারীরা শুধালেন, "কাফের দরবেশের পরিচয়?"

খোজা বললে, "কাফের দরবেশ বলছে সে খোর্দার রাজার মামু।"

তকী খাঁর অনুমতি পেয়ে লক্ষ্মীপরমগুরু দৃপ্ত ভঙ্গীতে দেওয়ান ই-খাসে প্রবেশ করলেন।

লক্ষ্মী পরমগুরু কিন্তু তকী খাঁকে কুর্নিশ করলেন না। তাঁর শালপ্রাংশু ঋজু দেহ আনমিত হল না বা মস্তক অবনত হল না। এমন বেআদবির আস্পর্ধা কারও হতে পারে তা তকী খাঁর দরবারে কেউ কল্পনাও করে নি। কিন্তু গজপতি পুরুষোত্তমদেবের কাঞ্চীবিজয়

হতে ফেরবার সময়ে যিনি তন্ত্রবলে গোদাবরী নদীতে অকাল বন্যা বহিয়ে কাঞ্চীর সৈন্যবাহিনীকে গোদাবরী অতিক্রম করতে না দিয়ে গোদাবরীবর্ধন মহাপাত্র উপাধি পেয়েছিলেন তিনি তো মহাভৈরব জগন্নাথ ছাড়া আর কারও কাছে মাথা নোয়াতে পারেন না।

এই বেআদবির জন্য কাফের দরবেশের প্রতি কি দণ্ডাদেশ হয় দেখবার জন্য সবাই কৌতূহলী হয়ে উঠল। কিন্তু লক্ষ্মী পরমগুরুর উন্নত ললাটে স্পর্ধিত সিন্দুরতিলক, শ্মশ্রুল মুখে অগ্নিদীপ্ত চক্ষু, প্রশস্ত বক্ষে আলম্বিত রুদ্রাক্ষমালা ও দক্ষিণ হস্তে ধৃত দীর্ঘ ত্রিশূল তকী খাঁকে যেন সম্মোহিত করেছিল।

তকী খাঁ নম্র কণ্ঠে বলেছিল, "তশরীফ রখিয়ে।"

লক্ষ্মী পরমগুরু উত্তর করেছিলেন, "ম্লেচ্ছের সিংহাসনতলে সাধকের আসনগ্রহণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।"

তকী খাঁ তারপর জিজ্ঞাসা করেছিল তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য, বলেছিল তিনি যা চাইবেন তা মঞ্জুর হবে।

লক্ষ্মী পরমগুরু তকী খাঁর অর্ধনিমীলিত দুই চোখের উপর তাঁর সম্মোহন দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কঠোর স্বরে বলেছিলেন, "খোদার সিংহাসন শূন্য। আমি এসেছি রামচন্দ্রদেবকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।"

তকী খাঁ সম্মোহিতের মত উত্তর দিয়েছিল : "মঞ্জুর।"

তারপর গৃহহারা অবোধ বালকের হাত ধ'রে অচেনা পথ থেকে ফিরিয়ে আনার মত লক্ষ্মী পরম গুরু সেদিন রামচন্দ্রদেবকে তকী খাঁর ব্যূহের ভিতর থেকে মুক্ত ক'রে এনেছিলেন। তকী খাঁ নির্বাক হয়ে ছিল। দরবারীরা বিস্ময়ে পরস্পরের মুখাবলোকন করছিল।

এখন সেই লক্ষ্মী পরমগুরু খোর্ধায় রামচন্দ্রদেবের একমাত্র শুভার্থী হিতৈষী ও মন্ত্রণাদাতা।

লক্ষ্মী পরমগুরু ভিতরে আসামাত্র রামচন্দ্রদেব আসন ছেড়ে উঠে পরমগুরুর পদস্পর্শ ক'রে প্রণাম করলেন। পরমগুরু অভয়-মুদ্রায় হস্ত উত্তোলিত ক'রে আশীর্বাদ করলেন।

রামচন্দ্রদেব এর পরে বললেন, "আপনি শুনেছেন, রত্নবেদীতলে ব'সে জগন্নাথকে আমি আর দর্শন করতে পারব না। এই মুক্তিমণ্ডপ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন?"

লক্ষ্মী পরমগুরু মৃদু হেসে বললেন, "সে কথা আমি শুনেছি, তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও করেছি। কিন্তু জগন্নাথ তোমাকে বঞ্চিত করবেন কি, যাকে আশ্রয় না করলে এ মহাভৈরব জাগে না, তাকে যে ধরবে সে জিতবে।"

রামচন্দ্রদেব আনন্দে গদগদ হয়ে বললেন, "আমি কি তবে জিতব?"

পরমগুরুর ওষ্ঠে রহস্যবিজড়িত হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠল। উত্তর দিলেন— "ভাববার আর কি বাকি আছে?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

1

[illegible] ব্রহ্মপুরের [illegible] মন্দির '[illegible]' এর [illegible] পশ্চিম দিক পুরোপুরি ভাঙা হয়ে গেছে।

ভাঙা পাথর এখানে সেখানে ছড়িয়ে [illegible] এক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের ভ্রম সৃষ্টি করছিল। [illegible] প্রাচীর ভাঙার পর এখন আক্রমণ হয়েছিল মন্দিরের গর্ভগৃহের উপর।

গাজী সুলতান বেগ [illegible] টি [illegible] খাওয়া [illegible] ঘোড়ার পিঠে বসে এই ধ্বংসকার্য পরিচালনা করছিল। প্রায় শ'খানেক লোক মন্দিরের গায়ে শাবলের [illegible] মারতে মারতে লায়েজান হয়ে গিয়েছিল। মন্দিরটা এক শক্ত জাঙাল। গাজী মিঞা এবং পিপিলীর ফৌজদারের কাছ থেকে একটা কামান কোনো মতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসত। তবে কিনা সে ভেবেছিল একসঙ্গে একশ'টা হাতের শাবলের ঘা সামলাতে পারে এমন মন্দির কোথাও নেই। ক্লান্তিতে পাথরভাঙা কাজে ঢিলে পড়লে গাজী পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠছিল "আল্লা হো আক্‌বর!"

শাবলের শব্দ তাইতে আবার বেড়ে উঠছিল, সিংহল-ব্রহ্মপুরের বাশবন ঘেরা শান্ত পরিবেশ আর্তনাদ ক'রে উঠছিল। মন্দির থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে শত শত নিরীহ দর্শক অসহায়ভাবে ভীত

দৃষ্টিতে চেয়ে মন্দির ভাঙা দেখছিল এবং মন্দিরের কোনও বহু পরিচিত অংশ ভাঙা হলে পরস্পরকে ডেকে দেখাচ্ছিল। মন্দিরের দেহে শাবলের প্রত্যেকটি আঘাত যেন তাদের হৃৎপিণ্ডের কোমলতম অংশে হাতুড়ির মত পড়ছিল। যন্ত্রণায় তাদের মুখ বিকৃত হচ্ছিল, চোখ বাষ্পাকুল হচ্ছিল; কিন্তু কেউ এতে বাধা দেবার সাহস খুঁজে পাচ্ছিল না। অথচ যত লোক সেখানে জড় হয়েছিল তারা শুধু আঙুলটিও তুললে গাজীমিঞা ও তার লোকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে কোথায় পালাত, কেবল এক অহেতুক ভয় তাদের পঙ্গু করে রেখেছিল।

দলতলা পাহাড়ের নীচে সিংহল-ব্রহ্মপুর সে সময়ে গড় নায়কের চউপাঢ়ী[1] ও দধিবামনদেবের মন্দিরের জন্য খোর্ধা রাজ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। ভোই বংশের প্রথম মহারাজা দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন বলে কথিত রামচন্দ্রদেব (প্রথম)-এর সময়ে এখানে এই মন্দির ও চউপাঢ়ী স্থাপিত হয়েছিল। এর নেপথ্যে ওড়িশার ইতিহাসের এক বিড়ম্বিত অধ্যায় এক ক্ষীণ স্মৃতিরূপে প্রচ্ছন্ন। প্রতাপশালী মহারাজা অথবা পরাক্রান্ত সেনাপতি না হয়েও বিশর মাহান্তির মত একজন সামান্য চাষী ও গৃহস্থ কালাপাহাড়ের কবল থেকে জগন্নাথকে উদ্ধার করতে যে দুঃসাহস দেখিয়েছিল ও ক্লেশবরণ করেছিল তা এই দধিবামন মন্দিরের শেওলাবসা প্রাচীরের গায়ে অদৃশ্য শিলালেখের মত উৎকীর্ণ ছিল। বিশর মাহান্তি গৌড় দেশ থেকে শ্রীজগন্নাথের ব্রহ্ম উদ্ধার ক'রে ফেরবার পরে নবকলেবরের সময়ে বহু অন্বেষণের পর এইখানে শাস্ত্রোক্ত সমস্ত লক্ষণ-সম্পন্ন দারু পাওয়া গিয়েছিল। তারই স্মৃতি-রক্ষার্থ এইখানে নির্মিত হয়েছিল এই দধিবামন মন্দির। এখন

1. চউপাঢ়ী— ব্যায়াম আখড়া, যেখানে কুস্তি, তলোয়ার খেলা তীরন্দাজি ও 'নলি' (বন্দুক) চালানো— এই চার বিদ্যার চর্চা হ'ত।

গাজীমিঞার ধর্মীয় বাতুলতা-বশতঃ সেই মন্দির ভেঙে ধূলিসাৎ করবার জন্য চলছিল তার উপর শত শাবলের আঘাত।

গাজী সুলতান বেগ্ কাছের কোথায় এক গ্রামে এক নূতন মসজিদ্ তৈরি করছে। এই মন্দিরের পাথরে সেই মসজিদের ভিত গাঁথা হবে, দেওয়াল উঠবে, চত্বর তৈরি হবে। গাজী সুলতান বেগ্ অতি পরাক্রান্ত। আবার মন্ত্রবলে চোরাই মাল বরামৎ করা, চোরেরও সন্ধান করা, দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করা প্রভৃতি নানা অলৌকিক সিদ্ধির অধিকারী বলেও তার ভারী কেরামৎ ছিল। তার উপর নায়েব-নাজিম মোহম্মদ তকী খাঁর আদেশে ও আল্লাতালার নির্দেশে সে এ অঞ্চলে এসেছিল মসজিদ তোলাতে। আবার, খোদার বান্দা হাফিজ্ কাদের বেগও তো বিধর্মী, যবন। কাজেই গাজীর বিরুদ্ধে হাত তুলবে কে? অসহায় দশরথ দত্ত ভাল করে দীর্ঘ নিশ্বাসও ফেলতে পারছিল না।

তেলেঙ্গা মুকুন্দ হরিচন্দনের রাজত্বের দশ 'অঙ্ক', 1488 শকাব্দের কথা—

কালাপাহাড়ের ভয়াবহ স্মৃতি ও সেই প্রসঙ্গে বিশর মাহান্তির অকুতোভয়তার কাহিনী এসব অবশ্য উপকথায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু সেদিন কালাপাহাড়ের আক্রমণ ওড়িশার দিকে দিকে প্রলয়ের আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। আর সেদিন ওড়িশার অভিশপ্ত ইতিহাসে ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য নীচ বিশ্বাসঘাতকতা তথা দেশদ্রোহের ছুরিকাও আর একবার উত্তোলিত হয়েছিল। সেদিন রাজু খাঁ কালাপাহাড়ের কেরামতিতে নয়, সারঙ্গগড়ের দুর্গপতি রামচন্দ্রভঞ্জের নীচ আততায়িতায়

গজপতি-সোহাগিনী ওড়িশার ইতিহাসে নেমেছিল দুর্ভাগ্যের যবনিকা। তাও যদি যুদ্ধক্ষেত্রে কালাপাহাড়ের খড়গাঘাতেই শেষ গজপতি মুকুন্দদেবের প্রাণ যেত। কিন্তু না, ইতিহাসের বিড়ম্বনায় আততায়ী রামচন্দ্রভঞ্জের পিছন থেকে বসানো ছুরিতে মুকুন্দদেব শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কটক অধিকারের পরে কালাপাহাড় পুরী শ্রীক্ষেত্রকে তার পীঠস্থান-স্বরূপ ক'রে ব'সে রইল। শ্রীমন্দিরের উপর আক্রমণ ও জগন্নাথের লাঞ্ছনা সুনিশ্চিত জেনে পরিছা দিব্যসিংহ পট্টনায়ক দেববিগ্রহদের নিয়ে কাঞ্চি নদীপথে চিলিকার মোহানায় ছপালি-হাতীপড়ায় নিয়ে গিয়ে সেখানে পাতালী[1] ক'রে রাখলেন কিন্তু দান-অ পাত্রান্ত্র সিংহের কাছ থেকে তার সন্ধান পেয়ে কালাপাহাড় সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। তারপর বিগ্রহদের তুলে হাতীর পিঠে ফেলে বয়ে নিয়ে গেল গৌড়ে। হিন্দুগণের মউড়মণিকে কাষ্ঠখণ্ডের মত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম ক'রে দেবে বলে।

সে সময়ে ওড়িশায় স্বাধীন রাজশক্তি ছিল না, জনশক্তি ছিল অথর্ব। কালাপাহাড়ের প্রতিরোধ কিংবা জগন্নাথের উদ্ধার করার মত অভয় পুরুষ ছিল না দেশে। ওড়িশার ঘরে ঘরে সেদিন কেবল নিষ্ফল হায় হায়! রাজু খাঁ কালাপাহাড় জগন্নাথকে চামড়ার দড়িতে বেধে বড়দাণ্ড দিয়ে বয়ে নিয়ে গেল।

অখ্যাত অজ্ঞাত দিশর মাহান্তি কিন্তু সেদিন গৌড়ের রাজপথে পাঠান ফৌজের পিছন পিছন ছুটেছিল ক্ষুধাত ভিক্ষুকের মত জগন্নাথের চ'লে যাওয়া পথ ধরে। পরনে তার গেরুয়া আলখাল্লা, গলায় মৃদঙ্গ

1. পাতালী করা— স্বস্থান ছেড়ে অন্যত্র লুকানো

ঝুলছে, মাথায় নামাবলী জড়ানো। মরকুটে হাড়গিলে চেহারার মানুষ, 'জণাণ'[1] গাইতে গাইতে সে চলেছে :—

"চাহাঁ শূন্যদেহী হেলে শূন্য রে
শূন্য দেউলেপহড় পড়িছি
শূন্যরে লাগিছি লীলা রে।
মন চাহাঁ রে॥"

[দেখ সে শূন্যদেহী হল শূন্য রে
শূন্য দেউলে পড়েছে দুয়ার
শূন্যে লেগেছে লীলা রে।
মন চেয়ে দেখ্ রে॥]

বিশর মাহান্তির দিকে পাঠান লশকরদের নজর ছিল না। গৌড়ের কে বা এক আউল-বাউল বৈষ্ণব-বৈরাগী ঘরমুখো ফিরছে ভেবে তার সম্বন্ধে তারা কৌতূহল বোধ করে নি।

সাধারণ লোক যারা চিনত তাকে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, বিশর মাহান্তিটা কি হঠাৎ ক্ষেপে গেল ?

মাঝে মাঝে গান থামিয়ে বিশর মাহান্তি সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে পাগলের মত বকছিল—"এও সেই ইচ্ছাময় শূন্যপুরুষের ইচ্ছা হে! নিজের ইচ্ছেতেই নিজে চামড়ার দড়িতে বাঁধা হয়ে গৌড়ের বড় রাস্তায় টানা হয়ে চলেছেন। আবার যেদিন ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হবে ফিরবেন!"

1. জণাণ (উচ্চারণ অকারান্ত)—শ্রীজগন্নাথের উদ্দেশে রচিত ভক্তি-গীতি যাতে ভক্ত হৃদয়ের দুঃখ অনুযোগ ও অভিমান জানানো হয়, সেই সূত্রে তাঁর লীলাও বর্ণনা করা হয়।

তারপর মৃদঙ্গ বাজিয়ে গেয়ে উঠছিল—

"শূন্যময় পুরে চহল[1] উঠুছি
অনাহত ধ্বনি নাদরে
মন শুন রে।"

[শূন্যময় পুরে উঠছে যে সাড়া
অনাহত ধ্বনি নাদে
মন শোন্ রে।]

বিশর মাহান্তির মৃদঙ্গ বাজানো আর গান করার অদ্ভুত ভঙ্গীতে সেই চরম দুঃখের সময়েও লোকে হাসি চাপতে না পেরে বলাবলি করছিল : "নাঃ, বিশর মাহান্তিটা বদ্ধ পাগলই হয়ে গেল।"

তারপরেই তাদের দৃষ্টি আবার ফিরে যাচ্ছিল জগন্নাথের দিকে, হাতীর পিঠে চামড়ার দড়িতে বাঁধা অবস্থায় তাঁকে গৌড়ের পথে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ওড়িশার ইষ্টদেব জগন্নাথের চরম লাঞ্ছনা চক্ষে দেখে লোকে যাতে আফগান শক্তির কেরামতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে সেইজন্য অতিশয় অশোভনভাবে বিগ্রহদের হাতীর পিঠ থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

রাস্তার ধারে ধারে নিরাপদ দূরত্বে থেকে আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে সেই মর্মান্তিক দৃশ্য চেয়ে দেখছিল। তাদের প্রতিবাদের ভাষা ছিল না, প্রতিরোধের শক্তি ছিল না, চোখে জল পর্যন্ত ছিল না। থেকে থেকে উঠে আসছিল কেবল শুষ্ক দীর্ঘশ্বাস— একটা মুমূর্ষু জাতির নাভিশ্বাসের মত। তাদের হৃৎপিণ্ডের কোমল তন্ত্রীগুলি যেন কেউ লৌহমুষ্টিতে ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলছিল। সড়কের মোড়ে হাতী বাঁক

1. চহল (উচ্চারণ অকারান্ত)—ছলকানি, আলোড়ন, সাড়া।

ঘুরে অদৃশ্য হবার সময়ে তারা পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে গলা উঁচু ক'রে চাইছিল কালা শ্রীমুখের একবার শেষ দর্শন পাবার জন্য।

বিশর মাহান্তি কিন্তু সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে ব'কে যাচ্ছিল—"মথুরার পথে কৃষ্ণকে কি একদিন অক্রূর এমনি টেনে নিয়ে যায় নি হে? রামচন্দ্র কি বনবাসে যান নি?"

সকলের মনে এক দণ্ডের জন্য সাহস ফিরে এসে আবার জলভার-হীন লঘু মেঘখানির মত মিলিয়ে যাচ্ছিল।

গৌড়ে পৌঁছে দারুবিগ্রহ পোড়াবার জন্য কালাপাহাড় গঙ্গার তীরে মহা ঘটা ক'রে আগুন জ্বালালে। কিন্তু এ কি অদ্ভুত দারু অগ্নিতে যা দগ্ধ হয় না! সপ্ততাল প্রমাণ উঁচু আগুনের শিখা উঠল, তথাপি বিগ্রহে আগুন ধরল না। কালাপাহাড় ঘোর বিরক্তিতে অগত্যা সেই অর্ধদগ্ধ বিগ্রহ গঙ্গায় ফেলে দিল আবর্জনার মত।

বিশর মাহান্তি বুঝি এই সুযোগের অপেক্ষায় ব'সে ছিল। গঙ্গাবক্ষ থেকে জগন্নাথের অর্ধদগ্ধ দারুর ভিতর থেকে ব্রহ্মপিণ্ডটি বার ক'রে নিয়ে এসে তার মৃদঙ্গের খোলের মধ্যে পুরে লুকিয়ে রেখে দিল।

তার পর স্থলপথে ফিরে আসতে সে সাহস করল না। সমুদ্রপথে ওড়িশায় ফিরছিল এক সওদাগরী নৌকা, দুস্তর যুগের দুর্লভ সম্পদ সেই দারুব্রহ্ম মৃদঙ্গের খোলের মধ্যে নিয়ে সে সেই নৌকায় উঠে বসল। বহুদিন পরে সে এসে পৌঁছল কুজঙ্গের সমুদ্র-উপকূলে। তার পর সেখান থেকে আবার স্থলপথে নিশাচরের মত রাত্রির অন্ধকারে অতি সঙ্গোপনে সে চলল খোর্ধার দিকে। দীর্ঘকালের অরাজকতার পরে তখন পাত্রগণ ভোই বংশের রামচন্দ্রদেবকে (প্রথম) ওড়িশার নায়ক নির্বাচিত ক'রে বসিয়েছেন খোর্ধার সিংহাসনে। মানসিংহের অভয়দানে ওড়িশায় আবার শান্তি ফিরে এসেছে।

কিন্তু রামচন্দ্রদেব তো শুধু রাজসেবক, ওড়িশার প্রকৃত রাজা যে জগন্নাথ তিনি কোথায় ? তাঁর সিংহাসন তো শূন্য। ভগ্ন, পরিত্যক্ত দেবালয়ে প্রতিধ্বনি ওঠার মত ওড়িশার মর্মভূমিতে কেবল বিলাপ উঠছে— জগন্নাথ ! জগন্নাথ !

এমনি সময়ে বিশর মাহান্তি জগন্নাথের মহাব্রহ্ম নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে এসে পৌঁছাল খোর্ধাগড়ে। জগন্নাথ নিজের ইচ্ছায় আবার ফিরে এসেছেন। ঘরে ঘরে মহোৎসব। কিন্তু এত বড় ঐতিহাসিক কীর্তিতে বিশর মাহান্তির কোনো গর্ব নেই, অহংকার নেই। ইচ্ছাময় নিজের ইচ্ছায় চামড়ার দড়িতে বাঁধা হয়ে গিয়েছিলেন, আবার নিজের ইচ্ছেতেই সাধবের[1] নৌকার খোলের ভিতরে ঢুকে তার পর পথে কত চাষী গৃহস্থের ঘরের চালের মাচায় আত্মরক্ষা করতে করতে ফিরে এলেন, বিশর মাহান্তি তো তুচ্ছ নিমিত্ত মাত্র। সে যদি এর জন্য পুরস্কারের আশা করে তবে মৃদঙ্গের খোল, নৌকার খোল, ঘরের চালের মাচাই বা কেন পুরস্কারের আশা করবে না ? নবকলেবর ক'রে শূন্য রত্নসিংহাসনের উপর আবার দেববিগ্রহের প্রতিষ্ঠার জন্য ওড়িশার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আলোড়ন উঠল। কিন্তু বহু জায়গায় বহু অনুসন্ধানেও বিগ্রহ নির্মাণের জন্য শাস্ত্রোক্ত লক্ষণসম্পন্ন দারু পাওয়া গেল না। অবশেষে এখন যেখানে দধিবামন মন্দির সেইখানে জগন্নাথের ঈষৎ কৃষ্ণাভ দারুর সন্ধান মিলল। সেখানে জনশূন্য প্রান্তরে ছিল এক পঞ্চশাখ মহানিম বৃক্ষ। তার দেহে পাওয়া গেল শাস্ত্রোক্ত শঙ্খচক্রের চিহ্ন। গাছের নীচে এক পুরানো উইঢিপি, কালক্রমে বেড়ে উঁচু হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন সকালে এক গোখরো

1. সাধব (উচ্চারণ অকারান্ত)— সাগরপারে বাণিজ্যযাত্রাকারী ওড়িশার সওদাগর।

সাপ সেই বিরাট বল্মীকস্তূপ থেকে বেরিয়ে ফণা তুলে খেলা করত। দারুব্রহ্মের জন্য দারুপ্রাপ্তির স্মারকস্বরূপ রামচন্দ্রদেবের আদেশে সেখানে স্থাপিত হয়েছিল ব্রহ্মপুর গ্রাম ও দধিবামন মন্দির। রামচন্দ্রদেব বিশর মাহান্তিকে গড়নায়ক উপাধি দিয়ে মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও চউপাঢ়ীর জন্য তিনশ' ষাট বাটী[1] নিষ্কর জমি দিয়েছিলেন। সিংহল-ব্রহ্মপুরের চউপাঢ়ী ও দধিবামন মন্দিরের এই ইতিবৃত্ত এখন চউপাঢ়ীর প্রাচীন পুথিপত্র 'ভউরিআ খেদা'য় লেখা আছে।

সেই সময় থেকে সিংহল-ব্রহ্মপুরের চউপাঢ়ীর উপর দিয়ে পাঁচ পুরুষ গত হয়েছে। বিশব মাহান্তি থেকে কুঞ্জ গড়নায়ক পাঁচ পুরুষের ব্যবধান। চউপাঢ়ীর সুদিনও আর নেই। মোগল নায়েব-নাজিমদের সময় থেকে খণ্ডায়ত[2] চউপাঢ়ীগুলিকে তছনছ ক'রে ওড়িয়া পাইকদের শিরদাঁড়া ভেঙে দেওয়ার জন্য বিশেষ উদ্‌যোগ হয়েছিল। সেইজন্য চউপাঢ়ী থাকা গ্রামগুলিকে ঘিরে আসে পাশে ধীরে ধীরে মুসলমান বসতি গ'ড়ে উঠেছিল। লশকরবৃত্তিধারী আফগানী পাঠানদের জমি-জায়গা দিয়ে তাদের শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রায় নিয়োজিত করাও তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সেইজন্য চউপাঢ়ীর নিষ্কর ভূমি কেড়ে নিয়ে সে সব এই নতুন আসা মুসলমান বাসিন্দাদের দেওয়া হচ্ছিল। এমনি ক'রে সবধাপুর, মুকুন্দপ্রসাদ, দিব্যসিংহপুর, কাইপদর, রথীপুর ও বলরামগড় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চউপাঢ়ীগুলিকে ঘিরে মুসলমান

1. বাটী— জমির সর্বাপেক্ষা বড মাপ, প্রায় কুড়ি একর।

2. খণ্ডাযত— ওডিশাব হিন্দু জাতিবিশেষ, শান্তির সময়ে কৃষিকর্ম ও যুদ্ধের সময়ে রাজ সেনাদলে যোগ দিযে যুদ্ধ করা এদের জাতিধর্ম, সেইজন্য প্রতি খণ্ডাযত গৃহে খণ্ডা অর্থাৎ খাঁড়ার পূজা হত।

বসতি ক্রমে ক্রমে গ'ড়ে উঠেছিল। সিংহল-ব্রহ্মপুর গ্রামেও এমনি মুসলমান বসতি এই সূত্রে স্থাপিত হয়েছিল। চউপাঢ়ীর বহু বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি এর ফলে গড়নায়কের দখল থেকে চ'লে গিয়েছিল। কুঞ্জ গড়নায়কের সময়ে চউপাটীর 360 বাটী ভূসম্পত্তির আর মাত্র প্রায় পঞ্চাশ বাটী ভূমি অবশিষ্ট ছিল। মন্দিরের দ্বাদশ যাত্রা ও উৎসব তাতে চালানো কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। তবু কুঞ্জ গডনায়ক নিজে অভুক্ত থেকেও সেই আয়েই মন্দিরের বিধিরক্ষা যেন তেন প্রকারেণ বজায় রেখেছিলেন।

দধিবামন মন্দিরটি পীঢ[1] রীতিতে গড়া। এতে সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখা যায় না। বস্তুতঃ সূর্যবংশের সময় থেকে ওড়িশায় মন্দির নির্মাণের আর বিশেষ উৎসাহ ছিল না। কোণার্ক মন্দির তৈরি ক'রে ওড়িয়া রাজা ও স্থপতিকুলের মন্দির-নির্মাণ-তৃষ্ণা যেন চিরকালের মত প্রশমিত হয়ে গিয়েছিল। সূর্য বংশের পরে নূতন মন্দির তৈরি অপেক্ষা পুরাতন মন্দিরগুলিকে বিধর্মীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করাই প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবার সিংহল-ব্রহ্মপুরের দধিবামন মন্দিরের মত যে-সব মন্দির সামন্ত রাজা বা রাজপুরুষরা তৈরি করিয়েছিলেন তাতে কলামন্ত ভাস্কর্যের চাইতে ব্যবহারিক স্থূলত্বই অধিক প্রতিফলিত হয়েছিল। দধিবামন মন্দিরটিও তেমনি মোটা অমসৃণ পাথরের তৈরি। এর গায়ে কোনো প্রকার কারুকার্য ছিল না। মন্দিরের 'বাড়'-তে[2]

1. পীঢ (উচ্চারণ অকারান্ত)— মন্দিরের এক একটি পিঁড়ির মত অংশ দেখলে মনে হয় যেন একটির উপর একটি ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে যাওয়া পিঁড়ি বসিয়ে মন্দিরটি তৈরি।

2. বাড (উচ্চারণ অকারান্ত)— মন্দিরগাত্র যতদূর পর্যন্ত খাড়া হয়ে উপরে ওঠে ততদূর পর্যন্ত অংশকে বাড় বলে।

কোথাও কোথাও ফুল লতাপাতা খোদাই করার অসফল প্রয়াস হয়েছিল, কালক্রমে তাও শেওলায় অদৃশ্য হয়েছে। 'পীঢ়'গুলিতে কেবল সিংহ হাতী ঘোড়া বানর ষাঁড় মকর আর সেগুলির মাঝে মাঝে অলসকন্যার মূর্তি খোদাই হয়েছিল। মন্দিরের চূড়ার বিভিন্ন অংশগুলি পরম্পরাগত-ভাবেই তৈরি হয়েছিল, তবে মোটের উপর স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের দিক দিয়ে মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। গায়ে লাগাও একটি জগমোহন বা নাট মন্দির আছে। মূল মন্দির নির্মাণের বহুকাল পরে কুঞ্জ গড়নায়কের প্রপিতামহ নাকি একটি নাটমন্দির তৈরির জন্য মূল পত্তন পর্যন্ত তোলেন, কিন্তু তারপর কাজটি অসমাপ্ত থেকে গেছে। মন্দিরের গায়ে কতকগুলি কুলুঙ্গির মধ্যে মুগুনি পাথরের তৈরি অষ্টভুজা দুর্গা, গণেশ, কার্তিক, কঙ্কালী, বরাহ প্রভৃতি মূর্তি আছে; দধিবামনের পার্শ্ব দেবদেবী তাঁরা। কিন্তু অনভ্যস্ত চোখেও মনে হয় সেগুলি বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত, কারণ এই মূর্তিগুলির সূক্ষ্ম ও চারু গঠনরীতি এ মন্দিরের আর কোথাও দেখা যায় না। মন্দিরের অঙ্গন সুপ্রশস্ত। উত্তর পাশে সযত্নে লালিত একটি পুষ্পোদ্যান ছিল, এখনও আছে। স্থানীয় লোকে তাকে জগন্নাথবল্লভ বলে। এই উদ্যান থেকে নিত্য ফুল তুলে নিজ হাতে গেঁথে দধিবামনের পূজার সময়ে পাঠানো কুঞ্জ গড়নায়কের এক দৈনন্দিন কর্ম ছিল। দক্ষিণ দিকে একটি বড় ইঁদারা ও ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি। চউপাঢ়ীর ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে এই দেবায়তনটিও কুঞ্জ গড়নায়কেব সময়ে জীর্ণদশাগ্রস্ত হয়েছিল। কালের ঘাতপ্রতিঘাত সয়ে কুঞ্জ গড়নায়কের ঋজু শীর্ণ দেহও যেমন ধনুকের মত বেঁকে গিয়েছিল, ফাটলধরা মন্দিরটিও তেমনি গুল্মাকীর্ণ ও শৈবালাচ্ছন্ন হয়ে তার প্রাচীনত্বের পরিচয় দিচ্ছিল। তবু এ সব সত্ত্বেও দেবালয়টি দাঁড়িয়ে ছিল ভক্তি ও বিশ্বাসের মহামেরুর মত।

চউপাঢ়ীর অবস্থাও তদ্রূপ। হাতীর মত উঁচু মাটির প্রাচীর কোথাও কোথাও ধসে পড়েছিল। সাত-মহল ঘরের অর্ধেকেরও বেশী অযত্ন ও অবহেলায় ভাঙাচোরা অবস্থায় প'ড়ে ছিল। স্নানের পুষ্করিণী পানায় ভ'রে গিয়ে ডোবায় পরিণত হয়েছিল। রথ টানার জন্য দুটি দাঁতালো হাতী চউপাঢ়ীতে বাঁধা; কিন্তু দেবতা ও গড়নায়ক উভয়েরই অন্নকষ্ট, হাতী দুটিরও খাদ্যাভাবে কঙ্কালসার অবস্থা। তবু প্রতি বৎসর রথযাত্রায় গলায় ঘণ্টা বাঁধা পটি আর জরিদার সাজ প'রে তারা বার হয়; তবে বথদাণ্ডে রথ কোথাও আটকায় না, তাই হাতী দুটিকে কখনো রথ টানতে হয় না।

কুঞ্জ গড়নায়ক অপুত্রক। একমাত্র কন্যা দুর্গেশ্বরী ছাড়া গড়নায়কের আর কোনো সংসারবন্ধন ছিল না। যমুনা-ঝাড়পড়ায় বৈয়াশল্যের ঘরে কুঞ্জ গড়নায়ক মহা আড়ম্বরে দুর্গেশ্বরীর বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু বছর না ঘুরতেই দুর্গেশ্বরী হাতের চুড়ি-শাঁখা[1] ভেঙে পিত্রালয়ে ফিরে এল। একমাত্র কন্যার করুণ কান্না কানে শুনতে না পেরে কুঞ্জ গড়নায়ক দধিবামন মন্দিরে তিন দিন তিন রাত হত্যা দিয়ে থেকে ডেকে-ছিলেন— "শেষে বিশর মাহান্তির বংশলোপ করলে জগন্নাথ?" কোনো প্রার্থনা নেই, যাচ্ঞা নেই, কেবল এক অভিমানস্ফীত অভিযোগ: "শেষে বিশর মাহান্তির বংশে এক ফোটা জল দিতেও কাউকে রাখলে না? বিশর মাহান্তি না তোমার মান রক্ষা করেছিল?" তৃতীয় রাত্রির শেষে কুঞ্জ গড়নায়ক স্বপ্নাদেশ পেলেন। স্বয়ং দারুমূর্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে নাকি বলেছিলেন: "আমাতে যে ভর করে সে সপ্ততাল জলে ডোবে। তুই তো ডুবেছিস্, আর দুঃখ কিসের? এবার চউপাঢ়ীতে ফিরে যা।"

1. চুড়ি-শাঁখা— কাচের চুড়ি গালার শাঁখা ওড়িয়া নারীর আযতির চিহ্ন।

কুঞ্জ গড়নায়ক সব দুঃখ শোক ভুলে চউপাঢ়ীতে ফিরে এলেন। কিন্তু সেই অবধি তিনি হয়ে গেলেন বদ্ধকালা। কানের কাছে বাজ পড়লেও তা শোনা তাঁরা সম্ভব ছিল না। দুর্গেশ্বরীর বুকফাটা কান্নাও তাই আর তাঁকে শুনতে হ'ল না। বহুদিন আগেই গড়নায়কের পত্নী পরলোকগতা হয়েছিলেন। এখন দধিবামনের মালা গাঁথা আর উঠান ঝাঁট দেওয়া প্রভৃতি সেবাকর্ম ছাড়া কুঞ্জ গড়নায়কের অন্য কাজ বা ঝঞ্ঝাট কিছু রইল না। তার একদা শোকমলিন চক্ষু শিশুর চোখের মত উজ্জ্বল নির্মল হয়ে উঠল। সকালের নরম রোদের মত সদাই তাতে কালিমাহীন আনন্দের ছোঁয়া। মুখের কুঞ্চিত রেখাগুলিও ক্রমে কোমল হয়ে উঠল। কুঞ্জ গড়নায়ক শোকসন্তাপহীন হয়ে উঠলেন।

এখন দধিবামন মন্দিরের গায়ে হাতুড়ি আর শাবলের আঘাতে যখন সিংহল-ব্রহ্মপুরের শান্ত পরিবেশ মথিত হচ্ছিল, কুঞ্জ গড়নায়ক তা আদৌ শুনতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর চোখদুটি তেমনি হাস্যোজ্জ্বল, মুখে গ্লানির ক্ষীণতম স্পর্শও নেই। তাঁর প্রিয় মন্দিরটি যে তিলে তিলে শাবলের আঘাতে ভেঙে পড়ছিল তা তিনি জানতে পারছিলেন না। বধিরতার সপ্ততাল প্রশান্তির তলায় তিনি পরিপূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলেন। অন্যান্য দিনেব মতই চউপাঢ়ীর বাহির বারান্দায় ব'সে কুঞ্জ গড়নায়ক দধিবামনের জন্য 'দঅণা' ফুলের মালা গাঁথছিলেন।

2

পশ্চিম আকাশে অপরাহ্ণ সূর্য ঢ'লে পড়েছে। দেউলভাঙা লোকগুলি দেউলের গায়ে শাবল হেনে হেনে হয়রান হয়ে গিয়েছিল। মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যেখানে 'খপুরি'[1] থেকে একটা ফাটলের

1. খপুরি— মন্দিরের মাথার ঢাকনির মত দেখতে একটি অংশ।

দাগ এঁকে বেঁকে নীচ পর্যন্ত নেমে এসেছে সেখানে সারা দিন ধ'রে শাবলের ঘায়ের ফলে বাহিরের পরন্তের কয়েকটি পাথর ভেঙে নীচে পড়েছিল। শাবলের শব্দে মন্দিরের গায়ের পায়রা-বসা থেকে শত শত পায়রা পুষ্করিণীর উপরে আর কখনো বা দূরের ধানক্ষেতের উপর দিয়ে এক চক্কর উড়ে এসে আবার মন্দিরের চূড়ায় দলে দলে ফিরে আসছিল— বোধ হয় এই আশ্বাসে যে ভক্তি ও বিশ্বাসের এই অচলায়তন টুটবার নয়। পায়রাদের বক্‌-বকম কূজনে যেন দেউল-ভাঙা লোকদের তুচ্ছ আয়াস ও আস্ফালনের প্রতি এক উপহাস ফুটে উঠছিল। মন্দিরের অদূরে দুইটা বুড়ো কদম্ব গাছের মাঝখানে পানায় ঢাকা চন্দন পুকুর সারাদিন ধ'রে কেবল ঝিমোচ্ছিল। তার উপর দুটি মাছরাঙা পুকুরের কালো জল আর মুদে আসা শ্বেতপদ্মগুলিকে বুঝি জাগিয়ে দেবার জন্য এখন উড়ে বেড়াচ্ছিল। দেউলভাঙা লোকেরা মন্দিরের 'বাড়' আর ভাঙতে না পেরে পার্শ্বদেবতাদের উপর আক্রমণ শুরু করেছিল। অষ্টভুজা দুর্গার চারখানি হাত ভেঙে পড়ে গেল। গণেশের লম্বোদরটি স্থানে স্থানে খাবলানো হয়েছিল মাত্র। তবে তাঁর শুঁড়ের অর্ধেকটা ভেঙে প'ড়ে গিয়েছিল। বরাহের উত্তোলিত পাদ জানুসন্ধি থেকে ভেঙে নীচে পড়েছিল।

দিনের এই সময়টাতে 'সন্ধ্যানীতির'[1] জন্য দেবতার 'মইলম লাগি'[2] হওয়ার বিধি। মন্দিরভঙ্গকারীদের আক্রমণ সত্ত্বেও মন্দিরের সিংহদ্বার বন্ধ ক'রে দুপুরের 'পহড়' পড়া[3] পর্যন্ত দেবতার সকালের

1. নীতি— মন্দিরের নিত্য কর্তব্যকর্ম।

2. মইলম লাগি— ঠাকুরকে বেশভূষা পরিধান করানো।

3. 'পহড়' (উচ্চারণ অকারান্ত) পড়া— মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বার বন্ধ হওয়া।

'নীতি' নমো নমো ক'রে কোনও মতে সারা হয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যার সেবক পূজকেরা 'পহড়' ভাঙতে[1] ভরসা ক'রে আর কেউ এলেন না। দর্শকদের সঙ্গে তাঁরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে মন্দির ভাঙার নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখছিলেন।

গাজী সুলতান বেগ তার টাটু ঘোড়ার পিঠ হ'তে থেকে থেকে চীৎকার ছাড়ছিল— "জোরসে মারো, আওর জোরসে···আল্লা হো আকবর!" ঘোড়ার পিঠে চৌকস হয়ে বসা তার মূর্তির দিকে সবাই ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। পরনে পা পর্যন্ত ঝোলা একটা কালো আলখাল্লায় গাজী মিঞাকে দেখাচ্ছিল যেন সাক্ষাৎ যম। মাথার লম্বা লম্বা বাবরি চুল কাঁধের উপর সাপের মত এসে পড়েছে। গলায় লাল-নীল পাথরের কয় সারি মালা পড়ন্ত রোদে ঝলসে উঠছে। কোমর থেকে ঝুলছে একখানা তলোয়ার।

গাজী মিঞার চীৎকারে দেউলভাঙাদের শাবলের স্তব্ধপ্রায় শব্দ আবার প্রবল হয়ে উঠছিল। সারাদিন শাবলপ্রহারের পরেও মন্দির প্রায় অক্ষত দেখে গাজী মিঞার মাথায় রক্ত চ'ড়ে গিয়েছিল। হুকুম দিল, মন্দিরের একেবারে চূড়ায় উঠে সেইখান থেকে ভাঙতে শুরু করো। গাজীর তাড়নায় শেষে শাহাবাজপুর গ্রামের ফকীরা মিঞা মন্দিরের গায়ের ফাঁকে ফাঁকে পা রেখে রেখে মন্দির বেয়ে উঠতে শুরু করল। তার দেখাদেখি আরও কয়জন ওঠবার জন্য লম্ফঝম্প করতে লাগল, কিন্তু মন্দিরের গায়ের শেওলাতে তাদের পা কেবলি পিছলে যেতে লাগল।

ইতিমধ্যে ফকীরা মিঞা 'পীঢ়'গুলির উপর পা দিয়ে দিয়ে চূড়ার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে। ঘোড়ার উপর থেকে গাজী মিঞা

1. 'পহড়' ভাঙা— গর্ভগৃহের দ্বার খোলা।

চীৎকার ক'রে তাকে উৎসাহ দিচ্ছিল— "সাবাস্! সাবাস্!"

ফকীরা মিঞা নজর করছিল 'খপুরি'র উপরে মন্দিরের কলসটির দিকে।

মন্দিরের মাথার নীচে 'আঁলাবেকি,' মানুষের মাথার নীচে যেমন গলা। তার উপরে চারিদিকে গোল ক'রে খোদাই করা 'আঁলা', 'আঁলা'র উপরে ঢাকনির মত 'খপুরি,' তার উপরে কলস অসীম নিরাকারের উদ্দেশে বিশ্বাসঘন বিদগ্ধ প্রাণের আকৃতির মত এক সুকুমার উজ্জ্বলতায় ঊর্ধ্বে উঠেছে। কলসের উপরে নীলচক্র ও সুদর্শনলাঞ্ছিত নিশান ইতিহাসের শত দুর্গতি ও বিলয়ের মধ্যে যেন এক অপরাজেয় জাতির দৃপ্ত বিজয়কেতন। আর অল্পক্ষণের মধ্যে সেই কলস ও নীলচক্র ফকীরা মিঞার শাবলের আঘাতে ভেঙে নীচে এসে পড়বে— এই চিন্তা দর্শকদের প্রাণে শেলের মত বাজছিল।

প্রথমে কলসটিকে ভাঙতে পারলে সেইখান থেকে মন্দির ভাঙা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। দেউলভাঙা লোকেরা তাই দেউলের উপরে উঠছিল। শেওলা বসা 'পীঢ়' ও পায়রাবসাগুলিতে মানুষের পায়ের শব্দে ত্রস্ত পায়রার দল মন্দিরের উপরে চক্কর দিয়ে উড়ছিল, তারপর অপরাহ্নের ক্রমদীর্ঘায়মান ছায়ার অনিশ্চিততার মধ্যে কিছুক্ষণ ঘোরা-ফেরা ক'রে শেষে নিশ্চিত অবলম্বন ও আশ্রয়ের জন্য আবার মন্দিরের উপরেই ফিরে আসছিল।

ফকীরা মিঞা ততক্ষণে 'পীঢ়'র মাথাল থেকে ওঠা বিকশিত পুষ্পদলের আকারে তৈরী তিনকোণা 'কাস্তি'গুলির উপরে পায়ের বুড়ো আঙুল ভর করে একটা মদ্দা হনুমানের মত 'খপুরি'র উপর উঠছিল, আর একটু পরেই সেখানে পৌঁছে যাবে সন্দেহ নেই। তারপরে সত্যি-সত্যিই যদি সে কলসটা ভেঙে দেয় তা হলে তো চক্ষের নিমেষেই

মন্দির ধ'সে প'ড়ে যাবে তাতে আর ভুল কি!

ফকীরা মিঞার শেষ আক্রমণ সবাই দাঁড়িয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিল। গাজী মিঞা পর্যন্ত উদ্বেল উত্তেজনায় "আল্লা হো আক্‌বর্" ধ্বনি দিতে ভুলে গিয়েছিল। দর্শকদের চোখে ভীতি উদ্বেগ ও আতঙ্কের ছায়া ঘনীভূত হয়ে উঠছিল। কিন্তু একটি ক'ড়ে আঙুল তোলবারও সাহস কারও ছিল না। অতীতের বহু অত্যাচার ও পীড়নের মধ্যে তাদের সমস্ত মনোবল অগনতি দেবমূর্তি ও মন্দিরের মতই ভেঙে মাটিতে লোটাচ্ছিল।

অথচ ফকীরা মিঞা বা তার সঙ্গের লোকেরা যারা পিঁপড়ের মত মন্দিরটিকে ঢেকে ধরেছিল তারা যে কখনো ধর্মের নামে এমন পাষণ্ড হতে পারে এমন চিন্তা তাদের সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না। আজ এই যারা মন্দির ভাঙছে গত দুই তিন পুরুষের মধ্যে তারা হিন্দু অধিবাসীদের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল। কেবল পরিচ্ছদ ও আচরণেই তাদের আলাদা ব'লে বোঝা গেলেও অন্তরে কিন্তু তারা ধর্মান্তর মানুষে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। যে জগন্নাথের মন্দির ভাঙবার জন্য তারা এসে মন্দির ঘিরেছিল তাদের মধ্যে অনেকে নিজের অজ্ঞাতসারে তারি ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। সালবেগ মুসলমান হলেও ভক্ত হিসাবে হিন্দুদের শ্রদ্ধার্হ ছিলেন। ঘরে ঘরে মুখে মুখে তাঁর ভজনের পদ— "আহে নীল শৈল প্রবলমত্ত বারণ!" আর যবন হরিদাস তো সেকালে ছিলেন প্রত্যেক হিন্দুর প্রণম্য!

অচ্যুতানন্দ গোসাঞির "শূন্য সংহিতা"র পদ "তুর্কী ভজে অলেক্ষ্, হিন্দু ভজে অলেখ" পুথির বিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে তখন ক্রমে প্রত্যেক ওড়িয়ার চিত্তভূমিতে প্রসারিত হয়েছিল। মুসলমানের আল্লা যেমন নিরাকার জগন্নাথও তেমনি অলখ নিরঞ্জন, সব সেই

অলেখের অব্যক্ত লীলা। আল্লা জগন্নাথ অভিন্ন এমনি এক সমন্বয়-চিন্তা সঙ্কীর্ণ ধর্মান্ধতার ঊর্ধ্বে হিন্দু-মুসলমানকে এক ক'রে দিয়েছিল। ওড়িশা কখনও মতান্ধতা ধর্মান্ধতা বা অনুদারতার ভূমি ছিল না।

নায়েব-নাজিমের রাজধানী কটকে বা অন্যত্র ধর্মীয় নির্যাতন ও ধর্মের নামে জুলুমের নানা রোমহর্ষক কাহিনী শোনা যেত বটে, কিন্তু বাঁশবন কেয়াবন আর ধানের ক্ষেতে ঘেরা এমনি শান্ত পল্লীভূমিতে তার ক্ষীণতম প্রভাব অথবা প্রতিক্রিয়া ছিল না। বস্তুতঃ মুসলমানেরা হিন্দু অধিবাসীদের সঙ্গে কাকা চাচা ভাই মামু প্রভৃতি সম্বোধনের সম্পর্ক ক'রে ফেলেছিল। ওড়িশার কোমল মাটি তাদের রুক্ষ জীবনে যেন এনেছিল কোমলতার স্পর্শ, তাদের রুঠ পশ্চিমা বুলিতেও তেমনি লেগেছিল ওড়িয়া বাচনভঙ্গীর মরমী ছোঁয়া। উর্দু কথার শেষে ওড়িয়া লব্জ 'ম'-টি জুড়ে গিয়ে এক বিচিত্র বাচনভঙ্গী জন্মলাভ করেছিল। মুসলমান বসতিতে, পথে ঘাটে শুনতে পাওয়া যেত "আরে মিঞা, মেরে সাথ কাহে খিজবিজ লগাতা ম!" "হো কহ্নেই চাচা, তুম কাঁহা যাতা ম ?"

সব ঠিক ছিল। কিন্তু যেদিন থেকে গাজী মিঞা পয়গম্বরের দূত ব'লে মরকুটে টাটু ঘোড়ায় চ'ড়ে এ অঞ্চলে এসে প্রথমে এক মাদ্রাসা খুলে বসল এবং তার পরে এক মসজিদ স্থাপন তার ধর্মীয় অভীপ্সায় পরিণত হ'ল, আবার তার সঙ্গে মিলল নায়েব-নাজিম তকী খাঁর সমর্থন ও পিপিলী ফৌজদারের সাহায্য, সেই দিন থেকে সব যেন কেমন হঠাৎ উলট-পালট হয়ে গেল। দামে ভরা পুকুরে আর বাঁশবনের ছায়ার মত পাঠান বাসিন্দাদের মমতাভরা নিথর চোখ হঠাৎ কঠিন ও নির্মম হয়ে উঠল। এই ফকীরা মিঞা, যে কলসের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে,

সে প্রতি বৎসর চন্দনযাত্রায় ঠাকুরের ভউঁরি[1] খেলার সময় রোশনাইয়ে কি বাহাদুরিই না দেখায়! দধিবামনজীউর চন্দনযাত্রায় সে ছিল এক বিশেষ আকর্ষণ। এখন কিন্তু সেই ফকীরা মিঞার মাথায় যেন ভূত চেপেছিল। মন্দিরের চূড়া থেকে সে বিকৃত উর্দুতে ডাক হাঁক করছিল: "আবে, নীচে খাড়া হোকে কেয়া দেখতা ম[2]। শাবেলি একঠো লে আ ম।" তার চেঁচামেচিতে ফয়জা মিঞা একটা শাবল নিয়ে মন্দিরের 'বাড়-অ' বেয়ে ওঠবার চেষ্টা করছিল।

এমনি সময়ে কোথা দিযে কি হ'ল কেউ ঠিক বুঝতে পারল না: অকালবজ্রের মত কোথা থেকে এক তীর এসে ফকীরা মিঞার বুকের পাঁজরায় বিঁধে গেল। মুহূর্ত পূর্বে যে ফকীরা মিঞা মন্দিরের চূড়া থেকে শাবলের জন্য হাঁকাহাঁকি করছিল হঠাৎ কাটা গাছের মত সে হুড়মুড়িয়ে নীচে এসে পড়ল। ওদিকে গাজী মিঞাও আর এক তীরের ঘায়ে তার টাটু ঘোড়া থেকে প'ড়ে গিয়েছিল। চক্ষের নিমেষে কোথায় কি— সব উলট-পালট হয়ে গেল। বৃষ্টির ধারার মত তীর এসে পড়তে লাগল দেউলভাঙা লোকগুলির উপর। তার সঙ্গে ঝঞ্ঝা-নির্ঘোষের মত শোনা যাচ্ছিল— 'জয় জগন্নাথ!' দর্শকেরাও তাদের সমস্ত জড়তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ডাক দিয়ে উঠল— 'জয় জগন্নাথ!'

প্রাচীরের ভাঙা পাথরের গাদায় ও মন্দিরভঙ্গকারীদের ভূলুণ্ঠিত মৃতদেহে মন্দির প্রাঙ্গণ এক শ্মশানে পরিণত হল। কুঞ্জ গড়নায়ক চউপাঢ়ীর বারান্দায় তাঁর শব্দহীন নিস্তরঙ্গ নির্বাণ লোক ছেড়ে কখন এখানে এসেছিলেন কে জানে। মন্দিরের গরুড় স্তম্ভের কাছে দুই চক্ষু

1. ভউঁরি— চন্দনযাত্রার শেষ দিনে ঠাকুরকে নৌকায় নিয়ে মণ্ডলাকারে জলবিহার।

2. ওড়িয়া সম্বোধনসূচক কথার মাত্রা, বাংলায় যেমন 'গো'।

মুদ্রিত ক'রে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর রেখাঙ্কিত মুখের উপরে দুই চোখের অশ্রুর দুটি ধারা ঝ'রে পড়ছিল। দুর্গেশ্বরী বিধবা হয়ে চউপাটীতে ফিরে আসার পর থেকে গড়নায়কের চোখে পুনরায় এমন অশ্রুধারা কেউ দেখে নি।

উল্কার ঝাঁকের মত যে 'অসুআরে'র দল সহসা আবির্ভূত হয়ে মন্দিরভঙ্গকারীদের আক্রমণ থেকে মন্দির রক্ষা করল তারা আবার ঘোড়া ছুটিয়ে পশ্চিম দিগন্তে সূর্যাস্তের সঙ্গে দলতলা পাহাড়ের নীচে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

সেদিন রাত্রে ঘরে ঘরে সেই এক আলোচনা— বিশ্বর মাহান্তির মানরক্ষা করতে স্বয়ং জগন্নাথ শ্বেতবাহনে আর বলরাম কৃষ্ণ-বাহনে এসেছিলেন বুঝি। পুরীতে নরি পড়িআরীর বারান্দায় ভাঙ্গ ঘোঁটার সময় সেই প্রসঙ্গ হচ্ছিল। নরি পড়িআরী ভাঙ্গ ঘুঁটতে ঘুঁটতে বলছিলেন, তিনি নিজের চোখে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী স্বয়ং জগন্নাথকে দেখেছেন। চণ্ডু পট্টনায়ক গাঁজার ছিলিমটি আর-একজনের হাতে বাড়িয়ে দিতে দিতে শুধোলেন, "কয় ডেলা 'আপু'[1] তখন গালে পড়েছিল হে পড়িআরী?" নরি পড়িআরী এতে মহা খাপ্পা হয়ে ভাঙ্গ বাটার শিল ছেড়ে উঠে প'ড়ে চীৎকার করলেন— "শোন, শোন, এই 'গঞ্জড়' আবার আমায় বলে কিনা 'আপুড়ি'। হ্যাঁ রে বৈকুণ্ঠ, সত্যি ক'রে বল্ তো, তুই দেখিস্ নি কালা ঠাকুরকে শ্বেতবাহনের উপরে?" বৈকুণ্ঠ মেকাপ অনেকক্ষণ হ'ল তীর্থের কাকের মত ব'সে

1. আপু— আফিম।
2. গঞ্জড— গাঁজাখোর।
3. আপুড়ি— আফিমখোর।

আছে একটু 'পাচনপাণি'র[1] আশায়। অন্য কোথাও সে বস্তুর জোগাড় আজ আর হয় নি এই ম্লেচ্ছের গণ্ডগোলে, তাই শরীর যেন তার আর বইছে না। সে বললে, "আরে ম'ল, তা না তো আর কি!" কিন্তু অন্য কাউকে কাউকে বলতে শোনা গেল যে খোর্ধার রাজা রামচন্দ্রদেব— যিনি হাফিজ্ কাদ্‌র্ বেগ হয়েছেন— 'অসুআর'দের পিছন থেকে তিনিই নাকি মন্দিরভঙ্গকারীদের উপর শরসন্ধান করেছিলেন।

তা শুনে পড়িআরী চীৎকার ক'রে উঠলেন: "দূর হ। দূর-হ! রামচন্দ্রদেব ম্লেচ্ছ, যবন। তার নাম মুখে আনাও পাপ। স্বয়ং জগন্নাথ বলভদ্র 'বেনি'[2] ভাই মান উদ্ধারণ হেতু 'বিজে' করেছিলেন, নইলে সব তো ডুবিয়েছিল।"

3

চিকাকোল থেকে কটক পর্যন্ত সদর রাস্তার ধারে ধারে বহু চটি, সেগুলির মধ্যে নানা পেঠ এ। একটি চটির কথা লোকের মুখে মুখে খুব ছড়িয়েছিল। চটির চালিকা সরদেঈয়ের[4] নামে ক্রমে সেটি সরদেঈয়ের চটি ব'লে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সে পথে যাওয়া-আসা করত যত ব্যবসায়ী, লশকর, ফৌজদার, সিপাহী, পথিক, তীর্থযাত্রী তাদের সকলেরই সাময়িক বিশ্রামের একস্থল ছিল এই সরদেঈ-চটি।

1. পাচন পাণি— ভাঙ্গ বাটা জল: হজমি গুণ আছে, তাই পাচন।
2. বেনি— দুই।
3. পেঠ (উচ্চারণ অকারান্ত)— গঞ্জ।
4. সর (উচ্চারণ অকারান্ত)— স্ত্রীলোকের নামবিশেষ, অর্থ দুধের সর।

সড়ক থেকে কিছুটা স'রে সরদেঈ-চটি, ডাক দিলে শোনা যায়। দক্ষিণমুখো তিন-চার কুঠরি মাটির ঘর। পিছনে চিলিকার উপকূলের বিস্তীর্ণ বালুপ্রান্তর ঝাউবন আর কেয়াবন। সামনে দিয়ে চিকাকোল-কটক সড়ক এঁকে বেঁকে পাহাড়ী অজগরের মত মোচড় খেতে খেতে দূরের বাঁক ঘুরে কোথায় হারিয়ে গেছে। চটি থেকে অল্প দূরে সড়কের ধারে একটি ছোট পুকুর, পুকুরের কাছেই একটা ঝাঁকড়া বটগাছ— তারও একটা নাম আছে : 'হাণ্ডিভঙ্গা বর-অ' (হাঁড়িভাঙা বট)।

কোনো পথিক সরদেঈ-চটির সন্ধান চাইলে উত্তর পেত— ঐ যে হাঁড়িভাঙা বট দেখছ, তারই বাঁ দিকে পাবে চটি, সরদেঈ-চটি।

চিলিকার ভিতরে বহু দ্বীপের মধ্যে একটি দ্বীপ কালীজাই। সেখানে কালীজাই ঠাকুরাণী দর্শনে দিনের বেলা যে যাত্রীবা যায়, ফিরতি পথে তারা এই বট গাছটির তলায় বিশ্রাম করে। তাই দেখা যায় গাছতলায় এখানে ওখানে উনান, উনানের ছাই আর ভাঙা হাঁড়ির মেলা। চিলিকায় ঢেউ বেশী থাকলে বা অন্য কোনো কারণে ফিরতে রাত হয়ে গেলে যাত্রীবা রাতটাব মত আশ্রয় নেয় সরদেঈ-চটিতে। সরদেঈয়ের সহজ আত্মীয়তা-মাখা ব্যবহারের জন্য অন্যান্য চটির চাইতে তার চটির প্রতিই যাত্রীরা বেশী আকৃষ্ট। এক রাত্রির জন্য হলেও বয়োজ্যেষ্ঠদের বাবা কাকা মামা মেসো, সমবয়স্কদের ভাই, কনিষ্ঠদের বাছা সম্বোধন ক'রে সরদেঈ তাদের আপনার অন্তরঙ্গ ক'রে নেয়। বয়স্কা স্ত্রীলোকদের তেমনি মা মাসী দিদি কাকী আর কনিষ্ঠাদের 'ওগো মেয়ে'। তাদের রান্নাবান্নার জন্য সরদেঈ সড়কের ধারের ইঁদারা থেকে কলসী কলসী জল এনে দেয়, বাসন জুগিয়ে দেয়। চাল চিড়ে হাঁড়ি কাঠের ব্যবস্থা তো রয়েইছে, কড়ি ফেললেই মেলে। আর তার সঙ্গে মেলে যা কড়ি দিলেও সর্বত্র পাওয়া যায় না— অকপট

মমতাভরা স্নেহের স্পর্শ। চটির ভাড়া এবং আর আর জিনিষের ভাড়াও অন্যান্য চটির তুলনায় অনেক কম : একটা রাতের জন্য জনপিছু মোটে এক কাহণ কড়ি। তারি ভিতরে মেলে রান্নার বাসন, জল আর সরদেঈয়ের স্নেহের ছোঁয়া লাগা সেবা। সেই জন্য সকলের মুখে সরদেঈয়ের চটির এত নাম।

কালীজাই যাত্রী ছাড়া আর এক শ্রেণীর খদ্দের সরদেঈয়ের চটিতে মাঝে মাঝে জোটে। রাতটা সেখানে কাটাবার জন্য এক কাহণ কেন আট কাহণ অর্থাৎ সেকালের পুরো একটি মোগলাই টাকা মূল্য দিতেও তাদের কুণ্ঠা ছিল না। তাদের চোখ রাঙা রাঙা, নিশ্বাস ঘন ঘন, বুক দুরু দুরু। সরদেঈ তাদের দূর থেকে দেখেও বেশ চিনতে পারে, এক রকম অভিমান-মেশানো আমন্ত্রণও করে। তাদের মধ্যে থাকে নানা ধাঁচের লোক— ব্যবসায়ী, মহাজন, সওদাগর থেকে শুরু ক'রে সিপাহী লশকর পর্যন্ত। ঘোড়ায় চ'ড়ে তারা আসে, কিন্তু একসঙ্গে নয়, একা একা। সরদেঈয়ের চটিতে ঘোড়ার জন্য ব্যবস্থাও কম থাকে না।

চেনাজানা এমনি খদ্দের দেখ'লে সরদেঈ অভিমানে ঠোঁট ফুলানোর মত ভঙ্গীতে বলে, "আ মরণ, এমন অসময়ে কোথা থেকে গো?··· পথ ভুলে নাকি?··· হ্যাঁ, তা একটা রাতের চটি তো, মনে থাকবে কেন!" ইত্যাদি। সরদেঈয়ের এমনি অভিমানভরা সম্বর্ধনায় তাদের নিশ্বাস ঘনতর বয়, বুকের দুপদুপানি খরতর হয়।

সে জাতের খদ্দেরের তদ্‌বির করার জন্য কিন্তু থাকে সরদেঈয়ের চির অনুগত জগুনি। চটির পিছন দিকে বালিয়াড়ির আড়ালে কেয়া-ঝোপের ভিতরে যে মদের ভাটি খদ্দেরদের জন্য, সেখান থেকে কেঁড়ে ভরতি ভরতি মদ নিয়ে আসে সে। চটিতে কেনাকাটাও মন্দ হয় না।

চটির বাইরের কুঠরিটাতে যে উনান আছে তাতে হাঁড়ি চড়ে। সেখান থেকে ভেসে আসে ভাজা মাংসের গন্ধ। জগুনি কিন্তু সে মদের কড়ি সব নিজের কাছেই রাখে, সরদেঈ তা ছোঁয় না।

মদ খেতে খেতে চোখ যখন পেঁয়াজের খোসার মত লাল হয়ে ওঠে, মুখ ঝামরে ওঠে, নিশ্বাস ঘন ঘন পড়ে, সরদেঈ তখন হয়তো কাঁকালে কলসী নিয়ে জল আনতে যায় হাঁড়িভাঙা বটতলার ইঁদারায়। চটির আগন্তুক অতিথি সরদেঈয়ের পিছু নেয়, যেন কোন বাঞ্ছিত দুর্লভের সন্ধানে। সরদেঈ পিছন দিকে না তাকিয়েও তা বেশ বুঝতে পারে। অনুসরণকারীর দিকে সস্মিত দৃষ্টিতে মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে দরদভরা গলায় ডাক দেয়— "জগুনি ই-ই, হ্যারে জগুনি—ই—ই!"

কেয়াগাছের বেড়ার নেপথ্য হ'তে পৃথুলকায় জগুনি সামনের বেয়াড়া রকমের উঁচু দাঁত তুলে বার ক'রে উত্তর দেয়—

"আমায় ডাকলি নাকি, দেঈ?"

জগুনির সে মূর্তি দেখে অনুসরণকারী আর বেশী এগতে ভরসা পায় না। বেকাহতের মত সে ফেরে চটির দিকে। যারা কেয়াঝোপের ভিতর থেকে জগুনির আবির্ভাবে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বাহুবলে ভর ক'রে সরদেঈয়ের সঙ্গ ধ'রে রসিকতা শুরু ক'রে দেয়, জগুনির আক্রমণে কেয়াবনের কণ্টকশয্যায় প'ড়ে কিছু বিলম্বে তারা বোঝে সরদেঈ ফুল নয়, কাঁটা— আর সেই কাঁটায় ফুল নেই, শুধুই কাঁটা।

এই জাতের খদ্দের কিন্তু একাধিক থাকলে জগুনিকে ডাকবার দরকার হয় না। সরদেঈ প্রত্যেকের দিকেই চেয়ে যে মৃদু মৃদু হাসে ও প্রত্যেককেই কেমন এক অভিমান মেশা গলায় এক এক ধরণে সম্বর্ধনা জানায় তাতে প্রত্যেকেই ভেবে নেয় সরদেঈয়ের সমস্ত আকুল প্রতীক্ষা শুধু তারই জন্য।

তার পরে চটির মধ্যে সেই দিবাস্বপ্নের উত্তেজনার ভিতর শূন্য পানপাত্রের সংখ্যা অসংখ্য হওয়ার পর তাদের মধ্যে অনুচ্চারিত যুদ্ধ যখন উৎকট আকার ধারণ করে তখন আবার জগুনির প্রয়োজন হয়— শান্তিরক্ষার জন্য।

সরদেঈ আর জগুনি।

রসিকেরা বড় দুঃখেই টিপ্পনী করে— ফুল আর কাঁটা! কিন্তু সে কাঁটায় আঙুল ফুটিয়েও ফুলটি তোলা যায় না।

সে দিন সেই রোদে পোড়া নির্জন দুপুরে চিলিকার তীরের তেপান্তরে সেই পরিত্যক্ত গাঁয়ের রাস্তায় পলাতক রামচন্দ্রদেব সরদেঈয়ের রোদে ঝলসানো শালুকের পাপড়ির মত যে দুটি চোখের বেদনভরা চাউনিতে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এখন সেই চোখ দুটির চাউনি বরং আরো মরমী হয়েছিল, মলিন হয় নি। ঋজু দেহলতা জীবন-নিদাঘের তপ্ততায় পোড় খেয়েও সুকুমার শ্যামলতা তার নিষ্প্রভ হয় নি। সরদেঈ ছিল সরদেঈ-চটির অন্যতম আকর্ষণ।

চিলিকাতীরের সেই গাঁয়ে সরদেঈয়ের সেই অন্ধ কানা পাগলী বুড়ী শাশুড়ী যেদিন শেষ নিশ্বাস ফেলল, সরদেঈয়ের শেষ বন্ধনটি যেদিন টুটে গেল, সেদিন সরদেঈ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জীবন সংগ্রামের রাজপথে একা একা বেরিয়ে পড়েছিল বাঁচার মোহড়া নিতে। তার পর সেই অনির্দিষ্ট পথে পা বাড়িয়ে সে কবে বালুগাঁর গঞ্জে জগুনির চটির বারান্দায় আশ্রয়প্রার্থিনী হয়েছিল, সংসার ছাড়া জগুনি কি ক'রে সরদেঈয়ের সঙ্গে প্রথম দর্শনেই কোন রহস্যময় আকর্ষণে অতি বড় মূল্য দিয়ে তাকে দেঈ[1] ব'লে ডেকেছিল সে সব কাহিনী এখন এক-এক দিন যাত্রীবিরল মুহূর্তে হাঁড়িভাঙা বটতলার ইঁদারার পাড়ে হয়তো

1. দেঈ— বড় বোনকে সম্বোধন।

চটির বারান্দায় ভাবতে বসলে সরদেঈ তার কোনো কূলকিনারা খুঁজে পায় না।

জগুনিও জীবনের ধুলোর ঝড়ে কি ক'রে কোথেকে কবে বালুগাঁ-পেণ্ঠের চটিতে উড়ে এসে লেগেছিল সে ইতিহাস তার স্মৃতিতেও অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

"জগুনি হ্যাঁরে, কোন্ গাঁয়ে তোর ঘর ছিল মনে পড়ে কিছু?"—এক-এক দিন সরদেঈ এমনি প্রশ্ন ক'রে বসলে জগুনির চোখের সামনে চিলিকার নোনা জলের মত বিস্মৃতির নীল অথৈ বিস্তার ভেসে ওঠে।

জগুনি তেমনি এক-এক দিন সরদেঈকে তার জীবনের ইতিকথা শুধিয়ে বসে। সরদেঈয়ের চোখের সামনে তখন ভেসে ওঠে দিগন্তছোঁয়া চিলিকার অতল দরিয়াতে ভেসে চলা নিঃসঙ্গ একটি নৌকার ছবি। দুয়ের মধ্যে আপন আপন অতীত জীবনের আলোচনা সেখানেই শেষ হয়ে যায়। সরদেঈ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। জগুনি কিন্তু তার পৃথুল বিরূপ দেহ সরদেঈয়ের কোলে ঢেলে দিয়ে আদুরে ছেলেটির মত আবদার করে: "আজ আর চটিতে কেউ আসবে না, ওঠ্ এবার, খিদে পেয়েছে।"

সরদেঈ সস্নেহে জগুনির মাথার কড়া চুলগুলি টানতে টানতে বলে, "যাচ্ছিরে যাচ্ছি—ওমা, দেখলি। তোর জন্য উনুনে মাছ দুটো দিয়ে এসেছিলাম, পুড়ে বুঝি খাক হয়ে গেল!"

সরদেঈ হাঁড়িশালের দিকে ছুটে যায়।

সরদেঈ আর জগুনি— দুই শুকনো পাতার মত জীবনের বৈশাখী ঝড়ে এমনি উড়তে উড়তে বালুগাঁর গঞ্জে এই চটিতে এসে লেগেছিল।

পৌষের দুপুর সেদিন সোলেরি পাহাড়ের পায়ে গড়িয়ে গিয়েছিল

না পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা কালো ধূমল মেঘের আড়ালে লুকিয়েছিল ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। অন্য বছর পাহাড়-জঙ্গলের নীচেকার ধানক্ষেতে এ সময়ে সোনালী ফসলের মহোৎসব লেগে যায়। টিয়া, হরিয়াল, বুনো পায়রা ও অন্যান্য পাখীদের মুগ্ধ কাকলিতে পরিপূর্ণ শস্যভূমি গীতিমুখর হয়ে ওঠে। কেবল একটি পুণ্য তিথির অপেক্ষা, তার পরেই স্ত্রীপুরুষ দলে দলে এসে ধান কাটা আরম্ভ ক'রে দেবে।

কিন্তু এ ধছর ক্ষেত সব অনাবাদী প'ড়ে ছিল।

টিকালী-রঘুনাথপুর চিকাকোল সুবাতে মেশা অবধি এই সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে মোগল লশকর সিপাহী আমিন ও ইজারাদারদের দৌরাত্ম্য বেড়েছিল। খোর্ধা রাজ্যের সীমার মধ্যে হলেও তাদের লুঠতরাজে বাধা দেবার মত ক্ষমতা বা সম্বল ছিল না রাজশক্তির। শস্যহীন প্রান্তরের বিপুল বিস্তারের মধ্যে এখানে ওখানে ছবির মত ঝাপসা এক-একখানি গ্রাম দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু সব যেন পরিত্যক্ত। ক্ষেতে ধান নেই, ধান কাটার লোকও নেই, পাখীর ঝাঁকও নেই। খোর্ধা রাজ্যে আবার সাজ সাজ রব পড়েছিল। নিষ্কর বৃত্তিভোগী পাইকেরা খোর্ধা, রথীপুর, রঙ্গপড়া, শিশুপালগড প্রভৃতি ঘাঁটিগুলিতে ছাউনি ফেলে ব'সে ছিল, জমি চাষ করবে কে? ধানের 'ভরণ' এখন থেকেই বিশ কাহণ দর হয়েছে। অনাবাদী ধানক্ষেতগুলির উপর শকুনির পাল দুর্ভিক্ষের ডানা মেলে এখন থেকেই ঝট্‌পটি শুরু করে দিয়েছে।

চিলিকার দিক থেকে ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া হু-হু শব্দে এসে গায়ের লোমের গোড়া কাঁপিয়ে দিয়ে অদূরের অরণ্যের ভিতর হারিয়ে যাচ্ছিল। সড়কের উপরে কোথাও একটি পথিক কি 'অসুআর' চোখে পড়ে না। আবার একটা লড়াই লাগবে এমনি একটা কথা চাউর হবার পর থেকে সাধারণ জীবনযাত্রায় ছেদ পড়েছিল, লোকেরা গ্রাম ছেড়ে

সব গড় অঞ্চলে পালিয়েছিল। বেওয়ারিশ অস্থিসার গাইগরু কেবল শুকনো মাটি শুঁকে বেড়াচ্ছিল।

সেই জন্য এ বছর আশ্বিন মাস থেকেই কালীজাই যাত্রীর আর দেখা ছিল না। নেহাত যাদের মানত ছিল তারাই কেবল একটি ছাগল কি ভেড়া কি একটি মুরগী নিয়ে বালুগাঁ থেকে নৌকায় চাপছিল।

অন্যান্য বছর কিন্তু এমনি সময়ে বালুগাঁর এই চটিতে কারবার বেশ জ'মে ওঠে। চটিতে, হাঁড়িভাঙা বটগাছ তলায়, এমন-কি, বালুর চরেও সবখানেই যাত্রীদের ভিড় হয়। আশ্বিনের পর কার্তিক মাসে আরম্ভ হয়ে যায় পুরীযাত্রীদের মেলা। বাণপুর, খল্লিকোট, গঞ্জামের দিক থেকে শত শত যাত্রী এসে বালুগা-পেণ্ঠে ভিড় করে। এখান থেকে নৌকায় চাপলে মাণিকপাটণা, মাণিকপাটণায় নামলে সেখান থেকে সোজা পুরীর সড়ক, পথে লোকনাথ দর্শন। সারা বৎসর শুনশান প'ড়ে থাকা সেই তেপান্তর ভুঁই খঞ্জনি মৃদঙ্গ আর ভজন গানের মধ্যে এক নূতন প্রাণস্পন্দনে জেগে ওঠে। কিন্তু এ বৎসর 'পঞ্চুকে'[1] পর্যন্ত একটিও যাত্রীর দেখা ছিল না সেখানে, কেবল কয়েকটি থুরথুরা বুড়ী বিধবা ছাড়া। তখনও অবশ্য বাস্তবিক দেশে কোনো যুদ্ধের হাঙ্গামা ছিল না, ঝড়ের আগে স্তব্ধতার মত সর্বত্র এক অচঞ্চল নীরবতা। কিন্তু কোন সূত্রে কে কিভাবে হঠাৎ যুদ্ধের সম্ভাবনার কথাটা লোকশ্রুতিতে পৌঁছুতে আরম্ভ করল তা কেউ জানে না। হয়তো 'বিগত দেড়শো' বছর যাবৎ বহু আক্রমণ ও যুদ্ধের আতঙ্ক সয়ে সয়ে গণমন এক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়বলে অবচেতন মনের অতলে যুদ্ধের দামামার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল। নইলে টিকালী-রঘুনাথপুরের যুদ্ধে,

1. পঞ্চুক (উচ্চারণ অকারান্ত)— কার্তিক মাসের শুক্লা-একাদশী থেকে পূর্ণিমা— এই পঞ্চতিথি-সংবলিত পুণ্য পর্বকাল।

রামচন্দ্রদেব হেরে গিয়ে হাফিজ্ কাদ্র হওয়া ইস্তক খোর্ধারাজ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা তো আর ছিল না।

চটি বন্ধ। জগুনি সেই সকাল থেকে বেরিয়েছে কেয়া জঙ্গলের মধ্যে বেজি ধরতে। সরদেঈ কলসী নিয়ে হাঁড়িভাঙা বটতলায় এসে এক উদাস আলস্যে ইঁদারার পাড়ে পা ছড়িয়ে ব'সে ছিল। মেঘে ঢাকা থমথমে আকাশ, অনাবাদী ধানক্ষেত, নিঝুম রাস্তা, চিলিকার জলের উপর নুয়ে আসা মেঘের ছায়া আর সব-কিছু কাঁপিয়ে বয়ে যাওয়া ঠাণ্ডা জ'লা হাওয়ায় সরদেঈয়ের অন্তঃস্থল এক অহেতুক হাহাকারে মোচড় দিয়ে উঠছিল। অদূরে বনের ভিতর থেকে যখন অরণ্যের মর্মস্থল কাঁপিয়ে ঘুঘু ডেকে উঠছিল তখন চট্‌কা ভেঙে সরদেঈও অকারণে ডেকে উঠছিল— "জগুনি—ই-ই, হাঁরে জগুনি-ই-ই !"

কিন্তু কেয়াঝোপের ওপার থেকে জগুনি সেই অভ্যস্ত উত্তর শোনা যাচ্ছিল না— "আমায় ডাকলি নাকি দেঈ ?"

সড়কের বাঁক পেরিয়ে একটা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল নাকি !

অন্য কোনো দিন, অন্য কোনো মুহূর্তে, নির্জন রাস্তায় ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনলে সরদেঈ ত্রস্তা হরিণীর মত চঞ্চল পদে চটির দিকে এগত। কিন্তু আজ অজানা 'অসুআরের' ঘোড়ার পায়ের শব্দে তার মনে আশঙ্কার সঞ্চার হল না; সে বরং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সেই ঘোড়াসওয়ারের প্রতীক্ষা করতে লাগল। সেই আত্মাহীন শূন্য শীতের অপরাহ্নে সরদেঈর প্রাণ কি খুঁজছিল মানুষের উষ্ণ উপস্থিতি ?

ঘোড়সওয়ার কে জানে কোন সিপাহী কি লশকর হবে বুঝি বা। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে— "বাণপুরের রাস্তা এই না ?"

হাঁড়িভাঙা বটতলা থেকে ডান দিকে একটা রাস্তা ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে বাণপুরের দিকে। সেইখান থেকেই শুরু হয়েছে বাণপুর আর খোর্ধার দোসীসগর জঙ্গল। সরদেঈ মাথা ঝুঁকিয়ে সঙ্কোচে মাথায় কাপড়টা টেনে দিয়ে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, ঐ রাস্তা গেছে বাণপুর।"

ঘোড়সওয়ার তার পর সরদেঈয়ের কাছে স'রে এসে বললে, "পিয়াস লেগেছে, জল দেবে না?"

চিত্র-প্রতিমার মত সরদেঈ সেই অচেনা ঘোড়সওয়ারের অঞ্জলি ভরে কলসীর জল ঢেলে দিল। জল খেয়ে ঘোড়সওয়ার বাণপুরের পথে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। ঘোড়ার পায়ের ক্ষুরে ছিটকে ওঠা লাল ধুলো যেখানে বাণপুরের পথের অরণ্যের উপরে একটুকরো লাল মেঘের মত ভেসে উঠেছিল, সেইখানে পশ্চিমের সিঁদুরে আলো আর এক পোঁছ রঙ মাখিয়ে দিল যেন।

সূর্যাস্তের বিলম্ব ছিল না। চিলিকার উপরে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমাট হয়ে উঠছিল।

"জগুনি, হ্যারে জগুনি—ই—!" ব'লে ডাক দিতে দিতে সরদেঈ চটির দিকে ফিরল।

"দেঈ, আমার বেজি দেখেছিস্? এই দ্যাখ্!" কলসী কাঁখে সরদেঈকে ফিরতে দেখে জগুনি চটির বারান্দার উপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল।

সরদেঈ বাদে আর যাকে জগুনি একান্ত নিজের ব'লে ভাবতে পারত সে ছিল জগুনির পোষা একটি বেজি। সরদেঈয়ের সম্বন্ধে তো তবু এক রকম আশঙ্কা ছিল, বরং বেজিটি সম্বন্ধে সে ছিল একেবারেই নিঃসন্দেহ নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ। সেই বেজি তার দিনকয়েক

হল হঠাৎ কোথায় পালিয়েছে। সেই থেকে জগুনি আর একটি বেজি ধরবার জন্য ঘোরাফেরা করতে করতে আজ সারাদিনের চেষ্টায় কোথা থেকে এক বেজির বাচ্চা ধ'রে এনে খাঁচায় পুরেছিল। সরদেঈ যখন ফিরল তখন জগুনি সেই নকুলশাবকের সঙ্গে নানা নির্বোধ একতরফা স্নেহালাপে ব্যাপৃত। নকুলনন্দন মুক্তির কন্টকাকীর্ণ শ্যামলতা থেকে খাঁচার ভিতরে এসে ক্ষীণ কণ্ঠে চ্যাঁ চ্যাঁ করছিল, পালাবার চেষ্টায় খাঁচার মধ্যে একবার এদিক একবার ওদিক অবিরাম ঘোরাফেরা করছিল। পরিণামে কেবল খাঁচার লোহার পাতে আপন বক্তপাতই সার হচ্ছিল, যন্ত্রণায় নেউল-শিশুর চীৎকার বেড়ে উঠছিল। জগুনি খাঁচার শিকের ফাঁক দিয়ে একটা কচি পেয়ারা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলছিল— "নে যাদুমণি, নে— নে— ।"

কিন্তু জগুনির স্নেহের মাত্রা যতই বাড়ছিল নেউল-শিশুর আর্তনাদও ততই তীক্ষ্ণ হচ্ছিল।

এমনি ধূসর মেঘম্লান দিনে যা-কিছু হারিয়ে গেছে ম'রে গেছে উধাও হয়ে গেছে মুছে গেছে সেই সবের স্মৃতি সরদেঈয়ের মনের আকাশ নিঝুম ক'রে ছেয়ে ফেলে। তার ভিতরে সরদেঈ যেন তখনকার মত নিজেকে হারিয়ে ব'সে থাকে। আজও ইঁদারার পাড়ে সারা দুপুরটা ব'সে থেকে চটিতে ফেরার সময়ে সরদেঈয়ের মনের অবস্থা তেমনি মেঘাচ্ছন্ন ছিল। তাই জগুনির চীৎকার শুনেও সে শুনতে পায় নি। বহুক্ষণ ধ'রে কাছছাড়া বাছুরকে দেখলে গাই যেমন হাম্বারব ক'রে ওঠে সরদেঈ তেমনি যতদূর সম্ভব সুর টেনে বলল, "তুই সেই সকাল থেকে কোথায় না খেয়ে না দেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলি রে জগুনি ? বেলা যে শেষ হয়ে এল সে !"

তেপাস্তরের ঝাউবনে হিমেল হাওয়া নিখিল রিক্ত প্রাণের হাহা-

কারের মত শব্দ তুলে বয়ে যাচ্ছিল। তারি ভিতরে সরদেঈয়ের স্নেহের সুরটানা কথা দূরের অরণ্যের দিকে হু হু ক'রে ভেসে গেল।

সরদেঈ আপন মনেই সে হাওয়াকে অভিসম্পাত দিয়ে বলল, "এ হাড়জ্বালানে বাতাসটা আবার বাদ সাধলে।"

জগুনি সরদেঈকে চটির বারান্দার নুয়ে আসা চালের নীচে দেখে আর-একবার চেঁচালে, "দেখেছিস্ দেঈ— আমার বেজি ?"

জগুনি তখন পেয়ারাটা বেজির মুখের উপর চেপে ধরেছে। সরদেঈ জলের কলসীটা বারান্দায় নামিয়ে রেখে বলল, "আরে, আরে, বাচ্চাটা ম'রে যাবে রে, জগুনি! বেজির বাচ্চা কি পেয়ারা খায় রে ?"

জগুনি সরদেঈয়ের দিকে চেয়ে বললে, "আর কি খায় তবে ?"

সরদেঈ বললে, "বড় বেজি একটা না-হয় ধ'রে আনতিস্। এ বাচ্ছাটাকে দুধ খাইয়ে কেমন করে বাঁচাবি কে জানে। ওটা কি দুধ খেতেও জানে ? দুধে নেকড়া ডুবিয়ে ফোঁটা ফোঁটা ক'রে না খাওয়ালে খেতে পারবে না, ম'রে যাবে।"

সরদেঈয়ের কথায় জগুনির হাত থেকে কচি পেয়ারাটা গড়িয়ে প'ড়ে গেল বারান্দার নীচে। তার পরে ঝোড়ো হাওয়ায় গড়াতে গড়াতে উড়ে চলল মনসার বেড়ার কাছে ঝোপের দিকে। জগুনি বেজির বাচ্ছাটির কথা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়ে ধূসর সায়াহ্নের মলিন ছায়ায় ক্রমে ঘনীভূত হয়ে ওঠা পাংশুল আকাশের দিকে চেয়ে ব'সে রইল। জন্তুর চোখের মত তার ভাবলেশহীন ঢলঢলে দুই চোখ যেন কী এক বেদনায় অদ্ভুত করুণ হয়ে উঠল।

বালিকাঁকড়া যেমন তার গর্তের ভিতর থেকে মাথা বার করে তেমনি জগুনির অবচেতনের বিস্মৃতির বালুচরের নীচ থেকে কোন্ কালের অস্পষ্ট স্মৃতি যেন সব একটির পর একটি জেগে উঠছিল।

এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের সময়ে কোন্ সড়কের ধারে পরিত্যক্ত এক অরক্ষ্য শিশু··· মানুষের মাংস মানুষে খাওয়ার মত সময় তখন··· আপন প্রাণ বাঁচানো অসম্ভব, শিশুর দিকে তখন চেয়ে দেখছে কে? হলই বা সে আত্মজ!

সেই প্রলয়ংকর দুর্ভিক্ষের সময়েও তবু কেউ কেউ এমন ছিল যাদের সন্তানবঞ্চিত ক্ষুধিত প্রাণে একটি শিশুর জন্য বাৎসল্যের স্নিগ্ধ দূর্বা ছিল তখনও সবুজ, সতেজ। মনে পড়ে ছাপ ছাপ ছায়া-মেশা আলোর মত— কার কাছে শোনা কথা যেন— সেই শিশুটি কোন্ তেপান্তরে এমন জীবন্মৃত হয়ে পড়ে ছিল যে দুধ গেলবার শক্তিটুকুও তার ছিল না। তার পর মনে পড়ে কত অচেনা কোলের অচেনা উষ্ণতা আর কত স্নেহভরা অচেনা মুখ। ক্রমে বেড়ে উঠে তাদের পানেই চেয়ে সেই শিশু হাসতে শিখল, আধ আধ সুরে 'বা— বা— মা' ডাকতে শুরু করল।

দুর্ভিক্ষ তো তখন ছিল জীবনের নিত্য সহচর। বছর কয় পরেই এল আবার এক দুর্ভিক্ষের দুষ্কাল। তাই যেন যথেষ্ট ছিল না, তার সঙ্গে আবার জুটল মোগলের হাঙ্গামা। দুর্ভিক্ষের করাল ক্ষুধায় ও মোগলের জুলুমে চারিদিকে কঙ্কালের স্তূপ আবার জ'মে উঠতে লাগল। সেই কুড়িয়ে পাওয়া শিশুকে যারা একদিন পথের ধার থেকে বুকে তুলে নিয়ে স্নেহে আদরে পালন করেছিল এবার এই দারুণ দুর্দিনে তাদেরও দেহ সেই কঙ্কালস্তূপে মিশল। শিশু আবার একবার জীবনের সদর রাস্তায় অরক্ষ্য হয়ে পড়ল। তখন কোন শুভাকাঙ্ক্ষী নাকি বালুগাঁ-পেঠের চটির মালিকানী এক বুড়ীর কাছে কয় কাহণ কড়ি নিয়ে বিক্রি ক'রে দিয়েছিল। তার বয়স তখন দশ কি এগারো! দুর্ভিক্ষের সময়ে ছোট ছেলেপিলে কিনে তাদের বিদেশে

ক্রীতদাস ভাবে চালান দেওয়া তখন এক লাভজনক ব্যবসায় ছিল।

বালুগাঁর চটির মালিকানী সেই বুড়ীর তাও ছিল আর এক ব্যবসায়। চটির এক খুপরি ঘরের মধ্যে আরো কয়েকটি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কঙ্কালসার বালকবালিকা চালান হবার জন্য মানুষের মাংসের সওদাগরদের অপেক্ষায় ক্ষুধাক্লিষ্ট শূন্য দৃষ্টি মেলে প'ড়ে ছিল।

রাক্ষসীর মত চেহারার সেই বুড়ীকে আজও ঝাপসামত মনে পড়ে জগুনির। নেড়া মাথা, কোটরে বসা গর্তপানা চোখ দুটোর উপরে ভুরুর লোম পেকে সাদা হয়ে গেছে। উপরের পাটির বেয়াড়া দাঁত কয়টা ছাড়া আর দাঁত নেই মুখে। সে দাঁতের উপর আবার এক প্রস্ত হলদে ছোপ। আর তার সেই শুকনো চামড়া ঢাকা দেওয়া মুখের উপর মাকড়সার জালের মত অগনতি সরু সরু কাটাকুটি রেখা। শকুনের ঠোঁটের মত প্রকট তার চ্যাপ্টা মুখের উপরে সে-সব কে যেন আলাদা বসিয়ে দিয়েছে। রোগা শরীরটা তার ধনুকের মত বাঁকা। ঢিলে চামড়া দিয়ে ঢাকা দুটো শিরাল হাতের গাঁটওয়ালা পাতা থেকে কালো বেঢপ বাঁকা আঙুলগুলো বেরিয়ে এসেছে যেন বাজপাখীর নখ। লোকে আড়ালে বলাবলি করত সে নাকি মানুষ নয়, মানুষখাকী ডাইনী।

কিন্তু সেও একদিন কিশোরী ছিল, তারও একদিন বিয়ে দিয়েছিল বাপ-মা। তারা তো জানত না তাদের মেয়ে ডাইনী। চিলিকার ধারের মানসিংহপুর গাঁয়ে যেদিন সে শ্বশুরঘর করতে এসেছিল সেদিন বউ দেখতে যারা এসেছিল তাদের কেউ কেউ তখনও বেঁচে ছিল। কিন্তু তার ছিল পোড়া কপাল। সে বিধবা হল, ছেলেপিলেরাও বাঁচল না। তার স্বামী আর ছেলেপিলেদের একটি একটি ক'রে সে নাকি রক্ত চুষে খেয়েছিল— এই কথাই বলে তার শাশুড়ী আর ননদেরা। এর পরে তার ডাইনী না হয়ে উপায় ছিল না। লোকে বলে

অমাবস্যার রাতে চারিদিক যখন নিশুতি হয়ে যায়, চিলিকার গভীর কালো জলে ঢেউয়ের পর ঢেউ ওঠে, ঝাউবন হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ওঠে, আকাশে মরা মানুষের চোখগুলি তারা হয়ে একটি একটি ক'রে ফুটে ওঠে, তখন সেই বুড়ী নাকি হাঁড়িভাঙার বটতলার তেমাথায় চুলো জ্বেলে ফেলে দেওয়া হাড়ি কুড়িয়ে এনে তাতে ক'রে মানুষের রক্ত ফোটায়। আগুনে জ্বালানি থাকে না, নিজেরই বাঁ পা-খানাকে চুলোর মুখে দিয়ে সে ব'সে থাকে। সেই সময়ে পথচলা লোক কেউ তার সামনে পড়লে তক্ষুনি রক্তবমি ক'রে ম'রে যায়। সেই জন্য নিশুতি রাতে হাঁড়িভাঙা বটতলায় কিংবা নির্জন দুপুরবেলায় একলা পথ চলতে লোকে এখনও ভয় পায়। হাড়িভাঙা বটতলায় সেই বুড়ীকে এখনও ব'সে থাকতে গুনিন কেউ কেউ নাকি দেখেছে।

ভাগ্য তার প্রতি নির্দয় হয়েছিল, তাকে নির্দয় করেছিল। দুনিয়ায় কারো প্রতি বুঝি তার মায়াদয়া ছিল না। চটির যাত্রীদের জন্য ভারে ভারে জল বওযা থেকে শুরু ক'রে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনা পযন্ত সব কঠিন কাজে সে সেই কঙ্কালসার ছেলেগুলিকে খাটাত। মাঝে মাঝে যারা চালান হয়ে যেত নয়তো অনাহারে উৎপীড়নে ইহলীলা সাঙ্গ করত তারাই কেবল সে জীবন্ত রৌরব থেকে উদ্ধার পেয়ে যেত।

সব গিয়ে গিয়ে কেবল বাকী ছিল জগুনি।

জগুনির কপাল তাকে কোথায় টানত কে জানে? পর পর কয়েক বছর আকালের পর সে বছর জল ভাল হয়েছিল, আবহাওয়াও ফসলের অনুকূল, মোগলের হাঙ্গামাও থেমেছিল। ক্ষেতে পরিপূর্ণা লক্ষ্মী, দেশে নিরুপদ্রব শান্তি। লোকেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল —এই সময় হঠাৎ কোথা থেকে এল মহামারী। গ্রামকে গ্রাম

উজাড় হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু অদ্ভুত কথা, চটির মালিকানী ডাইনী বুড়ীর রোগা শুকনো শরীর সে করাল বিভীষিকার মধ্যে দিন দিন যেন তাজা হয়ে উঠতে লাগল। মহামারীর মধ্যে যারা বেঁচে ছিল তারা ঘোর আতঙ্কে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল বুড়ীর প্রাণ নাকি কালীজাইয়ের দহের ভিতরে সপ্ততাল জলের তলায় একটা কৌটোর মধ্যে আছে। সেই কৌটো নাকি পাহারা দেয় এই বড় এক রাঘব বোয়াল! মহামারী বুড়ীকে তাই ছোঁয় নি। যে ক'জন বেঁচে রইল তাদের বিশ্বাস জন্মাল বুড়ী মহামারীব ভগ্নী, সে-ই মহামারীকে ডেকে এনেছিল মানুষের মাংসে ভোজ খাওয়াতে! তাকে প্রাণে না মারলে আর রক্ষা নেই।

আজও জগুনি ভোলে নি সে ভয়ংকর দৃশ্য। একদিন সন্ধ্যার সময় এই হাঁড়িভাঙা বটতলায় আসপাশের গ্রামের কতকগুলি কঙ্কালসার লোক এসে জমা হয়ে আগুন জ্বাললে। সপ্ততাল প্রমাণ আগুনের শিখা উপরে উঠল। ডাইনী বুড়ী সেদিন ঠিক তিনসন্ধের সময় শ্মশানে ঠ্যটো শিমুল গাছের তলা থেকে কী বা শিকড় বাকড় আনতে গিয়েছিল সেই জানে। লোকে সেইখান থেকে তাকে চ্যাংদোলা ক'রে তুলে নিয়ে এসে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলে, উনুনে বেগুন ফেলার মত।

সেদিন জগুনি প্রাণের ভয়ে পালিয়ে কেয়াবনের ভিতরে সারা রাত লুকিয়ে ছিল। হাড়িভাঙা বটতলাব সেই ভয়ংকর আগুন সেই সকালে গিয়ে নিবল। তখন লোকেরা আর কেউ সেখানে ছিল না। নিবে আসা ছাইচাপা আগুনের ধোঁয়ায় একটা চামসা গন্ধ তখনও লেগে ছিল।

তার পরে গিয়ে জগুনি চটিতে ফিরল। মহামারীও তার পর দূর হয়ে গেল।

বেজির বাচ্ছাটি খাঁচার লোহার শিকের ভিতর দিয়ে মুখ বার ক'রে জগুনির দিকে চেয়ে চ্যাঁ চ্যাঁ ক'রে চেঁচাচ্ছিল। এই বেজির বাচ্ছাটাকে দেখে জগুনির মনে আসছিল তার নিজের নিরাশ্রয় অসহায় লাঞ্ছিত শৈশবের নিষ্করুণ স্মৃতি। মনে হচ্ছিল যেখান থেকে ধরেছে সেইখানেই আবার বাচ্ছাটাকে ছেড়ে দিয়ে আসে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মন বদলে গেল। মনে প'ড়ে গেল সরদেঈ বলেছে বাচ্ছাকে দুধ খাওয়াতে। চটিতে দুধ ছিল না। কাছেই মহিষের বাথান। জগুনি সেখানে ছুটে গেল বেজির বাচ্ছার জন্য দুধ আনতে।

সরদেঈ ঘরের ভিতরে সন্ধ্যার সলতে পাকিয়ে যখন বাইরে এল তখন জগুনি নেই। ঝাউবনের ভিতরে বাতাস তখনো তেমনি সাঁই সাঁই ক'রে ছুটছে। বারান্দায় বেজির বাচ্ছাটা খাঁচার ফাঁকে মুখ বার ক'রে কেবল চ্যাঁ চ্যাঁ করছে। ঝাউবনের ভিতর থেকে বাদুড়ের পাল ডানা থেকে অন্ধকার ছড়াতে ছড়াতে বেরিয়ে আসছিল। উলটো দিক থেকে উড়ে আসছিল ঝাকে ঝাকে বাসায় ফেরা পাখী, কিন্তু কণ্ঠে তাদের কাকলি নেই।

সরদেঈ গলা ফাটিয়ে ডাক দিল: "জগুনি—ই— ই, হাঁারে জগুনি— ই—ই !"

তার প্রতিধ্বনি ঝড়ে আবার চটির দিকেই ভেসে এল। কিন্তু ঝাউবনে ঝড়ের দীর্ঘশ্বাস ছাড়া অন্য প্রত্যুত্তর ছিল না।

সরদেঈ কাঁথা একখানি গায়ে দিয়ে বারান্দার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ব'সে পড়ল। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যেন সে। সন্ধ্যা হয় হয়। বাণপুরের জঙ্গলের মাথার উপরকার আকাশটুকু যেন আবীরগোলা লাল হয়ে উঠেছে। ঝাউগাছ তালবন খেজুরগাছ সব যেন ডাকিনী যোগিনীর মত এলো চুল দুলিয়ে ঝড়ের রাত আসছে দেখে নেচে

নেচে উঠছে। অদূরে হাড়িভাঙা বটের ঝুরির ভিতর সন্ধ্যার আঁধার জমে উঠেছে। ঝড়ের সমস্ত বেগ আর রাত্রের সমস্ত বাদুড় যেন এক সঙ্গে নেমে আছে। কেয়াবনের ভিতর থেকে শেয়ালের দল হুক্কাহুয়া রব ছাড়ল।

বাণপুরের পথ শুধোচ্ছিল যে 'অসুআর'টি ঝোপজঙ্গলের রাস্তায় এখন সে কোথায় কত দূরে কে জানে! কে সে 'অসুআর'? কোথেকে এসেছিল? কেন আবার এই অন্ধকার ঝড়ের রাতে বাণপুর ছুটল সে?

সরদেঈয়ের চোখের সামনে ভেসে উঠল চিলিকাতীরের মালকুদা গাঁয়ের পথে আর এক জন 'অসুআরে'র মূর্তি। তারও এমনি পিপাসা লেগেছিল সেদিন। সেও এমনি হাঁটু গেড়ে ব'সে শুকনো ঠোঁটের কাছে হাতের আঁজলা মেলে ধরেছিল। সেও এমনি ঢক ঢক ক'রে আধ কলসী জল খেয়ে ফেলেছিল।

দুঃখিনীর নিঃসঙ্গ নিরাশ্রয় জীবন, অন্ধকার, মোগল-হাঙ্গামা, আর দুর্ভিক্ষ সব মিলে একটা গোটা অবিচ্ছিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছিল আজ সরদেঈর কাছে। কোনো একটিকে আলাদা ক'রে মনে আনা যায় না। কবেকার সেই অচেনা 'অসুআর', তার পিপাসা, আর সেই আগুন-ঝরা নিষ্ঠুর নিদাঘও তার চেতনায় তেমনি মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন সেই 'অসুআর'ও মালকুদা গাঁয়ের পথে শুধিয়েছিল বাণপুর যাবার পথ। বাণপুর কোথায়, সে কোন রাজ্য— সরদেঈ কী বা জানে? শুনেছে সে বাণপুরের ভগবতী ঠাকুরাণীর কথা, ডাকলে নাকি 'ও' ব'লে সাড়া দেন! তার শ্বশুর কতবার বাণপুরের ভগবতীর কাছে মানত করতে গিয়েছিলেন। আর··· কোথায় লুকাল কালো মুগুনি পাথরে খোদাই সেই চৌকো মুখ, দুই গালে গালপাট্টা, কাঁধের

উপরে গোছা গোছা বাবরী চুল— তার স্বামী ? কোথায় হারিয়ে গেল শালের কোঁড়ার মত তার দেওররা ? তাদের বিয়ের সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল— অজানা গাঁ থেকে আসত তার নতুন জায়েরা, ঘর ভ'রে উঠত। শাশুড়ীর তো সেই স্বপ্ন ছাড়া আর স্বপ্ন ছিল না। অকাল মেঘের মত কোথা থেকে এল মোগল-হাঙ্গামা। মোগল ফৌজ ধেয়ে এল খোর্ধার পানে। দেশ কি, স্বাধীনতা কি, সে সব তো জানত না সে। কিন্তু জন্ম-মাটির উপরে বৈরী এসে চড়াও হ'লে কোন পাইকের ছেলে ঘরে ব'সে রইবে ? কোন্ পাইকের বউ বা তাকে ধরে রাখবে ?

শ্বশুর যেন দেবতার ভর হওয়ার মত নেচে নেচে চীৎকার ক'রে ঘুরে বেড়ালেন— "আরে মেনীমুখোরা, ঘরের কোণে ব'সে আছিস্ কেন রে ? তোরা সব পাইকের ছেলে না 'বেহেরাণী'র ছেলে রে ? মোগল বড়-ঠাকুরের উপর হাত তুলেছে ! আরে জগন্নাথ গেলে ওড়িশার আর রইল কি রে ?"

পথে পথে দামামা তূরী ভেরী বেজে উঠল। কপালে প্রসাদী সিঁদুর চন্দন পরিয়ে সরদেঈ বিদায় দিল আপন স্বামী আর দেওরদের কিন্তু আর তো তারা কেউ নেউটে এল না। বৈরী হটল, লড়াই থামল, কিন্তু তারা আর ফিরল না— যাদের ফেরার পথ চেয়ে নিত্য সকল-সাঁঝে সে ব'সে থাকত। সেদিন সেই নিঝুম দুপুরে সেই যে 'অসুআর' পিপাসায় উথল-পাথল হয়ে এক ফোঁটা জল চাইছিল সেই কি সত্যি খোর্ধার রাজা ? ওড়িয়া জাতির মউড়-মণি ? আগে সে চেনা দেয় নি, কিন্তু মোগল লশকরেরা যখন সরদেঈয়ের গায়ে হাত দিতে এল তখন সে আগে চেনা দিয়ে তার পর লশকরদের উপরে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল তো !···মালকুদা গাঁয়ের পথে অসুরের মত সেই মোগল ঘোড়সওয়ারদের কথা ভাবলে এখনও সরদেঈর

গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে।··· সে রাজা এখন কোথায় ? কোন্ দেশে ?

সরদেঈ তার বাঁ হাতের নিরাভরণ বাহুতে একটা গভীর ক্ষত-চিহ্নের দিকে চাইল। সন্ধ্যার কোল-আঁধারে তখন তা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না, তবে আঙুল বোলালে ঠিকই টের পাওয়া যাচ্ছিল।

জগুনি তখনও ফেরে নি।

সরদেঈ আবার চেঁচিয়ে ডাকল, "জগুনি—ই—ই— !"

জগুনি তখন ফিরছে।

তার পর রাত এক প্রহর গড়িয়ে গেছে। সারাদিনের ক্লান্তি আর উত্তেজনার পর জগুনি যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ঘুমচ্ছে মেঝের উপর। উনানের একখানা কাঠ ধিকি ধিকি জ্বলছিল। গনগনে আগুন ছিল উনানে, তার লালচে আভায় ঘরের ভিতরটা সামান্য আলো হয়েছিল। বাইরে ঝড়ের দাপাদাপি আরো বেড়েছে। ঝাউবনে যেন সমস্ত সৃষ্টির নাভিশ্বাস উঠছে। পৌষের রাতের হিমেল হাওয়া হাড় কাঁপিয়ে ছুটে চলেছে। তালবনে ঝড় যেন দামামা বাজাচ্ছে। জগুনির শিয়রে বেজির ছানাটি ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু সরদেঈয়ের চোখে ঘুম নেই। জগুনির খালি গায়ের উপর কাঁথা ঢেকে দিয়ে সে ব'সে ঝড়ের কোলাহল শুনছিল। চটির কবাটগুলি হাওয়ার দাপটে এক-একবার যখন কেঁপে উঠছিল সরদেঈও তখন কী এক অনিশ্চিত আতঙ্কে কেঁপে উঠছিল !

বাইরের দরজায় কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে !

না, ঝড়ের শব্দ। সরদেঈ আপন মনে বিড়বিড়িয়ে উঠল : "এই হাড়জ্বালানে ঝড়ের রাত কি আর পোয়াবে না !"

কবাটে কিন্তু ধাক্কার পর ধাক্কা পড়ছেই। তার সঙ্গে কেউ থেকে

থেকে ডাকছে— "ভিতরে কে আছ, কবাট খোলো।"

এই অসময়ে নিশুতি ঝড়ের রাতে অচেনা মানুষের ডাক শুনে সরদেঈর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভয়ে কেঁপে উঠল। চোর না লশকর ?

বাইরের কবাটে ধাক্কার উপরে ধাক্কা পড়ছিল।

সরদেঈ জগুনিকে জোরে জোরে কয়েক বার নাড়া দিয়ে চাপা গলায় ডাকল—"জগুনি— জগুনি— !"

জগুনি চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসল।

জগুনিকে উঠে বসতে দেখে সরদেঈর মনে সাহস এল। তার শক্তি ও সাহসের উপর সরদেঈর চিরদিন অটল নির্ভর।

ভয়ার্ত কণ্ঠে সরদেঈ বললে, "শোন তো জগুনি, কে দোরে ধাক্কা মেরে ডাকে! চোর না লশকর বে ?"

জগুনি কান খাড়া ক'রে শুনল। তার পর একটা কুটোর দড়িতে আগুন ধরিয়ে হাতে টাঙ্গি নিয়ে অতি সন্তর্পণে খিল খুলল।

দোর খোলা মাত্র ঝড়ের ধাক্কায় কবাটটা দেওয়ালে এসে লাগল। দড়ির আগুনের ফুলকি ঝড়ে উড়ে চারিদিকে যেন মুঠো মুঠো আলোর কণা ছড়িয়ে গেল।

জগুনির সামনে দাড়িয়ে দু'জন পাইক। পরনে তাদের মালসাট আঁটা কাপড় আর গায়ে আঙ্গরাখা। কোমরে কোমরবন্ধ। তার উপরে আঁটা তকমায় নীলচক্রের চিহ্ন দেখে বোঝা যায় তারা খোর্ধার রাজার পাইক। মাথায় বাবরী চুলের উপরে উবুড় করা বাটির মত বিশাল পাগড়ি, চৌকো মুখে গালপাট্টা আর গোঁফ। কোমরবন্ধে বাঁকা ছুরি, বুকে ঢাল আর হাতে বর্শা। বারান্দার নীচে ঘোড়া দুটো মাটিতে পা ঠুকছিল।

জগুনি সরদেঈয়ের কাছে যত নিরীহ ও অসহায় অন্যের প্রতি

তত রূঢ় ও কঠোর। রুক্ষ কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, "কে তোমরা? চোর না লশকর? এই টাঙ্গি দেখেছ তো?"

একজন পাইক ক্লান্তভাবে বললে, "খোর্ধার বকশীর পাইক আমরা, বাণপুর যাচ্ছি, রাতটা থাকব এই চটিতে।"

কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় জগুনির মেজাজটা যেমন তিরিক্ষি হয়ে উঠেছিল হয়তো সে পাইক দু'জনের সঙ্গে ঝগড়াই বাধিয়ে বসত। তারা খোর্ধার পাইক জেনে সরদেঈ নিচু গলায় জগুনিকে বললে, "বল জগুনি, ওঁরা চটিতে থাকুন।"

জগুনি একটা হাই তুলে বললে, "আচ্ছা, এসো আমার সঙ্গে। ঘোড়া দুটো বেঁধে দিয়ো ঐ চালার নীচে।"

জগুনি আগন্তুকদের দেখিয়ে দিল চটির সঙ্গে লাগাও একটা চালাঘর, তার পর তাদের নিয়ে গেল পাশের ঘরের ভিতর।

ঝড় বাতাস অন্ধকার ভিতরের ঘরটিতে স্রোতের মত এসে ঢুকছিল। কিন্তু সরদেঈয়ের তখন আর কবাট বন্ধ করার কথা মনে নেই।

এরাও চলেছে বাণপুরে। এরা তো খোর্ধার পাইক, খোর্ধা রাজ্যের উপর আবার কি বিপদ এসে পড়ল?

ঝড়ের বেগ সামান্য কমেছিল। রাত্রির নিশুতি বেড়েছিল কেবল ঝাউবনের সোঁ সোঁ দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ যেন তেমনি রয়েছে চিল্কার জল ঝড়ের আঁধার রাতে কূল ছাপিয়ে যেতে চাইছিল যেন

জগুনি আবার অঘোর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অসময়ের চটিতে পাইকদের চোখে ঘুম আসছিল না। সরদেঈয়ের চোখেও ঘুম ছিল না। নিজের নানা লাগাড় চিন্তার মধ্যে তার অন্তঃস্থল ঝাউবনের মত বার বার হাহা ক'রে উঠছিল।

পাশের ঘরে পাইক দু'জনের কথাবার্তার মধ্যে একটি কথা হঠাৎ সরদেঈয়ের কানে এল: একজন পাইক আর-একজনকে বলছে, "বুঝলে হে রাউত, এবার খোর্ধার রাজার বুদ্ধি মামার বাড়ি দেখবে!" খোর্ধার রাজার নাম শুনে সরদেঈ কান পেতে তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগল।

রাউত অপ্রসন্ন স্বরে বলছে, "শিশুপালগড় ছাড়া ইস্তক তো অমনি বরফট্টাই করতে করতে আসছ। কথাটা কি খুলেই বল না, আমরা তো এক পথের পথিক।"

প্রথম জন উত্তর দিল, "বকশীর কাছ থেকে যে চিঠি নিয়ে মহারাণীর কাছে যাচ্ছ তাতেই তো রয়েছে তার হদিস। আমায় আর জিজ্ঞেস কর কেন?"

রাউত বলল, "তাতে কি হদিসটা আছে ভাল বলই না মিতে। আমি কি চিঠি খুলেছি না পড়েছি?"

প্রথম পাইক বললে, "কটক সুবার নায়েবের কাছে চিকাকোলের ফৌজদার 'পেস্‌কসে'র টাকা পাঠাচ্ছে। এই সড়কে সোলেরি ঘাটে তা বাটপাড়ি ক'রে লুঠ ক'রে নেবার জন্য বকশী মহারাণীর কাছে সংবাদ পাঠাচ্ছেন।"

রাউত বললে, "ভাল হদিস বাতলেছ মিতে! 'পেসকসে'র টাকা তো মহারাণীর পাইকরা লুঠ করবে, তাতে রাজার কী লোকসান হবে শুনি?"

অন্য পাইক বললে, "আহে খোর্ধার রাজার কাছে কটক সুবা সংবাদ পাঠিয়েছে : খবরদার, 'পেস্‌কসে'র টাকা যেন ভালয় ভালয় কটকের খাজনাখানায় পৌঁছায়। তা হলে দেখ, খোর্ধারাজ্যের মধ্যে সে টাকা যদি বাটপাড়ি হয় সে লেঠা পড়বে কার ঘাড়ে ?"

রাউত এবার গম্ভীর গলায় বললে, "রাজার ঘাড়ে, আর কার ঘাড়ে ?"

প্রথম পাইক খুসী হয়ে বললে, "সিংহল ব্রহ্মপুরে গাজী সুলতান বেগ্‌ তীরের ঘায়ে মরা ইস্তক কটক সুবা রাজার উপর দাঁত কিড়মিড় করছে। মুর্শিদাবাদ থেকে জরুরি খবর পেয়ে তকী খাঁ মুর্শিদাবাদ গেছে, তা না হ'লে এতক্ষণে খোর্ধা উলট-পালট ক'রে দিত, রাজা লোহার খাঁচায় ক'রে কটকে চালান হতেন হয়তো। তার উপর যদি পেস্‌কসের টাকা বাটপাড়ি হয় তা হলে খোর্ধার রাজার মাথার উপর শকুন উড়ল জেনে রাখো।",

রাউতের স্থূলবুদ্ধিতে এ কূটনীতির তাৎপর্য তবু বোধগম্য হয় নি। সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, "তা এতে বকশী সাআন্তের[1] কি লাভ ?"

প্রথম পাইক এবার খেঁকিয়ে উঠে বললে, "কি লাভ ? রাজ্য লাভ, আর কি লাভ ? বকশী রাজা হ'লে তোমারও লাভ আমারও লাভ, সবাইকার লাভ !"

এ ঘরে সরদেঈয়ের গায়ে কে যেন জলন্ত আগুনের ছেঁকা দিল ! সে আর কিছু বুঝল না, কেবল বুঝল খোর্ধার রাজার বিরুদ্ধে একটা ভারী ষড়যন্ত্র চলেছে, খোর্ধা রাজ্যের উপর যুদ্ধের হাঙ্গামা এসে পড়বে, তার মত আরো কত কুলবধূ হাতের চুড়ি-শাঁখা ভাঙবে, দেশ আবার শ্মশান হবে, খোর্ধার রাজা লোহার খাঁচায় ক'রে কটকে চালান হবেন।

1. সাআন্ত— 'সামন্ত'-এর কথ্য রূপ।

সরদেঈয়ের গলা দিয়ে একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল।

ঝাউবনের সোঁ সোঁ শব্দের সঙ্গে তালবন যেন লড়াইয়ের নাকড়া পিটছিল।

পাইক হঠাৎ ব'লে উঠল, "ও হে রাউত, ঘোড়ার জিনে থলের মধ্যে চিঠিখানা যে থেকে গেল।"

রাউত ঘুমজড়ানো গলায় বললে, "শুয়ে পড় হে মিতে। চিঠি তো থলির মধ্যেই রয়েছে, চিন্তা কি ?"

কিছুক্ষণ পরে পাইক দু'জনের নাক ডাকতে আরম্ভ করল। সরদেঈ তখন জগুনিকে নাড়া দিয়ে চাপা গলায় আস্তে আস্তে ডাকল —"জগুনি, হ্যাঁরে জগুনি— !"

জগুনি চোখ রগড়াতে রগড়াতে হাই তুলে বললে, "ধেৎ, আমায় ঘুমুতে দিবিনে দেঈ ?"

নিশুতি রাতে ঝড় তখনও গর্জন করছিল। সরদেঈ জগুনির কানের কাছে চুপি চুপি বললে, "চেঁচাস নি। ঘোড়ার চালায় চল। পাইক দুটোর ঘুম যেন না ভাঙে।"

জগুনি কিছু বুঝতে না পেরে যন্ত্রচালিতের মত সরদেঈয়ের পিছু পিছু ঝড় আর আঁধারের মধ্যে বাইরে বেরিয়ে এল।

4

কুরুলোবিশ সিংহল ব্রহ্মপুর গ্রামে সেদিন দধিবামন মন্দির ভাঙা পরিচালনা করতে করতে তীরের ঘায়ে টাট্টু ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে প'ড়ে গাজী সুলতান বেগের সঙ্গে সঙ্গেই 'ইন্তেকাল' হয়ে গিয়েছিল। আর তার ঘাসপাতাখেকো ঘোড়াটি তখনকার সেই অপার্থিব কোলাহলে

ভড়কে গিয়ে মাঠ-ক্ষেতের ভিতর দিয়ে আল বাঁধ না মেনে ঊর্ধ্বপুচ্ছ হয়ে যেভাবে পালাল তা দেখলে সেই বিভীষিকার মধ্যেও হাসি আসত।

মন্দিরের চত্বরে ফকীরা মিঞা ও আর-একজন মন্দির-ভঙ্গকারীর মৃতদেহও প'ড়ে ছিল। অকস্মাৎ কালবৈশাখীর ঝড় যেমন সব উলট-পালট ক'রে উড়িয়ে নিয়ে যায় তেমনি নিমেষের মধ্যে যে সব কাণ্ড ঘ'টে গেল, হিন্দু দর্শকরা ও মুসলমান মন্দির-ভঙ্গকারীরা কেউ তার কূল-কিনারা পেল না। মন্দির-ভঙ্গকারীরা যেমন আত্মরক্ষার জন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করেছিল, দর্শকরাও তেমনি অহেতুক আতঙ্কে কেয়াবন বাঁশবন প্রভৃতি নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন ক'রে কে স্বচক্ষে স্বয়ং জগন্নাথকে সাদা ঘোড়ার উপরে আর বলদেবকে কালো ঘোড়ার উপরে দেখেছে, আর কেই-বা খোর্ধার রাজা হাফিজ কাদ্‌র্‌কে ঘোড়ার পিঠে ব'সে তীর মারতে দেখেছে তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় গল্প জুড়ে দিয়েছিল।

তার পরে ক্রমে অন্ধকার হয়ে এলে তারা সেই অফুরন্ত আলোচনায় আরো জট পাকিয়ে গাঁয়ের দিকে ফিরে গিয়েছিল।

কয়েকজন মন্দির-ভঙ্গকারী মন্দিরের অনতিদূরে একটা বাঁশবনে গিয়ে লুকিয়েছিল। গাঁয়ের লোকেরা চ'লে গেলে তারা সাবধানে সেখান থেকে বেরিয়ে এল। সন্ধ্যার আকাশের গায়ে মন্দিরটি ছায়াচিত্রের মত দেখাচ্ছিল। কলসটি শাবলের ঘায়ে একপেশে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের দৃষ্টি আর তখন সে দিকে ছিল না। তারা নিঃশব্দে চুপি চুপি এসে মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে ফকীরা মিঞা ও আর এক মুসলমানের শব সশ্রদ্ধ সাবধানতার সঙ্গে গাজী মিঞার মৃতদেহের কাছে তুলে নিয়ে এল। তার পর কিছু দূরে এক শিমুল গাছের

তলায় শাবল দিয়ে গর্ত ক'রে সেই অন্ধকারে তিনটি কবর খুঁড়ল।

দক্ষিণ আকাশে একটি তারার ক্ষীণ আলোয় পথ দেখে তারা প্রথমে গাজীমিঞার দেহ এনে মাঝের কবরের ভিতর নামিয়ে দিয়ে মাটি চাপা দিল। তার পর আর-দুটি দেহকে তার দুই পাশে কবর দিল। মন্দিরের প্রাচীরভাঙা পাথর তুলে এনে কবর তিনটির উপর পেতে দিল। সব চেয়ে বড় পাথরটা পাতল গাজী মিঞার কবরের উপরে। আর-দুটি কবরের চাইতে এটি উঁচু হ'ল।

কবর তিনটির উপরে শাখাপ্রশাখা মেলে রইল সেই প্রকাণ্ড শিমুল গাছ। তার ডালে ডালে অসংখ্য জোনাকী আলোর চক্ষু মেলে দপদপ করতে লাগল। কাছেই নানা লতাপাতার জঙ্গল। তার পরে বাঁশবন আর কেয়াবন, তার ওপাশে ধানের ক্ষেত বরাবর চলে গেছে দলতলা পাহাড়ের নীচেকার জঙ্গল পর্যন্ত। কবর দেওয়া যখন শেষ হল তখন কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর চাঁদ দূরের বাঁশবনের উপরে উঠে এসেছে। গাজী মিঞা ধর্মের জন্য প্রাণবলি দিয়ে শহীদ পীরে পরিণত হলেন। ফকির মিঞা ও অন্যজন গাজী মিঞার মত বিশিষ্ট না হওয়ায় গাজী পীরের মুরিদ্ (শিষ্য) রূপে তার দুই পাশে কবরের ভিতরে চিরনিদ্রায় শয়ন করল। আবার যেদিন 'তেজ্‌ভিদ্ (অভ্যুত্থান) -এর শুভলগ্ন আসবে সেদিন গাজী পীরের সঙ্গে এরা আবার কবর থেকে উঠবে। তাদের উদ্দেশে মুবারক্‌বাদ জানাতে তারা মাটিতে হাঁটু গেড়ে ব'সে দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ ক'রে উপরে আকাশের দিকে চেয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে কয়বার উচ্চারণ করল—"কেরামৎ কেরামৎ।" তার পর শহীদদের উদ্দেশে শেষ প্রণাম জানিয়ে তারা মাঠের ভিতর দিয়ে ম্লান জ্যোৎস্নার আলোয় মিলিয়ে গেল।

গাজী সুলতান বেগ্ পীর-ই-রৌশন আলি বুখার্-এর শিষ্যমণ্ডলী-

ভুক্ত ছিলেন। এই আলি বুখার্ নাকি কালাপাহাড়ের সঙ্গে ওড়িশা এসেছিলেন কাফেরদের মন্দির ভেঙে তার জায়গায় মস্জিদ তুলবেন ব'লে। বহু মন্দির ও দেবমূর্তি ভেঙেছিলেন আলি বুখার্। ঐতিহাসিকেরা বলেন বারবাটী দুর্গ আক্রমণের সময়ে প্রতিপক্ষের তলোয়ারে তাঁর দেহ দুই খণ্ড হয়েছিল। তাঁর মাথা পড়েছিল বারবাটী দুর্গে, ধডটা তাঁব বিশ্বস্ত ঘোড়া পিঠে ক'বে নিয়ে গিয়েছিল যাজপুরে। তাই আলি বুখারের দুইটি সমাধি দুই বিভিন্নস্থানে রয়েছে। বারবাটী দুর্গে যেখানে মাথা পড়েছিল সেখানে একটি, আর অন্যটি তৈরি হয়েছিল যাজপুরে মুক্তিমণ্ডপ-পীঠের উপরে— যেখানে আলি বুখারের কবন্ধ কবর পেয়েছিল। কাফেরের দেবদেবী ও মন্দিরের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ সত্ত্বেও ইতিহাসের এক পরিহাসে যেমন কাফেরদেরই মুক্তি-মণ্ডপ-পীঠে আলি বুখাবের আত্মা 'তজ্‌জিদের' প্রতীক্ষায় অন্তিম বিশ্রাম লাভ করেছিল, কাফের হিন্দুরা তেমনি 'ধর্মরাজ' আলি বুখারের সমাধিকে ক্রমে এক পবিত্র পীঠস্থানে পরিণত করেছিল। বাস্তবিক, হিন্দুরা এমনি মন্দিরবিধ্বংসীদের পীবস্থানে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে যত শিরনি চড়িয়েছে মুসলমানেরাও তত করে নি!

পীর-ই-রৌশনের মত গাজী সুলতান বেগ্‌ও একজন নিষ্ঠাবান্ মুসলমান ছিলেন। খর্বাকৃতি পৃথুলকার মূর্তি, সারা মুখে বসন্তের দাগ, পিঙ্গল চোখ দুইটি ভিতরে ঢুকিয়ে বসানো, চ্যাপ্টা ও চওড়া নাক, দুই টুকরা চালতার মত দুই ঠোঁট—এমনি ছিল তাঁর চেহারা। গায়ে কালো আলখাল্লা আর হাজীত্বের নিদর্শন স্বরূপ মাথার বাবরী চুলের উপর চাকতির আকারে একটি মোটা সাদা দড়ির কুণ্ডলি। তার উপরে সাদা টুপি, গলায় লাল নীল পাথরের মালা। বাহন একটি রোগা টাটু ঘোড়া। হিজলী-মেদিনীপুর থেকে পুরী খোর্ধা পর্যন্ত মুসলমান

ফৌজদার সুবাদারদের কেল্লায় তিনি যেমন সম্মানের পাত্র ছিলেন, হিন্দু মন্দিররক্ষক ও দুর্গপতিদের কাছে ছিলেন তেমনি আতংকের স্থল। নায়েব-নাজিম তকী খাঁর দরবারে তাঁর অতিশয় খাতির। এ-সবের উপর তিনি ছিলেন এক অলৌকিক শক্তির অধিকারী : তাঁর নাম নিয়ে খুঁজলে হারানো গোরু থেকে শুরু ক'রে চোরাই মাল পর্যন্ত সব নাকি 'বরামৎ' হতে পারত।

এর প্রমাণও মিলেছিল খোদ তকী খাঁর দরবারে! একবার তকী খাঁর একটা হীরে-বসানো আংটি লালবাগের গোশলখানার মধ্যে হারিয়ে যায়। আমীর ওমরাহ্ মীর বকশী মুৎসদ্দীরা আংটি খুঁজে খুঁজে লবেজান হয়ে গেলেন। এই সময়ে একজন গাজী সুলতানের নাম নেওয়াতে নাকি আংটিটি গোশলখানার স্নানের কুণ্ডের ভিতর থেকে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু আংটি চুরির সন্দেহে গোশলখানার এক বেচারী ভিস্তীকে শূলে চড়ানো হয়েছিল। সেইদিন থেকে গাজী পীরের 'নেকনাম' চারিদিকে জাহির হয়ে গেল। গাজীকে ইনাম নিতে চাইলেন তকী খাঁ। কিন্তু গাজী পরমার্থী মানুষ, গুরু আলি বুখারের মত তিনিও রজ্‌ম্ (যুদ্ধ), বজ্‌ম্ (ভোজ) ও ইবাদাত্ (ঈশ্বরোপাসনা) ছাড়া আর কিছু জানতেন না। ভদ্রখ্ থেকে খোধা পর্যন্ত যত মন্দির আছে সে-সব ভেঙে মসজিদ ও ইমামবাড়া বানাতে পারলে বুঝি তাঁর জীবনের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হয়। তার জন্য গাজী মিঞা দিল্লী-শাজাহানাবাদ থেকে পরোয়ানাও পেয়েছিলেন। তাঁর হুকুমের খেলাপ করলে অথবা কোনও হিন্দু তাঁর প্রতিরোধ করলে তার প্রাণদণ্ড দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কাজীদের।

গাজী সুলতান বেগ্ এই পরোয়ানার জোরে নতুন ক'রে এক কালাপাহাড়ী আক্রমণ শুরু করেছিলেন। যাজপুরে বিরজাদেবীর

মন্দিরের সামনে চণ্ডেশ্বর স্তম্ভ তাঁর শাবলের প্রহারে হেলে পড়েছিল। স্তম্ভের চূড়ার পক্ষীরাজ গরুড়ের মূর্তিটি কেবল শাবলের আঘাতে স্থানচ্যুত হয়ে পড়েছিল, স্তম্ভটির যদিও আর কোনো ক্ষতি হয় নি। যাজপুরের দশাশ্বমেধ ঘাটের সপ্তমাতৃকা মূর্তিগুলিকে তিনি বৈতরণী নদীর গর্ভে নিক্ষেপ ক'রে মন্দিরটি মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। মন্দিরের ভাঙা পাথর মসজিদ তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। তেমনি, নিকটবর্তী বড়ডিহ পাহাড়ের বৌদ্ধকীর্তিগুলি ধূলিসাৎ ক'রে সেখানে পাহাড়ের উপরেও তিনি নির্মাণ করেছিলেন এক মসজিদ।

অবশেষে তাঁর শনির দৃষ্টি পড়েছিল সিংহল-ব্রহ্মপুরের দধিবামন মন্দিরের উপর। কিন্তু সেই মন্দির ভাঙতে গিয়েই ঘটল তার স্বর্গপ্রাপ্তি।

এমনি পীর মুজাহিদদের দেহ মুসলমান ভক্তেরা যথাবিধি কবর না দিয়ে কাফেরের ভূমিতে ফেলে চ'লে আসবে কেমন ক'রে। তাই বিপদের শত আশঙ্কা সত্ত্বেও শবগুলিকে উচিত মতে কবর দেবার পরে দেউলভঙ্গকারীরা আপন আপন গ্রামের দিকে অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্তে ফিরে গেল।

পর দিন সকালে ভাল করে ভোর না হতেই সিংহল-ব্রহ্মপুর গ্রামের তান্ত্রিক গোবিন্দ ত্রিপাঠী হনুমের মত মেরুদণ্ডটি বাঁকিয়ে কোমরের তলায় একটি অনতিপ্রশস্ত গামছায় আপাততঃ লজ্জানিবারণ ক'রে বাঁ হাতে একটি ঘটি ও দক্ষিণ হস্তের দুই আঙুলের অগ্রভাগে নস্যি শুঁকতে শুঁকতে বিষ্ণুনাম স্মরণপূর্বক প্রকৃতির আবশ্যিক তাড়নায় শিমুলগাছের নিকটবর্তী লতাপাতার জঙ্গলের পিছনে কেয়াঝোপের দিকে অগ্রসর হওয়ার কালে শিমুলতলায় তিনখানা পাথর সমান ক'রে শোয়ানো দেখে থমকে দাঁড়ালেন। গতকাল মধ্যাহ্ন মন্দির ভাঙার

সময়ে হঠাৎ ভৌতিক ব্যাপারের মত যে-সব কাণ্ড হয়ে গিয়েছিল সে-সব তাঁর মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল। সেইখানে শিমুল গাছের তলায় ঘোড়ার পিঠ থেকে গাজী মিঞার দেহ যেখানে শরাঘাতে ভূমিশায়ী হয়েছিল গোবিন্দ তিহাড়ী চক্ষুমার্জনপূর্বক সেইদিকে দৃষ্টিপাত করলেন। লাস শেয়ালে টেনে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু তার কোনও চিহ্ন দেখতে পেলেন না।

তখন অকস্মাৎ তাঁর পূর্ণ প্রতীতি হল, তাই তো, মন্দির-ভঙ্গকারী মুসলমানগুলো দধিবামনজীউর অভিশাপে পাথর হয়ে গেছে যে!

গোবিন্দ তিহাড়ীর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। সেই উত্তেজনার মধ্যে তিহাড়ীর নিকট থেকে প্রকৃতির তাড়না সম্পূর্ণ বিতাড়িত হয়েছিল। তিনি সেইখান থেকে গাঁয়ের রাস্তায় ফিরে গিয়ে দুয়ারে দুয়ারে সোর তুললেন, "আরে দ্যাখ্ রে 'চকাডোলা'[1] বলিআরভুজের অভিশাপে অল্লায় ম্লেচ্ছগুলো পাথর হয়ে গেছে রে! পাষাণ হয়ে গেছে রে! আরে, দেখবি আয় রে! দৌড়ে আয় রে!"

যাদের চোখে ভোরবেলাকার ঘুম আর-এক প্রস্থ ঘিরে আসছিল অথবা যারা সদ্য ঘুম ভেঙে উঠেছিল, তিহাড়ীর চীৎকারে তারা সবাই সদর দুয়ারের খিল খুলে ব্যাপার কি দেখবার জন্য রাস্তার মাঝে দৌড়ে এল।

তিহাড়ী কিন্তু ততক্ষণে চলেছেন চউপাঢ়ীর দিকে, গড়নায়ককে আগে খবরটা দিয়ে আসতে। তিহাড়ীর এলোমেলো কথা থেকে কে কী বুঝল কে জানে। কেউ কেউ বললে ম্লেচ্ছেরা মন্দিরের উপরে ওঠাতে দধিবামন রাগ করে শিমুলতলাতে চ'লে এসেছেন, সেইখানে তাঁর নতুন দেউল তোলা হবে। আর কেউ-বা বুঝল

1. চকাডোলা—যার চোখের ডোলা অর্থাৎ তারা চাকার মত, শ্রীজগন্নাথ।

ম্লেচ্ছেরা আবার মন্দির ভাঙতে ধেয়ে আসছে। আর কেউ তিহাড়ীর বক্তব্যটা বুঝতে পেরে ঘোষণা করলে ম্লেচ্ছগুলো পাথর হয়ে গেছে। কিন্তু যে যাই বুঝুক সকলেই ছুটল মন্দিরের দিকে ব্যাপারটাস্বচক্ষে দেখবার জন্য।

গোবিন্দ তিহাড়ী শিমুলগাছতলায় গাজী মিঞার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক বলছিলেন : "দেখ দেখ, অল্লায়ু ম্লেচ্ছগুলো পাষাণে পরিণত হয়েছে।"

গতকাল মন্দিরের উপরে ম্লেচ্ছদের আক্রমণের চাইতে তারা যে রাতারাতি পাথর হয়ে গেছে এটাই সকলের মনে অধিক উত্তেজনার সৃষ্টি করল। হোক না তারা ম্লেচ্ছ, 'চকাডোলা'র অভিশাপে তারা যখন পাষাণ হয়েছে তখন 'চকাডোলা'র বিভূতিও অবশ্য তারা কিছু পেয়েছে! মহিষমর্দিণী দুর্গার সঙ্গে মহিষাসুরও তো পূজার ভাগ পায়। সেই বিবেচনায় কেউ কেউ কবরের পাথরের উপরে কখন একটি পিদিম জ্বালিয়ে সিঁদুর লেপতে শুরু করেছিল।

সিংহল-ব্রহ্মপুরের আশপাশের গ্রামগুলিতে দধিবামনের মহিমার প্রচার আর আলোচনা ছাড়া দিনকয়েক সে তল্লাটে আর অন্য কথা ছিল না। জগন্নাথ সাদা ঘোড়ায় আর বলরাম কালো ঘোড়ায় চ'ড়ে দধিবামনকে রক্ষা করতে আসার প্রত্যক্ষদর্শীদের জনরবটা তার মধ্যে গৌণ হয়ে পড়েছিল।

কয়েক দিন পরে একদিন খাড়া দুপুরবেলা মক্‌রামপুরের মৌলবী সঙ্গে একদল মুসলমান নিয়ে সিংহল-ব্রহ্মপুরের সেই কবরস্থানে এলেন। মুসলমানরা আবার দেউল ভাঙতে এসেছে এমনি এক গোল ওঠায় লোকেরা বাঁশঝাড় আর কেয়াবনের ভিতর পালিয়ে গিয়ে সেখান থেকে মুসলমানদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। কিন্তু দেখল এবার তারা

দেউলের ত্রিসীমানায় পা না দিয়ে অতি নিরীহভাবে কবরের কাছে গেল। কবরের উপর পুরু ক'রে কলিচুন ধরালো তারা। সঙ্গে তারা এনেছিল লাল সালুর তৈরি চাঁদোয়ার মত তিনখানি কাপড়, সেগুলির জমিতে সাদা কাপড়ে বড় বড় চন্দ্রবিন্দুর মত চিহ্ন সেলাই ক'রে লাগানো। পিপিলীর বাজারে প্রায় ঐরকমই চাঁদোয়ার কাপড় ঢের পাওয়া যায়। ঠাকুরের সিংহাসনের উপরে চাঁদোয়া টাঙাবার জন্য লোকে তা কেনে। কিন্তু এখন মুসলমানে সেইরকম সালুর চাঁদোয়া দিয়ে ঐ চৌরস পাথরগুলিকে এত শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে ঢেকে দিল কেন তা বাঁশবন আর কেয়াঝোপের আড়াল থেকে সিংহল-ব্রহ্মপুরের লোকে বুঝতে পারল না। তার পর মুসলমানেরা কবরের পাথরগুলির নীচে সারি সারি ধূপকাঠি পুঁতে জ্বেলে দিলে। ধূপের ধোঁয়া প্রথমে তেরছা হয়ে তার পরে কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠে মিলিয়ে যেতে লাগল। মৌলবী ছোটে মিঞা দাঁড়িয়ে উঠে, হাঁটু গেড়ে, আবার দাঁড়িয়ে, আবার হাঁটু গেড়ে দোয়া জানালেন। অন্য মুসলমানেরা মৌলভীর অনুকরণে তেমনি দাঁড়িয়ে, হাঁটু গেড়ে দোয়া পড়লে। তার পরে তারা মাঠের ভিতর দিয়ে আবার মকরামপুরের দিকে ফিরে গেল।

সিংহল-ব্রহ্মপুরের লুক্কায়িত দর্শকেরা তখন তাদের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বেরিয়ে কবরের কাছে এসে জমা হ'ল। সেইখানে এক-একটি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ক'রে আর কেউ কেউ তার উপরে আরো খানিকটা সিঁদুর লেপে দিয়ে, সবাই গাঁয়ের দিকে ফিরল। সমস্ত ঘটনাটা তাদের কাছে একটা রহস্য হয়েই থেকে গেল।

কিন্তু তার কিছুদিন পরে যখন ভিন গাঁয়ের একলা একটি মুসলমান কবরের কাছে ধূপকাঠি জ্বেলে দোয়া করতে এল তখন গাঁয়ের লোক তাকে শুধিয়ে জানল যে মাটির ঢিবির উপর সেই বড় পাথরটা হল

গাজী সাহেব পীর, তাঁর কাছে দোয়া দিলে হারানো জিনিষ পাওয়া যায়। তার মেয়ের গলার রুপোর মাদুলি-হার খামারে হারিয়ে গিয়েছিল, গাজী পীরকে দোয়া দিয়ে মানত করাতে হারটি কুটোর গাদায় খুঁজে পাওয়া গেছে। তাই সে এসেছিল গাজী পীরের কাছে মানতের পূজা দিতে।

সেই দিন থেকে গাজী সাহেব পীরের কবরের সেই লম্বা পাথরটি সিংহল-ব্রহ্মপুর ও আশপাশের গাঁয়ে গাজীশা পীর নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল। দধিবামনজীউর কাছে যারা আসত, গাজীশা পীরের স্থানেও একটি গড় না ক'রে তারা ফিরত না।

দধিবামন মন্দিরের প্রাচীরের শীতল অভয়চ্ছায়াতলে গাজী সাহেবের কবরের চারিদিকে ও তাব উপরে ক্রমে বহু আগাছা ও লতাপাতার শ্যামলতার মধ্যে অগনতি ছোট ছোট লাল গোলাপী ফুল হিন্দু-মুসলমান ধম ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের মত যখন ফুটে উঠেছিল তখন কটক লালবাগ কেল্লায় আমীর ওমরাহ্ মহতাসিব কাজী ও বকশীরা খোর্ধা আর সেইসঙ্গে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের উপরে আর-একবার আক্রমণ শুরু করবার জন্য দাঁত কড়মড় করছিলেন। গাজী সাহেবের মত পীর পয়গম্বর সিংহল-ব্রহ্মপুরের মত সামান্য পাড়াগেঁয়ে কাফেরের অস্ত্রে শহীদ হলেন এটা তাঁদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল।

কিন্তু সে সময়ে নায়েব-নাজিম তকী খাঁ শ্বশুর সুজা খাঁর আদেশে ফৌজ কুচ করিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন পাটনা-আজিমাবাদে। বিহার

সুবায় ঘাড় গুঁজে প'ড়ে থাকা আফগান শক্তি তখন হঠাৎ মাথা তুলে সুজা খাঁর অতি অনুগত সুবাদার আলিবর্দী খাঁয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। সুজা খাঁর হুকুম পেয়ে তকী খাঁ গিয়েছিলেন আলিবর্দী খাঁর সাহায্য করতে। তাঁর অনুপস্থিতিতে মিত্ররাজ্য খোর্ধার উপরে আক্রমণ করতে কেউ ঠিক ভরসা পাচ্ছিলেন না। তাই সবাই তকী খাঁর প্রত্যাবর্তনের উৎকণ্ঠ অপেক্ষায় ছিলেন।

এদিকে সেই অবসরে গাজীসাহেব পীর 'গাজীশা' থেকে ক্রমে 'গঞ্জেইশা'য়[1] নামান্তরিত হয়ে গিয়েছেন। তা হয়েছিল এমনি ভাবে :

প্রথমেই বলে রাখা আবশ্যক যে গাজীসাহেব কোরানশরীফের পবিত্র নির্দেশ অনুসারে সুরা স্পর্শ করতেন না, কিন্তু সে কালের বহু সাধু-সন্তের মত গাঁজা-ভাঙের প্রতি তাঁরও বিতৃষ্ণা ছিল না। একবার কোনও মুসলমান তার চুরি যাওয়া জিনিষের জন্য গাজীশার কাছে মানত করে সে জিনিষ ফিরে পেয়ে গাজীশার পীরস্থানে শিরনি দিতে এসেছিল। মুসলমানেরা দোয়া দিতে এলে তাদের সঙ্গে সাধারণতঃ এক-আধ জন হিন্দুও এসে জুটত। সেদিনও সেখানে নিকটস্থ হংসুআ গাঁয়ের নরি পলেই, বন্ধু রাউত প্রমুখ ভক্তগণ উপস্থিত হয়েছিল। গাজীশাকে পানা নৈবেদ্য দেওয়া হচ্ছে দেখে তারা বড় আশান্বিত হয়েছিল। পানা থেকে গাঁজার দূরত্বটা কতখানি এবং কত দিন বজায় থাকত কে জানে ; কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ একদিন নরি পলেইর একটা বুড়ো বলদ কোথায় হারিয়ে গেল। বলদ হারানোয় ঘরে অরন্ধন, ঘরের সাবালক নাবালক সবাই কোঁচড়ে এক এক মুঠো চিঁড়ে হুড়ুম নিয়ে বলদ খুঁজতে বেড়িয়ে গেল। গোটাদিন

1. গঞ্জই — গাঁজা

চলে গেল, বলদ মিলল না। এমনি সঙ্কটের সময়ে পলেইয়ের মনে পড়ে গেল সিংহল-ব্রহ্মপুর গাঁয়ের গাজীশার কথা। মনে মনে সে গাজীশার কাছে মানত যাচলে। তারপর অদ্ভুত ব্যাপার, বলদ মিলে গেল এক কেয়াবনের ভিতর থেকে। তারপর বৃহস্পতিবার দিন নরি পলেই খুব ঘটা ক'রে গাজীশা পীরের কাছে মানতের পূজা দিলে। ধূপকাঠির ধোঁয়ার সঙ্গে সেদিন গাঁজার ধোঁয়া মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

সেই থেকে গাজীশা পীরের ডাকনাম অপভ্রষ্ট হয়ে পরিণত হল গঞ্জেইশা পীরে। এরপর দেখা গেল হিন্দু মানতকারীর সংখ্যা ক্রমে বাড়তে শুরু করেছে। সকলেই কিছু-না-কিছু হারিয়ে গঞ্জেইশার পীর-স্থানে মানত ক'রে তা আবার খুঁজে পেতে লাগল। তারপর গঞ্জেইশা পীরের কাছে লেগে গেল মচ্ছব। কিন্তু মুসলমানেরা সেখানে গাঁজা টানা পছন্দ করত না। তারা বলত কবর থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে শিমুল গাছের মোটা মোটা শিকড়গুলি যেখানে অজগর সাপের মত প'ড়ে আছে তার উপর ব'সে যত খুশি গাঁজা টানো। গাঁজা টানায় তাদের আপত্তি ছিল না। অমনি মাইফেলে মিলিত কণ্ঠে শোনা যেত অচ্যুতানন্দ গোসাঞিের ভজন— "তুর্কী ভজে অলেফ্ হিন্দু ভজে অলেখ।"

কেবল খোর্ধার আকাশে তখন কাল-শকুন আবার যে ডানা ঝাড়া দিচ্ছিল তার দিকে কারও দৃষ্টি ছিল না।

দলতলা পাহাড়ের নীচে গড় রাউতপড়ার কাছে সিংহল-ব্রহ্মপুর গ্রাম। সিংহল-ব্রহ্মপুরের চউপাড়ীটি রাউতপড়া গড়ের অধীনে ছিল।

খোর্ধার চারিদিকে একরকম ব্যূহরচনা ক'রে যে গড়গুলি ছিল গড় রাউতপড়া সেগুলির অন্যতম। যেদিন গাজী সুলতান বেঙ্গলবল নিয়ে সিংহল-ব্রহ্মপুরে মন্দির ভাঙতে এসেছিল সেদিন রামচন্দ্রদেব দলতলা জঙ্গলে শিকারে এসেছিলেন। সেখানে খবর পৌঁছাল মুসলমানেরা দধিবামন মন্দির ভাঙছে। খবর পাওয়ামাত্র রাউতপড়া গড় থেকে ধনুক-ধারী পাইকদের নিয়ে সেখানে এসে তিনি কী ক'রে মন্দির রক্ষা করলেন তা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

মন্দিরভঙ্গকারীদের উপর আক্রমণের সময় রামচন্দ্রদেব আপন উপস্থিতি গোপন রাখবার চেষ্টা করলেও তা গোপন রইল না। স্বয়ং রামচন্দ্রদেবের আক্রমণে সেদিন সিংহল-ব্রহ্মপুরে মন্দির ভাঙতে গিয়ে গাজী সুলতান নিহত হয়েছেন এ সংবাদ লোকের মুখে মুখে খোর্ধা ও কটকে গিয়ে পৌঁছাল। রামচন্দ্রদেব এই ঘটনায় সম্পৃক্ত থাকতে পারেন না, কলমা প'ড়ে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে হিন্দু মন্দির ও দেবতাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না এ-সব কথা ভেবে খোর্ধায় নায়েব-নাজিম তকী খাঁর উকিল লোধুমিঞা তা মোটে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। লোধুমিঞা লোকটি রামচন্দ্রদেবের উপর বড় সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত টাক মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে শুধু অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন— "তোবা তোবা!" তকী খাঁ আজিমাবাদ থেকে ফিরে এ বৃত্তান্ত শুনলে তাঁর উপরেই যে রাজরোষ পড়বে সে সম্বন্ধে তাঁর তিলার্ধও সন্দেহ ছিল না।

খোর্ধা পাথরগড় 'উআসে' রামচন্দ্রদেব ও লোধু মিঞা মনে মনে সেই-সব চিন্তা করছিলেন। তাই দুজনের মধ্যে দাবা খেলাটা সেদিন মোটে জমছিল না। দাবার ছকের উপরে ঘুঁটি চালাতে কেউ ব্যস্ত

লেন। চিন্তাকুলচিত্তে ঘুঁটি হাতে নিয়ে তাঁরা কেবল ঘোরাচ্ছিলেন ফেরাচ্ছিলেন। লোধু মিঞার মুখ আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তায় বিমর্ষ। কিন্তু রামচন্দ্রদেবের ভাব অন্য রকম। নিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী দুর্যোগের সম্মুখীন হ'লে সব আতঙ্ক আশঙ্কা কেটে গিয়ে ফুটে ওঠে যে অচঞ্চল সাহস ও ধৈর্য রামচন্দ্রদেব এখন তারই বলে নায়েব-নাজিম তকী খাঁর মোহড়া নেবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

গাজী সুলতানের মৃত্যু তকী খাঁর শত্রুতার উপস্থিত কারণ বটে, কিন্তু এমনিতেও খোর্ধারাজ্যকে কটক সুবার অন্তর্ভুক্ত ক'রে মোগল-বন্দিতে পরিণত করা তকী খাঁর প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় ছিল—যেদিন থেকে দক্ষিণে টিকালী-রঘুনাথপুর খোর্ধার হাত থেকে চ'লে গিয়েছিল। অতীতে মানসিংহ ও কেশোদাস মারু প্রমুখ মোগল সেনাপতি থেকে খান-ই-দৌরান পর্যন্ত বহু ফৌজদার ও নায়েব-নাজিম বারম্বার সেই চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন। কিন্তু স্বাধীনতা বজায় রাখতে সমর্থ হলেও বার বার আক্রমণে খোর্ধার পাইকদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা ও সেই সঙ্গে দেশের চাষবাসের অবস্থায় বড়ই বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। তার উপর প্রতি বৎসর যুদ্ধ নয়তো বন্যার দরুন দুর্ভিক্ষ। আক্রমণ-কারীদের এ সব আভ্যন্তরীণ সমস্যা ছিল না। তাই তারা প্রত্যেক বারই নূতন তেজে আক্রমণ করতে পারছিল, অপর পক্ষে খোর্ধার পাইকদের অবস্থা উত্তরোত্তর শোচনীয় হওয়ায় তাদের মনোবল ভেঙে গিয়েছিল। তার উপর পাইকদের বেতন দেওয়ার মত অর্থও ছিল না খোর্ধার রাজকোষে।

এ সবের উপর আর-একটি বড় বিপদ উপস্থিত হয়েছিল। জগন্নাথের সেবকচূড়ামণি হিসাবে খোর্ধার রাজার প্রতি আঠারো গড়জাতের সামন্তরাজগণ তথা অন্যান্য দুর্গপতিদের যে বিশ্বস্ততা ছিল,

রামচন্দ্রদেব জাতিভ্রষ্ট হওয়ার পর তাতেও ফাটল ধরেছিল। ওদিকে সেই কারণেই রাজকুমারেরাও বিদ্রোহী। সিংহাসনের লোভে এখন পিতৃহত্যাতেও তাঁরা কুণ্ঠিত নন। বকশী এবং দেওয়ানও ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন। এই সবরকম কারণে খোর্ধাকে মোগলবন্দিতে পরিণত করার এটাই ছিল মাহেন্দ্রক্ষণ।

কেবল কতকগুলি রাজনৈতিক কারণে তকী খাঁ এখনও খোর্ধা রাজ্যকে খাসে আনতে সাহস করছিলেন না— যে-সব কারণে পূর্ববর্তী নায়েব-নাজিম সুজা খাঁর নীতিও খোর্ধা খাস করার বিরুদ্ধে ছিল। রাজাকে পরাজিত করা সম্ভব, কিন্তু খোর্ধাকে জয় করা সম্ভব ছিল না। কারণ বিপক্ষের সামরিক পরাজয় আর রাজনৈতিক বিজয় এক নয়। আকবরের দূরদর্শী সেনাপতি মানসিংহ সে পার্থক্য বেশ বুঝেছিলেন। সেইজন্য খোর্ধার পাইকদের মোগল সাম্রাজ্যের অঙ্গে বিষকণ্টক ক'রে স্থাপন করার পরিবর্তে ওড়িশায় আফগান শক্তির বিরুদ্ধে তাদের রক্ষাকবচরূপে ব্যবহার করতেই তিনি চেয়েছিলেন। এই নীতি অনেকাংশে সফলও হয়েছিল। সেই অবধি খোর্ধা সম্বন্ধে মানসিংহের সেই দূরদৃষ্টিসূচক উদার নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়ে আসছিল। সুজা খাঁও অতি বিশ্বস্তভাবে সেই নীতির অনুসরণ করেছিলেন।

আবার ইতিমধ্যে বিহার ও উত্তর উড়িশায় আফগান শক্তি আবার যেরকম মাথা তুলছিল তাতে খোর্ধার পাইক ও গড়জাতের সামন্ত রাজারা যদি ইন্ধন জোগায় তা হলে ওড়িশায় মোগলের স্থিতি বিপন্ন হয়ে পড়বে এতে ভুল নেই। তাই খোর্ধা ও জগন্নাথের বিরুদ্ধে কোনও রকম অপরিণামদর্শী মতান্ধ কার্যক্রম যাতে অবলম্বন না করা হয় সেজন্য মুর্শিদাবাদ থেকে সুজা খাঁ তকী খাঁকে পদে পদে সাবধান ক'রে আসছিলেন। রামচন্দ্রদেবকে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে বন্দী করার

পরেও তকী খাঁ তাঁর প্রতি যে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার ক'রে আসছিলেন তার পিছনে এই সব নির্দেশই কাজ করছিল।

রামচন্দ্রদেব ধর্মান্তরিত হয়ে হাফিজ্ কাদ্‌র্ হবার পর থেকে খোর্ধায় কাফের রাজত্ব ক্রমে লোপ পেয়ে ইসলামের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে তকী খাঁর এমনি এক গভীর ধর্মীয় বিশ্বাসও ছিল। কিন্তু তার পরিবর্তে গাজী সুলতান বেগের মত পীর পয়গম্বর খোর্ধা রাজ্যের কাফেরের শরাঘাতে শহীদ হবেন এ ব্যাপার স্বয়ং সুজা খাঁরও বেবরদাস্ত ছিল। এইটিকে ছুতা ক'রে তকী খাঁ খোর্ধার উপরে আবার আক্রমণ করবে এতে আর সন্দেহ ছিল না।

লোধু মিঞা বললেন, "লালবাগের ওয়াকিয়ানবিশ (সংবাদলেখক)-রা খবর পেয়েছে নায়েব-নাজিম মহম্মদ তকী খাঁ বাহাদুর রমজানের আখেরে মুর্শিদাবাদ থেকে কটকে ফিরে আসবেন। মুর্শিদাবাদ থেকে এই খবর পেয়েছে তারা।"

কিন্তু রামচন্দ্রদেব আর সে আশঙ্কায় আশঙ্কিত ছিলেন না। চরম দুর্যোগের সম্মুখীন হতে তিনি তখন প্রস্তুত। বকশী বেণু ভ্রমরবরের প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টায় রামচন্দ্রদেবের প্রতি অধিকাংশ দুর্গপতিদের আনুগত্য কমে এলেও কয়েকটি সামন্ত রাজা ও দুর্গপতি তখনও সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত ছিলেন।

সিংহল-ব্রহ্মপুরে গাজী মিঞা নিহত হবার পর থেকেই আবার মোগল আক্রমণের আশঙ্কায় রামচন্দ্রদেব তাঁদের সঙ্গে গোপন যোগ-সূত্র স্থাপন করতে শুরু করেছিলেন। সেদিন সেই উদ্দেশ্যে লোধু মিঞার অজ্ঞাতে আঠগড়ের রাজা জগন্নাথ হরিচন্দন জগদ্দেব সেই বিষয়ে পরামর্শের জন্য খোর্ধায় এসেছিলেন। সম্পর্কে তিনি রামচন্দ্র-দেবের একরকম বেয়াই। রামচন্দ্রদেব জাতিভ্রষ্ট হওয়ার পরেও তাঁর

প্রতি জগদ্দেবের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বস্তুতঃ তখন সমগ্র ওড়িশায় তিনিই ছিলেন রামচন্দ্রদেবের পরম নির্ভরের পাত্র।

তাঁর সঙ্গে গোপনে আমন্ত্রিত হয়ে সেদিন কুরাঢ়মল্ল ও চম্পাগড়ের দুর্গপতিরাও এসেছিলেন। কালক্ষেপ করার মত সময় ছিল না, তাই লোধু মিঞার সঙ্গে দাবা খেলায় সেদিন রামচন্দ্রদেবের আগ্রহ ছিল না। লোধু মিঞা কখন বিদায় নেবেন তিনি কেবল তারই অপেক্ষায় ছিলেন।

এক সময়ে হাতের ঘুঁটিটি ফেলে দিয়ে মখমলের 'পাগোই' ঘষটাতে ঘষটাতে তিনি অন্দরমহলে চলে গেলেন।

মধ্যাহ্ন নমাজের সময় হয়েছে।

লোধু মিঞাও মাথার টাকে হাত বোলাতে নামাজ পড়তে উঠে গেলেন।

লোধু মিঞা চ'লে যাওয়ার পরে 'উআসে'র ভিতর প্রস্থে রামচন্দ্রদেব নিভৃতে আঠগড়ের সামন্ত রাজা জগন্নাথ হরিচন্দন জগদ্দেব, কুরাঢ়মল্লের পীতাম্বর মঙ্গরাজ ও চম্পাগড়ের শত্রুঘ্ন দলগঞ্জনের সঙ্গে গোপন মন্ত্রণায় বসলেন। মন্ত্রণার বিষয় ছিল খোর্ধার উপরে তকী খাঁর আশঙ্কিত আক্রমণ। এবার খোর্ধা আক্রমণ করলে কিন্তু তকী খাঁ জগন্নাথকে কখনও রেহাই দেবেন না। তাই নিজের আত্মরক্ষা অথবা খোর্ধা রাজ্য রক্ষার চাইতে জগন্নাথকে কি ক'রে রক্ষা যায় তাই ছিল মুখ্য সমস্যা। টিকালী-রঘুনাথপুর সমেত সমগ্র চিলিকা মোগলদের অধিকারে চ'লে যাওয়ার পর থেকে চিলিকা জগন্নাথের পক্ষে আর

তেমন নিরাপদ ছিল না। বাণপুরের রাজা গোবিন্দ হরিচন্দন যদিও রামচন্দ্রদেবের শ্বশুর, তবু মহারাণী ললিতা মহাদেঈ ধর্মচ্যুত রামচন্দ্র-দেবকে পরিত্যাগ করে কুমারদের সঙ্গে পিত্রালয়ে আশ্রয় নেওয়া অবধি বাণপুর রামচন্দ্রদেবের পক্ষে আর নিরাপদ ছিল না।

জগন্নাথ জগদ্দেব কালো মুগুনি পাথরে খোদাই নিশ্চল মূর্তির মত ব'সে সমস্যাটি অনুধাবন করছিলেন। কপালের উপরে কিঞ্চিৎ অবিন্যস্ত তাঁর বাবরী চুলের নীচে ঘন ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। জগদ্দেব আকৃতিতে যেমন বিশাল, উপায়চিন্তা ও কাজেও তেমনি চরমপন্থী। গালপাট্টার উপরে দক্ষিণ করপৃষ্ঠ অসহিষ্ণুভাবে ঘর্ষণ করতে করতে তিনি বললেন, "তকী খাঁ এবার জগন্নাথের উপর চড়াও হ'লে জগন্নাথকে একেবারেই পুরুষোত্তম-পুরীছাড়া করতে হবে। বেড়ালছানা নাড়ানাড়িব মত তাঁকে একবার পুরী থেকে চিলিকা আবার চিলিকা থেকে পুরী ক'রে আর লাভ নেই। ওড়িশায় মোগল রাজত্ব থাকা পর্যন্ত জগন্নাথ অরণ্যবাসী হয়ে থাকবেন।"

রামচন্দ্রদেব চিন্তান্বিতভাবে বললেন, "কিন্তু কোন অরণ্যই বা এখন তাঁর পক্ষে নিরাপদ ?"

জগদ্দেব বললেন, "তার জন্য চিন্তা করবেন না ভাই[1]। সে সময় এলে জগন্নাথ আপনি সে স্থান দেখিয়ে দেবেন।"

কিন্তু রত্নসিংহাসন ত্যাগ ক'রে জগন্নাথ কোন এক মহাকান্তারে অরণ্যবাসী হবেন, এমন চিন্তাও তখন কেউ করতে পারত না। কুরাঢ়-মল্লের পীতাম্বর মঙ্গরাজ বললেন, "জগন্নাথ অরণ্যে যাবেন রত্নসিংহাসন ছেড়ে ? আপনি এ কি বলছেন জগদ্দেব ?"

জগদ্দেব উত্তর দিলেন, "একদিন সেই মহাকান্তার তো জগন্নাথের

1. ভাই— অগ্রজ ও অগ্রজপ্রতিমকে সম্বোধন।

আবাসস্থল ছিল— বিশ্বাবসু যখন তাঁকে শবরী-নারায়ণরূপে পূজা করত। জগন্নাথ আবার শবরী-নারায়ণ হবেন তার জন্য ভাবনা কি ?"

রামচন্দ্রদেবের বিষণ্ণ চোখদুটি উজ্জ্বল হল। জগদ্দেবের অভয় আশ্বাস তাঁর দুশ্চিন্তার ভারলাঘব করল। সে সম্বন্ধে আরো আলোচনা চলত, কিন্তু এই সময়ে প্রতিহারী এসে সংবাদ দিলে, বালুগা-পেণ্ঠ থেকে একজন এসেছে 'ছামুর'[1] দর্শনপ্রার্থী হয়ে। বলছে, তার কে এক সরদেঈর নিকট থেকে সে 'ছামুর' সকাশে পত্র নিয়ে এসেছে, 'ছামু' ভিন্ন আর কারও হাতে পত্র দিতে সে অসম্মত। লোকটা কেমন আড়-পাগলা ধরনের, নাম বলে জগুনি।

বালুগা-পেণ্ঠ। সরদেঈ। রামচন্দ্রদেবের হঠাৎ কিছু হৃদয়ঙ্গম হল না। কেবল সরদেঈ নামটি তাঁর মনশ্চক্ষুর সম্মুখে যেন এক কুহেলী-গুণ্ঠন মেলে ধরল। তার ভিতর থেকে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল এক বিগত দিনের চিলিকা-তীরের সেই মরুপ্রান্তবর্তী মাল্বুদা গ্রামের জলদাত্রী আশ্রয়দাত্রী হতভাগিনী এক নারীর বিষাদময়ী মূর্তি।

কিন্তু বালুগা-পেণ্ঠের এই সরদেঈ কে ?

জগুনিকে ভিতরে নিয়ে আসতে আজ্ঞা করলেন রামচন্দ্রদেব।

কিছুক্ষণ পরে জগুনি নির্বোধ কৌতূহল ও বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চারিদিকে চাইতে চাইতে রাজসকাশে উপস্থিত হল। মেদ ও মাংসের একটি পিণ্ড। কাহিনী ও উপকথায় মাত্র শোনা যে খোর্ধার মহারাজা, তাঁরই নিকটে সরদেঈয়ের কাছ থেকে বার্তা বহন ক'রে আসার উত্তেজনা তার মুখে, সর্বাঙ্গে প্রতীয়মান। কিন্তু আসবার সময়ে তাকে সরদেঈ বার বার সাবধান ক'রে দিয়েছিল যে বালুগাঁ থেকে খবর নিয়ে যাচ্ছে সে কথা যেন সে ঘুণাক্ষরেও কারও কাছে প্রকাশ না করে।

1. ছামু— রাজাকে সম্বোধন।

কুলোর মত তার দুই কানে সোনার মাকড়ি, গলায় একগাছি হার, হাতে রুপার খাড়ু আর পরনে লাল কন্তা আর নীল আঙ্গরাখা জগুনির নির্বোধ সরলতাকে হাস্যোদ্দীপক ক'রে তুলেছিল।

বিনা ভূমিকায় সে আঙ্গরাখার ভিতর থেকে একটি বাঁশের চোঙা বার ক'রে তার ভিতর থেকে সযত্নরক্ষিত পত্রখানি বার করে শুধাল, "খোর্ধার মহারাজা কে ?"

রামচন্দ্রদেব উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ পত্র কে পাঠিয়েছে ? কোথা থেকে আসছ ?"

জগুনি বললে, "এ তো আমার সরদেঈ পাঠিয়েছে। আর কেউ কেন আমায় পাঠাতে যাবে গো ? সরদেঈ বারণ ক'রে দিয়েছে খোর্ধার রাজা ছাড়া আর কাউকে সে কথা বলতে! দু'জন 'অসুআরে'র কাছ থেকে এ চিঠি সে চুরি ক'রে নিয়েছিল— না, না, সরদেঈ কেন চুরি করবে, সরদেঈ দাঁড়িয়ে রইল আর আমি ঘোড়ার পেটের নীচে একটা থলে থেকে চিঠিটা চুরি ক'রে নিলাম ! ওঃ, সে রাতে কি ঝড়, চিলিকা খালি উঠছে আর পড়ছে !"

এই ভূমিকার স্বকীয়তা রামচন্দ্রদেবের মনে কেবল প্রহেলিকা সৃষ্টি করল। উৎকণ্ঠ আগ্রহে চিঠিখানি জগুনির হাত থেকে তিনি প্রায় কেড়েই নিলেন।

পত্রের আরম্ভে লেখা— "...ম্লেচ্ছ হাফিজ্‌ কাদ্‌র্‌-এর আট অঙ্ক, ধনু পাঁচ দিন..."। রামচন্দ্রদেবের দৃষ্টিতে উৎকণ্ঠার স্থলে ক্রমে কঠোরতা ফুটে উঠল। সমস্ত পত্রখানি প'ড়ে কক্ষপ্রাচীরলম্বিত একখানি ঢালের দিকে গম্ভীর দৃষ্টিপাত ক'রে তিনি যেন কিসের চিন্তায় নিমগ্ন হলেন।

চিকাকোলের পেস্‌কসের টাকা লুঠ করিয়ে তার 'আঠা রামচন্দ্র-

দেবের মাথায় মাখানো'র[1] জন্য বেণু ভ্রমরবরের কুটিল ষড়যন্ত্র দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছিলেন। দীর্ঘকালের এক দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার গ্রন্থি যেন আজ নিমেষে ছিন্ন হল।

পত্রে কোনো দুঃসংবাদ আছে আশঙ্কা ক'রে জগদ্দেব উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "চিঠিতে কি লেখা আছে ভাই? আপনি হঠাৎ এমন গম্ভীর হলেন কেন?"

রামচন্দ্রদেব নীরবে চিঠিখানি জগদ্দেবের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। পত্রের বৃত্তান্ত জানবার জন্য পীতাম্বর মঙ্গরাজ এবং শত্রুঘ্ন দলগঞ্জন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠছিলেন। তাঁরাও জগদ্দেবের দুই পাশ থেকে ঘাড় বাঁকিয়ে মাথা নুইয়ে পত্রটি পড়তে লাগলেন।

পড়া শেষ ক'রে জগদ্দেব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চিঠিখানি রামচন্দ্রদেবের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আপনার বকশীটি নির্ঘাত শকুনি[2] ব'লে বহুদিন থেকে আমি যা সন্দেহ ক'রে এসেছি এখন তা যথার্থ দেখছি!"

চম্পাগড়ের শত্রুঘ্ন দলগঞ্জন বললেন, "দেওয়ান ভগী ভ্রমরবরের বিজাত পুত্র বেণু রাউত এ ছাড়া আর কি হবে? ঘরের ঢেঁকি এখন কুমীর! তকী খাঁকে দোষ দেওয়া বৃথা।"

রামচন্দ্রদেব কিন্তু অট্টহাস করে বললেন, "আমাদের পাইকদের বেতন দেওয়া আর বালেশ্বরের ফিরিঙ্গীদের কাছ থেকে বন্দুক কেনার জন্য কড়ি ছিল না, বকশী তার একটা সুব্যবস্থা ক'রে দিয়ে কিন্তু

1. কাঁঠাল খেয়ে অন্যের মাথায় আঠা মাখানো— ওড়িয়া প্রবচন। যার মাথায় আঠা সেই কাঁঠাল খেয়েছে এমনি প্রতীতি হয়, ফলে প্রকৃত ভক্ষক ধরা পড়ে না।

2. শকুনি— বাহিরে মিত্র, অন্তরে শত্রু।

আমাদের পরম উপকারই করেছেন।"

কিন্তু রামচন্দ্রদেব কি পত্রের প্রকৃতমর্ম বুঝতে পারেন নি? জগদ্দেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "কিন্তু সে টাকা আপনার হাতে আসবে কি ক'রে ভাই? ঐ টাকা দিয়ে বকশী বরং আপনার বিরুদ্ধে ফিরিঙ্গী বন্দুক কিনবে।"

রামচন্দ্রদেব বললেন, "আঠাটা যখন নির্ঘাত আমাদের মাথাতেই মাখানো হচ্ছে তখন কাঁঠালটাই বা না খাই কেন? কি বলেন মঙ্গরাজ মহাশয়?"

কুরাঢ়মল্লের পীতবাস মঙ্গরাজ কিন্তু কোনও উত্তর দিলেন না। কেবল তাঁর পাথরে কোঁদা দুই ওষ্ঠাধরে হাসির একটি ক্ষীণ রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল এবং তা ক্রমে জগন্নাথ জগদ্দেব ও শত্রুঘ্ন দলগঞ্জনের ওষ্ঠে সঞ্চারিত হল।

রামচন্দ্রদেব এই-সমস্ত চিন্তা ও উত্তেজনার মধ্যে দেওয়ালে টাঙানো ঢালের দিকে চেয়ে স্বপ্নমজ্জিতের মত ভাবছিলেন—এই সরদেঈটি আবার কে? মালকুদা গ্রামের সেই জলদাত্রী নিরাভরণা নারীমূর্তিটি তাঁর চোখে ভেসে উঠছিল, কিন্তু মোগল লশকরের বর্শার আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে তাকে তো তিনি স্বচক্ষেই দেখেছিলেন। খোর্ধার মহারাজা হয়েও তিনি সেদিন সেই অসহায় উপকারী রমণীর প্রাণ রক্ষা করতে অক্ষম হয়েছিলেন।

সেই স্মৃতির দুঃসহ গ্লানিতে রামচন্দ্রদেবের দুই চক্ষু আবার বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। জগুনির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর এই সরদেঈ কে রে?"

জগুনি সকৌতূহলে ঘরের সাজসজ্জা ও দেওয়ালে টাঙানো উজ্জ্বল পটচিত্রগুলির দিকে চেয়ে দেখছিল। রামচন্দ্রদেবের প্রশ্নে সে

অপ্রসন্ন স্বরে উত্তর দিল— "গেল যা, রাজ্যির লোক জানে বালুগাঁ-পেণ্ঠের চটির সরদেঈকে, আর মহারাজা জানেন না ?"

রামচন্দ্রদেব আপন মনকেই যেন শুধিয়ে চলেছিলেন— কিন্তু এই সরদেঈ কে ? কে ?

তাঁর স্মৃতির মরুপ্রান্তরে চিলিকাকূলের ঝাউবন আর বেনার ঝোপ সাই-সাই দীর্ঘশ্বাসের ঝড় তুলেছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

1

পাটনা-আজিমাবাদের বিদ্রোহী আফগানদের শায়েস্তা ক'রে রমজান মাসের শেষে তকী খাঁ ফেরার পথে মুর্শিদাবাদ দরবার থেকে আসদ্-জঙ্গ্ খেতাব ও পনেরো হাজারের উপরে আরও পাঁচ হাজারের মনসব্দারি পেয়ে নির্বিঘ্নে কটকে ফিরে এলেন।

এর পর শাওয়াল মাসে ঈদ্-উল্-ফিত্র্ উৎসব। ঈদ্-উল্-ফিত্র্-এর নূতন চাঁদ হিলাল-ই-ঈদ্-এর উদয় থেকে কটক হাবেলীতে দুই দিন যাবৎ এই উৎসব পালনের রেওয়াজ ছিল। কিন্তু পূর্বতন নায়েব-নাজিম সুজা-উৎ-দৌলা সুজা-উৎ-দীন মহম্মদ খাঁর আমল হতে এখন পুরা সাত দিন ধ'রে এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে। এই উপলক্ষ্যে মোগলবন্দির জমিদার, ইজারাদার, চৌধুরী, বিশিষ্ট প্রজা ও অন্যান্য অনুগতেরা উপঢৌকন নিয়ে যেমন লালবাগে আসতেন তেমনি খিলাত্ বা উপঢৌকন নিয়ে ফিরেও যেতেন। কোরান-শরীফে অবশ্য এই উপলক্ষ্যে নৃত্য গীত প্রভৃতি লঘুতা নিষিদ্ধ। কিন্তু রমজান মাসে ঈদ্-উল্-আজ্হার উপবাস ও আত্মনিগ্রহের পর ঈদ্-উল্-ফিত্র্-এর অবকাশে অবাধ নৃত্য গীত, অজস্র শিরাজী ও অকুণ্ঠিত সাকীর রেওয়াজ সম্রাট্ শাজাহানের সময় থেকে চ'লে আসছে। কটক হাবেলীতে অন্যান্য পর্ব অপেক্ষা এই পর্বটি বিশেষ সমারোহে পালিত

হয়। সেই জন্য মুর্শিদাবাদের বহু কণ্টকিত সমস্যার নিষ্পত্তি আপাতত পিছনে ফেলে এই উৎসবের জন্য তকী খাঁ কটকে ছুটে এসেছিলেন।

কিন্তু তকী খাঁর মনে আনন্দ ছিল না। সুজা খাঁর ঔরসপুত্র সরফরাজ খাঁ আপন পিতার ষড়যন্ত্রে পিতামহ জাফর খাঁ নাসিরীর প্রদত্ত সমগ্র বঙ্গ-বিহার-ওড়িশার মস্‌নদ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তার পর থেকে তাঁর নজর পড়েছিল কটকের নায়েব-নাজিমির উপর। সরফরাজ ছিলেন হয় নির্বোধ অথবা অতি সরল প্রকৃতির লোক। মুর্শিদাবাদ দরবারে হাজী মহম্মদের মত জনকয়েক কুচক্রী মোসাহেবের প্ররোচনায় তিনি বাংলার সীমানায় ভদ্রখের উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে ওড়িশার আফগানদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন এ খবর তকী খাঁ মুর্শিদাবাদ থাকাকালীনই পেয়েছিলেন। বালেশ্বর ও ভদ্রখ্‌ থেকে ওয়াকিব্‌হাল লোকে যে-সব খবর পাঠিয়েছিল তাতে আফগানেরা আবার মাথা তুলছে বলে জানা গিয়েছিল। এদিকে বালেশ্বর বন্দরে ইংরাজ অঙ্গুলিপ্রবেশাৎ বাহুপ্রবেশের মত সেখানকার মোগল ফৌজদারকে পর্যন্ত রক্তচক্ষু দেখাতে আরম্ভ করেছিল। কটক সুবার হরিশপুর বন্দরে তাদের আড্ডাটিও ইতিমধ্যে বেশ জ'মে উঠেছিল। বিদ্রোহীরা সেই-সব জায়গার গঞ্জে আত্মরক্ষা ক'রে মোগল প্রভুত্বের পক্ষে বরাবর এক বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওড়িশার গড়জাতের সামন্ত রাজাদের তারা বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করার খবরও বরাবর পাওয়া যাচ্ছিল। সেই-সব চিন্তার ভারে তকী খাঁর মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে ছিল।

তার উপর লালবাগে পা দিতে না দিতেই তিনি শুনলেন সিংহল-ব্রহ্মপুর গাঁয়ে পীর মুজাহিদ গাজী সুলতান বেগ্‌ মন্দির ভাঙবার সময়ে কাফেরদের তীরের ঘায়ে শহীদ হওয়ার দুঃসংবাদ। হাফিজ্‌ কাদ্‌র্‌-এর

কাফেরদের সঙ্গে সংপৃক্ত থাকার অতিরঞ্জিত সংবাদও মহতাসিব জুলফিক্‌র্ খাঁর বিবরণী থেকে বাদ পড়ে নি।

মহতাসিব জুলফিক্‌র্ খাঁ 'বড়া সৈয়দ'-গোষ্ঠীর না হলেও জবরদস্ত্ উলাবী সৈয়দ ছিলেন। ধর্মাধিকরণরূপে কটক দরবারে জুলফিক্‌রের প্রতিপ্রত্তি সুবিদিত ছিল।

আওরঙ্গজেবের পর 'বড়া সৈয়দে'রা দিল্লীর দরবারে অমিত-ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের নির্দেশে মোগল বাদশারা উঠতেন বসতেন। বস্তুতঃ তাঁরাই ছিলেন তখন দিল্লীর সিংহাসন-বিধাতা। সৈয়দ জুলফিক্‌র্ খাঁ উলাবী সৈয়দ হলেও শাজাহানাবাদ-দিল্লীর লাল-কেল্লার সঙ্গে তাঁর বহু প্রভাবশালী যোগসূত্র ছিল। গাজী সুলতান বেগ্ সিংহল-ব্রহ্মপুরে যেভাবে নিহত হলেন তা তাঁর চোখে সমগ্র ইসলামের প্রতি এক স্পর্ধিত আহ্বান ব'লে বিবেচিত হয়েছিল। বয়সে প্রৌঢ় হলেও ইসলামের বার্তা প্রচারে তাঁর খড়গমুষ্টি যেমন শিথিল হয় নি, মন্দিরের পর মন্দির ভেঙে মস্‌জিদ ও ইমামবাড়া গড়বার ধর্মীয় পিপাসাও তেমনি তাঁর নিবৃত্ত হয় নি। কোরান-শরীফের নির্দেশ যাতে কটক সুবায় অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় তার প্রতি তাঁর নিরন্তর তীক্ষ্ণ ও সজাগ দৃষ্টি ছিল।

মহতাসিব্ জুলফিক্‌র্ খাঁ সাহেবের দেহটি শীর্ণ, গাত্রচর্ম শুষ্ক ও কঠিন। প্রশস্ত কপালের উপরে মুণ্ডিত মস্তক, নীচে ঈগল-চঞ্চুর মত নাক। কেশহীন দুই ভ্রূর নীচে তীক্ষ্ণ কঠোর দুই চক্ষুতে শুচিতা ও ধর্মনিষ্ঠা নির্ধূম অঙ্গারের মত অহরহ প্রজ্বলিত। প্রবল পরাক্রান্ত তকী খাঁ পর্যন্ত তাঁর ধর্মনিষ্ঠার জন্য তাঁকে ভয় ক'রে চলেন। তকী খাঁর সামনে দাঁড়িয়ে এক হাতে জপমালার অক্ষগণনা করতে করতে এবং অন্য হাত আহত পক্ষীর ডানার মত নিরন্তর সঞ্চালন করতে করতে তিনি

বলছিলেন, গাজী সুলতান বেগের হত্যার প্রতিশোধকল্পে সমস্ত খোর্ধা রাজ্যকে যদি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে কবরস্থানে পরিণত করা না হয় তবে তিনি দিল্লীর নিজাম্-উল্-মুল্‌ক-এর নিকট শিকায়ত করবেন। হাশিম খাঁ রসুন খাঁ প্রমুখ ফৌজদার ও খোআজা বক্‌শীগণ তাঁর প্রতিটি কথায় সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাচ্ছিলেন এবং অবিলম্বে খোর্ধা আক্রমণের প্ররোচনা দিচ্ছিলেন। শেষোক্তদের উদ্দেশ্য অবশ্য যত না ধর্মসংক্রান্ত তত অর্থসংক্রান্ত। কয় বৎসর হ'ল ধর্মের নামে লুঠতরাজ বন্ধ থাকায় তাঁদের পুঁজির আকার হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

তকী খাঁ সমস্ত শুনে নিষ্পত্তি দিলেন : ঈদ্-উল্-ফিত্‌র্ পালনের জন্য হাফিজ্ কাদ্‌র অবশ্য অন্যান্য বৎসরের মত কটকে আসবেন, সেই সময়ে তাঁকে ধ'রে কয়েদ ক'রে রাখলেই সুরাহা হবে। আজিমাবাদ থেকে ফিরে লশকরেরা যেমন ক্লান্ত ও অবসন্ন তাতে এখনই খোর্ধা আক্রমণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

ঈদ্-উল্-ফিত্‌র উৎসব শেষ হতে আর মাত্র দুই দিন বাকী।

তকী খাঁ মুর্শিদাবাদ থেকে ফেরার পর এ পর্যন্ত মোগলবন্দির বহু জমিদার, 'গড়জাতে'র[1] কয়েকজন সামন্ত রাজা, কটক সুবার কেল্লাদার

1. গড়জাত— প্রাচীন ওড়িশার বিভিন্ন স্ব স্ব প্রধান বনপর্বতসমাকীর্ণ ছোট ছোট রাজ্য। এগুলির রাজবাটি গড়ের মধ্যে অবস্থিত থাকত। ব্রিটিশ আমলে এগুলি করদ রাজ্যে পরিণত হয়, যেমন ময়ূরভঞ্জ, কেওনঝর, বলাঙ্গির ইত্যাদি।

ফৌজদার, এমন-কি বালেশ্বর হরিশপুর ও গঙ্গার ফিরিঙ্গী কুঠিগুলির ফিরিঙ্গীরা পর্যন্ত নায়েব-নাজিম মহম্মদ তকী খাঁকে মুবারকবাদ জানাতে নানা উপঢৌকন সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। আবার বিদায় হবার সময়ে কেউ পেয়েছেন টিকা শিরোপা, কেউ নবাবী 'হুদা'[1], আর কেউ বা জরিদার খিলাতী কাপড়, হীরা জহরৎ—আপন আপন পদমর্যাদা অনুসারে। খোর্ধার হাফিজ্ কাদর্ আজ আসবেন কাল আসবেন এমনি প্রতিক্ষায় লালবাগে সবাই ব'সে, কিন্তু তাঁর এখনও দেখা নেই। ব্যাপার কী জানবার জন্য লোধু মিঞার কাছে যে গুপ্তচর পাঠানো হয়েছিল সে ফিরে এসে খবর দিলে যে খোর্ধা কেল্লায় হাফিজ্ কাদর্ মহাসমারোহে ঈদ্-উল্-ফিত্র্ পালন করছেন, নায়েব-নাজিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যথাশীঘ্র সম্ভব আসবেন। সে বার্তা পেয়ে তকী খাঁ ও তাঁর পারিষদমণ্ডলী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু ঈদের উৎসব যত আখের হয়ে আসছিল হাফিজ্ কাদর্-এর আগমন-সম্ভাবনা যেন ততই সুদূরপরাহত হয়ে উঠছিল।

লালবাগ প্রাসাদের আম্ মজলিস্খানায় জরিদার মখমল গালিচার উপরে একটি সিংহাসনে নায়েব-নাজিম মহম্মদ তকী খাঁ আসদ্-জঙ্গ্-বাহাদুর অর্ধনিমীলিত নেত্রে ব'সে ছিলেন। তাঁর সিংহাসনটি দেখতে একটি ছোটখাট রথের মত। সিংহাসনের বাজু থেকে চার কোণে সোনার পাতে মোড়া চারটি স্তম্ভ, তার উপরে মণিমুক্তা-খচিত গম্বুজাকৃতি চূড়া। তা দিল্লীর ময়ূর সিংহাসন না হ'তে পারে, কিন্তু ময়ূর সিংহাসনেও হিন্দুস্থানের বাদশারা তখন এত নিশ্চিন্ত আড়ম্বরে বসতে পারতেন না। সিংহাসনের দুই পাশে মখমলের গদিআঁটা কুরসি সাজানো। নায়েব-নাজিমের দরবারীদের মধ্যে যাঁরা

1. হুদা—পদবীসূচক ধাতুফলক।

অতি বিশ্বস্ত তাঁরাই কেবল সেই কুরসিগুলিতে সম্ভ্রান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে ব'সে ছিলেন। সিংহাসনের পিছনে গুরজবরদার ও খাদিমরা ময়ূর-পুচ্ছের পাখা হাতে তকী খাঁকে বীজন করছিল। সামনে সুপ্রশস্ত মখমল গালিচার উপরে সেতার বেহালা তবলা তানপুরা প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্র হারেমের বিস্মৃতা বাঁদীদের মত যত্রতত্র প'ড়ে ছিল। গত রাত্রে চিরাগদানগুলিতে যে-সব চিরাগ জ্বলছিল তার মধ্যে কতকগুলির মৃদু স্নিগ্ধ আলোক তখনও অনির্বাণ। কিন্তু তেল ফুরিয়ে আসাতে সেগুলির কম্প্র শিখা দপদপ ক'রে আসন্ন অবসানের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রাম করছিল। দিনেমারদের নিকট থেকে কেনা ছাদ হতে লম্বমান প্রকাণ্ড কাচের ঝাড়ের আলোকশিখাগুলি তখনও অম্লান স্থির। তাদের মৃদু আলোক বিক্ষিপ্ত বাদ্যযন্ত্রগুলির উপর বিচ্ছুরিত। গত রাত্রির নর্তকী-দের কবরীস্খলিত কয়েকটি ফুলের মালা মলিন মুখে গালিচায় ইতস্ততঃ প'ড়ে আছে। ফিরিঙ্গী শৌণ্ডিকের নিকট থেকে কেনা লাল নীল শরাবের বোতল কোতলখাওয়া সিপাহীর মত গড়াগড়ি যাচ্ছিল।

তবু এ-সবের মধ্যে যেন উৎসবের আনন্দ ছিল না। খোর্ধা থেকে রামচন্দ্রদেব এলে তাঁকে বন্দী ক'রে খোর্ধার উপর আক্রমণের তোড়-জোড়ের উত্তেজনায় ঈদ্-উল্-ফিতর্ এর উৎসবের আনন্দ এঁদের পরিপূর্ণ হ'ত। কিন্তু রামচন্দ্রদেব এখনও আসেন নি, আসবেন কিনা তারও স্থিরতা নেই। জুলফিক্‌র্ খাঁ প্রমুখ পারিষদবর্গ সেজন্য সবিশেষ চিন্তিত। আর সিংহাসনের উপরে স্বয়ং তকী খাঁ চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন না ঘুমাতে ঘুমাতে চিন্তা করছিলেন জানবার কোনো উপায় ছিল না।

তবে তাঁকে মুবারকবাদ জানাতে কেউ এলে খোজা-খাদিম তার নাম ও পদবী উচ্চারণমাত্রে তকী খাঁ অর্ধনিমীলিত আরক্ত চক্ষু দুইটি

ঈষৎ উন্মুক্ত ক'রে জরিমোড়া জুতা পরা একখানি পা আগন্তুকের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছেলেন। আগন্তুক সেই পা বা পাদুকা চুম্বন করার পর তিন পা পিছনে হটে গিয়ে তিনবার আদাব আরজ করছিলেন। তার পর তকী খাঁর হাতের নির্বাক অঙ্গুলি পক্ষিপক্ষত্রবৎ ঈষৎ আন্দোলিত হয়ে তাঁকে সেখানে আসন গ্রহণের নির্দেশ দিচ্ছিল। সম্মুখের সারি সারি কুরসিগুলির একটিতে আগন্তুক উপবেশন করলে খাদিমরা তাঁর রুচি অনুযায়ী সুরাপূর্ণ পানপাত্র নচেৎ শরবত ও মেওয়া প্রভৃতি এনে দিচ্ছিল। তা পান অথবা ভোজনের পর তকী খাঁর আঙুল আবার ডানা নেড়ে আগন্তুককে বিদায় নিতে নির্দেশ দিচ্ছিল। খাজাঞ্চীর কাছ থেকে তাঁরা নিজ নিজ প্রাপ্য খিলাত্ যথাবিধি নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। যাঁরা বিশিষ্ট অতিথি তাঁদেরই কেবল স্বয়ং নায়েব-নাজিমের সমক্ষে উপঢৌকন দেওয়া হচ্ছিল।

একজন খোজা-খাদিম মজলিসখানার ভিতরে এসে ঘোষণা করল —"পটিআ কিল্লাকা রাজা পদম্‌নাভ্ দেউ।"

পাটিআ কেল্লার পদ্মনাভদেব দুইজন অনুচর সমভিব্যাহারে আসছিলেন। অনুচরদের পরনে ছিল গাঢ় লাল রঙের বনাতের তৈরী গলা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা আঙ্গরাখা। কোমরে জরিদার কোমরবন্ধ, তা থেকে ঝুলছিল হাতীর দাঁতের খাপের ভিতরে একখানি ক'রে বাঁকা ছুরি। পায়ে অবশ্য 'পাণ্ডোই' ছিল না, কিন্তু মাথায় শিরোপা পাগড়ি সাড়ম্বরে বাঁধা ছিল। রাজা পদ্মনাভদেবের পরিধানে মাল-সাট ক'রে পরা ধুতির উপরে সাদা মসলিনের জরিদার সুজনি। সুজনির ডান পাশে সোনার তারের কাজ করা দড়ি কয়গাছি ঝুলছে। গলার সোনার হার বুকের উপরে দর্শনীয়ভাবে নেমে এসেছে। চৌকো মুখে গালপাট্টা জুলপি, নাকের নীচে মোমমাখানো এক জোড়া বাঘা

গোঁফ। গালপাট্টা ও গোঁফ স্থানে স্থানে পেকে কালো বা লালচে চুলের উপর ছোট ছোট সাদা তালির মত দেখাচ্ছিল। মাথায় কাঁধ-ছোঁয়া বাবরী চুলের উপরে অবস্থা বিবেচনায় একখানি জরিদার মুসলমানী টুপি চড়িয়ে পদ্মনাভদেব নায়েব-নাজিমের প্রতি বশংবদ আনুগত্য ঘোষণা করছিলেন। মানসিংহ টোডরমল্লের আমল থেকে এই-সব দরবারী পোষাক তাঁর তোশাখানায় সযত্নে পেটরাজাত হয়ে আছে। লালবাগে বহুবার বহু নবাব-মোলাকাতে সে-সব প'রে হাজিরা দেওয়ার দীনতাপূর্ণ মালিন্য তার প্রতি জীর্ণ তন্তুতে উৎকীর্ণ ছিল।

সারঙ্গগড়ের কনিষ্ঠ অংশ পটিআ কেল্লা। আকবরের সেনাপতি মানসিংহের ফয়সালা ও টোডরমল্লের বন্দোবস্তে গজপতি মুকুন্দদেবের উত্তরাধিকারিগণ খোর্ধার সিংহাসন থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁদের ভাগে আলি ও সারঙ্গগড় কেল্লা পেয়ে তাতেই মুখ গুঁজে পড়ে ছিলেন সে কথা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কনিষ্ঠ শরিক ছ'কড়ি ভ্রমরবর পেয়েছিলেন কেল্লা সারঙ্গগড়, তার কনিষ্ঠ অংশ পটিআ মাত্র বারো-খানি গ্রাম। এ ছাড়া মোগলবন্দির সাইবিরী পরগনাটি পটিআর রাজার জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতেই পদ্মনাভদেব কিন্তু বীর শ্রীগজপতি গৌড়েশ্বর কর্ণাটোৎকল কলবর্গেশ্বর বীরাধিবীরবর শ্রীশ্রীশ্রীপদ্মনাভদেব নামে দলিল দস্তাবেজ ও চিঠিপত্রের মধ্যে নিজেকে খুব জাহির রেখেছিলেন।

খোর্ধার প্রতি তাচ্ছিল্য যেমন প্রচণ্ড ছিল জ্যেষ্ঠ অংশ সারঙ্গগড়ের প্রতিও ঈর্ষা ছিল তেমনি প্রখর। গড় নামে কথিত কাঁটাবাঁশ-ঘেরা তাঁর মাটির 'উআসে'র উঁচু বারান্দায় ব'সে খোর্ধার রাজবংশের উপরে যখন শ্রাব্য অশ্রাব্য গালিবর্ষণ করেন এবং সেই সূত্রে খোর্ধার রাজা

পুরুষোত্তমদেব নিজের 'জেমা'কে[1] চতুর্দোলায় দিল্লীতে বাদশা জাহাঙ্গী-রের জেনানায় পাঠিয়ে কেমন ক'রে আপন রাজগদি রক্ষা করেছিলেন সেই বহুবার কথিত ও শ্রুত ঘটনার অতিরঞ্জিত বিবরণ আউড়ে খোঁচা দেন। অনুচর-পরিচরগণ সেই সব বহু রোমন্থিত কাহিনী শোনবার সময় পদ্মনাভদেব যে বাস্তবিকই গজপতি সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধি-কার হতে বঞ্চিত সে সম্বন্ধে প্রত্যেকবারই একবার ক'রে নিঃসন্দেহ হয়। পদ্মনাভদেব চীৎকার করেন— "কিসের যদুবংশ হে? যত বাজে কথা! ওরা কি আমাদের মত সূর্যবংশী ক্ষত্রিয়? ওরা হল 'ভোই'[2]। ভোই— গজপতি মহারাজার গাঁয়ের খবরদারি করত, হিসাবপত্র রাখত, পাঁজিপুথি সামলাত। মানসিংহ যখন ওড়িশায় আসেন পুরীতে চন্দনের মৌজে ভাণ্ড় পাণ্ডাদের ধ'রে ভোই রমেই রাউত রামচন্দ্রদেব সেজে মানসিংহের কাছ থেকে খোর্ধার রাজত্ব পেয়ে গেল, তাই না। নইলে আমাদের মত সূর্যবংশী ক্ষত্রিয় নাকি ওরা? আরে ওরা যাকে বলে ফপরদালাল, পাঁজিপড়া মাহান্তি! আলি আর সারঙ্গগড় হ'ল গজপতি অংশের প্রকৃত বংশধর!"

সভাসদেরা বারান্দার ধাপের মহাসনে গজপতি পদ্মনাভদেবকে সশব্দ সমর্থন জানায়।

ভোইদের উৎপাটিত ক'রে খোর্ধার সিংহাসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার একটা বহুপোষিত অভিলাষ বকশী বেণু ভ্রমরবরের মত পদ্মনাভ-দেবেরও ছিল। কিন্তু বাহুবলে খোর্ধা আক্রমণ করা তো সম্ভব ছিল না, তাই খোর্ধা ও পটিআর দো-সীমানায় একটির পর একটি গ্রাম

1. জেমা—রাজার মেয়ে, রাজকুমারী।

2. ভোই— প্রাচীন কালে গ্রামের শাসনভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীদের উপাধি বা পদবী।

জবর দখল ক'রে পদ্মনাভদেব তাঁর রাজ্য বিস্তার করছিলেন।

কটকের নায়েব-নাজিমের প্রতি এই কারণে পদ্মনাভদেব অতি বিশ্বস্ত ও অনুগত ছিলেন। খোর্ধা ও কটকের দো-সীমানায় পটিয়া অবস্থিত ব'লে পদ্মনাভদেব এক কূটনৈতিক প্রাধান্যও পেয়েছিলেন। তাঁর উপরে পাঁচ বৎসরের পেস্কস্ বাকি পড়েছিল। পটিআ কেল্লার কয়খানি গাঁয়ের চাষী রায়তদের মেরে ধ'রে যে রাজস্ব আদায় হয় তাতে রাজবাড়ি চালানোর খরচই কুলায় না। তার উপরে আছে আবার গজপতির নিদর্শন-স্বরূপ দুটি রোগা হাতী, গোটাকয়েক বুড়ো আরবী ঘোড়া, পালকি দুই জোড়া, অনুচর-পরিচরদের ভরণপোষণের দায়িত্বও আছে। এদিকে পদ্মনাভদেবের উপর বকেয়া পেস্কসের অঙ্ক ক্রমবর্ধমান। তার উসুল দিতে আরও সময় চাওয়া ঈদ উপলক্ষ্যে নায়েব-নাজিম-সাক্ষাতে আসার আসল উদ্দেশ্য ছিল।

কিন্তু পদ্মনাভদেব যথাবিধি তকী খাঁর পাদচুম্বন ক'রে কোমর ভেঙে কুর্নিশ করতে না করতে তকী খাঁ সিংহাসন ছেড়ে যে ভাবে তাঁকে প্রায় ক্রোড়াশ্রিত ক'রে "আও দোস্ত্, মিজাজ্ কৈসে হৈ?" প্রভৃতি উচ্ছ্বসিত সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করলেন তাতে পদ্মনাভদেব বিস্ময়ে অভিভূত হলেন।

সম্প্রতি খোর্ধার রাজার মতিগতি যেমন অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে তাতে এই নির্বোধটিকে তোয়াজ ক'রে রাখার আবশ্যকতা তকী খা খুবই অনুভব করছিলেন।

পদ্মনাভদেব কুরসিতে উপবেশনমাত্র একজন খোজা-খাদিম হাতে একখানা ফর্দ নিয়ে পদ্মনাভদেব সঙ্গে কী কী উপঢৌকন এনেছেন উচ্চৈঃস্বরে তার ফিরিস্তি প'ড়ে গেল— নবাবভোগ পোলাওয়ের চাল একগাড়ি, ছাগল চারটা, ঘি এক কলসী, এবং সেইরকমই প্রজাদের

কাছ থেকে ছাড়িয়ে ছিনিয়ে আনা অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার। এই সব তুচ্ছ বস্তুর তালিকা খোদাবন্দ্ নায়েব-নাজিমের মজলিসী ইজলাসে পড়তে খোজা-খাদিমের বড় অশ্বস্তি লাগছিল।

তালিকাপাঠ শেষ হওয়ামাত্র একজন খাদিম সুরাপূর্ণ একটি পেয়ালা এনে যথাবিধি পদ্মনাভদেবের দিকে এগিয়ে দিল। কিন্তু পদ্মনাভদেব অস্ফুটে আর্তনাদ ক'রে সুরাস্পর্শ করেন না এই কথা অত্যন্ত করুণ ও অনুনাসিক সুরে নিবেদন করায় খোজা-খাদিম তাঁর জন্য এক পাত্র শরবত ও মেওয়া এনে দিয়ে গেল। পদ্মনাভদেব এক নিশ্বাসে শরবতের পাত্রটি খালি ক'রে মেওয়া ভক্ষণের অবকাশ খুঁজছিলেন ইতিমধ্যে নায়েব-নাজিমের চোখের ইশারায় একজন খোজা-খাদিম ভিতরে গিয়ে একটা রুপার থালায় খিলাতী কাপড়া এক থান, বাদশাহী টিকা শিরোপা ও বিশটি নূরজাহানী মোহর এনে পদ্মনাভদেবকে ভেট দিল। এক গাড়ি চাল আর চারটে ছাগলের বিনিময়ে পদ্মনাভদেব নায়েব-নাজিমের দরবার থেকে এমন উপঢৌকন আশা করেন নি। তাঁর চোখদুটি হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেগুলি স্বহস্তে পুটুলিজাত করবার জন্য তাঁর মন ও হাত চঞ্চল হয়ে উঠল।

কিন্তু সে চঞ্চলতা দমন ক'রে পদ্মনাভদেব বিনীত কণ্ঠে বললেন, "জাঁহাপনার রাজত্ব যাবচ্চন্দ্রার্কে[1] কটক সুবায় জাহির থাবুক!"

তকী খাঁ তখন কিন্তু ভাবছিলেন— রামচন্দ্রদেব আজও এলেন না। এটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ ঘোষণা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না এমনি সন্দেহ তাঁর মনে ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছিল।

ঘুমের ঘোরে কথা বলার মত তকী খাঁ হঠাৎ চাপাগলায় গর্জন করে উঠলেন—"হুঁ"।

1. যাবচ্চন্দ্রার্কে— যতদিন চন্দ্র সূর্য থাকবেন, যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।

পারিষদেরা চকিত দৃষ্টিতে তকী খাঁর দিকে চাইলেন।

কোনো-একটা কঠিন সংকল্প ক'রে ফেললে তকী খাঁ এমনি হুংকার দিয়ে থাকেন।

পদ্মনাভদেবের উপস্থিতি সেই উত্তেজনার মধ্যে তকী খাঁ ততক্ষণে ভুলে গিয়েছিলেন। যন্ত্রচালিতের মত তাঁর আঙুলটি ইতিমধ্যে পদ্মনাভদেবকে বিদায় নেবার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিল। পদ্মনাভদেবও উপঢৌকনগুলি অনুচরদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তকী খাঁর উদ্দেশে পশ্চাদপসরণপূর্বক কুর্নিশ করতে করতে প্রস্থান করছিলেন।

তকী খাঁ সিংহাসনে সোজা হয়ে বসে কী যেন খুঁজছেন এমনি ভাবে রাঙা চোখ দুটি ঘুরিয়ে চারিদিকে চাইতে লাগলেন। তার পর উঠে হেলতে দুলতে অন্দরমহলের দিকে চলে গেলেন।

এ-সব আসন্ন ঝড়ের পূর্বলক্ষণ।

পারিষদেরা উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনায় পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করলেন।

লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ প্রান্তে রিজিয়া বেগম তাঁর খাস মঞ্জিলের অলিন্দে দাঁড়িয়ে কাঠজোড়ির নীল জলে ঘূর্ণির অস্থির গতিবৈচিত্র্য লক্ষ্য করছিলেন। অলিন্দের প্রবেশদ্বারে একজন খোজা নপুংসক প্রহরী পাথরের স্থাণু মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল। মঞ্জিলের বাহিরে দেবদারু-বীথিকা-শোভিত গোলাপবাগের পত্রকুঞ্জের ভিতর থেকে একটি ডাহুক থেকে থেকে যেন কোন্ আহত আত্মার আর্তনাদের মত ডেকে

উঠছিল। ভরা কলসী উপুড় করার মত শব্দ তার ডাকের। সে চুপ করতেই কোথা থেকে বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে উঠতে লাগল একটি ঘুঘু। মঞ্জিলের পায়রাবাসাগুলিতে পায়রারা গুমরে গুমরে উঠছিল। লালবাগের প্রবেশদ্বারে নহবৎখানা থেকে সানাইয়ে বাগেশ্রীর বিলম্বিত আলাপ ভেসে আসছিল। সেই আলাপের অভিমানঘন রূপ রিজিয়ার মনে জাগিয়ে তুলছিল তার মায়ের কণ্ঠে শোনা পদকীর্তনের সুর, নিঠুর নাগর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার চির অভিমানের গান :—

'সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিয়াসা।'

কী সে ভুবনমোহিনী রূপ ছিল তার মায়ের। লালবাগ দুর্গের পাষাণভিত্তিতে মাথা কুটে আরো বঙ্কিম হয়ে বয়ে চলেছে কাঠজোড়ির যে নীল জলবেণী তাতে যেন তারই মা কাঞ্চন মুর্শিদাবাদীর নিতম্বচুম্বী কুটিল বেণীশোভা।

ব্রাহ্মণ ঘরের কন্যা, ব্রাহ্মণ ঘরের বধূ। আর— ক্রূর দুদৈর্বের করকাপাতে ব্রাহ্মণ ঘরের বালবিধবা। মুর্শিদাবাদের গোপীকৃষ্ণের মন্দিরে মালা গাঁথাই হ'ল প্রতিপোষণের অবলম্বন। ক্রমে সে হয়ে উঠল গোপীকৃষ্ণের সেবাদাসী। বিগ্রহের সামনে পদাবলী গান ক'রে নাচে কাঞ্চন, তার সেই পরিপূর্ণ প্রেমোন্মাদনার দৃশ্য দেখে ধন্য হতে আসে মুর্শিদাবাদের অসংখ্য নরনারী।

সেদিন বৈশাখের মোহিনী একাদশী—

দিনান্তে ভাগীরথীর নির্জন ঘাটে উপবাসিনী ব্রতচারিণী কাঞ্চন মন্দিরে যাবার আগে স্নান করছিল। তার ভক্ত হৃদয়ের সৌন্দর্য তার গোপীকৃষ্ণকে যেমন আনন্দ দেয়, তার উদ্ভিন্ন যৌবনের রূপ বাসনাদিগ্ধ মানুষের মনে তেমনি আনে কামনার জ্বালা তা বুঝি জানত

না কাঞ্চন। গাছের আড়ালে লুকিয়ে দেখছিলেন মুর্শিদাবাদ নবাবের জামাই সুজা খাঁ। স্নানান্তে কাঞ্চন ঘাটে ওঠা মাত্রই সবলে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন বর্ধমানের পথে।

সুজা খাঁর সেই মুর্শিদাবাদী বেগম কাঞ্চনের কন্যা রিজিয়া।

কাঞ্চনকে তার গোপীকৃষ্ণের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলেন সুজা খাঁ। ছিনিয়ে এনেছিলেন দেহটাই, কাঞ্চনের কৃষ্ণপ্রেমে কখনও বাধা দিতে যান নি তিনি। তবু এক অভিলাষ অতৃপ্ত থেকে গেল কাঞ্চনের: শ্রীমন্দিরের রত্নবেদীতলে একবার জগন্নাথ দর্শন। সুজা খাঁ কটকের নায়েব-নাজিম হয়ে এলেন। কিন্তু হায়! কাঞ্চন মুর্শিদাবাদীর সে অভিলাষ পূর্ণ হল না কোনো দিন। শেষে একদিন যখন তার অন্তিমকাল ঘনিয়ে এল সুজা খাঁ তখন মুর্শিদাবাদে। সেই দিন মুর্শিদাবাদী কাঞ্চন তাঁর জীবনকাহিনী বললেন রিজিয়াকে। হাতের ইন্দ্রনীলের আংটি খুলে তাকে দিয়ে বললেন রিজিয়ার যদি কোনোদিন সৌভাগ্য হয় জগন্নাথ দর্শনের, তা হলে সেই আংটিটি যেন নিবেদন ক'রে আসে রত্নবেদীর নীচে। "পারিস যদি মা, তোর অদৃষ্টে যদি থাকে, অবশ্য দেখিস্ সেই নীলমাধবকে। সব নিশির প্রভাত সে, সব প্রতীক্ষার প্রাপ্তি, সব দুঃখনলিনীর চন্দ্রমা।

'গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করব বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ্ বাহির নহ মুই ছার॥' "

রিজিয়ার চোখের সামনে আবার ভেসে উঠল আর-এক জনের অসহায় মূর্তি—রামচন্দ্রদেব ওরফে হাফিজ্ কাদর্। তিনি না জগন্নাথের শ্রেষ্ঠ সেবক! কিন্তু রিজিয়ার জন্যই তো জগন্নাথ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন

তিনি! তবু, জগন্নাথ যদি জগতের নাথ, রিজিয়া কি জগতের বাহির?

তুহঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ্ বাহির নহ মুই ছার॥'

গুনগুন ক'রে মায়ের কাছে শেখা সেই দুটি পদ গাইতে গাইতে কাঠজোড়ির জলকণাসিক্ত সমীরণে রিজিয়ার সুর্মাটানা চোখদুটি মুদে আসছিল। এমন সময়ে মঞ্জিলের বাহির প্রাঙ্গণ থেকে দ্বাররক্ষী খোজার উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল: "মুতামিন্-উল্‌মুল্‌ক্ আলা-উৎ-দৌলা মহম্মদ তকী খাঁ নাসীর জঙ্গ্ খাঁ বাহাদুর আসদ্ জঙ্গ্ …।"

এ অসময়ে রিজিয়াব মঞ্জিলে নায়েব-নাজিম তকী খাঁ কেন? নানা অনামা আশঙ্কায় রিজিয়ার অন্তর দুরু দুরু হয়ে উঠল। গত কয়েকদিন যাবৎ রাজা রামচন্দ্রদেবের প্রতি নায়েব-নাজিমের ক্রোধ ও তাঁকে বন্দী ক'রে খোর্ধা খাসে আনার সম্বন্ধে যে-সব জনরব শোনা যাচ্ছে তকী খাঁর এই আকস্মিক আগমনে সেই সব আশঙ্কা যেন দেবদারুবীথিকার শত শত ঝুলন্ত বাদুড়ের মত ডানা ঝটপট করে উঠল।

তকী খাঁ। মদ ও মেদের একটি স্ফীত কন্দুক। শিথিল পদক্ষেপে তিনি প্রাঙ্গণ অতিক্রম ক'রে অলিন্দে এসে উঠলেন। রিজিয়া শঙ্কা-সন্দিগ্ধ কণ্ঠে স্বাগত জানালেন, "আসতে আজ্ঞা হোক, জাহাঁপনা! এমন অবেলায় এ বাঁদীকে জাহাঁপনা স্মরণ করলেন যে?"

তকী খাঁর তীব্র দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য রিজিয়া শয়ন-কক্ষের ভিতরে চ'লে এসে বনাতের চাদরে ঢাকা একটি আসনে রাখা পানের ডালার কাছে পান সাজতে ব'সে পড়লেন।

তকী খাঁ রিজিয়ার পিছন পিছন সেই ঘরে এসে কি ভাবে কথা আরম্ভ করবেন হঠাৎ স্থির করতে না পেরে ইতস্ততঃ পাদচারণা করতে

করতে লাল পাথরের খিলান থেকে ঝোলানো খাঁচায় রিজিয়ার পোষা টিয়াপাখির দিকে চেয়ে একদণ্ড দাঁড়ালেন।

টিয়া তকী খাঁর দিকে চেয়ে খাঁচার শিকে ডানা ঝাপটে কর্কশ চীৎকার জুড়ে দিল। রিজিয়া পান সাজতে সাজতে বলল, "বোল রে টিয়া: জাহাঁপনা— জাহাঁপনা—"

কিন্তু মনিবের শাসন মানতে টিয়া আজ প্রস্তুত ছিল না। তকী খাঁ মুখ ফিরিয়ে একটি সাদা মারবেলের চৌকিতে ব'সে পড়লেন। আরও কয়টি অস্বস্তিকর মুহূত নীরবে কাটল। তারপর আর যেন থাকতে না পেরে তকী খাঁ হঠাৎ ব'লে উঠলেন—"ঈদ্ পরব আখের হতে চলল, এত রাজা-রাজড়া কেল্লাদর জমিদার এল, অথচ হাফিজ ভায়া এলেন না।"

রিজিয়া দেখলেন এর পর অভিনয় না করলে আর উপায় নেই, নয়তো তকী খাঁর নানান অপ্রীতিকর প্রশ্নের উত্তর একটি একটি ক'রে দিতে হবে। যথা— হাফিজ্ কাদ্র্ তকী খাঁর অনুপস্থিতি-কালে নিয়মিতভাবে কটকে আসছিলেন কিনা, তাঁর ও রিজিয়ার মধ্যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান আছে কিনা, হাফিজ্ কাদ্র্-এর সাম্প্রতিক মতিগতি কী প্রকারের কোথাকার জল কোথায় গড়াচ্ছে —এমনি সব অস্বস্তিকর জিজ্ঞাসা। সত্যি বলতে গেলে হাফিজ্ কটক ছাড়ার পর রিজিয়াকে তিনি মনে রেখেছেন না ভুলেই গেছেন সে-বিষয়ে রিজিয়ার নিজেরই ঘোর সন্দেহ ছিল। তাই অমনি সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পীড়াদায়ক অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রিজিয়া মেহেদি-রাঙা করতলে মুখে ঢেকে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিলেন।

রিজিয়ার মত তকী খাঁও অন্য এক হিন্দু রমণীর গর্ভজাত

সুজা খাঁর বিজাত পুত্র। কিন্তু তকী খাঁ যেমন কঠোর রিজিয়া তেমনি কোমল। তকী খাঁ সুন্নীদের চাইতেও অধিক ধর্মান্ধ। আর দুর্ধর্ষতা কূটকৌশল ও পাষণ্ডতায় তিনি সুজা খাঁর স্বপত্নীজাত পুত্র সরফরাজ খাঁয়ের উপরে যান। সেইজন্য সুজা খাঁ নিজ উত্তরাধিকারী হিসাবে তকী খাঁকেই কটক সুবায় স্থাপিত করেছিলেন। রিজিয়া ও তকী খাঁর চরিত্রে এই মৌল প্রভেদ সত্ত্বেও তকী খাঁর প্রাণে ভগিনী রিজিয়ার প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ ও সহানুভূতি ছিল। রিজিয়াকে কাঁদতে দেখে তকী খাঁ আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টায় ব'লে উঠলেন, "বাস্ বাস্, কেঁদো না শাহজাদী! হাফিজ এত বড় ঈদ পর্বেতেও এল না সে দুঃখ তোমারও যেমন আমারও তেমনি।"

রিজিয়া দেখলেন অভিনয়ে ফল ফলেছে। বললেন, "আমার কথা ছেড়ে দিন জাঁহাপনা, আমার নসীব তো বরবাদ হয়েই গেছে। আপনি দীনদুনিয়ার মালিক, ওড়িশা সুবার নায়েব-নাজিম। খোর্ধার রাজা আপনার খিদমতে হাজির হলেন না? এ তো কম আস্পর্ধা নয়! আপনি ফৌজদারদের পাঠান, তাঁরা খোর্ধার রাজাকে ধ'রে আনবেন।"

তকী খাঁ গম্ভীর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে রিজিয়ার দিকে চেয়ে দেখলেন। এ বেচারী কী বা বোঝে ওড়িশা সুবার রাজনীতি? আফগানেরা আবার বিদ্রোহী হয়ে উঠছে, সরফরাজ খাঁর শ্যেনদৃষ্টি কটকের মসনদের উপরে, ওড়িশার জমিদার ও 'গড়জাত'-রাজাদের মতিগতি অনিশ্চিত, মরাঠা বর্গীরা ঘাপটি মেরে সুযোগের অপেক্ষায় ব'সে আছে। এমনি সময়ে খোর্ধার উপরে আক্রমণ না ক'রে কৌশলে যদি হাফিজ্ কাদ্রকে কটকে বন্দী ক'রে রাখা যেত তা হলেই তো বিনা ঝঞ্ঝাটে কাজ মিটত। কিন্তু ফৌজদারের মারফতে তলব বা আমন্ত্রণে যদি সে অন্য কিছুর গন্ধ পেয়ে কটকে না আসে?

তকী খাঁ বললেন, "হাফিজ্ ভায়া আমাদের বিরাদর্। ফৌজ-দারের হাতে, তায় আবার ঈদের মত পরবের সময়ে তাকে কয়েদ ক'রে আনাটা কি ভাল দেখাবে? তুমি বরং চিঠি লেখ শাহজাদী: চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন হাফিজ্ ভায়া কটকে আসেন। ঈদ্ তো আখের হতে চলল।"

এই কথাবার্তার মধ্যে বার বার যখন হাফিজ কাদর্-এর নাম উচ্চারণ হচ্ছিল তখন রিজিয়ার টিয়া পাখিটি ঠোঁট ঘুরিয়ে চোখ ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। হাফিজ্ কাদর্ বারবাটীতে থাকা কালে এই টিয়াটি তাঁর বড় প্রিয় ছিল। রিজিয়া পাখিটিকে বুলি শিখিয়ে-ছিলেন: "খোদা হাফিজ।"

হাফিজ কাদর্কে দেখলেই টিয়া "খোদা হাফিজ— খোদা হাফিজ" ব'লে ডেকে উঠত। এখন বার বার হাফিজ্ নাম শুনে সে "খোদা হাফিজ! খোদা হাফিজ্!" ব'লে ডেকে উঠল।

রিজিয়া টিয়ার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, "আমার চিঠি হ'ল এই টিয়া। একে দেখলে তিনি যেখানে যে অবস্থায় থাকুন নিশ্চয় কটক ফিরে আসবেন। খোজা কেউ একজন এই টিয়ার খাঁচা নিয়ে এই মুহূর্তে খোর্ধা রওনা হয়ে যাক-না।"

কে জানে এই টিয়াটি হাফিজ কাদর্ আর রিজিয়ার মধ্যে মোহা-ব্বতের কোন্ গোপন সংকেত! চিঠির চাইতে এ সংকেত আরো শক্তিশালী হতে পারে তকী খাঁর এমন বিশ্বাস হ'ল।

খাঁচার ভিতর থেকে টিয়া একবার তকীখাঁর দিকে একবার রিজিয়ার দিকে যেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত ক'রে আর-একবার "খোদা হাফিজ' খোদা হাফিজ!" ব'লে ডেকে উঠে নীরব হল।

তকী খাঁ ও রিজিয়াও নীরব। তাঁরা আবার নিজ নিজ চিন্তায়

নিমগ্ন হলেন। অলিন্দের বেড়ার ধারে ধারে পায়রাদের বকবকম ও নহবৎখানার সানাইয়ে বাগেশ্রীর আলাপ ভিন্ন অন্য শব্দ ছিল না।

2

সিংহল-ব্রহ্মপুর গ্রামে গাজী মিঞা পীর নিহত হওয়ার পরে পরেই আবার বাণপুর-সোলেরি ঘাটে পেস্‌কসের টাকা লুট হওয়ার সংবাদে খোর্ধার সর্বত্র আতঙ্কের বিভীষিকা সৃষ্টি হয়েছিল।

চিকাকোল থেকে একজন ফৌজদার পেস্‌কসের টাকা হাতীর পিঠে চাপিয়ে সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ জন লশকর নিয়ে কটকে আসছিল। শাজাহানাবাদ-দিল্লী থেকে টাকার জন্য ঘড়ি ঘড়ি তাগাদা আসছিল মুর্শিদাবাদে, মুর্শিদাবাদ থেকে তাগাদা যাচ্ছিল কটকে।• এমন অবস্থায় পেস্‌কসের টাকা লুট হওয়াটা যে এক ভয়ংকর ব্যাপার তাতে কারও তিলার্ধ সন্দেহ ছিল না।

খোর্ধায় আবার মোগল-হাঙ্গামা লাগবার ভয়ে সকলে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। ঘরে ঘরে আবার আগুন জ্বলবে, গ্রামকে গ্রাম খালি ক'রে লোকে প্রাণের ভয়ে বনের ভিতরে গিয়ে লুকোবে, যারা পালাতে না পারবে তাদের সর্বনাশ হবে— অতীতের বহু ভয়াবহ স্মৃতি একটি একটি ক'রে খোর্ধার লোকের চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। সর্বত্র আবার ত্রাহি ত্রাহি রব উঠল।

কিন্তু এই ভীতি ও আতঙ্কের মধ্যে খোর্ধায় নিঃশঙ্ক ও নিশ্চিন্ত কেউ যদি থাকেন তো তিনি রামচন্দ্রদেব। এমন-কি তকী খাঁর প্রতিনিধি লোধু মিঞা ও তাঁর সাগরেদ খলিফা গদাধর মঙ্গরাজ প্রমুখ সবাই রামচন্দ্রদেবের সমূহ বিপদ আশঙ্কা ক'রে তাঁর প্রতি সহানুভূতি-

বশে যত উদ্‌বিগ্ন হয়েছিলেন স্বয়ং রামচন্দ্রদেবকে কিন্তু তত উদ্‌বিগ্ন মনে হচ্ছিল না।

ঈদ উৎসবের আমোদে হাফিজ্ কাদ্‌র্ ওরফে রামচন্দ্রদেব ফিরিঙ্গী শরাবের রঙিন বোতল খুলে ব'সে ছিলেন। মজলিসখানায় মখমল গালিচা ও বনাতের গদির উপরে রঙিন তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে রামচন্দ্রদেবের সামনে ব'সে ছিলেন লোধু মিঞা ও খলিফা গদাধর মঙ্গরাজ। নিকটে গ্রহবিপ্র কুশ-অ নায়ক মেঝের উপর খড়ি পেতে অনেক কুণ্ডলীতে নানা অঙ্ক ক'ষে রামচন্দ্রদেবের কোষ্ঠী নানা পুথির সঙ্গে মিলিয়ে মহারাজের কটক-যাত্রার জন্য দিনক্ষণ ধরছিলেন, কিন্তু কোনো শুভদিন বা শুভক্ষণ যেন কিছুতেই ধরা যাচ্ছিল না। যেমন করে হোক আর যত শীঘ্র সম্ভব একটি শুভক্ষণ খুঁজে বার করবার জন্য রামচন্দ্রদেব যতই তাড়া করছিলেন গ্রহবিপ্র কুশ-অ নায়ক গলা ঝাড়তে ঝাড়তে এবং টিকিতে বাঁধা কলকে ফুলটি অনাবশ্যক দোলাতে দোলাতে ক্রমাগত নূতন নূতন চক্র কেটে আবার ঝটিতি মুছে ফেলছিলেন।

তকী খাঁ মুর্শিদাবাদ থেকে ফেরা ইস্তক কেবল শুভক্ষণের অভাবেই রামচন্দ্রদেব আজ পর্যন্ত তকী খাঁর সঙ্গে মোলাকাতের জন্য কটক যেতে পারেন নি— লোধু মিঞার অন্ততঃ তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। দিনক্ষণের প্রতি মুসলমানদের সে সময়ে যত বিশ্বাস ছিল রামচন্দ্রদেবের মত হিন্দু সংস্কারে বর্ধিত লোকেরও তেমন ছিল না। 'সইত্' বা শুভক্ষণ না জুটলে মোগল ফৌজদারেরা যুদ্ধ ও আক্রমণও আরম্ভ করতে পারতেন না। 'সইত্' না জোটায় রামচন্দ্রদেব তকী খাঁ সাক্ষাতে যেতে পারছেন না— লোধু মিঞা এর মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি দেখতে পাচ্ছিলেন না। তকী খাঁর ওয়াকিয়ানবিশকে তিনি সেই মর্মে গুপ্ত সংবাদও পাঠিয়েছিলেন।

কিন্তু সপ্তাহকালব্যাপী ঈদ উৎসবের দিনগুলি যতই ফুরিয়ে আসছিল তকী খাঁর মনে ততই সন্দেহ হচ্ছিল যে একাদিক্রমে এতদিন ধ'রে 'সইত্' না জোটা রামচন্দ্রদেবের কোষ্ঠীর ভুল না গ্রহবিপ্রদের গণনায় ত্রুটি অথবা লোধু মিঞার চোখে ধূলি নিক্ষেপ।

লোধু মিঞা ও খলিফা গদাধর মঙ্গরাজ উৎসবের ফেনিল উদ্দামতায় মশগুল। সামনে একাধিক খালি বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছিল। রামচন্দ্রদেবের হাতের পেয়ালাটি যেন শূন্য হচ্ছিল না, মাতলামির অভিনয় করতে করতে তিনি সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলেন লোধু মিঞার ওষুধটা ঠিক ধরছে কি না।

লোধু মিঞা কম্পিত হস্তে রামচন্দ্রদেবের পেয়ালায় শরাব ঢালতে গেলে রামচন্দ্রদেব পেয়ালা সরিয়ে নিয়ে জড়িত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—"বাস্ বাস্ মিঞা সাহেব, আপনি নিন, আপনি নিন। পেস্কুসের টাকা রাহাজানি হয়ে যাওয়া ইস্তক আমার আর স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। জাঁহাপনা খোদাবন্দ্ কটক্ সুবার নায়েব-নাজিম আমার বেরাদার, তিনি কী না জানি ভাবছেন আমায়! এত বড় ঈদ পরব পার হতে চলল, অথচ দেখুন আমি এখনও তাঁর সাক্ষাতেও যেতে পারলাম না!"

লোধু মিঞা তবু রামচন্দ্রদেবের পেয়ালায় শরাব ঢালতে গিয়ে প্রায় সবটাই বনাতের গদির উপরে ফেললেন। পেস্কসের টাকা লুঠ নিয়ে রামচন্দ্রদেবের আক্ষেপ শুনে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বললেন, "আপনি ভাববেন না মহারাজা বাহাদুর। যে ডাকাতরা নবাবের পেস্কসের টাকা লুঠ করেছে আল্লাতালার ইচ্ছায় তারা আলবৎ জাহান্নমে যাবে— একশোবার যাবে— লক্ষ বার যাবে—!"

খলিফা গদাধর মঙ্গরাজ তাকিয়ায় ঘুসি মেরে বিড়বিড় করে

বললেন, "আলবৎ। জরুর।"

গ্রহবিপ্র কুশনায়ক আর-এক প্রস্ত খড়ি পেতে কুণ্ডলী কাটতে কাটতে গণনা ভুলে কৌতূহলী হয়ে এঁদের মাতলামি লক্ষ্য করছিলেন। রামচন্দ্রদেব সংকেতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রায় চীৎকার ক'রে বলছিলেন— "সাত দিন কাবার হয়ে গেল, একটা ভাল দিন-ক্ষণ বার করতে পারলে না তুমি!"

কুশ নায়ক কুণ্ডলী সব আবার মুছে ফেলে পাঁজির তালপাতার পুথি উলটে পালটে কাঁপা গলায় বললেন, "দেখছি, খুঁজে দেখছি ছামু। এ কি আর আমার হাতের কথা। ছামুর রাশি হল মেষ, ভরণী নক্ষত্র। তাতে বুধের সঞ্চার হয়েছে। কুম্ভ দুই দিনের আগে তো ভাল যোগ নেই। আমি কী করব? কুম্ভ দুই দিনের এখনও অনেক বিলম্ব।"

কুশ নায়ক চিন্তিতভাবে আরো কতকগুলি কুণ্ডলী কেটে ফেললেন।

লোধু মিঞা বহু আয়াসের পর রামচন্দ্রদেবের পেয়ালায় শরাব ঢেলে রসোচ্ছল কণ্ঠে বললেন, "সইত মিল যাএগা। আজ নেহি তো কাল। পিও পিও মেরে রাজা।"

রামচন্দ্রদেব উৎসবের আসবের এ-সমস্ত আমোদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে নিমজ্জিত হলেও প্রতি মুহূর্তে যেন অমঙ্গলের পদধ্বনি শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে ব'সে ছিলেন। তাই ভিতরগড় থেকে জনৈক প্রতিহারীর সতর্ক প্রবেশ লোধু মিঞা ও মঙ্গরাজের নজরে না পড়লেও তার দৃষ্টি এড়াল না।

রামচন্দ্রদেবের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে প্রতিহারী বললে, "কটক লালবাগ থেকে 'ছামু'র সাক্ষাতে খোজা এসেছে, 'ছামু'।"

রামচন্দ্রদেব আপন হৃৎস্পন্দন শুনতে পেলেন। গত কয়েকদিনের শত উৎকণ্ঠার মধ্যে তিনি যেন এই বার্তাটির প্রতীক্ষা করছিলেন।

খোজাকে নিয়ে আসার ইঙ্গিত ক'রে তিনি এক নিশ্বাসে কয়েক ঢোক শরাব পান ক'রে আবার তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসলেন। এ-সমস্ত ব্যাপারে অব্যাপারে যেন তিনি সম্পূর্ণ নিরুদ্‌বিগ্ন, নিস্পৃহ।

অল্পক্ষণ পরে মুসলমানী পোষাক পরা একজন খোজা হাতে একটি পাখির খাঁচা ঝুলিয়ে ভিতরে এল। রামচন্দ্রদেব তার দিকে দৃষ্টিপাত মাত্রে কুর্নিশ ক'রে সে বলল, "শাহজাদী রিজিয়া বেগম এই টিয়াকে হুজুরের কাছে পাঠিয়ে কটক রওয়ানা হবার জন্য খবর করেছেন।"

টিয়া অপরিচিত পরিবেশে খাঁচার শিকে ডানা ঝাপটে কর্কশ স্বরে চীৎকার করে উঠল। লোধুমিঞা ও গদাধর মঙ্গরাজ ঢুলুনি ভেঙে চোখ রগড়ে কটক থেকে আসা শাহজাদীর টিয়ার দিকে বিস্মিত কৌতূহলে চেয়ে রইলেন। এই বিচিত্র উপঢৌকনের সংকেতার্থ তাঁরা কিংবা রামচন্দ্রদেব কেউ হঠাৎ বুঝতে পারলেন না।

টিয়াপাখি আর বেঁকিয়ে এদিকে-ওদিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে শেষে বুঝি রামচন্দ্রদেবকে চিনতে পেরে ডেকে উঠল— "খোদা হাফিজ!"

সেই পরিচিত সম্বোধন রামচন্দ্রদেবের মনে জাগিয়ে তুলল বারবাটী দুর্গে বন্দীজীবনের স্মৃতি। এই টিয়াপাখিটির মত তিনিও একদিন লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে চিলিকাতীরের মালকুদা গ্রাম থেকে বারবাটী-কটকে নীত হয়েছিলেন!

টিয়া আবার ডাকল—"খোদা হাফিজ্!"

লোধু মিঞা টিয়াপাখিটির তারিফ করে সপ্রশংস কণ্ঠে বললেন, "শাহজাদীর টিয়া, বহোৎ হুশিয়ার শরীফ্!"

রামচন্দ্রদেব গদির উপর সোজা হয়ে ব'সে লোধু মিঞার উদ্দেশে বললেন, "নায়েব-নাজিমের কাছে খোজার মারফতে খবর পাঠিয়ে দিন খাঁ সাহেব : সইত্ মিলুক বা নাই মিলুক আমরা কাল নিশ্চয় কটক রওয়ানা হয়ে যাব।"

খাঁচার ভিতরে টিয়া তখনও ডাকছিল— "খোদা হাফিজ্ ! খোদা হাফিজ।"

রিজিয়া বেগমের এই প্রিয় পক্ষীটিকে একবার হাতে ধরবার জন্য রামচন্দ্রদেব খাঁচার দরজা খুললেন। কিন্তু দরজা খোলা মাত্র টিয়া বেরিয়ে উড়ে পালাল।

খোজা আত্মবিস্মৃত হয়ে দুই হাত শূন্যে তুলে "শাহজাদীর টিয়া উড়ে গেল" বলে চেঁচিয়ে উঠল।

রাজবাড়ির বাইরে কাঁটাবাঁশের ঝাড়ের মধ্যে টিয়াটি তখন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল।

রামচন্দ্রদেব যেন মত্ততাবশতই হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। তাঁর অট্টহাসে রাজবাড়ির মূর্ছিত পরিবেশ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

তার পরের দিন কিন্তু রামচন্দ্রদেব ভিতরগর রাজবাড়িতেও ছিলেন না, কটকেও পৌঁছান নি। শাহজাদীর টিয়ার মত তিনি উড়ে গিয়েছিলেন পাহাড় জঙ্গলের মুক্তির মধ্যে।

3

লালবাগের দেওয়ান-ই-খাসে তকী খাঁর মন্ত্রণাসভা বসেছিল। তকী খাঁর মসনদের চারিদিক ঘিরে ব'সে ছিলেন ফৌজদার উজীর মহতাসিব ও আমিনচাঁদ প্রমুখ পারিষদগণ। বাহিরে কড়া পাহারা, মাছিটিও ঢোকা বারণ।

সিংহল-ব্রহ্মপুর গাঁয়ে পীর মুজাহিদ গাজী সুলতান বেগ প্রকাশ্য দিবালোকে কাফেরের হাতে শহীদ হওয়া ইস্তক সোলেরি-ঘাটে চিকা-কোলের ফৌজদারের উপরে বাটপাড়ি পেস্‌কসের টাকা লুঠ আবার খোর্ধার রাজা তকী খাঁয়ের সাক্ষাতে না এসে তকী খাঁর প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করা পর্যন্ত যা-কিছু ঘটে গেছে সে-সমস্ত যদি মুর্শিদাবাদে বঙ্গ-বিহার-ওড়িশার নবাব সুজা খাঁর কানে যায় তা হ'লে ওড়িশা সুবায় তকী খাঁর নায়েবির দিনকাল ফুরিয়ে আসতে যে দেরি হবে না এতে সন্দেহ নেই। তকী খাঁর দুর্বলতার জন্যই ওড়িশায় মোগল আধিপত্য বিপন্ন হ'ল ব'লে সুজা খাঁর কান ভারী করার জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে দিল্লী পর্যন্ত তকী খাঁর শত্রুর তো অভাব নেই।

এই কথা চিন্তা ক'রে তকী খাঁ ক্রোধে অপস্মার-রোগীর মত কাঁপছিলেন। কম্পনের মাত্রা অতিশয় বেড়ে উঠলে কোনো পারিষদ তকী খাঁর হাতে শরাবের পেয়ালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। সেই পেয়ালায় তকী খাঁ এক-এক চুমুক দিতে তাঁর কম্পন মুহূর্তের জন্য শান্ত হচ্ছিল। বদ্‌তমীজ রামচন্দ্রদেবকে বন্দী ক'রে তার প্রতি কী প্রকার কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করলে আহত অভিমানের জ্বালা প্রশমিত হ'তে পারে তার অভিনব পন্থা চিন্তা করছিলেন তিনি মনে মনে।

খোজা খবর নিয়ে গেছে খোর্ধায়। রামচন্দ্রদেব কখন এসে পৌঁছাবেন লালবাগে তার জন্য সকলের উদগ্রীব অপেক্ষা। লালবাগ দুর্গের কোতোয়াল কিন্তু ঘড়ি ঘড়ি এসে কেবল সেই একই খবর দিয়ে যাচ্ছিল :— খবর নিয়ে যে খোজা গিয়েছিল সে কিংবা রামচন্দ্রদেব কারোই কোনো খবর নেই।

তকী খাঁ হঠাৎ বিস্ফোরণ করলেন : "কম্‌বক্ত্‌ চিকাকোল ফৌজ-দারকো বোলাও!"

সোলেরি-ঘাটের রাহাজানিতে আহত ক্ষতাক্ত চিকাকোলের ফৌজ-দার তার সঙ্গের লশকরদের চিকাকোলে ফিরিয়ে দিয়ে একাকী লাল-বাগ দুর্গে এই দুর্ঘটনার সংবাদ নিয়ে এসে পৌঁচেছিল। তার কাছ থেকে এ কথা শোনা মাত্র তকী খাঁ সঙ্গে সঙ্গে তাকে কয়েদ করবার আদেশ দিয়েছিলেন। ফৌজদারের অপদার্থতার জন্যই মোগল ইজ্জত সেদিন সোলেরি-ঘাটে লুন্ঠিত হ'ল। তা ছাড়া সে নিজে যদি পেস্‌কসের টাকা আত্মসাৎ ক'রে এমনি এক গল্প ফেঁদে থাকে? বস্তুতঃ তখন মোগল পদাধিকারীরা একে অন্যকে বিশ্বাস করা দূরের কথা, নিজের ছায়াকেও বিশ্বাস করতেন না। অভ্যুত্থানের নিমিত্ত সংগ্রামের যুগে যে স্বপ্ন, আদর্শবাদ ও আত্মবিশ্বাস মোগলকে জয়টিকা পরিয়েছিল তা লোপ পেয়ে এই বিলয়ের যুগে পদাধিকারীদের মধ্যে ক্ষমতা ও স্বার্থের জন্য যে উৎকট কুকুরের লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়েছিল তাতে নিজেকে বিশ্বাস করাই সময়ে সময়ে অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। মোগলশক্তির পতনের সময়ে দিল্লী থেকে মুর্শিদাবাদ, আজিমাবাদ থেকে কটক সর্বত্র সেই অলক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল।

তকী খাঁ ফৌজদারের কাছ থেকে রাহাজানির বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শোনেন নি, তখন তাঁর শোনবার ধৈর্য ছিল না। ফৌজদারের হাতে হাতকড়া পায়ে বেড়ি দিয়ে ছিন্ন মলিন বেশে তকী খাঁর সামনে আনা মাত্র তকী খাঁ একটি জুতা পরা পা মেঝের উপর অকারণে ঠুকে গর্জন ক'রে উঠলেন: "চিকাকোল থেকে রওয়ানা হবার সময়ে তোমার সঙ্গে কত লশকর ছিল?"

ফৌজদার কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "সঙ্গে ছিল একশো ঘোড়-সওয়ার। দুটো হাতীর পিঠে পেস্‌কসের টাকা চাপিয়ে আমরা ঝাড়ী-পাহাড়ী রাস্তায় আসছিলাম, ঘোড়সওয়ারেরা ছিল হাতীর সামনে

আর পিছনে। তাদের পিছন পিছন আমি আসছিলাম ঘোড়ায়।"

তকী খাঁ বললেন, "তার পর ?"

ফৌজদার— "শাহ্-ইন-শাহ্ মেহেরবান্। আল্লাতালা জানেন আমরা কত শীঘ্র লালবাগে পৌঁছাতে পারি এই ভাবতে ভাবতে দিন কি রাত না মেনে পথ পাড়ি দিয়ে চলেছিলাম। আমাদের ভয় ছিল কেবল ছত্রদ্বার-ঘাটের জন্য। লেকিন ছত্রদ্বার-ঘাট আমরা নির্বিঘ্নে পার হয়ে এলাম। বাণপুর ছাড়িয়ে সোলেরি-ঘাটে পৌঁছবার সময়ে দিন আখের হয়ে আসছে ব'লে মনে হচ্ছিল। কিন্তু আসলে ঘাটের বাঁশঝাড়ের ভিতরে পাহাড়ের আড়ালে দিনের রোশনি ক'মে গিয়েছিল। আমি ঘোড়াসওয়ারদের হুকুম দিলাম যে সন্ধ্যার আগেই এই ঘাট পার হয়ে সরকার-তরফ কুহুড়ি গড়ে পৌঁছানো চাই। ফজর্ নামাজের পব কুহুড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লে খোর্ধা, তার পর দিন কটক।"

তকী খাঁ চীৎকার ক'রে উঠলেন—"ও সব বাজে গল্প শোনার আমার সময় নেই। সোলেরি-ঘাটে রাহাজানি করল কারা ? দুশমনদের লশকর কত ছিল ?"

ফৌজদার বললে, "সোলেরি-ঘাটে কাঁটাবাঁশের ঝাড়ের মধ্যে আমরা সামনে কয়েক পা ছাড়া তার ওদিকে আর কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না সেই রাস্তায় চলেছি, হঠাৎ বৃষ্টির ধারার মত আমাদের উপরে চার দিক থেকে তীর এসে বিঁধতে লাগল। আর তার সঙ্গে জাহান্নমের শয়তান-দের মত চীৎকার— জয় জগন্নাত। ঘোড়াগুলো সওয়ারদের কাঁটা জঙ্গলের মধ্যে ফেলে পালাল। আমি তলোয়ার বার ক'রে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতেই…"

ফৌজদারের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হল। ক্ষতাক্ত মুখের উপর দুই হাত চেপে সে শিশুর মত কেঁদে উঠল।

তকী খাঁ খেঁকিয়ে উঠলেন, "বাস্ বাস্ ঔরৎকা মাফিক কান্না বন্ধ কর।"

মহতাসিব জুলফিক্‌র খাঁ খোর্ধার রাজার বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করবার জন্য বহুক্ষণ যাবৎ গলার মধ্যে একটা সুড়সুড়ি অনুভব করছিলেন এবং হয়তো সেইজন্য তাঁর গলার কণ্ঠাটা বার বার ওঠানামা করছিল। এখন সুযোগ বুঝে এক নিশ্বাসে ব'লে ফেললেন, "কাফেরেরা জয় জগন্নাত চীৎকার ক'রে সরকারের পেসকস্ লুটে নিল। লেকিন জাঁহাপনা, খোর্ধার রাজা হাফিজ্ কাদ্‌র্ ছাড়া এর জিম্মাদারি আর কার হ'তে পারে? চিকাকোলের পেস্‌কসের টাকা যাতে ভালোয় ভালোয় কটক মুকামে পৌঁছায় সেজন্য তো অনেক আগে থেকেই খোর্ধার রাজাকে হুঁশিয়ার করা হয়েছিল। তা হলে তিনি ছাড়া পেস্‌কস্ লুঠ করবে কে? পীর মুজাহিদের কোরবানি তবু বরদাস্ত হয় কিন্তু পেস্‌কস্ লুঠ বিলকুল বেবরদাস্ত!"

তকী খাঁ রাগে আবার কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "ঐ কম্‌বক্ত্ হাফিজ্ কাদর্-এর গায়ের চামড়া থেকে চিমটে দিয়ে একটি একটি ক'রে লোম উপড়ে পেসকসের টাকা আমি এক-এক পাশুলা ক'রে আদায় করব। তার পর খোর্ধা হবে খাস্। আর জগন্নাথকে টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙে মাটিতে..."

প্রচণ্ড ক্রোধে তকী খাঁর বাক্‌রোধ হল।

প্রতিশোধের প্রস্তাব এতেই সম্পূর্ণ হল না। তার পর আর কী কী শাস্তিবিধান হতে পারে তকী খাঁ তাই চিন্তা করতে যাবেন এমন সময়ে খোর্ধাফেরত সেই খোজ শূন্য খাঁচা নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে এসে পৌঁছাল। দেওয়ান-ই-খাসে সে প্রবেশমাত্র সকলের সোৎকণ্ঠ দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ হল। সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল: "হাফিজ

কাদ্‌র্‌ কোথায়, কত দূরে ?"

খোজা অশঙ্ক স্বরে বললে, "খোর্ধার রাজা কোথায় বেমালুম উধাও হয়েছেন। খোর্ধা কেল্লাতে তাঁর কোনো পাত্তা নেই !"

তকী খাঁ ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "আর শাহজাদীর চিড়িয়া ?"

খোঁজা কাঁপতে কাঁপতে বললে, "শাহজাদীর চিড়িয়াকে খোর্ধার রাজা খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিয়েছেন !"

কেবল যে শাহজাদীর চিড়িয়াকে হাফিজ্‌ কাদ্‌র্‌ উড়িয়ে দিয়েছেন তা নয়, যেন নায়েব-নাজিম তকী খাঁর আধিপত্যকেই তিনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন-পূর্বক উড়িয়ে দিয়েছেন !

তকী খাঁ ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে কোমরবন্দ্‌ থেকে তলোয়ার খুলে দেওয়ান-ই-খাসের একটি পাথরের থামে এক প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। থামটি শিহরিত হ'ল। তলোয়ার দু'খানা হয়ে ভেঙে গেল। তকী খাঁ তাঁর বজ্রমুষ্টির ভিতর ভাঙা তলোয়ারের অধাংশের দিকে চেয়ে রইলেন— যেন তা হাফিজ্‌ কাদ্‌র্‌-এর কাটা মুণ্ড !

সভাগৃহ স্তব্ধ।

তকী খাঁ আদেশ দিলেন : ' ফৌজ কুচ্‌ করো।"

কটক হাবেলীতে সাজ সাজ রব প'ড়ে গেল। খোদ সরকার ফৌজ হম্‌রায় খোর্ধা রওয়ানা হবেন।

তকী খাঁ যখন বিপুল বিক্রমে অর্ধচন্দ্রতারালাঞ্ছিত পতাকা উড়িয়ে গোলন্দাজ, পয়দল ফৌজ আর ঘোড়সওয়ার সৈন্য নিয়ে রওনা হলেন সেই সময়ে খোর্ধা ও বাঙ্কীর দোসীমানার ঘন অরণ্যে ঘেরা দাণ্ডমাল

পর্বতমালার এক নেড়া পাহাড়ের চূড়ায় ব'সে পলাতক রামচন্দ্রদেব শীতশেষের নিরাভরণ বনভূমির উদাস সৌন্দর্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিলেন। এত পাখি এত কাকলি, এত আলো এত ফুল, এত ছায়া এত প্রশান্তি এই আশঙ্কাভাবনাবিড়ম্বিত পৃথিবীতে সম্ভব! বসন্তের নবকিশলয়ের সুষমায় মণ্ডিত হওয়ার পূর্বে বনলক্ষ্মীর এ যেন তপঃক্লিষ্টা অপর্ণার বেশ। রাশি রাশি শুকনো পাতা বাতাসে মর্মরধ্বনি তুলে শূন্যে শত শত তির্যক্ রেখা টেনে ঝ'রে পড়ছিল। জীবনবৃক্ষ থেকে ঝ'রে পড়াতেও এত আনন্দচপলতা, মরণ এমন সংগীতময়, রিক্ততা এত ঐশ্বর্যময়— রামচন্দ্রদেব বুঝি জীবনে প্রথম অনুভব করছিলেন। তাঁর উদ্‌বেজিত কপালের উপরে দক্ষিণা পবনের অকুণ্ঠিত দাক্ষিণ্যে দুই চোখ তাঁর মাঝে মাঝে এক নিশ্চিন্ত আরামে বুজে আসছিল।

আঃ— এত পাখি— এত কাকলি— ! আবার প্রত্যেকে প্রত্যেক হ'তে এত স্বতন্ত্র, স্বকীয়তায় এত উজ্জ্বল। রামচন্দ্রদেব খোর্ধার ভবিষ্যৎ, তকী খাঁর আক্রমণ সমস্ত যেন কয় মুহূর্তের মত ভুলে গিয়েছিলেন।

ভিতরগড় 'উআস' ছেড়ে পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেওয়া রামচন্দ্রদেবের জীবনে এই প্রথম নয়। অতীতে খোর্ধার ইতিহাসে বহুবার যা ঘটেছিল এ তারই এক পুনরাবৃত্তি মাত্র। এ পলায়ন নয়, এও এক পুরাতন রণকৌশল। শিশুপাল গড়, ধউলি গড়, রথীপুর গড় প্রভৃতি পার হয়ে মোগল ফৌজ যখন খোর্ধা আক্রমণ করতে আসে তখন তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আর সেই সময়ে খোর্ধা আর তার চারিপাশের পাইকেরা পিছু হ'টে আসা জলস্রোতের মতো একসঙ্গে তাদের চারিদিকে ঘিরে আসে। অতীতে মোগলবাহিনী বারবার

যেমন এই রণকৌশলে খোর্ধা থেকে পরাস্ত হয়ে ফিরেছে এবারও তকী খাঁর ফৌজ নিশ্চয় তেমনি ক'রে ফিরে যাবে— রামচন্দ্রদেবের এ বিশ্বাস ছিল। বিশেষত লুঠ করা পেস্‌কসের টাকায় পাইকদের বকেয়া বেতন শোধ ক'রে দেওয়ায় তাদের মনোবল ফিরে এসেছিল। মোগল সম্রাট্ আকবরের মৃত্যুর পর থেকে মোগলের সঙ্গে খোর্ধার এমনি লুকোচুরি খেলা বার বার হয়ে এসেছে, নূতন কথা নয়। কিন্তু তকী খাঁর সঙ্গে প্রকাশ্য শত্রুতা খোর্ধার শান্তি ব্যাহত করার সঙ্গে সঙ্গে যে জগন্নাথকেও বিপন্ন করবে, আবার নৌকায় চেপে তিনি চিলিকায় যাবেন, নয়তো কোনো বনে পর্বতে আত্মগোপন করবেন— এই কেবল ছিল রামচন্দ্রদেবের দুর্ভাবনার হেতু।

কিন্তু আপাততঃ সে-সব বিস্মৃত হয়েছিলেন রামচন্দ্রদেব।

কচ্ছপের পিঠের মতো নেড়া পাহাড়, লতাগুল্মবিহীন। পাহাড়ের পাদদেশে কাঁটাবাশের ঘন বন। তার মাঝে মাঝে এক-একটা কেন্দু, শাল, মহানিম প্রভৃতি গাছ মাথায় আলোকলতা ও শিআলিলতার[1] ঘন জটাজূট জড়িয়ে এক-একটা দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে। পাহাড়ের গা মাঝখানে বেশী গোল হয়ে ওঠায় নীচে দাঁড়িয়ে উপর দিকে তাকালে পাহাড়ের মাথা দেখা যায় না। এই নেড়া পাহাড়টির পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক বেড়ে রয়েছে দাণ্ডমাল পর্বতমালা। দক্ষিণে রণপুরের

1. শিআলি, শিআরি— ওড়িশার একটি সাধারণ বনজাত লতা, আদিবাসীরা তা দড়ির মত ব্যবহার করে, বড় বড় পাতা জুড়ে খাবার পাত বানায়।

মণিনাগ পর্বত ও পশ্চিমে খণ্ডপড়ার পর্বতমালার সঙ্গে জড়িয়ে পাকিয়ে দাণ্ডমাল শৈলশ্রেণী সেখানে যেন এক শৈল-আবর্তের সৃষ্টি করেছে। দূর থেকে দেখায় কোনো এক নীলবসনা আলসশয়না সুন্দরীর বঙ্কিম অঙ্গরেখা ও পীবর বক্ষশোভার মত। কিন্তু এই নেড়া পাহারের চুড়া থেকে দূরত্বের সে মোহভঙ্গ হয়ে এখন তা ভীষণ বনাকীর্ণ দেখাচ্ছে। পাহাড়টিকে অর্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন ক'রে রণ-অ নদীর একটি শাখা দক্ষিণমুখো বয়ে গিয়ে মহানদীর সঙ্গে মিলেছে। শৈলদন্তুরিত নদী-গর্ভ চিরে স্থানে স্থানে জলপ্রপাত সৃষ্টি ক'রে শীতশেষের ক্ষীণ কিন্তু খরস্রোতা ধারা নেচে নেচে বয়ে যাচ্ছে। এক প্রাকৃতিক পরিখার মত সে যেন এই পাহাড়টিকে সুরক্ষিত ক'রে রেখেছে।

দুই শত বৎসর আগে পুরুষোত্তমে শূন্যবাদী বৌদ্ধদের উপরে যখন প্রবল নির্যাতনের সূত্রপাত হয় সেই সময়ে যারা আপন প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছিল তারা বাঙ্কীর এমনি অনেক পাহাড়ে পালিয়ে এসে নির্বিঘ্নে সেখানে নিজের সাধন-ভজনের মঠ স্থাপন করেছিল। এই পাহাড়ে যে-কয়টি গুহা আছে সেগুলি সেই সময়ে তাদের আত্মরক্ষার আশ্রয়স্থল হয়েছিল। সেইজন্য এই পাহাড়টির নাম লোকমুখে 'শূন্য-গিরি' হয়েছে। লোকবিশ্বাসে এই এক ধারণাও চ'লে আসছে যে ঘোর কলি উপস্থিত হ'লে শূন্যদেহী জগন্নাথ একদিন নীলকন্দর ত্যাজ্য ক'রে এই শূন্যগিরিতে ফিরে আসবেন। কোন নিরঞ্জন দাসের 'মালিকা'য়[1] নাকি এমনি ভবিষ্যদ্‌বাণী লেখা আছে।

সত্য সত্যই জগন্নাথ কিছুকাল এই শূন্যগিরির একটি কন্দরে 'বিজে' করেছিলেন। তা খোর্ধার রাজা পুরুষোত্তম দেবের 21 'অঙ্কের' ঘটনা। কটকের দিক থেকে মোগল ফৌজদার মক্‌রাম্ খাঁ

1. মালিকা:— পদ্যছন্দে লেখা ভবিষ্যদ্‌বাণীসংবলিত পুথি।

যখন খোর্ধা আক্রমণ করেছিল আর ওদিকে জগন্নাথ যাতে চিলিকার মধ্যে পালিয়ে যেতে না পারেন সেজন্য জলপথগুলি বন্ধ ক'রে পাহারা বসিয়েছিল সেই সময়ে রাজা পুরুষোত্তমদেব জগন্নাথকে নিয়ে লুকিয়ে এই জোড়া পাহাড়টিতে পালিয়ে এসেছিলেন। এখনও একটি গুহার মধ্যে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার জন্য তিনটি বড় বড় গোল চেটালো পাথর রয়েছে। বিগ্রহ তিনটি সেদিন এই পাথর তিনটির উপর স্থাপিত হয়েছিল। সেইজন্য প্রত্যেক বৎসর কার্তিক পূর্ণিমায় দূর-দূরান্তর থেকে বহু তীর্থযাত্রী দুর্গম গিরিকান্তার অতিক্রম ক'রে এই-খানে এসে সেই শূন্য পাথর তিনটির পূজা ক'রে থাকে। সে দিন শূন্যগিরির পাদমূলে রণনদীর শিলাদস্তুরিত শয্যার উপরে মেলা বসে। রাজা পুরুষোত্তমদেব এখানে জগন্নাথকে আগলে রেখে অন্য গুহা-গুলিতে তাঁর 'লাগুতিগহণ' নিয়ে কিছুকাল ছিলেন। মক্‌রাম্‌ খাঁ, তার মধ্যে খোর্ধা অধিকার ক'রে বাণপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এমনি সময়ে পুরুষোত্তমদেব হঠাৎ পশ্চাদাক্রমণ ক'রে মক্‌রাম্‌ খাঁকে পরাস্ত করেছিলেন। পরবর্তী কালে জগন্নাথ না এলেও খোর্ধার অনেক রাজা মোগল আক্রমণের সময় এইখানে পালিয়ে এসে আত্ম-রক্ষা করেছেন।

রামচন্দ্রদেবও এখন তকী খাঁর আক্রমণ আসন্ন বুঝে সঙ্গে কয়েক জন সেনাপতি ও সর্দারদের নিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছিলেন। কারণ সামরিক দিক থেকে জায়গাটি ছিল অতি নিরাপদ। তা ছাড়া গড়-জাতের সামন্ত রাজাদের সঙ্গে এখান থেকে যোগাযোগ রক্ষা করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল।

রামচন্দ্রদেব পাহাড়ের উপরে অন্যমনস্কভাবে পাদচারণ করতে করতে সেই ঠাকুরের গুহার কাছে চ'লে এসেছিলেন। গুহাটি দক্ষিণ-

মুখো হওয়ায় তার ভিতরে যথেষ্ট আলো। গুহার প্রবেশদ্বারে একটি ঝাকড়া কাঁঠাল গাছের ঘন পাতার আড়াল ভেদ ক'রে শীতের মধ্যাহ্ন রৌদ্র গুহার মেঝের উপরে আলোছায়ার আলপনা এঁকেছিল। গুহার ভিতরে বিগ্রহদের তিনটি বিরাট্ চক্রাকার প্রস্তর বেদী বিগত বহু কার্তিক-পূর্ণিমাব পুণ্যার্থীদের সিন্দূরনৈবেদ্যচর্চিত হয়ে শূন্য প'ড়ে ছিল। অতীতের বহু পূজা-অর্চনার শুষ্ক ফুলদল পাথর তিনটির চারিদিকে বিছিয়ে প'ড়ে ছিল।

সহসা যেন সেই শূন্য পরিবেশ এক অচিন্ত্যনীয় অবর্ণনীয় পূর্ণতায় ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠল। তার অপূর্ব আবেশে রামচন্দ্রদেবের ক্লান্ত অক্ষি-পল্লব আপনি মুদ্রিত হ'ল।

পরমুহূর্তে তাঁর মনে পড়ল তিনি ধর্মান্তরিত! ধর্মচ্যুত! জগন্নাথের রত্নসিংহাসনের বেদীমূল থেকে নির্বাসিত!

তাই প্রবল ও উৎকণ্ঠ বাসনা সত্ত্বেও তিনি গুহার ভিতরে না গিয়ে কাঁঠাল গাছেব নীচে মুদিত নয়নে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন তাঁর কোনো প্রার্থনা ছিল না, কোনো যাচ্ঞা ছিল না— মুদিত নয়নের অন্ধবলয়ের মধ্যে তিনি দেখছিলেন তাঁর হৃদয়সিংহাসনও যেন রিক্ত ও শূন্য হয়ে প'ড়ে আছে; সে সিংহাসন হয়তো এ জীবনে পূর্ণ হবার নয়।

চারিদিক ঘিরে এক অশেষ শূন্যতা! উপরের নিমেঘ অসীম আকাশেও সে শূন্যতা ধারণের স্থান নেই। মাঘ মাসের পত্রবিরল শাখা থেকে সে শূন্যতা যেন রাশি রাশি শুষ্ক পত্রের মত ঝরে পড়ছিল।

ওহে জগন্নাথ, জীবনে কেন দিলে অন্তহীন দহনের এই দীক্ষা? ধর্মান্তরিত হয়েও তোমা হতে অন্তর হওয়া যায় না! তোমাকে

ছাড়লেও তুমি ছাড় না। তকী খাঁর মোসাহেবি করতে পারলে খোর্ধার সিংহাসন কেন, ওড়িশা সুবার নায়েবি কি নাগালের বাইরে হত?

রামচন্দ্রদেব চোখ মেলে ভিতরের দিকে চাইলেন। এক টুকরো রোদ গুহার মেঝে থেকে ধীরে ধীরে জগন্নাথের শূন্য আসনটির উপরে সরে আসছিল। অল্পক্ষণ পরে রোদ ঘুরে গেলে গুহার অভ্যন্তর আবার ছায়াঢাকা মৌনতার মধ্যে ফিরে যাবে।

রামচন্দ্রদেবের মনে পড়ল তকী খাঁ জগন্নাথের অভিমুখে সৈন্য-বাহিনী নিয়ে চলেছে, জগন্নাথ আবার কোথায় কোন্ বনে পর্বতে অজ্ঞাতবাসী হবেন কে জানে!

জগন্নাথ নিগৃহীত ওড়িশার অজেয় আত্মা। অগ্নি তাঁকে দগ্ধ করে নি, জল তাঁকে নিমজ্জিত করতে পারে নি। শস্ত্র তাঁকে ছিন্ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। জগন্নাথ নিখিল বিশ্বের মৃত্যুহীন অক্ষয় অব্যয় আত্মা। পুণ্য প্রস্তরবেদীর দিকে চেয়ে রামচন্দ্রদেব উদাত্ত স্বরে আবৃত্তি করলেন—

'অবিনাশী তু তদ্‌বিধি যেন সর্বমিদং ততম্
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি।'

আবৃত্তির উত্তেজনায় তাঁর সব ক্লান্তি ও গ্লানি কেটে গেল। সেই প্রেরণাপ্রদীপ্ত মুহূর্তে রামচন্দ্রদেবের মনে হল এ জীবন পূর্ণ, পূর্ণৈশ্বর্য-ময়! রামচন্দ্রদেব মহানদীর উত্তর তীরের সুদূর শৈলশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন।

কাঁটা বাঁশের বনের ভিতরে শুকনো পাতার রাশির উপরে কার পায়ের শব্দ হল। রামচন্দ্রদেবের ধ্যান ভঙ্গ হ'ল। তলোয়ারের মুঠে হাত রেখে পায়ে পায়ে তিনি সেইদিকে এগিয়ে গেলেন।

মালিপড়া গড়ের নরসিংহ বিশোয়ী ঊর্ধ্বশ্বাসে পাহাড় বেয়ে উপরে উঠছিলেন, রামচন্দ্রদেবকে দেখতে পেয়ে চীৎকার ক'রে বললেন— "তকী খাঁর লশকর শিশুপাল গড় তছনছ ক'রে ধউলি গড়ের দিকে চলেছে। বকশী বেণু ভ্রমরবরের পাত্তা নেই। পাইকেরাও বিদ্রোহী হয়েছে!"

রামচন্দ্রদেবের মুখের কোমল রেখাগুলি হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল। রুক্ষ কণ্ঠে বললেন, "শিশুপাল গড়ে বকশী তা হ'লে কি তকী খাঁকে বাধা দেন নি?"

মাঘ মাসের পাহাড়ী শীতেও কপালে ফুটে-ওঠা স্বেদবিন্দু বাঁ হাতে মুছে ফেলে বিশোয়ী বিষণ্ণভাবে বললেন, "বকশী আর তাঁর পাইকেরা 'মেলিআ'[1] হয়েছে, 'ছামু'! তার পরে নরসিংহ বিশোয়ী সবিস্তারে যা বললেন তা এই :—

তকী খাঁর লশকরেরা শিশুপাল গড়ের সীমানা মাড়াতে প্রথমটা ভরসা পাচ্ছিল না। অতীতে বহু দাঁতালো ফৌজদার শিশুপাল গড়ের পাইকের প্রহারে ধরাশায়ী হয়েছেন, কালাপাহাড় পর্যন্ত শিশুপাল গড়ের জন্যই ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরে আঙুল ছোঁয়াতে পারে নি। সেইজন্য তকীখাঁর লশকরেরা অতি সাবধানে শিশুপাল গড়ের দিকে পায়ে পায়ে এগচ্ছিল। কাঁটাবাঁশের ঘন বনের ভিতর থেকে শিশুপাল গড়ের মাটির প্রাচীরের মাথাটুকুই কেবল তারা দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু প্রাচীরের উপরে পাথর-ছোঁড়া পাইক কি ধনুকধারী বা বন্দুকধারী পাইক একটিও দেখতে পেল না তারা। সামনে প্রতিরোধকারীদের দেখতে পেলে তাদের শক্তি অনুমান

1. মেলিআ— যারা 'মেলি' করেছে অর্থাৎ বিদ্রোহের জন্য জোট পাকিয়েছে, বিদ্রোহী।

ক'রে তকীখাঁর লশকরদের ভয় হয়তো ভেঙে যেত, কিন্তু শিশুপাল গড়ে তকী খাঁকে বাধা দিতে বেড়ালছানাটিরও দেখা মেলে নি। ঘন কাঁটাবাঁশের ঝাড়ে ঘেরা শিশুপাল গড়ের মাটির প্রাচীর অবিচলিত মৌনতায় তকী খাঁর হুংকার অবজ্ঞা ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। প্রাচীরের বাহিরে গঙ্গুআ নদীর জলে বাঁশবনের অচঞ্চল ছায়া তেমনি স্থির হয়ে প'ড়ে রইল।

এই অস্বাভাবিক প্রতিরোধহীনতার সামনে তকী খাঁর ফৌজ-দারেরা অহেতুক আতঙ্কে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তকী খাঁ তখন গোলন্দাজদের হুকুম দিলেন: "গোলি চালাও!" উটটানা গাড়িতে ক'রে বয়ে আনা কামান থেকে কাঁটাবাঁশের বনের উপরে যথেচ্ছ গোলাবর্ষণ শুরু হল। বাঁশবনে আগুন লেগে ধু ধু ক'রে জলতে লাগল। তখনও শিশুপাল গড়ে জীবনের কোনো লক্ষণ নেই, প্রতি-রোধের কোনো চেষ্টা নেই।

লশকরেরা গঙ্গুআর জলপরিখা পার হল, তখনও গড়ের ভিতর থেকে পাইকদের সেই অমোঘ শরবৃষ্টি হ'ল না। শিশুপাল গড়ের সিংহদ্বার খোলা ছিল। লশকরেরা 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি দিয়ে গড়ের ভিতরে জলস্রোতের মত ঢুকতে লাগল। বাঁশঝাড়ের আগুন গড়ের ভিতরে ছড়িয়ে প'ড়ে একটির পর একটি ঘর গ্রাস করতে লাগল। বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ ছাড়া গড়ে আর কোনো শব্দ ছিল না। বহু পূর্বেই বকশী বেণু ভ্রমরবর পাইকদের সঙ্গে নিয়ে গড় ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

বিশোয়ী বললেন, "ধউলি গড়ও গেল ধ'রে নিন! তারপরে রথীপুর পেরোলেই খোর্ধা আর কত দূর?"

রামচন্দ্রদেব স্বগতোক্তি করার মত বললেন, "তার পরে খোর্ধা

অধিকার ক'রে তকী খাঁ পিপিলীর পথে চলবে পুরী।"

রামচন্দ্রদেব ভাবতে পারেন নি যে বকশী বেণু ভ্রমরবর তকী খাঁর প্রতিরোধ না ক'রে এমনভাবে পলায়ন করবেন। রামচন্দ্রদেবের হিসাব এই ছিল যে যুদ্ধে বকশী মরলেও লাভ, বাঁচলেও লাভ। বাঁচলে সন্ধির শর্ত হিসাবে তকী খাঁ আগে বকশীর কাটা মাথা চাইবে। আর মরলে তো একটা অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতকের ক্ষমতালিপ্সা থেকে খোর্ধা উদ্ধার পাবে। তার পর ধউলি গড়। তার পর রথীপুর। এমনি ভাবে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তকী খাঁ প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে শেষে খোর্ধার দিকে এগলে রামচন্দ্রদেব তখন আরম্ভ করবেন পিছন থেকে আক্রমণ।

কিন্তু বকশীর ধূর্ততায় সে-সব পরিকল্পনা বালির কেল্লার মত মুহূর্তের মধ্যে এমনি ধ'সে পড়বে তা রামচন্দ্রদেব আশঙ্কা করেন নি।

বললেন, "আর এখানে থেকে লাভ নেই। চলো খোর্ধা, সেখানেই যা হবার হবে।"

পাহাড়ের নীচে একটি পলাশ গাছে রামচন্দ্রদেবের ঘোড়া বাঁধা ছিল। রামচন্দ্রদেব সেই দিকে অবিচলিত দৃঢ় পদে এগিয়ে গেলেন।

মোগলের হাঙ্গামা লাগবার আগে থেকে শ্রীক্ষেত্রের উদ্দেশে যে যাত্রীরা দূরদূরান্তর থেকে যাত্রা করেছিল তারা মহা বিপদে পড়ল। মধ্যপথে এমন ভাবে মোগল হাঙ্গামা শুরু হবে তা কেউ ভাবে নি।

এখন মোগল লশকরদের দেখে জগন্নাথ সড়ক ছেড়ে কোথায় কোন্ বাঁশঝাড় পাহাড় জঙ্গলের ভিতর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে নদী নালা পেরিয়ে অর্ধেক লোক হয়তো পুরী আঠারো নালা পর্যন্ত পৌঁছাবে, বাকী অর্ধেক শুকনো পাতার মত ঝ'রে প'ড়ে যাবে পথে। এদিকে জগন্নাথের ডোর টানছে, ফেরবার তো উপায় নেই! আর পথে প্রাণটা গেলে তো মোক্ষলাভ— এমনি বিশ্বাস। মোগল-হাঙ্গামা ও দুর্গম পথের ভয় তুচ্ছ করে তারা জগন্নাথ ব'লে এগিয়েই চলেছিল পায়ে পায়ে।

শিশুপাল গড় থেকে দুই ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে জগন্নাথ-সড়কের একধারে সরদেঈপুব গ্রাম, জগন্নাথ-যাত্রীদের এক প্রধান আশ্রয়। সারা বৎসর এখানে পশ্চিমা যাত্রীর ভিড় লেগে থাকে। গাঁয়ের রাস্তায় কত টাটু ঘোড়া, ডুলি পালকি আব বিদেশী ঝালরওয়ালা গরুর গাড়ির মেলা। কিন্তু এখন হাঙ্গামার ভয়ে সেই জনাকীর্ণ গ্রাম নির্জন, পরিত্যক্ত। গাঁয়ের লোকেবাও প্রাণ ও মান বাঁচাবার জন্য গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিল। গ্রামের বাস্তায় কেবল জীবনের মৌনছায়ার মত দলে দলে গাই গরু, কিসের এক ভয়ে যেন তারা ঘাসেও মুখ দিতে পারছে না। সেই মূর্ছিত বিষণ্ণ পাণ্ডুব পরিবেশের উপরে মাঘ মাসের হিমেল হাওয়া যেন নৈরাশ্যের শেষ ছোপটুকু ধরাচ্ছিল।

সরদেঈপুব পেরোলে ধউলি গাঁ। দয়ানদীব নির্দয় বন্যা বাত্যা এবং দারিদ্র্যের গদাঘাতে নিষ্পিষ্ট কতগুলি ঘর মাটিতে মিশে যাওয়ার আগে পোকাধরা ফোঁপরা বাঁশের খুঁটিতে যেন কোনোমতে ঠেকে রয়েছে কেবল। বৃষ্টিতে দেওয়াল রোয়াক সব ধুয়ে গেছে। এই গ্রাম ছুঁয়ে গেছে ধউলি গডে যাওয়ার সড়ক। তাই সরদেঈপুরের মত এই গ্রামটিও মোগল লশকরের ভয়ে পরিত্যক্ত, জনশূন্য। গ্রামটিকে

দেওয়ালের মত আড়াল ক'রে রয়েছে ধবলগিরি বা ধউলি পাহাড়—তৃণগুল্মহীন, পাথুরে, নেড়া। কেবল নীচে বাঁশ আর বেতের জড়াজড়ি-করা বন। পাহাড়ের মাথায় ধবলেশ্বর মন্দির, একটি পায়ে-চলা পথের দাগ এঁকেবেঁকে নীচ থেকে মন্দির পর্যন্ত উঠে গেছে।

ধবলগিরির দক্ষিণে আর-একটি ছোট তেমনি জোড়া পাহাড় বা টিপি, নাম অশ্বত্থামা। মাঝখানে হিন্তাল, বাঁশ আর বেতের ঘন অরণ্য। অশ্বত্থামার প্রস্তরগাত্রে সম্রাট্ অশোকের অনুশাসন-সংবলিত শিলালিপি। লোকবিশ্বাসে কিন্তু তা কোনো সিদ্ধ মহাপুরুষের আগামী-কালের ভবিষ্যলিপি। কলিযুগ শেষ হ'লে মানুষ সে পাথরের ভাষা পড়বে, বুঝবে। তারপর সত্যযুগ আসবে।

অশ্বত্থামার দক্ষিণে ধউলি গড়। খোর্ধা যাওয়ার পথে এই গড় অবস্থিত ব'লে তার সামরিক গুরুত্ব ছিল। পোড়া ইটে তৈরি দুর্গ। পাঁচশো অশ্বারোহী ও দুই হাজার সৈন্য এই গড়ে সর্বদা মজুত। গড়ের পাহারাদার বা দুর্গপাল ছিলেন নবঘন সামন্তরায়। বকশীর প্ররোচনায় নবঘন সামন্তরায়ও সমস্ত পাইক সমেত শিশুপাল গড়ের মত এই গড় ছেড়ে পালিয়েছিলেন।

ধউলি বা ধবলগিরি এবং অশ্বত্থামা নামক টিবি—এই দুইয়ের মাঝে যে সংকীর্ণ উপত্যকা তার ঘন অরণ্যের মধ্যে ধউলি গড়ের ইষ্টদেবী মহিষমর্দিনী দুর্গার একটি প্রাচীন মন্দির ছিল। খোর্ধার রাজারা বিষ্ণু-উপাসক হ'লেও প্রতি বৎসর রজ সংক্রান্তি[1] ও দশহরায় এখানে পূজা দিতেন। কখনো কখনো দেবীর নিকট নরবলির আতঙ্ক ছড়াত

1. রজ সংক্রান্তি—জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংক্রান্তি; জ্যৈষ্ঠের শেষ দিন ও আষাঢ়ের প্রথম দুই দিন—এই তিন দিন রজ পর্ব পালিত হয়, বসুন্ধরা ঋতুমতী এই বিশ্বাসে ভূমি কর্ষণ স্থগিত থাকে।

এ অঞ্চলে। সেজন্য সরদেঈপুর গাঁয়ের পূজক ও দেহুরীরা[1] ছাড়া এ মন্দিরের দিকে ভয়ে সাধারণত কেউ ঘেঁষত না। বেতবন ও কাঁটা-বাঁশঝাড়ে ঘেরা থাকায় মন্দিরটি বাহির থেকে কারও হঠাৎ দৃষ্টিগোচরও হ'ত না।

শিশুপাল গড়ে লঙ্কাদহনকাণ্ড ঘটিয়ে তকী খাঁ যখন ধউলি গড়ের দিকে চলেছিলেন সেই সময় সেই মন্দিরের ভিতরে আত্মগোপন ক'রে বকশী বেণু ভ্রমরবর দেবীর কাছে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য পূজা দিচ্ছিলেন। একটি নরকপালের মধ্যে একটি সলতে জ্বলছিল। তার ক্ষীণ আলোকে দেবী ভয়ংকররূপিণী প্রতীয়মান হচ্ছিলেন।

দেবীর সামনে যূপকাষ্ঠ। অতীতের অগণিত বলির রক্তে রক্তাত। কুশাসনের উপরে দেবীপূজক তান্ত্রিক গোবিন্দ ব্রহ্মচারী মন্ত্রপাঠ-সহ আহুতি দিচ্ছিলেন। গোবিন্দ ব্রহ্মচারী বয়সে বৃদ্ধ। তাঁর পাংশু-বর্ণ মুখ আহুতির অগ্নিশিখাব আলোকে আরো বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। শীর্ণ শুষ্ক দেহে আনাভিলম্বিত রুদ্রাক্ষমালা। তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে আর-একটি কুশাসনের উপরে বকশী বেণু ভ্রমরবর ব'সে মন্ত্র জপ করছিলেন। প্রদীপের আলোয় মুণ্ডিত মস্তক ও ঘন ভ্রূর নীচে বকশীর মুখও এক জীবন্ত নরকপালের মতই মনে হচ্ছিল। কেবল বীজমন্ত্র জপ করাব সময়ে তাঁর স্থূল ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত হয়ে জীবনের সামান্য সূচনা দিচ্ছিল মাত্র।

মন্দিরের ভিতরে হঠাৎ একটা ছায়া পড়ায় বকশী মুদ্রিত চক্ষু ধীরে ধীরে উন্মোচন ক'রে গর্ভগৃহের নিচু দ্বারপথে দৃষ্টিক্ষেপ করলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন দেওয়ান কৃষ্ণনরীন্দ্র আর তাঁর পিছনে নবঘন সামন্তরায়। তাঁদের দেখে বকশী উদ্‌বিগ্নভাবে আসন ছেড়ে বাইরে

1. দেহুরী— দেবীর সেবাকারী নিম্নজাতিবিশেষ।

উঠে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—"কি সংবাদ ?"

কৃষ্ণনরীন্দ্র বললেন, "রথীপুর গড়ের পাইকরাও 'মেলিআ' হয়েছে, সেখানেও তকী খাঁর আক্রমণের কোনো প্রতিরোধ হবে না। ভিতর-গড় ছেড়ে রাজা কোথাও পলায়ন করেছেন বলে খবর এনেছেন নবঘন।"

বকশী উল্লসিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাজা ভিতরগড় ছেড়ে পলায়ন করার সংবাদ তা হলে সত্য ? খোর্ধার পাইকেরা কি বিদ্রোহ করেছে ?"

নবঘন উত্তর দিলেন, "আমি তো জঙ্গলের পথ দিয়ে খোর্ধা থেকে এইমাত্র আসছি। ভিতরগড় 'উআসে' রাজা নেই। খোর্ধায় জনমনিষ্যি নেই।"

বকশী উত্তেজিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "জয় মা ভবানী ! এই তো সুযোগ, খোর্ধা সিংহাসন খালি প'ড়ে আছে ! এই অবসরে আমি যদি খোর্ধার সিংহাসন অধিকার ক'রে ব'সে থাকি তা হলে তকী খাঁ যখন খোর্ধা পৌঁছাবে আমরা তার সঙ্গে যে-কোনও শর্তে সন্ধি ক'রে খোর্ধার গদি নিজের এক্তিয়ারে রাখতে পারব। রাজা তকী খাঁর হাতে প্রাণ না দিলেও অন্ততঃ চিরদিনের মত খোর্ধার গদি থেকে বিদায় হবেন।"

কৃষ্ণনরীন্দ্র ও নবঘন সামন্তরায় ভেবে দেখলেন প্রস্তাবটা মন্দ নয়, এখানে বেতবন আর বাঁশঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে ব'সে থাকার চাইতে ভিতরগড় 'উআসে' তকী খাঁর সম্বর্ধনার জন্য প্রস্তুত হওয়া কূটনীতি ও রাজনীতি দুই হিসাবেই অধিক লাভজনক।

কৃষ্ণনরীন্দ্র বললেন, "তা হলে আর বিলম্ব ক'রে লাভ নেই। তকী খাঁর ফৌজ এতক্ষণে সরদেঈপুর ধরো ধরো করছে, এইবেলাই এখান থেকে খোর্ধা যাওয়া ভাল, পরে আর সুবিধা তো নাও হ'তে পারে।"

কৃষ্ণনরীন্দ্রের কথা শেষ হতে না হতে যে নরকপালে দীপের সলতে জ্বলছিল সলতে পুড়ে দীপের শিখা ক্রমে ভিতরে আসাতে তার উত্তাপে খুলিটি ভয়ংকর শব্দ ক'রে ফেটে গেল। গোবিন্দ ব্রহ্মচারী সেই শব্দে চমকে উঠে দেবীপ্রতিমার দিকে চাইলেন। পূজায় নিশ্চয় কোনো বিঘ্ন হয়েছে। কিন্তু গোবিন্দ ব্রহ্মচারী তা প্রকাশ না ক'রে নীরবে আর-একটি সলতে নরকপালের একভগ্নাংশের মধ্যে জেলে দিলেন। খুলি ফাটার শব্দে বকশী ও তাঁর পিছন পিছন কৃষ্ণনরীন্দ্র ও নবঘন সামন্তরায় ভিতরে ঢুকে এলেন।

সেই সময়ে দেবীর কিরীট থেকে একটি কাঠচাঁপা ফুল খসে পড়ল। নবঘন ফুলটি তুলে মাথায় ছুঁইয়ে বললেন, "দেবী প্রসন্না না হ'লে দেবীর মাথার ফুল নীচে পড়ে না। বকশী 'সাআন্ত' (সামন্ত) এবার খোর্ধার গদি পাচ্ছেন এতে আর সন্দেহ নেই।"

বকশী দেবীর উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ক'রে ঢিপঢিপ করে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বললেন, "আম্মার অভীষ্ট পূর্ণ ক'রে দে মা, খোর্ধার গদি পেলে নরবলি দেব।"

গোবিন্দ ব্রহ্মচারী চোখ মেলে একবার বকশীর দিকে একবার দেবী-প্রতিমার দিকে তাকালেন। তার পর আবার চক্ষু মুদ্রিত ক'রে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক আহুতি দিতে লাগলেন।

বকশী প্রমুখ সকলে আর-এক বার ক'রে দেবীর উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ক'রে মন্দিরের বাহিরে এলেন।

খোর্ধা ভিতরগড়ে তাঁরা যখন পৌঁছালেন দেখলেন গড় সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। তকী খাঁ ততক্ষণে ধউলিগড় অধিকার ক'রে রথীপুরগড়ে ডেরা গেড়েছিলেন। খোর্ধার পথেঘাটে জনমানবের চিহ্ন ছিল না, মোগল-হাঙ্গামার ভয়ে লোকে খণ্ডপড়া, নূআগড় ও রণপুরের অরণ্যে

পলায়ন করেছিল।

তকী খাঁ যদি খোর্ধা অধিকার করে তো সে কেবল খোর্ধার পিণ্ড, প্রাণ নয়। অতীতে এমন বার বার বহুবার ঘটে এসেছে। এখন তার পুনরাবৃত্তি হচ্ছিল মাত্র। খোর্ধার লোক এতে অভ্যস্ত ছিল।

বকশীরা সকলে যেন গড় জয় করেছেন এমনি বিক্রমে ভিতরগড়ের সিংহদ্বারের কাছে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়লেন। সিংহদ্বারের কাঁসার কবাটে আঘাত করামাত্র ভিতর থেকে কবাট খুলে গেল।

বকশী চীৎকার ক'রে ভিতরে প্রবেশ করা মাত্র রামচন্দ্রদেব কোন্ অন্তরাল থেকে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত বকশীর উপর লম্ফ দিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন, "এই বিশ্বাসঘাতকের দলকে অন্ধকূপে বন্দী করো!"

মুহূর্তের মধ্যে রামচন্দ্রদেবের পাইকেরা এসে বকশীপ্রমুখ সবাইকে বন্দী ক'রে ফেললেন।

ধউলি গড়ের জীর্ণ প্রাচীরগুলিকে অকারণ দর্পসহকারে ভূমিসাৎ করে এসে নায়েব-নাজিম তকী খাঁ ঘাঁটি গেড়ে ব'সে ছিল রথীপুর গড়ে। এই গড়ে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ও দশ হাজার পাইক থাকে। ভিতর গড় খোর্ধা রাজাদের আবাসস্থল, কিন্তু রথীপুর খোর্ধার মুখ্য রাজনীতিক ও সামরিক কেন্দ্র ছিল। তাই এইখানে খোর্ধার রাজার সঙ্গে শেষ লড়াই হবে ভেবে তকী খাঁ প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন।

কিন্তু গুপ্তচরেরা খবর আনল যে শিশুপাল গড় ও ধউলি গড়ের মত খোর্ধা রাজার পাইকেরা রথীপুর গড়ও ছেড়ে পালিয়েছে, গড় জনশূন্য। তকী খাঁর প্রথমে এ সংবাদে বিশ্বাস হয় নি; যে খোর্ধার পাইকেরা

মানসিংহ থেকে এ পর্যন্ত দেড়শো বছর বার বার ল'ড়ে ল'ড়ে ওড়িশায় মোগল-পাঠানকে ঘোল খাইয়ে এসেছে, তারা হঠাৎ বিনাযুদ্ধে দুর্গের পর দুর্গ এমন ক'রে ছেড়ে পালাবে এ কথা তকী খাঁ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। সেইজন্য রথীপুর গড়ের কাছাকাছি এসে সম্মুখ-আক্রমণের আশঙ্কায় তকী খাঁ আর অগ্রসর না হয়ে একটি আম-বাগানে ছাউনি ফেলে সেইখানে প্রথম দিনটি অতিবাহিত করলেন। কিন্তু রথীপুর গড় থেকে প্রতিরোধের কোনো চিহ্ন নেই।

রথীপুর গড়ের পরিসর বেষ্টন ক'রে যে 'মেঘনাদ' প্রাচীর সগর্বে দাঁড়িয়ে ছিল তকী খাঁর আদেশে লশকরেরা তার কাছবরাবর বারুদ গাদলে। তবু কোনো প্রতিরোধ নেই। গড় শূন্য ও পরিত্যক্ত, প্রতিরোধ কে করবে?

প্রমত্ত শক্তির আস্ফালনের সম্মুখে আক্রান্তের অবিচলিত মৌনভাব চাইতে ধৈর্যচ্যুতিকারী আর কিছু নেই। রথীপুর গড়ের নির্বাক প্রাচীরের উপর যেন মোগলদ্রোহী হাফিজ্ কাদর্-এর স্পর্ধিত মূর্তি ফুটে উঠল তকী খাঁর মানসনেত্রে। তকী খাঁ গোলন্দাজদের হুকুম দিলেন তোপ দেগে সেই প্রাচীর মাটিতে মিশিয়ে দিতে।

কামানের গোলার ঘায়ে 'মেঘনাদ' প্রাচীরের উত্তরাংশ নিমেষের মধ্যে ধূলিসাৎ হ'ল। বারুদের ধোঁয়া আর ধুলোর মেঘের আড়ালে গড় কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল। তার পর তকী খাঁর হৃদয়ংগম হ'ল যে গড় বাস্তবিকই শূন্য ও পরিত্যক্ত। স-লশকর তকী খাঁ গড়ে প্রবেশ করলেন।

খোর্ধা থেকে তকী খাঁর প্রতিনিধি লোধু মিঞা সংবাদ নিয়ে এসে পৌঁছলেন যে রাজা খোর্ধা ভিতরগড় ছেড়ে পালিয়েছেন, ভিতরগড় জনশূন্য। কাজেই আর বৃথা পথশ্রম স্বীকার ক'রে খোর্ধায় অভিযান

না ক'রে তকী খাঁ সেইখান থেকেই হাফিজ্ কাদর্‌কে জীবন্ত বা মৃত ধ'রে আনবার হুকুম দিয়ে লশকর ও ফৌজদারদের বিভিন্ন দিকে পাঠালেন। কিন্তু হাফিজ্ কাদর্-এর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য, দুর্গের পর দুর্গ পরিত্যক্ত, নিশিতে পাওয়ার মত ঘুরে ঘুরে লশকর ও ফৌজদারেরা রথীপুর গড়ে ফিরে এল।

এমনি অবস্থায় একদিন তকী খাঁ নিষ্ফল ক্রোধে দাঁত কিড়মিড় করছেন এমন সময়ে একজন লশকর এসে এত্তেলা দিল যে খোদ হাফিজ্ কাদর্ বেগ জাহাঁপনার মোলাকাতের জন্য গড়ে হাজির। পারিষদ ও ফৌজদারবর্গদের স্তিমিত ক্লান্ত চোখে উত্তেজনার সঞ্চার হ'ল— হাফিজ্ কাদর্-এর প্রতি এবার কী শাস্তি বিধান হয়। তকী খাঁ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলে না।

কিন্তু রামচন্দ্রদেব বা হাফিজ্ কাদর্ তখন যেন শরাবের নেশায় অর্ধোন্মাদের মত টলতে টলতে তকী খাঁর সামনে এসে বিনা ভূমিকায় দু' হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে চীৎকার ক'রে বলতে শুরু করেছিলেন— "আমি মুজ্‌রিম্! আমি অপরাধী! আমার গোস্তাকি মাফ্ করবেন না জাহাঁপনা! আমার বরাদার, আমার বড় ভাই, জাহাঁপনার কাছে আমি অনেক কসুর করেছি। আমায় শূলে চড়ান— হাঁ, শূলে চড়ান আমাকে!"

ব্যাপার কী তকী খাঁকে বোঝবার অবসর না দিয়ে রামচন্দ্রদেব তেমনি প্রলাপ ব'কে চলেছেন— "হায় রিজিয়া বেগম! শূলে যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে আখের মোলাকাতও হ'ল না!"

আড়-চোখে চেয়ে দেখলেন তকী খাঁ এই আকস্মিক নাটকীয়তায় বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। কণ্ঠস্বর আর-এক পর্দা চড়িয়ে তিনি ব'লে চললেন—"আর দেরি কেন জাহাঁপনা? এই আমি হাফিজ্

কাদ্‌র্‌, আপনার ছোট ভাই, আপনার দরবারে হাজির। জাহাঁপনা নিজ হাতেই তলোয়ারের এক চোটে এই মুজ্‌রিমের মাথা এই মুহূর্তে ধুলোয় লুটিয়ে দিন। আমি বেআদব। আমি মুজ্‌রিম্‌!"

তকী খাঁ কী করবেন তখনও ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। রামচন্দ্র-দেবকে নিজের কাছে একটি আসনে বসিয়ে বললেন, "হোশ্‌মে আও, হাফিজ্‌ কাদ্‌র্‌!"

ওষুধটা ঠিক ধরেছে দেখে রামচন্দ্রদেব অভিনয় ক'রে চললেন। বুক চাপড়ে তিনি ব'লে উঠলেন, "হোশ্‌ নেহি! বেহোশ্‌ ভি নেহি! জাহাঁপনার একটিও দুশমন্‌ জিন্দা থাকা ইস্তক হাফিজ্‌ কাদ্‌র্‌ হোশে থাকতে পারে না!"

তকী খাঁ এইবার রাগে চীৎকার ক'রে উঠলেন—"দুশমন্‌ তুমি, হাফিজ্‌ কাদ্‌র্‌! সেই তো আমার মুসিবৎ! সিংহল-ব্রহ্মপুর গাঁয়ে পীর মুজাহিদ্‌ গাজী সুলতান বেগ্‌কে খুন করেছিল কে?"

রামচন্দ্রদেব আবার বুক চাপড়ে নাটকীয় কণ্ঠে বললেন, "ইনশাল্লাহ্‌! পীর মুজাহিদ্‌ গাজী সুলতান বেগের কোর্বানিতে বেহেস্তে একজন শহীদ বাড়ল, কিন্তু জাহান্নমে একটি শয়তান কমল না!"

এমনি অবান্তর অনির্দেশ্য উত্তরে তকী খাঁ আর কী অভিযোগ করবেন ভেবে না পেয়ে রুষ্টকণ্ঠে বললেন, "চিকাকোল ফৌজদারের উপর বাটপাড়ি ক'রে পেস্‌কসের টাকা লুঠ করার জিম্মাদারি কার? এ-সব খুন আর রাহাজানির পিছনে তুমি হাফিজ কাদ্‌র্‌ না থাকলে ঈদ্‌ পরবে কটকে না এসে খোর্ধায় লুকিয়ে ব'সে থাকবে কেন?"

রামচন্দ্রদেব যেন এতক্ষণ এই সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিলেন। পেস্‌কসের টাকা লুঠের কথা নিয়ে তকী খাঁর অভিযোগ শোনামাত্র তিনি নাটকীয় ভঙ্গীতে সুজুনির ভিতর থেকে বকশী বেণু ভ্রমরবরের

ললিতা মহাদেঈকে লেখা পত্রখানি বার ক'রে তকী খাঁর মুখের সামনে নেড়ে বললেন, "খোদাবন্দ্‌ জাহাঁপনা দীনদুনিয়ার মালিক। পেস্‌কসের টাকা লুঠের জন্য আমায় শূলে দিন, কিন্তু যে বদ্‌তমীজ্‌ দুশমন্‌ পেস্‌কসের টাকা লুঠ করেছে সেই লুঠেরারও উচিত শাস্তির ব্যবস্থা হোক। এই চিঠিতে আছে তার সব সাক্ষী সাবুদ। টাকা লুঠ করল কে? কে দোস্ত্‌, আর কে দুশ্‌মন?"

তকী খাঁ একরকম কেড়েই নিলেন চিঠিখানা। কিন্তু ওড়িয়া হরফে লেখা থাকায় চিঠি দেখে তার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারলেন না। জায়গিরদার মুনশী আমিনচাঁদ ওড়িশায় থেকে ইতিমধ্যে ওড়িয়া পড়ায় বেশ এলেমদার হয়ে উঠেছিলেন। তকী খাঁর দরবারে তাই তাঁকে খোজা-মুনশীর পদ দেওয়া হয়েছিল। তকী খাঁ পত্রখানি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "চিঠিখানা পড়ো তো মুনশী।"

আমিনচাঁদ থেমে থেমে একটি একটি ক'রে হরফ চিনে চিনে পড়ছিলেন— "... তৎকালে তকী খাঁর সহিতে সন্ধি করিয়া ভাগীরথী-কুমারকে সিংহাসনে বসানো যাইবে।"

যে-কোনো সামান্য লশকর্‌ বা প্রজার মত তকী খাঁর নাম সেই পত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল— মুতামিন্‌-উল-মুল্‌ক্‌ নাসিরজঙ্গ খাঁ বাহাদুর আসদ্‌জঙ্গ প্রভৃতি পল্লবিত প্রশস্তির একান্ত অভাব— তা শুনে তকী খাঁ মেঝের উপর দুই জুতা-পরা পা দাপাতে লাগলেন।

আমিনচাঁদ পড়ছিলেন—"নচেৎ খোর্ধা হইতে ম্লেচ্ছ রাজত্ব লোপ হইবার আশা নাহি—।"

রামচন্দ্রদেব ঈষৎ মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করার ভঙ্গীতে বললেন, "এতেই বুঝুন জাহাঁপনা, খোর্ধা রাজ্য থেকে মোগল শাসন উচ্ছেদ করবার জন্য তলোয়ার তুলেছে কারা, পীর পয়গম্বর গাজী সুলতান

বেগকে, কত্‌ল্‌ করেছে কে; আর চিকাকোলের পেস্‌কসের টাকা লুঠ করার জিম্মাদারি কাদের, জাহাঁপনার দোস্ত্‌ কে আর দুশমন্‌ কারা!"

তকী খাঁ আসন ছেড়ে উঠে রামচন্দ্রদেবকে আলিঙ্গন ক'রে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, "আমায় মাফ্‌ করো বেরাদার, আমি না বুঝে তোমায় কয়েদ করার হুকুম দিয়েছিলাম। আল্লাতালা জানেন তোমার উপর আমার খাতির কত! তোমার মনসবদারি পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার করবার জন্য আমি মুর্শিদাবাদের নবাবকে জানিয়েছি। যথা সময়ে তুমিও পাবে ইয়ার জঙ্গ খেতাব। কিন্তু বকশী কোথায়? আর বকশীর সঙ্গে যারা হাত মিলিয়েছিল তারাই বা কোথায়?"

রামচন্দ্রদেব বললেন, "তারা পাইকদের শিখিয়েছিল জোট পাকাতে— জাহাপনার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য, কিন্তু আমি তাদের ধ'রে কয়েদ ক'রে রেখেছি, পাইকদের হুশিয়ার করে দিয়েছি খোর্ধার মাটি যেন ইসলামের রক্তপাতে কলঙ্কিত না হয়। আমি জিন্দা থাকতে খোর্ধার মাটিতে মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলবে মুসলমান?"

দরবারে সমবেত পারিষদেরা সমস্বরে তারিফ্‌ ক'রে উঠলেন— "সাবাস! কেয়াবাত্‌!"

রামচন্দ্রদেব আহত নির্দোষিতার অভিনয় ক'রে বললেন, "সেইজন্য খোর্ধায় গড়ের পর গড় খালি প'ড়ে আছে, ভিতর গড়েও কেউ নেই যে জাহাপনার প্রতিরোধ করবে।"

তকী খাঁর সব সন্দেহ দূর হল। সব রাগ গিয়ে পড়ল বকশী ও তাঁর সহযোগীদের উপর। নতুন হুকুম দিলেন তিনি: "বকশী আর অন্য বিদ্রোহীদের মাথা জলদি পেশ কর! তাদের মাথা তখ্‌তায়[1]

1. তখ্‌তা— ফাঁসিকাঠ।

না ঝুলিয়ে আমরা এখান থেকে ছাউনি তুলব না।"

এই হুকুম শিরোধার্য ক'রে তকী খাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত ফৌজদার রামচন্দ্রদেবের সঙ্গে খোর্ধা রওনা হয়ে গেল।

যথাসময়ে বকশী বেণু ভ্রমরবর, দেওয়ান কৃষ্ণনরীন্দ্র ও অন্যান্য বিদ্রোহী সর্দারদের ছিন্ন শির বস্তায় ভ'রে তকী খাঁর কাছে পেশ করা হল। তকী খাঁ এই বুঝলেন যে মোগল প্রভুত্ব এবার নিষ্কণ্টক হ'ল। রামচন্দ্রদেব আশ্বস্ত হলেন যে, যে-দুইটি কোটরগত চক্ষু খোর্ধার আকাশে ধূমকেতুর মত রামচন্দ্রদেবের প্রতিটি মুহূর্ত কণ্টকিত ক'রে রেখেছিল তা চিরকালের জন্য মুদ্রিত হ'ল।

এর পর বাণপুর অভিমুখে ফৌজ কুচের জন্য সাজ সাজ রব পড়ে গেল। বাণপুর বিদ্রোহীদের আর-একটি পীঠস্থানে পরিণত হওয়ায় বাণপুরের সামন্ত রাজা জগন্নাথ মানসিংহ হরিচন্দনকে শাস্তি দেওয়াও তকী খাঁর অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু রামচন্দ্রদেব এই বলে আশ্বাস দিলেন যে বাণপুরকে তিনি একাই শায়েস্তা করতে পারবেন। তখন কেবল ফৌজদার হালিম খাঁকে বাণপুর পাঠিয়ে তকী খাঁ রথীপুর থেকে ছাউনি তুলে কটকে ফিরে গেলেন।

খোর্ধা আবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

1

জনরবের সহস্রমুখে আর যাত্রীসংগ্রাহক গোমস্তাদের পল্লবিত প্রচারে সেই অদ্ভুত কথাটি দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত রটে গেল— জগন্নাথ আর বড় দেউলে নেই ! নেই তো গেলেন কোথায় ? কেউ বলে খোর্ধার জঙ্গলে চ'লে গেছেন, আর কেউ বলে অভিমান করে বড়দাণ্ডের উপরে ব'সে আছেন— এমনি নানা কথা ! কিন্তু কোন্‌টাই বা কে স্বচক্ষে দেখেছে ? আর বড় দেউলের রত্ন-সিংহাসনে ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য সমারোহ ছেড়ে জগন্নাথ এখন কোথাও যাবেনই বা কেন ? রাজ্য থেকে মোগল-হাঙ্গামা তো গেছে, খোর্ধার রাজা আর নবাবের মধ্যে আত্মীয়তা বন্ধুত্ব হয়েছে। মোগল পাঠান উভয়েই এখন শান্ত। এমন সময়ে জগন্নাথ বড় দেউল ছেড়ে যাবেন কিসের জন্য ? তবে এমনি প্রশ্নের এক তাত্ত্বিক উত্তরও শোনা যাচ্ছিল : "ওহে, ভক্তের টানে বলিআরভুজ-অ কি আর রত্নসিংহাসনে ব'সে থাকতে পারেন ?" আর তার পরেই 'হরি বোল ! বোল হরি-বোল !' ধ্বনির মধ্যে সব বিচার-বিতর্ক তলিয়ে যাচ্ছিল।

এ রামচন্দ্রদেবের নয় অঙ্ক, মেষ (বৈশাখ) মাসের কথা।

কুস্থন-অ সাহু ফি বছর এমনি সময়ে মাল-বওয়া বলদের পাল নিয়ে তাদের পিঠে পিতল-কাঁসার বাসনের পসার চাপিয়ে এই সমুদ্র-উপকূল

অঞ্চলে আসেন কারবারের জন্য। মিথুন (আষাঢ়) মাসে রথযাত্রার সময়ে আবার ফিরে যান বলদের পিঠে মুগ মাষকলাই চাল নুনের পণ্যসম্ভার চাপিয়ে। সেই কুস্থন-অ সাহু নাকি কোথায় কাকে বলেছিলেন জগন্নাথ আর বড় দেউলে নেই। এখন আবার সাহুকে খুঁজে বার ক'রে সে কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে কে? কাজেই সেই শোনা কথা ডালপালা মেলে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়েছিল।

আর সেইজন্যই যেদিন যাত্রীগোমস্তা কণ্ঠমেকাপ পালাগানের অধিকারী গোবিন্দ মহাপাত্রকে সঙ্গে নিয়ে মাথায় পাগড়ি ক'রে চাদর বেঁধে একটি ক'রে শুকনো অন্ন-মহাপ্রসাদের দানা বিলোতে বিলোতে আর জগন্নাথভজনের কলি গাইতে গাইতে মোগলবন্দির 'ধোইয়া'[1] অঞ্চলে মঙ্গলপুর গাঁয়ে এলেন। সেদিন গাঁয়ের মাঝখানে 'মহাপুরুষের বট' তলায় ভাগবতঘরের[2] চারিদিকে গাঁয়ের লোকের ভিড়ে তিল-ধারণের স্থান রইল না।

পুরাদস্তুর 'ধোইয়া' অঞ্চল মঙ্গলপুর, অজস্র নদীনালার জাল-বোনা। কেয়াবন তালবন নারকেলবাগান আর বাঁশঝাড়ে ভরা। তার মাঝে মাঝে চাষের ক্ষেতে ঘূর্ণি হাওয়া শুকনো ঘাসপাতা আর ধুলোর রাশ গায়ে মেখে চক্কর দিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। এখন ক্ষেতে হাল চালানোর সময়, কিন্তু পুরুষোত্তম-পুরী থেকে যাত্রী-গোমস্তারা মঙ্গলপুর গাঁয়ে এসেছেন শুনে আশপাশ থেকে সবাই কাতার দিয়ে এসেছে।

1. ধোইযা— ওড়িশায যে-সব অঞ্চলে প্রায প্রতি বৎসরই বন্যায় লোকের জমিজমা ঘর-দুয়ার ধুয়ে নিয়ে যায। এ-সব অঞ্চলে ফসল ভাল হয়।

2. ভাগবত ঘর (উচ্চারণ অকারন্ত)— গ্রামের যে বারোয়ারী ঘরে ভাগবত পাঠ এবং অন্যান্য সাধারণ অনুষ্ঠান হয়।

গাঁয়ের মাঝখানে 'মহাপুরুষের বট'। মহাপুরুষ ভজহরি দাস এই গাছের তলায় বহুকাল পূর্বে সমাধি নিয়েছিলেন। মহাপুরুষের সমাধির স্মৃতি হিসাবে রয়েছে গোবর-লেপা একটি মাটির বেদী। তার গায়ে আলপনা আঁকা দুইটি প্রকাণ্ড চোখ। বেদীর নীচে খড়ম জোড়াটি স্থাপনা করা আছে। এই খড়ম জোড়া পায়ে দিয়ে ভজহরি দাস মহিমাবলে নাকি ত্রিভুবন বিচরণ করতেন। যেদিন ভজহরি দাস এই গাছতলায় সমাধি নিলেন সেদিন নাকি কেউ তাঁকে দেখেছিল পুরীর মন্দিরের 'বাইশ পাহাচ'র[1] উপরে, আর কেউ বা দেখেছিল পিপিলীর বাজারে, আবার আর-কেউ বারবাটী-কটকে! এমনি নানা কথা নানা মুখে শোনা গিয়েছিল তখন। তবে মঙ্গলপুর গাঁয়ের প্রবীণ লোকেদের কাছে শোনা গিয়েছিল যে ভজহরি দাস সমাধি নেবার সাত দিন আগে থেকে এই বটগাছতলায যোগাসনে ব'সে ছিলেন। কিন্তু তারও উত্তর ছিল :— সে তো কেবল এই চর্ম-চক্ষুর ভ্রম যে তিনি ঐখানে যোগাসনে ব'সে আছেন, নইলে এ তো জানা কথা যে সেই খড়ম পায়ে দিয়ে তিনি তখন ত্রিভুবন ভ্রমণ করছিলেন! তাই মহাপুরুষের সমাধি-বেদী অপেক্ষা রোদ-জল-খাওয়া এই খড়ম-জোড়াই লোকের চোখে ছিল বেশী রহস্য ও আকর্ষণের বস্তু। ক্রমে সমাধির কাছে একটি ভাগবত ঘর স্থাপনা হল। ভাগবত শ্রবণ, অসময়ের অতিথির আশ্রয়, গাঁয়ের পঞ্চায়েতের বিচার, আর ইজারাদার বা আমিন বা খাজনা-আদায়কারী কোনো হিন্দু কর্ম-চারী গাঁয়ে এলে তার ডেরা বাঁধা— এমনি সবের জন্যেই তো ভাগবত

1. বাইশ পাহাচ (উচ্চারণ অ-কারান্ত)— বাইশ পইঠা। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বার পার হবার পর মন্দিরে উঠতে বাইশটি 'পাহাচ' অর্থাৎ পইঠা বা ধাপ উঠতে হয়।

ঘর। আজ যাত্রী-গোমস্তাদের থাকার বন্দোবস্তও সেই ভাগবত ঘরেই হয়েছিল।

ভাগবত ঘরের বারান্দায় 'হেঁস'-র[1] পাটির উপরে কণ্ঠ মেকাপ আর গোবিন্দ মহাপাত্র মাথায় পাগড়ি বেঁধে এক-একখানি গেরুয়া মের-জাই গায়ে দিয়ে তার উপরে নামাবলী জড়িয়ে ব'সে ছিল। মঙ্গল-পুর আর কাছাকাছি অন্যান্য গ্রামের মুরুব্বী লোকেরা দুই হাত জোড় ক'রে চোখ দুটি গাঁজায় অথবা ভক্তিতে অর্ধনিমীলিত ক'রে যাত্রী-গোমস্তাদের মুখ থেকে বচনামৃত শ্রবণ করছিল। গাঁজার ছিলিমটি ঘুরে ঘুরে বার বার সেই কণ্ঠ মেকাপের হাতেই ফিরে আসছিল হারানো বলদ কিংবা হারানিধির মত। বারান্দার নীচে বাকী আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই উদ্‌গ্রীব উন্মুখ হয়ে ব'সে ছিল। ভাগবত ঘরের পিছনে যে রাঁধুনিরা যাত্রী-গোমস্তাদের জন্য অন্নপ্রসাদ পাক করছিল আর অকারণে যারা রান্নার জায়গায় ঘিরে হাঁকডাক করছিল তারাও মাঝে মাঝে এসে দু দণ্ড দাঁড়িয়ে গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে কণ্ঠ মেকাপের কথা শুনে যাচ্ছিল।

গত বৎসর পুরী একরকম জনশূন্য ছিল। মোগলের হাঙ্গামার ভয়ে 'পঞ্চকোশী' (কাছের) যাত্রীরা ছাড়া দূরের যাত্রীর দেখা ছিল না। পাণ্ডারা হাত-পা গুটিয়ে ব'সে ছিল। এ বছর এখন সামনেই দেবস্নান বা স্নানযাত্রা, সেই স্নানপূর্ণিমা থেকে গুণ্ডিচা তার পর উলটো রথ পর্যন্ত জগন্নাথের যত বড় বড় যাত্রা। যাত্রী তেমন ভালমত এলে গত কয় বছরের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। রাজ্যে এবার আর মোগল হাঙ্গামা নেই, তায় জগন্নাথ আবার পতিতপাবন হয়েছেন। যাত্রী-গোমস্তারা সেই বৃত্তান্তই সর্বত্র ব্যাখ্যান ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

1. হেঁস (উচ্চারণ অকারন্ত)—বেনা ইত্যাদি তৃণের তৈরি পুরু পাটি।

তাইতে এখন থেকেই লোকের মন পুরী যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠছিল।

কণ্ঠ মেকাপ ছিলিমে বেশ ভাল ক'রে একটা টান দিয়ে নিলেন। দম নেওয়া ধোঁয়াটা আধ্যাত্মিক গাম্ভীর্যে ধীরে ধীরে অর্ধনিমীলিত চক্ষুর ভিতর দিয়েই উদ্গীরণ করলেন বুঝি বা। তার পর ব্যাখ্যান শুরু হল— "তোমাদের কাছে মিথ্যে, আমার কাছে সত্যি। হাঁঃ, অমনি ধারাই কথা তো। এখনই-না কলিযুগ ঘনিয়েছে, 'চকাডোলা' জগন্নাথ হাত-পা গুটিয়ে নুলো ঠুঁটো সেজে কেবল চাকা-চোখ মেলে ব'সে আছেন, নইলে ভক্তের মানরক্ষার জন্য জগন্নাথ বলরাম দুই ভাই তো একদিন সাদা ঘোড়া আর কালো ঘোড়ায় চেপে কাঞ্চি যুদ্ধযাত্রায় গিয়েছিলেন।"

হরি বোল, বোল হরি বোল ও উলুধ্বনিতে মহাপুরুষের বটতলা প্রকম্পিত হয়ে উঠল।

কণ্ঠ মেকাপ ছিলিমে আর-এক টান দিলেন। সেই অবসরে পালা অধিকারী গোবিন্দ মহাপাত্র কথার খেই ধরলেন—"আহা, এত কথা কিসের হে! দিব্যসিংহ রাজা দীনকৃষ্ণ দাস কবিকে কারাযন্ত্রণা দিলেন। কবি বললেন কৃষ্ণ ছাড়া কারও নামে পদ রচব না। রাজা তো তাইতে কবিকে নিয়ে বন্দীশালে পুরলেন। কবির কাতরোক্তি শুনে জগন্নাথ তখন নিত্য বন্দীশালে কবির ঘরে যেতেন, না এ মিছে কথা? রাজা একদিন বন্দী-ঘরে প্রভুর 'দঅণা' মালা দেখে কবিকে মুক্ত ক'রে মহাসমারোহে নিয়ে গেলেন— সে কথা কে না জানে।"

ছিলিমটি গোবিন্দ মহাপাত্রের কাছে ফিরে আসায় তাঁকে অবসর দেওয়ার জন্য মঙ্গলপুরের মুখপাত্র হরি শতপথী বললেন, "আসল কথা হল ভ-ক্-তি, শাস্তরে বলেছে না যার মন যত বড় তার প্রভু তত বড়।"

কণ্ঠ মেকাপ এবার খেই ধরলেন—"আবার এও তো জানা কথা: প্রমেশ্বরের (পরমেশ্বরের) 'পোড়-অ পিঠা'[1] ভোগ থেকে একবার চুল বেরুল। রাজা বললেন—কি, এমন কথা? তোর এত বড় কাজ রে 'শুআর-অ'[2], অমৃতভোগে চুল ফেললি? কে আছিস্, 'শুআর-অ'কে বেঁধে নিয়ে যা বন্দীশালায়। 'শুআর-অ'কে বেঁধে নিয়ে তো বন্দীশালে পোরা হ'ল। তার পর 'বলিআরভুজ'-অ রাজাকে স্বপ্নাদেশ করলেন—'তুই আমার 'শুআর-অ'কে ছেড়ে না দিলে আমি তোর ভোগ স্পর্শ করব না।' ঠাকুর ভোগ-নৈবেদ্য ত্যাজ্য ক'রে উপোসে রইলেন। তার পর হ'ল কি, রাজা বন্দীশালে গিয়ে নিজের হাতে 'শুআরঅ'-কে বন্ধনমুক্ত ক'রে বললেন, আমার অপরাধ নিয়ো না হে শুআর-অ। আমি মহাপাতকী। সেই দিন থেকে প্রমেশ্বরের জন্য রাজা বন্দোবস্ত করলেন বালভোগের[3]।"

বারান্দার নীচ থেকে রোল উঠল—হরি বোল! মনসা বেড়ার ওপারে মেয়েরা ব'সে শুনছিল, সেখান থেকে উঠল হুলুধ্বনি।

কণ্ঠ মেকাপ গম্ভীরভাবে উপর পানে চেয়ে ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

মেকাপের ডাইনে ব'সে ছিলেন মঙ্গলপুরের মাতব্বর চাষী পহলি বিশ্বাল। বয়স ষাটের উপরে, শরীর তবু মজবুত আছে। প্রত্যেক বছরই রথযাত্রায় যাবার মানস করেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে মোগলের

1. পোড় (-অ) পিঠা—উপরে আঁচ নীচে আঁচ দিয়ে তৈরি ছানার পিঠে।

2. শুআর (-অ)—জাতিবিশেষ, এঁরা পরম্পরাক্রমে জগন্নাথ-মন্দিরে পাচকের কাজ ও অন্যান্য সেবা করেন।

3. বাল (-অ)—চুল।

হাঙ্গামা নয়তো সংসারের কোনো ঝঞ্ঝাট— এমন হঠাৎ এসে পড়ে যে যাওয়া আর তাঁর হয়ে ওঠে না। সেই দুঃখ ঘুণ ধরার মত তাঁর মনটা কুরে কুরে খাচ্ছিল। তাই যাত্রী-গোমস্তারা কেউ এ তল্লাটে কোথাও এলেই তিনি গিয়ে সেখানে হাজির হন জগন্নাথের কথা শোনবার জন্য। আজও তাই এসেছিলেম ভাগবত ঘরে জগন্নাথের বৃত্তান্ত শুনতে। তবে তিনি কানে শোনেন কম। ব্যাখ্যানকারীরা যখন ভক্তিতে ভোর হয়ে গলা উঁচুতে তুলছিলেন তখনই কেবল তাঁর কানে যা এক-আধটা কথা ঢুকছিল, কিছু বুঝুন আর না বুঝুন দুই চোখ বুজে শিরওঠা হাত দুটি জোড় ক'রে অনেকক্ষণ ধ'বে বার বার কপালে ঠেকাচ্ছিলেন। তার পর নিষ্প্রভ চোখ মেলে যাত্রী-গোমস্তার দিকে চেয়ে নিশ্চল মূর্তিটিব মত ব'সে থাকছিলেন। হাঁড়ির উবুড করা ঢাকনিব মত তাঁব মাথা ভবা পাকাচুল। আগায গিঁঠ দেওয়া এক গোছা টিকি ঝুলছে। দুই কানে ভাবী কুণ্ডল জোডার জন্য কান দুটিও লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে। মুখে বযসেব অগনতি কাটাকুটি রেখা। শিরাবহুল দুই হাতে দুইটি রুপার খাড়ু বিশ্বালের মাতব্বরত্বের পরিচায়ক। কপালে তিলক ফোঁটা নেই, কিন্তু গলায তিন সারি তুলসীর মালার উপরে চন্দনের একটি অস্পষ্ট ফোঁটা। একখানি গামছা গলবস্ত্রের মত গলায় দিযে বিশ্বাল যাত্রী-গোমস্তাদের দিকে একদৃষ্টে চেযে ব'সে ছিলেন।

বিশ্বাল সংগতিপন্ন লোক। চাষের জমি ছাড়া ব্যবসায়পত্রও কিছু আছে, মহাজনীও করেন। তিনি পুরী এলে তাঁর কাছে দক্ষিণা পাওনা প্রভৃতি ভাল মিলবে এতে ভুল নেই। মেকাপ বিশ্বালের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ বছব রথযাত্রায় আসছ তো 'অজা' (দাদু)? শাস্তরে বলে কলিকালে দেহ বওয়া জলে যথা চন্দ্রছায়া।

আজ আছে কাল নেই। এই ব'সে আছ, এই ঢ'লে পড়লে। তার আগে 'চকাডোলা'কে একবার দেখে এলে একেবারে জীবন মোক্ষ। এ দিক থেকে এ সন তো অনেকেই যাবে। তুমি আয়ীকে আর ছেলে-পিলেদের নিয়ে এসো।"

বিশ্বাল ভাল শুনতে পেলেন না, মেকাপের দিকে চেয়ে কেবল মুচকে মুচকে হাসতে লাগলেন। কে ব'লে উঠল, "ওকে একটু বড় গলা ক'রে বলতে হয়, নয়তো শুনতে পান না। আপনি একটু চেঁচিয়ে বলুন।"

মেকাপ আগেকার কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে এবার তার সঙ্গে দুই পদ শ্লোক জুড়ে দিলেন: "বলে—

অহো তৎক্ষেত্রমাহাত্ম্যং গর্দভোঽপি চতুর্ভুজঃ।

যত্র প্রবেশমাত্রেণ ন কস্যাপি পুনর্ভবঃ॥

বলে— পুরী শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য এমন যে মানুষ তো মানুষ, গাধা পর্যন্ত সেখানে চতুর্ভুজ হয়ে যায়।"

মেকাপের কথা শুনে বিশ্বাল দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে বহুবার প্রণাম করলেন। তারপর ফোকলা মুখে এক গাল হেসে বললেন, "'চকাডোলা' না টানলে যাওয়ার কথা বলা বৃথা। ইহধাম ছেড়েই তো একেবারে যাব যাব ক'রে পা বাড়িয়ে আছি।"

মেকাপ বললেন, "এ সন রথযাত্রায় অনেক যাত্রী হবে। কোথায় শ্বেতদ্বীপ মগদ্বীপ নেপাল কাশ্মীর রাঢ় গৌড় অবন্তী অঙ্গ বঙ্গ কাশী-বৃন্দাবন মরাঠা-দেশ বিহার দ্বারকা মথুরা— কোথা কোথা থেকে যাত্রীরা আসছে। তায় আবার জগন্নাথ পতিতপাবন হয়েছেন।"

জগন্নাথ পতিতপাবন হয়েছেন শুনে আবার উঠল হরিবোল আর হুলুধ্বনি।

সে-সব থামলে সকলের মনে পড়ল জগন্নাথ বড় দেউল ছেড়ে চ'লে গেছেন সেই কথা। অইণ্ঠু দাস জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রমেশ্বর না দেউলে নেই ?"

পালা গাইন গোবিন্দ মহাপাত্র ভক্তিতে চোখ বুজে থলের ভিতর হাত ঢুকিয়ে মালা জপছিলেন। অইণ্ঠু দাসের কথা শুনে চোখ খুলে আকাশ থেকে পড়ার মত বললেন, "আমাদের ওদিককার লোকেদের রকমই এই, না বুঝে না সুঝেই এক-একটা কথা ব'লে দেয়। দেউল হ'ল 'শ্রীবৎস খণ্ডাশাল'-অ[1] দেউল। প্রমেশ্বর সে দেউল ছেড়ে গেলে পৃথিবী কি আর থাকবে? কলিযুগ শেষ হ'লে তবে গিয়ে না প্রমেশ্বর রত্নবেদী ছাড়বেন।— কত বড় কথাটাই না ব'লে দিল কোথাকার সে কোন্ 'বেইপো', অ্যাঁ ?"

অইণ্ঠু দাস অপরাধীর মত অপ্রতিভভাবে বললেন, "শোনা কথা কেবল। কুসুন-অ সাউ মহাজন নাকি সাআঁতরাপুর হাটে আমাদের লখিআর মায়ের খুড়ীর ভাসুরকে বলছিল ও কথা। সাউ কত বড় কথাই না বলল, অ্যাঁ ?"

ব্যাপারটা স্পষ্ট ক'রে দেবার জন্য মেকাপ তাঁর হেঁড়ে গলা ভাল ক'রে ঝেড়ে নিয়ে বললেন, "জগন্নাথ পতিতপাবন হয়ে গুমটিতে এসে ব'সে আছেন না? দেউল ছেড়ে যাবেন কেন হে ?"

এবার বহু কণ্ঠে সমস্বরে রব উঠল—"জগন্নাথ পতিতপাবন হলেন সে আবার কি গো ?"

মেকাপ বললেন, "প্রমেশ্বর ছোট পরিছা বিষ্ণু মহাপাত্রকে একদিন রাত্রে স্বপ্ন দিলেন— আমার ভক্ত খোর্ধার রাজা যবন হওয়াতে যদি আমার রত্নসিংহাসনের কাছে আসতে না পারল তবে আমিও আর এ

1. শ্রীবৎস খণ্ডশাল-অ দেউল-অ— পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের বিশেষ নাম।

রত্নসিংহাসনে বসতে পারব না। যেমন খানে রাজা আমায় রোজ দেখতে পাবে আমি তেমনি খানেই উঠে যাব।"

সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি উঠল, "সে কেমন ?"

মেকাপ আবার অর্ধনিমীলিত নেত্রে সে বৃত্তান্ত শুরু করলেন : —"হেই শোন, তোমাদের কাছে মিথ্যে, আমার কাছে সত্য। সেদিন চৈত্র শুক্লদশমী। এক প্রহর রাত বাকী থাকতে দেউল খুলল। চার শঙ্খ, মহুরি[1], বীণা, ভাট, রাবা, শিঙ্গা, ঘণ্টা, ভেরী, মৃদঙ্গ, কম-অ সব বেজে উঠল। ভিতরছো[2] মহাপাত্র হাতে প্রদীপ নিয়ে জয়বিজয় দ্বারের মোহর পরীক্ষা ক'রে দেখলে পর মোহর ভেঙে দুয়ার খোলা হ'ল। সান-অ পরিছার পিছন পিছন মুদিরথ, ব্রাহ্মণ, পালিআ পাণ্ডা, সিংহারী, পশুপালক, অখণ্ড-মেকাপ[3], বাহার গরাবড়ু, ভিতর গরাবড়ু[4], শ্রীমুখ সিংহারী, ভিতর সুনা দেহুড়ী সেবক, পত্রী বড়ু, ভিতর ভণ্ডার মেকাপ, ফারেক মুডুলী, জ্যোতিষ, পাত্র, দর্পণিআ আর অন্যান্য খাটানিরা মণিমা মণিমা ব'লে ডাকতে ডাকতে ভিতরে ঢুকলেন। ছামুদ্বার পর্যন্ত যেতে প্রদীপের নরম আলোয় সান পরিছা দেখলেন জয়বিজয় দ্বার আর ছামুদ্বারের মধ্যে শুকনো 'দঅণা' ফুল আর নাগেশ্বর ফুলের পাপড়ি সব ঝ'রে আলপনা দেওয়া মতো পড়তে পড়তে গেছে।

"এ কি অদ্ভুত ব্যাপার ! ভিতর ছো মহাপাত্র এক দণ্ড থমকে দাঁড়ালেন। কাল রাতে 'পহড়' অ পড়ার সময় তিনি তো দেউলে ছিলেন

1. মহুরী— সানাই।

2. ভিতরছো— জগন্নাথ মন্দিরের .ম্বাধিকারিক বিশেষ।

3. অখণ্ড মেকাপ— যে মেকাপ অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক 'অখণ্ড' (অনির্বাণ) দীপের তত্ত্বাবধান করেন।

4. গরাবড়ু—'গরা' বা গড়া যে সেবকের হেফাজতে থাকে।

'পহড়' পড়ার আগে 'দেউলশোধ'[1] হয়েছিল। তা হলে এ-সব ফুল-পাপড়ি এল কোত্থেকে ?"

উৎকণ্ঠিত শ্রোতাদের কণ্ঠ থেকে একসঙ্গে শোনা গেল—"সে কেমন ?"

মেকাপ ন'ড়ে-চড়ে ব'সে আবার আরম্ভ করলেন— "সেবকেরা 'গম্ভীরা'র মধ্যে এল। শয্যাঘরের মেকাপ বিছানা খাটে 'বিজে' করিয়ে শয্যাঘরের ভিতরে নিয়ে যাবার সময় দেখলেন শ্রীমস্তকের বালিশ, শ্রীপাদের বালিশ, কোল বালিশ, গোল গোল সব বালিশ পরমেশ্বরের নয়নের জন্য দেওয়া হয়েছিল সে-সব এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে প'ড়ে আছে। রাত্রে তো 'বড় সিংহার'[2] তার পরে 'সঙ্খুড়ি সিংহারে'র[3] 'অবকাশ' (আরতি) হয়েছিল। পুরাণ পাঠ, 'তাম্বুল লাগি' 'হড়প-লাগি'[4], কাঞ্চি বাটুলা, পখাল-অ ভোগ'[5] আদি সমস্ত বিধি সম্পন্ন হয়েছিল। আরতি বন্দনার পর পালঙ্ক শয্যা পড়েছিল। সোনার অর্ধনারী-নারায়ণ দেবকে ফুলের বালিশ দিয়ে চন্দ্রউদিআ' (সাদা ও গোল) ছত্রচামর, 'আলট খদী', বীণা গীতগায়ন, এ-সব নিয়ে সিংহারীরা 'পশুপালক বিজে' করিয়ে এনে জগমোহনের দ্বারে সোনার 'ডেউঁরিআ'র উপরে 'বিজে' করিয়ে জয়-সিংহার শীতল ভোগ পঞ্চ উপচারে পূজা করেছিলেন। আরতি হয়েছিল। 'ভিতর ভণ্ডার

1. দেউলশোধ—মন্দির পরিষ্কার ও শুদ্ধি করণ।

2. বড় সিংহার বা শিঙ্গার— জগন্নাথের শয়নের পূর্বেকার শৃঙ্গার অর্থাৎ বেশভূষা ও বিলাসসজ্জা ধারণ।

3. সঙ্খুড়ি— উচ্ছিষ্ট, সকড়ি।

4. হড়প— পান ও মশলার বাটা।

5. পখাল (-অ)— পান্তা।

মেকাপ' বড় 'অখণ্ড দীপ' ও সিংহাসনের ধারের বার ক'রে আনবার পরে 'পহড়-অ পড়েছিল। এখন ভোরের 'অবকাশে'র সময় বালিশ-গুলি এমনি এদিক ওদিক ক'রে রাখল কে? এমন অঘটন ঘটল কেমন ক'রে?"

শ্রোতাদের ঔৎসুক্য যত বাড়ছিল মেকাপের কথকতাও তত রহস্য-ঘন হয়ে উঠছিল।

ছিলিমে আর-একবার দম লাগিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, "ওদিকে বেলা বয়ে যায়। প্রমেশ্বরের 'কাঠি লাগি'[1], আছ্য সম্বোধনী পূজা আরম্ভ হওয়ার আগে 'শ্রীকাপড়া লাগি', চুন 'লাগি', কত কাজ আছে। তার পর সূর্য পূজা, গরুড় পূজা, দ্বারপাল পূজা— তবে গিয়ে সকালের ভোগ। সেবকেরা হতভম্বের মত এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? মনের কথা মনেই রেখে তারা বিধি সম্পন্ন করতে লাগল।"

সমবেত কণ্ঠে আবার প্রশ্ন হল— "তার পর?"

"তার পর লাগ লাগ কয় দিনই তেমনি অঘটন ঘটল! শেষে জয়বিজয় দ্বারের মোহর সান অ পরিছা' নিজের হাতে বসালেন। তবুও ভোরের 'অবকাশে' মোহর খুলে দেখা গেল কোনোদিন মাথার সেবতী ফুলের খোপা বাইরে প'ড়ে তো আব-কোনো দিন 'দঅণা' ফুলের মালা নীচে প'ড়ে। 'সান পরিছা' তখন একদিন খাড়া উপোস ক'রে হত্যে দিলেন। সেদিন 'মাঝরাতে ঠাকুর সান পরিছা'কে স্বপ্ন দিলেন—"

মেকাপ দুই গাল চুপসিয়ে ছিলিমে আর-একদম খুব ভাল ক'রে টান দিতে লাগলেন, কথাটা শেষ হ'ল না।

1. কাঠি লাগি— জগন্নাথের দাঁতন করা।

কিন্তু শ্রোতারা অধীর হয়ে উঠেছিল। "কী স্বপ্ন দিলেন?" ব'লে অর্ধেক লোক চোখ কপালে তুলে ফেললে, আর অর্ধেক হরিবোল আর হুলুধ্বনিতে বটতলা কাঁপিয়ে তুললে।

সেই অবসরে ধীরে সুস্থে ধোঁয়াটা ছেড়ে মেকাপ বললেন, "সান পরিছাকে স্বপ্ন দিলেন: আমার সেবক খোর্ধার রাজাকে তোমরা রত্নসিংহাসনের কাছে আসতে দিলে না, তাকে অচ্ছুৎ করলে; আমি রত্নসিংহাসন ছেড়ে দেউলের গুমটিতে বসব, আমার রাজসেবক যাতে নিত্য আমায় দর্শন করতে পারে।"

মেকাপের কথা শেষ হতে না হতেই ঘন ঘন হরিবোল হুলু-ধ্বনিতে মঙ্গলপুর গাঁয়ের ছাপ ছাপ চাঁদের আলো-মাখা নরম রাত চলকে উঠতে লাগল। পহলি বিশ্বাস কতক কথা শুনছিলেন, কতক কথা শুনতে পাচ্ছিলেন না। হরিবোল হুলুধ্বনির উচ্ছ্বাসের মধ্যে তিনি কপালে কেবল শিরাল হাত দুখানি ঠেকিয়ে ঘন ঘন প্রণাম জানাচ্ছিলেন।

এরা তাত্ত্বিক নয়। তাই জগন্নাথ কে ও কী এরা বোঝেনা কিংবা বোঝবার চেষ্টাও করে না। এরা নেহাত সংসারী মানুষ। এদের মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগই, বা তার বেশী. হয়তো জগন্নাথকে দেখেইনি। জগন্নাথ সড়কের এক ঘাঁটি থেকে আর-এক ঘাঁটি জিজিয়ার কড়ি গুণে গুণে জগন্নাথ দর্শনে যাওয়ার মত এদের সম্বলও নেই। সংসারের জঞ্জাল ছেড়ে তীর্থ করতে যাওয়ার তেমনি এদের সময়ও

নেই। আপদে বিপদে এরা যে ছোট বড় মানসিক ক'রে থাকে সে-সব 'বিলেশ্বর মহাদেব'[1] নয়তো 'উতৈশুণী ঠাকুরাণী'র কাছে ভালয় ভালয় উদ্‌যাপন হয়ে যায়। বেশী বড় মানত থাকলে 'ধবলালিঙ্গ' আছেন। আধিব্যাধির জন্য আছেন গ্রামদেবী; কালো শাড়ী একখানি, কালো ছাগল একটা মানত করলেই হ'ল। কিন্তু জগন্নাথের কাছে কার কিসেরই বা মানত থাকে? সেই শ্রীক্ষেত্রে চোখ বোজা ছাড়া আর কী অভিলাষ নিয়েই বা সেখানে যায় কে? তবু জগন্নাথের সঙ্গে এদের সম্বন্ধ যেন জন্মজন্মান্তরের। সে জগন্নাথ আবার মহাসামন্ত। একবার এই চর্মচক্ষুতে তাঁকে দর্শন করতে পারলে 'জীবন-মোচ্ছ' হয়ে যায়। তিনি সুদূর, তবু অন্তরঙ্গ; দুর্লভ তবু অনুগত।

এখন সেই জগন্নাথ ভক্তের মানরক্ষার জন্য রত্নসিংহাসনের উপর থেকে ত্রিভুবনের বাড়বাড়ন্ত ছেড়ে সিংহদ্বারের গুমটিতে যাত্রীদের পায়ের ধুলার উপরে আসন পেতে রয়েছেন। ভক্তির সিংহদ্বারে প্রভু হয়েছেন ভক্ত। এই কথা এদের চেতনা ও অবচেতনা এই দুইকে আবেগের উদ্‌বেল আলোড়নের মধ্যে এক ক'রে দিচ্ছিল।

ঘন ঘন হরিবোল ও উলুধ্বনি প্রশমিত হ'লে পর বারান্দার উপরে ব'সে বটুয়া থেকে পান বার ক'রে সাজতে সাজতে নাথ-অ মিশ্র হঠাৎ সন্দেহের সুরে ব'লে উঠলেন, "রাজা না জাত হারিয়ে মুসলমান হয়েছেন? তিনি আর রাজসেবক কিসে? বকশী বেণু ভ্রমর-বর তো প্রাণটা দিলেন! রাজার জন্য জগন্নাথ আবার পতিতপাবন হলেন কি রকম?"

নাথ মিশ্রের সন্দেহ মুহূর্তপূর্বের বিশ্বাসীদের কণ্ঠে সংশয়িত জিজ্ঞাসা হয়ে ফুটে উঠল: "কি রকম?"

1. বিল (-অ)— ক্ষেত।

মেকাপ বললেন, "সেইজন্যই তো 'বলিআরভুজ'-অ বললেন আমি পতিতপাবন হব, নইলে আমার সেবক রাজা রামচন্দ্রদেবকে পাবন করবে কে? তাকে 'মোচ্ছ' দেবে কে?"

নাথ মিশ্রের মুখে আর কথা জোগাল না।

যে খোর্ধার রাজা রামচন্দ্রদেবের জন্য স্বয়ং জগন্নাথ পতিতপাবন বানা[1] উঠালেন তিনি কত বড় ভক্তই না হবেন সত্যি! সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল— "জয় জগন্নাথের জয়! জয় খোর্ধার রাজা রামচন্দ্রদেবের জয়!"

কেয়াবন বাঁশবন নদীনালা খালবিলে ঘেরা উপকূল অঞ্চলের এই মঙ্গলপুর গাঁয়ে যেমন রাজা রামচন্দ্রদেবের নামে জয়জয়কার পড়ছিল ওড়িশার দিকে দিকে তেমনি তাঁর নামে জয়ধ্বনি উঠছিল— ভক্তের জন্য ভগবানের পতিতপাবন হওয়ার কারণে। ওড়িশার জনসাধারণের কাছে তিনি যেন ক্রমে আবার এক নূতন আনুগত্য লাভ করছিলেন।

যাঁর প্রতি জগন্নাথের অনুগ্রহ হয় বংশ-কুল নির্বিশেষে উড়িশা-সিংহাসন তাঁরই হয়ে থাকে। স্পর্ধা ক্ষমতা বা অহংকারের নয় ওড়িশার সিংহাসন, জগন্নাথের সেবা ও তাঁর অনুগ্রহভাজনতার উপরে সে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। তাই খোর্ধার রাজা জাত হারিয়ে মুসলমান হয়েছেন এ কথা প্রচার হওয়া অবধি তাঁর প্রতি পাইক দুর্গনায়ক ও জনসাধারণের আনুগত্য যেমন প্রায় লোপ পেতে বসেছিল, আজ জগন্নাথ তাঁর জন্য পতিতপাবন হয়ে সিংহদ্বারের ধুলায় আসন পেতেছেন এ সংবাদে আবার তা ফিরে আসতে লাগল। জগন্নাথ মন্দিরের অদ্ভুত ব্যাপারের কথা শুনে খোর্ধা তথা সমস্ত মোগলবন্দি আবার রাজা রামচন্দ্রদেবের প্রতি অন্তরের আকর্ষণ অনুভব করতে লাগল।

1. বানা— নিশান।

মন্দিরের সেই অলৌকিক ব্যাপারে সবার সব ঔৎসুক্য ও বিস্ময়ের মধ্যে কিন্তু কেউ যদি আশ্চর্য না হয়ে থাকেন তো তিনি সান পরিছা বিষ্ণু মহাপাত্র ও তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত মন্দিরসেবক।

2

অক্ষয় তৃতীয়া হয়ে গেছে। স্নানপূর্ণিমার পর থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত বাণপুরের নীলাদ্রিপ্রসাদ গড়ে পুরুষোত্তম পুরীর মত জগন্নাথের 'অণসর' অ[1] বিধি পালিত হয়। তার পরে আষাঢ়ের শুক্লাদ্বিতীয়ায় রথযাত্রা। অক্ষয় তৃতীয়া থেকে গুণ্ডিচা 'বাহুড়া'[2] পর্যন্ত নীলাদ্রিপ্রসাদ উৎসবমুখর হয়ে থাকে। বাণপুরের রাজারা সাধারণত শাক্ত হলেও নীলাদ্রিপ্রসাদ গড়ে রথযাত্রা পরম্পরাগত বিধি অনুসারে সাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু এ বৎসর ফৌজদার হাশিম খাঁ বাণপুরের উপরে সৈন্যচালনা করায় নীলাদ্রিপ্রসাদ পরিত্যক্ত, জনশূন্য।

মোগল-হাঙ্গামা আসন্ন জেনে গড়ের অধিবাসীরা সদর দরজায় তালা দিয়ে বা যাদের দরজার কবাট নেই তারা এক-একখানি শুধু টাটির ঝাঁপ ফেলে দিয়ে অরণ্যে পলায়ন করেছিল। গত একশো বছরের বেশী এই দৃশ্য এখানে বার বার অভিনীত হয়ে এসেছে। রাজা জগন্নাথ মানসিংহ নীলাদ্রিপ্রসাদ ছেড়ে ভালেরি পাহাড়ের খোলে এক গুপ্ত দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নিয়েছেন। খোর্ধার মহারাণী ললিতা

1. অণ (-অ) সর (-অ) — স্নানপূর্ণিমা ও নেত্রোৎসব অমাবস্যার মধ্যবর্তী এক পক্ষ কাল ; এই সময়ে জগন্নাথ রুদ্ধদ্বারের অন্তরালে থাকেন, দর্শন দেন না।

2. বাহুড়া—উলটা রথ।

মহাদেঈ তাঁর 'লাগুতি গহণ' নিয়ে চ'লে গেছেন বীরজাঈ-বিলাস গড়ে। মোগল ফৌজদার হাশিম খাঁ যদি ভালেরি খোলের পার্বত্য ব্যূহ ভেদ করার দুঃসাহস করে তবে অতীতে মোগল ও পাঠান ফৌজদারেরা যেমন বাণপুরের কন্ধ[1] পাইকদের পাহাড়ী আক্রমণে অস্থির হয়ে বার বার নাকে খত দিয়ে ফিরেছিল, হাশিম খাঁরও সেই দশা হবে। এই ছিল রাজা জগন্নাথ মানসিংহের প্রস্তাব।

সে ইতিহাস হাশিম খাঁরও অজানা ছিল না। তাই সে কিছুদিন নীলাদ্রিপ্রসাদে ছাউনি ফেলে থেকে কিছু লুঠতরাজ ক'রে রাজা গোবিন্দ-চন্দ্র মানসিংহের আমলের জগন্নাথ মন্দিরটি ভাঙাচোরা ক'রে তার পর একটা লশকর বাহিনী সেখানে রেখে দক্ষিণে ঝঙ্কড়ের দিকে ফিরে গেল। মোগল হাঙ্গামার আতঙ্ক তখনও ভাল ক'রে তিরোহিত না হওয়ায় গড়ের লোকেরা তখন ফিরল না, রাজা জগন্নাথ মানসিংহ ভালেরি-খোলেই রইলেন।

নীলাদ্রিপ্রসাদ গড় খালি প'ড়ে আছে। গড়ের বিপদের যেন শেষ নেই, কাল রাত্রিতে আবার হঠাৎ এসেছিল এক প্রচণ্ড ঘূর্ণি ঝড়, তার সঙ্গে বৃষ্টি। গড়ের যত পুরানো বড় বড় গাছ— করঞ্জ, তেঁতুল, আম, শাল ইত্যাদি সব সেই ঝড়ে উপড়ে প'ড়ে গেল। গড়ের রাস্তার দু'পাশের ঘরের চালগুলি উড়ে এসে কঙ্কালস্তূপের মত মাটিতে প'ড়ে ছিল। বৃষ্টিতে দেওয়ালগুলো ধুয়ে মাটির ঢিপিতে পরিণত হয়েছিল। জগন্নাথের দেউলের চূড়া থেকে নীলচক্র ভেঙে কিছু দূরে একটা ভাঙা ঘরের মাটির গাদায় উড়ে গিয়ে পড়েছিল।

সকালে কিন্তু ঝড় বৃষ্টি কেটে গিয়ে বষা-ধোয়া আকাশ ও পৃথিবী শান্ত নির্মল হয়ে উঠেছিল। ভয়ংকরী রাত্রির দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেয়ে

1. কন্ধ— আদিবাসী পার্বত্য জাতিবিশেষ।

পৃথিবী যেন সকালের নবোদিত সূর্যকে প্রণাম জানাচ্ছিল।

গড়ের রাস্তায় কয়েকজন মোগল লশকর ঘোড়ার পিঠে বেপরোয়া-ভাবে বর্শা ঘোরাতে ঘোরাতে টহল দিচ্ছিল। খোর্ধার রাণী ললিতা মহাদেঈ ও যুবরাজ ভাগীরথীকুমারকে বন্দী ক'রে নিয়ে যাবার কড়া হুকুম তাদের দিয়ে গিয়েছিল হাশিম খাঁ। কারণ খোর্ধায় রাজা রাম-চন্দ্রদেব ও সেই সূত্রে ওড়িশায় মোগল শক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সূত্রধর ছিলেন রাণী ও যুবরাজ এ কথা রাণীকে লেখা বকশী বেণু ভ্রমরববের পত্র থেকে স্পষ্টই জানা গিয়েছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও লশকররা রাণী কিংবা যুবরাজ কারও সন্ধান পায় নি।

কিন্তু তারা যখন বাণপুরের পাহাড় জঙ্গলের ভিতরে তাঁদের সন্ধান করছিল সেই সময়ে ভালেরিব পাদদেশে বীরজাঈপ্রসাদ গড়ের বীর-জাঈ মন্দিবে ললিতা মহাদেঈ ক্ষুধিতা ব্যাঘ্রীর মত ব'সে বগলামুখী মন্ত্র জপ করছিলেন।

ললিতা মহাদেঈ রাজা গোবিন্দ মানসিংহ হরিচন্দনের ঔরস-জাত কন্যা, কিন্তু তিনি জন্মেছিলেন ব্রাহ্মণীর গর্ভে। বাণপুর রাজবংশের পরম্পরা ও বিধি অনুসারে বাণপুরের রাজারা ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ ক'রে থাকেন। বাণপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যদুরাজ কোনও এক অন্য রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে যখন আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন কন্ধ-অধ্যুষিত বীরজাঈপ্রসাদে কন্ধদের 'দিগাল্' বা রাজা দেবীপূজক মালী বলভদ্র রণা তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বলভদ্র রণার আশ্রয়ে থেকে তাঁর সঙ্গে যদুরাজও ক্রমে বীরজাঈয়ের সাধক ও পূজক হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তার দৃষ্টি দেবীর পাদপদ্ম অপেক্ষা বীরজাঈপ্রসাদের রাজসিংহাসনের উপরেই অধিক নিবদ্ধ ছিল।

প্রতি বৎসর পৌষ পূর্ণিমায় বীরজাঈয়ের কাছে নরবলি দেওয়া

কন্ধদের এক প্রাচীন প্রথা ছিল। ধরিত্রী বা 'থড়াপানু'-কে বৎসরে একবার নরবলি না দিলে বসুন্ধরা আর ফলবতী হবেন না, দেশে দুর্ভিক্ষ মহামারী হবে এমনি এক ধারণা কন্ধসমাজে প্রাচীন কাল থেকে বদ্ধমূল হয়ে ছিল যে ধরিত্রীমাতার দাক্ষিণ্যে বসুন্ধরা শস্যবতী হন, অরণ্য ছায়াঘন হয়, পাহাড়ী ঝরনা সুশীতল হয়, প্রতি বৎসর একবার সেই ধরিত্রীমাতাকে মানুষ কৃতজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যরূপে মানুষের জীবন বলিদান করে। মৃত্যুর মধ্যে থেকে চিরদিন যে নবজীবনের পল্লব অঙ্কুরিত হয়, বার্ষিক কৃষিকর্ম আরম্ভের পূর্বে প্রতি বৎসর এই নরমেধ যজ্ঞের মধ্যে তা অভিনীত হয়। কন্ধদের 'দিগাল্' বা রাজা হিসাবে বীরজাঙ্গী দেবীর কাছে প্রতি বৎসর 'মেরিআ' বলি দেওয়া বলভদ্র রণার একমাত্র রাজকর্তব্য বা রাষ্ট্রদায়িত্ব ছিল। অন্যান্য বছরের মত সেবারও পৌষ পূর্ণিমায় বীরজাঙ্গীয়ের কাছে 'মেরিআ' বলি দেওয়ার জন্য বলভদ্র রণা খালিকোট মাল অঞ্চল থেকে একটি অনাথ বালককে ধ'রে এনে বীরজাঙ্গীর মন্দিরে বেঁধে রেখেছিলেন। বিধি অনুসারে বলির জন্য উদ্দিষ্ট 'মেরিআ'কে কন্ধেরা দেবতা জ্ঞানে ষোড়শোপচারে পূজা ক'রে থাকে। পৌষ পূর্ণিমার সাত দিন আগে থেকে কন্ধ পল্লী-গুলিতে নাচগান শিকার মদ ও মৈথুনের পার্বণ জ'মে ওঠে। তেমনি সময়ে সুবিধা বুঝে 'মেরিআ' বালকটিকে যদুরাজ মানসিংহ রাতারাতি বাণপুরের সীমানা পার ক'রে ছেড়ে দিয়ে এলেন। সকালে কন্ধ জনতা মিছিল করে বিরাট মাদল বাজিয়ে 'মেরিআ' বলি দিতে বীরজাঙ্গী মন্দিরে এসে দেখল 'মেরিআর' কোনো চিহ্ন নেই।

মাদল-ভেঁপুর আওয়াজ, মাথায় ময়ূরপুচ্ছ প'রে উদ্দাম নৃত্য সব মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। মৃত্যু মড়ক মহামারী প্রভৃতি অনাগত অমঙ্গলের নিদারুণ আশঙ্কায় কন্ধেরা মহা আতঙ্কিত হয়ে উঠল। 'থড়াপানু'র

মায়ায় এবার যদি বলি না পড়ে তবে কন্ধভূমি উচ্ছন্নে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যেমন ক'রে হোক 'মেরিআ' না দিয়ে উপায় নেই।

রাজপুত্র যদুরাজ মানসিংহ এমনি এক মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলেন।

এই অবস্থায় 'মেরিআ' বলির বিধিরক্ষা কেমন ক'রে করা যেতে পারে সেই দুশ্চিন্তায় কন্ধ দলপতিরা বুড়ো তেঁতুলগাছের তলায় সিঁদুর-মাখানো বীরজাঙ্গী দেবীর সামনে পোঁতা বলি-বাঁধা খুঁটির চারিদিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-বেরনো থুতনিগুলি হাঁটুর উপর চাপিয়ে ব'সে ছিল। যদুরাজ তখন উপায় বাতলালেন: 'মেরিআ' নেই তো বলভদ্র রণাকে 'মেরিআ' দিয়ে দাও। তার জন্যই তো এই অঘটন ঘটল, তার জন্য কন্ধকুল উৎসন্নে যাবে কেন?

সেই উত্তেজিত বিচারবর্জিত মুহূর্তে যদুরাজের পরামর্শ কাজে পরিণত করবার জন্য উৎকণ্ঠিত কন্ধদের এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় নি। বলভদ্র রণাকে তারা গড়ের ভিতর থেকে টেনে এনে খুঁটিতে বেঁধে ফেলল। নিষ্ঠুর মৃত্যু আসন্ন জেনে তাঁর মুখ ছাইয়ের মত নিষ্প্রভ হয়ে গেলেও তাতে ভয়ের কোনও লক্ষণ ছিল না। 'মেরিআ'কে এক কোপে কেটে বলি দেওয়া কন্ধদের বিধি নয়। তার জীবন্ত দেহ থেকে খণ্ড খণ্ড মাংস কেটে নেওয়া হয়, সেই পবিত্র মাংস ক্ষেতে পুঁতলে ফলন বাড়ে, গাঁয়ের মাথায় পুতলে অমঙ্গল দূরে যায়। কন্ধদের নূতন 'দিগাল' রূপে যদুরাজ আশ্রয়দাতা বলভদ্র রণার দেহে টাঙ্গির প্রথম আঘাত হানলেন। পা থেকে কোমর বুক পর্যন্ত বলভদ্র খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। নিদাঘের ছায়াঢাকা বনস্থলীর মত তাঁর মুখ সেই দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও প্রশান্ত। ক্রমে রক্তহীন হয়ে আসা ঠোঁটদুটি তাঁর কাঁপছিল, হয়তো তিনি দেবীমন্ত্র জপ করছিলেন। যদুরাজের টাঙ্গির ঘায়ে

বলভদ্র রণার দক্ষিণ বাহুর এক ফালা কেটে গিয়ে তাজা মাংস বেরিয়ে পড়ল। রক্তের ধারায় খুঁটির নীচের মাটি ভিজে কাদা হ'ল। 'মেরিআ'র মাংস কেটে নেবার জন্য খুঁটির কাছে কন্ধদের ভিড় ও প্রমত্ত নৃত্য লেগে গেল।

'মেরিআ' বাজনার পৈশাচিক আওয়াজের সঙ্গে বলভদ্র রণার দেহের মাংস খণ্ড খণ্ড হ'তে লাগল। 'মেরিআ'র কেবল মুখখানি 'কিন্তু' অক্ষত রাখা বিধি। বলভদ্র রণার কঙ্কালটি মাত্র যখন অবশিষ্ট রইল, তাঁর সেই যন্ত্রণাদিগ্ধ মুখে দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠাধরে প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা তখনও অঙ্কিত ছিল যেন।

বলভদ্র রণাকে এমনি ক'রে 'দিগাল্'-গদি থেকে অপসারিত ক'রে যদুরাজ সেখানে এক গড় তৈরি ক'রে কন্ধদের রাজা হয়ে বসলেন। কিন্তু হিতৈষী আশ্রয়দাতা বন্ধু বলভদ্র রণার কবন্ধের উপরে নির্মিত এই গড়ে বহু ব্যতীপাত দেখা যেতে লাগল। তখন ব্রাহ্মণদের পরামর্শে যদুরাজ সে স্থান ত্যাগ ক'রে ঝঙ্কাড়ে উঠে গেলেন, পরে সেখান থেকেও উঠে গেলেন নীলাদ্রিপ্রসাদে। যেখানে বীরজাঙ্গীর আস্থান ছিল, বলভদ্র রণা 'মেরিআ' হয়েছিলেন, সেখানে তৈরি হয়েছিল বাণপুর রাজ্যের প্রথম গড় বীরজাবিলাস। কিন্তু তা ক্রমে কালজীর্ণ হয়ে ভগ্নস্তূপে পরিণত হ'ল।

বলভদ্র রণা মৃত্যুর আগে অভিশাপ দিয়েছিলেন : যদুরাজের বংশ লোপ হবে।

সে অভিশাপ মোচনের জন্য ব্রাহ্মণদের পরামর্শে যদুরাজ ব্রাহ্মণ-কন্যা বিবাহ করেছিলেন। সেই অবধি বাণপুর রাজবংশের রাজারা ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করার প্রথা অনুসরণ করেছিলেন।

বাণপুরের রাজারা ব্রাহ্মণ-কন্যা বিবাহ করায় অন্য ক্ষত্রিয় রাজারা

বাণপুরের 'জেমা'দের আপন পরিবারে বধূ ক'রে আনতে কুণ্ঠিত হতেন। এমনও শোনা যেত যে বাণপুরের রাজারা ছিলেন মালী 'দহুরী', এক মালী আপন ভাইকে হত্যা ক'রে কন্ধদের 'দিগাল্' গদি অধিকার ক'রে রাজা হয়েছিল।

তেলেঙ্গা মুকুন্দ হরিচন্দনের আমলে কালাপাহাড় ওড়িশা আক্রমণ করেছিল, সেই সময়ে যদুরাজ কন্ধ পাইকদের দিয়ে মুকুন্দ হরিচন্দনের যথেষ্ট সহায়তা করায় তিনি পেয়েছিলেন মানসিংহ হরিচন্দন উপাধি। নইলে তাঁরা ক্ষত্রিয় ছিলেন না। এইজন্য বাণপুরের রাজারা অনেক সময়ে 'জেমা'দের বিবাহ দিতে না পেরে তাদের অনূঢ়া চিরকুমারী ক'রে ঘরে রাখতে বাধ্য হতেন।

গোবিন্দ মানসিংহ হরিচন্দনের কন্যা ললিতাদেঈ[1]ও অন্য অনেক 'জেমা'র মত চিরকুমারী থাকতেন হয়তো। কিন্তু তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যের প্রশংসা লোকমুখে শুনে খোর্ধার রাজা গোপীনাথদেব নিজের ছোট ভাই কেশব রায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহের জন্য গোবিন্দ মানসিংহের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন।

বলভদ্র রণার অভিশাপেই হোক কি প্রাকৃতিক কারণেই হোক, বাণপুরের রাজারা দীর্ঘায়ু ছিলেন না। কিন্তু গোবিন্দ মানসিংহ সে অভিশাপ বা দৈবকূট সব তুচ্ছ ক'রে দীর্ঘ আশি বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। গোপীনাথদেবের প্রস্তাব আসার সময়ে তাঁর বয়স সত্তরের ঊর্ধ্বে। পৃথুল দেহ বয়সের ভারে অবনত, কিন্তু কপালে বলিরেখা ছিল না বা বয়সের ঊর্ণনাভ জালে মুখমণ্ডল কুঞ্চিত হয় নি। স্কন্ধবিলম্বিত বাবরী চুল, গালপাট্টা ও গোঁফ পেকে সাদা হয়েছিল, তবু প্রশস্ত ললাট ও ঘন ভ্রূযুগলের নীচে দুই চক্ষুতে দুর্দান্ত যৌবনের আগ্নেয়

1. দেঈ— সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা।

দীপ্তি ম্লান হয় নি। নির্মল ললাটে সিঁদুরের টিকা অগ্নিশিখার মত দেদীপ্যমান। কেশবহুল বিশাল বক্ষলম্বিত রুদ্রাক্ষমালা দুই মাংস-পেশীর কাঠিন্যকে যেন পরিস্ফুট করছিল।

খোর্ধার রাজা গোপীনাথদেব ছোট ভাই কেশব রায়ের সঙ্গে জেমা-দেঈয়ের বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন শুনে গোবিন্দ মানসিংহ ক্রোধে দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হলেন। অখ্যাত অজ্ঞাত কোন কেশব রায়ের জন্য গোপীনাথদেবের প্রস্তাব পাঠানোর জন্য গোবিন্দ মানসিংহ যেন দেখতে পেলেন তাচ্ছিল্যের ইঙ্গিত। প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন খোর্ধার যে রাজপুরোহিত তাঁর হাত থেকে প্রস্তাবসূচক নারিকেলটি কেড়ে নিয়ে ভূতলে নিক্ষেপ ক'রে খণ্ডবিখণ্ড ক'রে গোবিন্দ মানসিংহ চীৎকার করে উঠলেন—"তুমি ব্রাহ্মণ, তাই অবধ্য। নইলে এই মুহূর্তে তুমি অকালে 'মেরিআ' হতে!"

এ অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য কেশব রায় খোর্ধার পাইকদের নিয়ে বাণপুর অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করলেন। গোবিন্দ মানসিংহও শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য কুহুড়ি গড়ের চণ্ডেশ্বর মহাদেবের কাছে ছাউনি ফেলে শত্রুর আগমন-অপেক্ষায় রইলেন।

কিন্তু একদিন সকালে উঠে গোবিন্দ মানসিংহ হরিচন্দন দেখলেন তাঁর শয্যাপার্শ্বে অর্ধপ্রোথিত একখানি তরবারিতে গাঁথা একখণ্ড পত্র, তাতে লেখা—"আমি এসেছিলাম তোমায় বধ ক'রে অপমানের প্রতিশোধ নিতে, কিন্তু তোমাকে নিদ্রায় অচেতন অসহায় অবস্থায় দেখে আমি ফিরে গেলাম। কুমারী কন্যাকে অনূঢ়া রাখা অস্ফুট পুষ্পকোরককে কুয়াশায় ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে দগ্ধ করার সমান। সে পাপ থেকে ক্ষান্ত হও।"

পত্রে লেখকের স্বাক্ষর অথবা সঙ্কেত ছিল না। তবে গোবিন্দ

মানসিংহ বুঝলেন পত্রলেখক স্বয়ং কেশব রায়। তিনি সেখান থেকে সসৈন্যে ফিরে গেলেন। তার পরে কেশব রায়ের সঙ্গে ললিতা জেমা-দেঈয়ের বিবাহ যথাবিধি সম্পন্ন হ'ল। যেদিন ললিতা দেঈ শুভ শঙ্খধ্বনির মধ্যে খোর্ধার পাঁথর গড় 'উআসে'র উদ্দেশে যাত্রা করলেন তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি যেন অনন্ত যুগের বন্দিনী রাজকন্যা, অচেনা রাজকুমারের সঙ্গে কোন্ উপকথার দেশে উড়ে যাচ্ছেন। ললিতা দেঈর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল— পিত্রালয় বাণপুর ছেড়ে যাবার বেদনায় নয়, সম্মুখে অফুরন্ত অজানা পথের আনন্দ-উত্তেজনায়। দুটি আয়ত নেত্র তাঁর অশ্রুতে ছলছল ক'রে উঠছিল।

গোপীনাথদেবের অন্তে কেশব রায় রামচন্দ্রদেব নাম নিয়ে খোর্ধার সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন। ললিতা খোর্ধার মহাদেঈ হলেন। তার পর একদিন রামচন্দ্রদেব বারবাটী-কটকে ধর্মান্তরিত হয়ে জাত হারিয়ে যবনী রিজিয়াকে বিবাহ করলেন। ললিতা মহাদেঈর স্বপ্নভঙ্গ হ'ল। ছিন্নমস্তা রুদ্রাণীর মত তিনি হাতের শাঁখা কঙ্কণ ভেঙে সীমন্তের সিঁদুর মুছে আপন বৈধব্য ঘোষণা ক'রে পিত্রালয় বাণপুরে ফিরে এলেন।

ঈর্ষার অপর নাম নারী!

ললিতা মহাদেঈকে যবনীর দাক্ষিণ্যে বেঁচে থাকতে হবে এ কল্পনাও যেন তাঁকে বজ্রের মত বাজছিল। ললিতা দেঈয়ের যে দুটি আনত নয়নে একদিন এসেছিল রোমাঞ্চের আনন্দাশ্রু এখন তাতে ফুটে উঠেছিল প্রতিহিংসার বহ্নি। সেদিনের স্নিগ্ধ গৌর তনু আজ ঈর্ষার প্রদাহে তপ্ত তাম্রবর্ণ ধারণ করেছিল।

রামচন্দ্রদেবকে তন্ত্রবলে মূক স্তম্ভিত ও বাতুল ক'রে দেবার জন্য ললিতা মহাদেঈ ব্রতচারিণীর মত বীরজাঈর প্রতিমার সম্মুখে কুশাসনে ব'সে আজও নিয়মিত দশ সহস্র বগলামুখীর বীজমন্ত্র জপ করছিলেন —"রামচন্দ্রদেবস্য বুদ্ধিং নাশয় নাশয় জিহ্বাং বিলয় বিলয় হ্লীং ফট্ স্বাহা।"

আজ কিন্তু রুদ্রাক্ষমালা নিয়ে জপ করতে করতে ললিতা মহাদেঈর ধ্যাননেত্রে বৈরীজিহ্বামুদ্গরধারিণী বগলা দেবীর রূপ আবির্ভূত হচ্ছিল না, তাঁর মনে আসছিল নানা দুশ্চিন্তা। পুরী থেকে সংবাদ এনেছে বাণপুরের চর, জগন্নাথ পতিতপাবনরূপে মহারাজা রামচন্দ্রদেবকে নাকি দর্শন দিয়েছেন, সেজন্য চতুর্দিকে মহারাজা রামচন্দ্রদেবের জয়জয়কার! তিনি জাতিভ্রষ্ট হওয়া অবধি শ্রীমন্দিরের চূড়ায় মহাদীপ ওঠার সময় 'চিনরা'রা এত দিন রামচন্দ্রদেবের নামে ডাক না ডেকে কেবল হরিবোল ধ্বনি দিচ্ছিল, এখন তারা আবার ডাক পাড়ছে—"মহাপ্রভু, খোর্ধার মহারাজাকে শঙ্খে পুরে চক্র আড়াল কর হে— হরিবোল!"

রামচন্দ্রদেব ওড়িশার জনসাধারণ তথা সামন্ত রাজা ও দুর্গপতি-গণের আনুগত্যে ক্রমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন এ কথা মহাদেঈয়ের কাছে সুসংবাদ ছিল না। তার পর, সর্বাপেক্ষা দুশ্চিন্তার কারণ, মুক্তি মণ্ডপের পণ্ডিতেরা নাকি অনুমতি দিয়েছেন যে এ বৎসর রথযাত্রার সময়ে রামচন্দ্রদেব 'ছেরাপহঁরা'[1] ও অন্যান্য রাজনীতি[2] সম্পাদন করতে

1. ছেরাপহরা– রথের যাত্রারম্ভের পূর্বে রথের উপর উঠে সুগন্ধ জল সেচন ক'রে ঝাট দেওযা ; জগন্নাথেব রাজসেবক হিসাবে গজপতি রাজাকে তা স্বহস্তে করতে হয।

2. রাজনীতি— যে নীতি অর্থাৎ মন্দিরসংক্রান্ত কর্ম স্বযং রাজাকে সম্পন্ন করতে হয।

পারবেন। তাঁরা নাকি বলেছেন, রথারূঢ় জগন্নাথের কাছে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদ যখন নেই আর রামচন্দ্রদেব জাতিভ্রষ্ট হলেও তাঁর ভক্তিতে যখন জগন্নাথ প্রসন্ন তখন রাজসেবকরূপে তাঁর যে অধিকার তা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হবে কেন? কোনও স্মার্ত পণ্ডিত এ প্রশ্নের সমাধান দিতে পারেন নি। আবার এও শোনা যাচ্ছে যে রামচন্দ্রদেব কয়েকটি ব্রাহ্মণকে উভয়মুখী-রামচন্দ্রপুর 'শাসন' দান ক'রে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে আবার নাকি হিন্দুধর্মে ফিরে এসেছেন। যদি তাই হয়ে থাকে তা হলে ভাগীরথীকুমারের সিংহাসন পাওয়া আর হল না।

বকশী বেণু ভ্রমরবর জীবিত থাকলে রামচন্দ্রদেব এতদিনে হয়তো সিংহাসনচ্যুত হতেন। মহারাণী ললিতা মহাদেঈ বৈধব্য ঘোষণা ক'রে অঙ্গ থেকে আয়তির সমস্ত চিহ্ন ত্যাগ ক'রে বকশীকে কথা দিয়েছিলেন —যেদিন রামচন্দ্রদেবের কাটা মাথা দেখবেন সেদিন বকশীকে অর্ঘথালা নিয়ে নিজে বরণ করবেন। কিন্তু জগন্নাথের বিধান অন্য প্রকার হ'ল। রামচন্দ্রদেবের কূটকৌশলে বকশী নিজেই প্রাণ হারালো।

বাম হাতে কপাল থেকে সর্পিল কুন্তলরাশি সরিয়ে ললিতা মহাদেঈ বীরজাঈ দেবীর দিকে প্রার্থনাপূর্ণ নয়নে চাইলেন। কিন্তু দেবীর চুয়া-কস্তুরীচর্চিত মুখমণ্ডলে প্রসন্নতার কানো চিহ্ন দেখতে পেলেন না।

ললিতা মহাদেঈর সম্মুখে কুশাসনে ব'সে ব্রহ্মচারী কামানন্দ অঙ্গন্যাস ক'রে বগলামুখীর মন্ত্র জপ করতে করতে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিচ্ছিলেন।

রুদ্রাক্ষমালা আসনের উপর রেখে ললিতা মহাদেঈ অস্থিরভাবে মন্দিরের বাহিরে উঠে এলেন।

এবার রথযাত্রার 'ছেরাপহঁরা' আদি 'রাজনীতি' যাতে ভাগীরথী-কুমার করেন সেইজন্য 'বড় পরিছা' গৌরী রাজগুরুকে ধ'রে তার সব

ব্যবস্থা করেছিলেন ললিতা মহাদেঈ। খোর্ধার সিংহাসন অধিকারের পথে তা প্রথম এবং প্রধান পদক্ষেপ। রামচন্দ্রদেবের স্থলে ভাগীরথী-কুমার জগন্নাথের 'ছেরাপহঁরা' করলে খোর্ধার প্রকৃত রাজা কে সমবেত দেশবাসীর সামনে তার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যেত। কিন্তু ঘটনার গতি অন্য রকম হ'ল। এ অবস্থায় ভাগীরথীকুমার পাইকদের সঙ্গে ক'রে যথাশীঘ্র পুরী অভিমুখে যাত্রা করা আবশ্যক ব'লে ললিতা মহাদেঈ স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন।

সিংহাসনের জন্য ভাগীরথীকুমারের প্রবল উৎকাঙ্ক্ষা ছিল বটে, কিন্তু সেজন্য ক্লেশস্বীকারের মত মানসিক দৃঢ়তা তাঁর ছিল না। ললিতা মহাদেঈয়ের মত তাঁরও তনুদেহ ঋজু শালপ্রাংশু বটে, কিন্তু চক্ষু দুটি ছিল অতিশয় কোমল উদাস ও বিষণ্ণ। তাঁর চেহারার সঙ্গে তাঁর সেই চোখেব আদৌ সামঞ্জস্য ছিল না। ললিতা মহাদেঈ তাঁকে যতই কঠোব শৃঙ্খলাব মধ্যে আবদ্ধ রাখবার প্রয়াস করতেন ভাগীরথীকুমার ততই কেবল আপন বয়স্যদের নিয়ে নৃত্যগীত ও মৃগয়ায় দিনাতিপাত করতেন।

মন্দিরের বাহিরে চারিদিক বিবিক্ত, নির্জন। নীচে গুল্মাকীর্ণ উপত্যকার বনশীষের উপর মহাকায় বৃক্ষরাজির অলস ছাযা মধ্যাহ্নের রৌদ্রে বিছিয়ে পড়ে আছে। রৌদ্রতাপে পাখিরা নীবব। কোন বৃক্ষ-শাখে একটি কপোতের বিলাপ ও দূরের কোন গাছ থেকে আর-এক কপোতের ক্লান্ত প্রত্যুত্তর ব্যতীত জীবনেব অন্য লক্ষণ নেই। মন্দিরের মধ্যে কামানন্দ ব্রহ্মচারী আত্মগত অনুনাসিক স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করছিলেন, মধ্যাহ্নের নিঃসঙ্গতা তাতে আরো নিবিড় হয়ে উঠছিল।

ভাগীরথীকুমারের অন্বেষণে ললিতা মহাদেঈ জীর্ণ প্রাঙ্গণ, অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ ও পশ্চিম প্রস্তের গৃহশ্রেণী ক্রমে ক্রমে সমস্ত অতিক্রম

ক'রে এসে শুনতে পেলেন দোলমণ্ডপের দিক থেকেই পাখোয়াজের বোল মধ্যাহ্ন বাতাসে ভেসে আসছে। তখন ললিতা মহাদেঈ নাগেশ্বর বনে পুষ্করিণীর তীরে দোলমণ্ডপের নিকটে এলেন। তিনি যা অনুমান করেছিলেন তাই বটে: মণ্ডপে ব'সে ভাগীরথীকুমার নিরুদ্‌বেগে পাখোয়াজে বোল তুলছিলেন— ধিনতা ধিন্, তাধিন তাধিন, তা...

নর্তকীর ঠাটে সুসজ্জিত একটি 'গোটি-পিলা'[1] বাম পদের উপর শ্রোণীভার ন্যস্ত ক'রে যাবকরঞ্জিত অন্য পদটি নৃত্যের ভঙ্গীতে সামনে এগিয়ে করাঙ্গুলিতে মুদ্রা রচনা করছিল। আর একটি 'গোটি-পিলা' বেশভূষা ক'রে নিজের ভূমিকার অপেক্ষায় মণ্ডপের উপরে অদূরে দাঁড়িয়ে পাখোয়াজের সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুঙুর-পরা পায়ে মৃদু মৃদু তাল দিচ্ছিল।

ভাগীরথীকুমাব পাখোয়াজ বাজাচ্ছিলেন— ধিনতা, ধিন্ তাধিন তা—

একটি পুষ্পিত নাগেশ্বরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ললিত মহাদেঈ কতক্ষণ এই সব লক্ষ্য করছিলেন তাঁর খেয়াল ছিল না। যে নাগেশ্বরের নীচে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন তার এক অনুচ্চ শাখায় দেহবেষ্টন ক'রে এক কালসাপ নাগেশ্বরের সৌরভে মূর্ছিতবৎ ছিল। এক সময়ে সাপটি সে ডাল থেকে উপরের ডালে ওঠবার জন্য পাক খুলতে লাগল। তার দেহ-ঘষণে গাছের পাতায় মর্মর শব্দে ললিতা মহাদেঈ হঠাৎ কালনাগটিকে দেখতে পেয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন— "কুমাব—!"

নাগেশ্বর বনের ভিতর থেকে ললিতা মহাদেঈ দোলমণ্ডপের দিকে ছুটে এলেন।

1. গোটি-পিলা বা গোটি-পুঅ— স্ত্রীবেশে পালাগান ও নৃত্যকারী অল্প-বয়স্ক বালক।

সেই সময়ে সেই অবস্থায় ভাগীরথীকুমার সেখানে মহাদেঈকে দেখতে পাবেন তা কখনও ভাবেন নি। তিনি অপরাধীর মত মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর কোনো কৈফিয়ৎ দেবার ছিল না, ললিতা মহাদেঈও তা আশা করেন নি। কিন্তু ভাগীরথীকুমারের মৌনতার মধ্যে যেন ফুটে উঠেছিল এই-সব শাসন-সংযমের বিরুদ্ধে অতর্কিত আগমনের নীরব প্রতিবাদ। কপালের উপর থেকে অসংযত কেশরাশি কুমারের বাম চক্ষুর উপর এসে পড়েছিল। এই পরিস্থিতি ও দৃশ্য উভয়ের পক্ষে নূতন নয় এবং এই শেষও নয় বলে উভয়েই বহুদিন হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।

ললিতা মহাদেঈয়ের কণ্ঠে কিন্তু আজ ছিল এক অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য। সঘন নিশ্বাসে তিনি বললেন, "কুমার, খোর্ধা-রাজবংশের বিষাক্ত রক্ত তোমার ধমনীতে প্রবাহিত বটে, কিন্তু তার মধ্যে মিশে আছে ব্রাহ্মণীর সংযম ও সাধনা। এই কি তার পরিচয়?"

এমন প্রশ্ন অতীতে ভাগীরথীকুমার হয়তো একশো বার শুনেছেন। মহাদেঈও এ প্রশ্নের কোনো উত্তর কুমারের কাছে প্রত্যাশা করছিলেন না। হাঁস যেমন ক'রে ডানা নেড়ে অবলীলাক্রমে গায়ের জল ঝেড়ে ফেলে ভাগীরথীকুমারও তেমনি দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে জননীর সমস্ত ভর্ৎসনা স্বচ্ছন্দে ঝেড়ে ফেলে নিরুদ্‌বিগ্ন মৌনতায় মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অন্যান্য বারের মত রসভঙ্গের পরিসমাপ্তি আজ কিন্তু এখানেই হ'ল না। ললিতা মহাদেঈ বললেন, "খোর্ধার রাজাই এ বছর 'ছেরাপহঁরা' করবেন ব'লে পুরীতে আয়োজন হচ্ছে। তুমি আজ এই মুহূর্তে এখান থেকে চম্পাগড় চ'লে যাও, কুমার। সেখান থেকে পাইকদের সঙ্গে নিয়ে অন্ধারী গড় হয়ে চিলিকার তীর ধ'রে ধ'রে পুরী চ'লে যাবে। কিন্তু

সাবধান, খোর্ধায় যেন এ কথা প্রকাশ না পায়। পুরীতে পৌঁছানোর পর বলদেব তর্কালঙ্কার যেমন বলবেন তেমনটি করবে। বুঝতে পারছ? নয়তো খোর্ধার সিংহাসনের আশা আর নেই জেনো।"

ললিতা মহাদেঈ ক্ষিপ্র পদে সেখান থেকে মন্দিরে ফিরে এলেন—নাগেশ্বর শাখার সেই কালনাগ যেন সর্পিল প্রলুব্ধতায় তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছে। অকারণ ভয় ও আতঙ্কে ললিতা মহাদেঈর সর্বাঙ্গ শিহরিত হচ্ছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

1

কটক হাবেলীর লালবাগ কেল্লার দেওয়ান-ই-খাস্ মহ্ফিলখানায় তকী খাঁ গোপন মন্ত্রণায় বসেছেন। মন্ত্রণা অত্যন্ত গোপনীয় নিশ্চয়, তা না হ'লে মুসারিফ্-ই-খওয়াস্ মহ্ফিলখানার বাহিরে, কেল্লার প্রবেশদ্বারে, নহবৎচৌকিতে এবং অন্যান্য সন্ধিস্থানে কড়া পাহারার ব্যবস্থা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিতেন না। মুসারিফ-ই-খওয়াস্ কিন্তু মন্ত্রণার বিষয়বস্তু জানেন না, কেল্লাদারের নির্দেশে তিনি কেবল চৌকি পাহারা বাড়িয়েছেন। কেল্লাদারেরও তার কারণ জানা নেই। তিনি কেবল জানেন যে খোদ উজীর, খাঁ বাহাদুর মুস্তাফা আলি খাঁর নিকট থেকে তিনি এজন্য কড়া হুকুম পেয়েছেন। কেল্লাদার বা মুসারিফ-ই-খওয়াস্ মন্ত্রণার সামিল নন মহফিলখানায় তাঁদের প্রবেশও নিষিদ্ধ। কিন্তু নায়েব-নাজিমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য লালবাগে যে সব জমিদার, ইজারাদার, এবং নালিশ জানাবার জন্য যে সব সাধারণ প্রজারা এসেছে এবং অন্যান্য যে সব বেকার দরবারী আছেন তাঁদের চোখে আপন প্রাধান্য জাহির করাও তো দরকার। তাই তাঁরা গম্ভীরভাবে অযথা ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি ক'রে আর মহ্ফিলখানার পর্দাঢাকা দরজায় উঁকিঝুঁকি মেরে তার পর অকারণে হাঃ হুঃ করতে করতে কিংবা বোদ্ধার মত মাথা নেড়ে আতর মাখানো রুমালে মেহেদি-রাঙা দাড়ি

মুছতে মুছতে ফিরে আসছিলেন।

মহ্‌ফিলখানার ভিতরে নায়েব-নাজিম তকী খাঁ সিংহাসনের বাজুর উপরে তার বাঁ কনুইটি একটি মেদুল স্তম্ভের মত ভর দিয়ে হাতের মাংসল তেলোর উপরে স্থূল মুখখানি রেখে চক্ষু মুদ্রিত ক'রে নাক ডাকাচ্ছেন। মন্ত্রণাদাতাদের মধ্যে তিন জন— উজীর মুস্তাফা আলি খাঁ, ফৌজদার দীল্‌ মোহম্মদ ও তকী খাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত হিন্দু জায়গিরদার আমিনচাঁদ। তাঁবা নিজ নিজ আসনে নীরব নিশ্চলতায় ব'সে পরস্পরের মুখাবলোকন করছেন এবং আজকের সমস্যাটার প্রকৃত স্বরূপ কি হতে পারে মনে মনে পর্যালোচনা করছেন।

কিসের মন্ত্রণার জন্য তাবা পরওয়ানা পেয়ে এখানে এসেছেন— বিশেষ ক'রে আমিনচাঁদকে আলাদা বাতাবহ গিয়ে মাহাঙ্গা পরগনা থেকে কেন ডেকে এনেছে— তা তাঁরা নিজেরাই জানতেন না। তকী খাঁর তন্দ্রাভঙ্গেব অপেক্ষায় ব'সে থাকা ছাড়া তাঁদের আর কিছু করবার ছিল না। তাব গভীব নাসিকাগর্জন যখন কিঞ্চিৎ প্রশমিত হচ্ছে, তার শার্দূলসুলভ গোঁফ জোড়া ঈষৎ ন'ড়ে উঠছে, কিংবা বাঘের থাবাব মত লোমশ হাতখানা কপালের উপর দিয়ে একবার বুলিয়ে যাচ্ছে, তখন সিংহাসনেব পিছনে দাঁড়িয়ে ময়রপাখায় বীজনরত খাদিম খিদমৎগাবেরা যেমন ঝিমুনি ভেঙে চঞ্চল হয়ে উঠছে, মন্ত্রণাহূত মহামান্য ব্যক্তিত্রয়ও তেমনি উদগ্রীব হয়ে নিজ নিজ মেরুদণ্ড একবার ক'রে সোজা ক'রে নিচ্ছেন।

আমিনচাঁদ আর উৎকণ্ঠা দমন করতে না পেরে দরবারী কায়দায় বাঁ হাতে মুখ ও ঠোঁট আড়াল ক'রে অস্ফুট স্বরে উজীরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "খোদাবন্দ্‌ এ খিদমৎগারকে হঠাৎ স্মরণ করেছেন কেন?"

উজীর নিজেই নিজেকে এ প্রশ্ন মনে মনে জিজ্ঞাসা করছিলেন,

তিনি আর কি উত্তর দেবেন ? গাম্ভীর্য বজায় রেখে অর্ধনিমীলিত চোখ দুটি বিস্ফারিত ক'রে যে ভাবে আমিনচাঁদের দিকে তাকালেন তাতে আমিনচাঁদ বুঝলেন বিষয়টি বাস্তবিক বড় গুরুতর।

যে কয়জন হিন্দু অতীতে সুজা খাঁর নেকনজরে প'ড়ে প্রচুর ইনাম রোশম ও জায়গির পেয়ে ওড়িশায় বসবাস ক'রে ছিলেন আমিন চাঁদ তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। আমিন চাঁদ উত্তর ভারতের অধিবাসী। তিনি একজন মল্লযোদ্ধা। তলোয়ার খেলায় তাঁর সমকক্ষ মোগল লশকরদের মধ্যেও প্রায় কেউ ছিল না বলা চলে। তাঁর সেই গুণের জন্য তিনি তকী খাঁর সঙ্গে মুর্শিদাবাদ থেকে কটকে এসেছিলেন। সে সময়ে দুর্দান্ত খণ্ডায়ত চউপাঢ়ীগুলিকে শায়েস্তা করবার জন্য নিষ্কর বৃত্তিভোগী চউপাটীর খণ্ডায়ত অধিকারীদের উচ্ছেদ ক'রে তাদের জায়গায় মোগল-অনুরক্ত জায়গীরদারদের বসানো হচ্ছিল। আমিন চাঁদ সেই সূত্রে বিরূপার দক্ষিণতটবর্তী মাহাঙ্গা পরগনায় এক সুবিস্তীর্ণ জায়গির পেয়েছিলেন। বহু যুদ্ধে তিনি তকী খাঁর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। তা ছাড়া কটক কেল্লায় এক রণকুশলী খণ্ডায়তবহুল অঞ্চলকে বাধ্য ও অনুগত রাখতে বিশেষভাবে সফল হয়েছিলেন। তবু তকী খাঁ এখন স্বতন্ত্র বার্তাবহের মারফতে এমন হঠাৎ ডেকে পাঠানোতে আমিন চাঁদের মনে নানা আশঙ্কা জাগছিল, তিনি বড় অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

অথচ সে সময়ে ওড়িশা সুবার রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে তেমন গুরুতর বা সঙ্কটজনক কিছুই ছিল না। খোধা সম্পূর্ণ শান্ত ও অনুগত ছিল। ইতিমধ্যে হাফিজ্ কাদ্‌র্ কয়েক বার কটকে এসে নায়েব-নাজিমের কাছে তাঁর আনুগত্য ও সম্প্রীতির অকাট্য প্রমাণ দিয়ে গেছেন। অহেতুক ধর্মান্ধতায় জগন্নাথ ধ্বংস করাও তকী খাঁর উদ্দেশ্য নয়। বস্তুতঃ জগন্নাথ যেমন আকুমারী-হিমাচল হিন্দু জনতার

মোক্ষদাতা ছিলেন তেমনি ওড়িশায় মোগল রাজত্বেরও তিনিই ছিলেন একমাত্র নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। সুজা খাঁর আমলে জিজিয়া যাত্রীকর থেকে আদায় হ'ত বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা, কিন্তু তকী খাঁ যাত্রীকরের হার বৃদ্ধি ক'রে তা সাত লক্ষে দাঁড় করিয়েছিলেন। এ তো গেল সরকারী আদায়ের হিসাব। জগন্নাথ সড়কের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ইজারাদাররা বরকন্দাজ নিয়ে ব'সে আছে। যে যার পাওনা না পেলে যাত্রীদের ছাড়তে তারা নারাজ। গত খোর্ধা ও কটকের মধ্যে যুদ্ধের গোলযোগের দরুন বেশী যাত্রী পুরী আসে নি, তাই আদায়ের পরিমাণটাও খুব কম প'ড়ে গিয়েছিল। সেজন্য তকী খাঁকে মুর্শিদাবাদ থেকে যথেষ্ট তাগাদা পেতে হয়েছে। তাই মোগল রাজস্বের প্রধান উৎস জগন্নাথকে নষ্টভ্রষ্ট না ক'রে অন্য কি উপায়ে তকী খাঁ তাঁর জগন্নাথ-বিদ্বেষ চরিতার্থ করবেন এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা।

আগের আগের মোগল নায়েব-নাজিমদের মত তকী খাঁও শুনেছিলেন জগন্নাথের ব্রহ্মপিণ্ড সুদুর্লভ ইন্দ্রনীলমণিতে গঠিত। বস্তুতঃ অতীতের আগঙ্গাগোদাবরীবিস্তৃত সুবিশাল উৎকল সাম্রাজ্যের প্রশস্ত সম্পদ জগন্নাথে নিবেদিত হয়ে থাকায় জগন্নাথ দিল্লী-শাজানা-বাদের বাদশা, মুর্শিদাবাদের নবাব অথবা দক্ষিণে নিজাম উল্-মুল্কের চাইতেও দুর্লভ মণিমুক্তার ঐশ্বর্যে অধিকতর ঐশ্বযশালী ছিলেন। সেই সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য কালাপাহাড় থেকে আরম্ভ ক'রে এ পর্যন্ত জগন্নাথ মন্দিরের উপর বার বার আক্রমণ হয়ে এসেছে। অতীতে বাদশা জাহাঙ্গীরের সময়ে হিন্দু ফৌজদার কেশোদাস মারু মন্দির রুদ্ধ ক'রে সেখান থেকে কিছু রত্ন আত্মসাৎ করেছিল। হাশিম খাঁ, মক্রাম্ খাঁ, এক্রাম্ খাঁ, প্রভৃতি মোগল ফৌজদারেরাও বিভিন্ন সময়ে মন্দির আক্রমণ ক'রে কম রত্ন লুঠ করে নি। তবু যা অবশিষ্ট ছিল তাতে

সমগ্র বঙ্গ-বিহার-ওড়িশার নবাবী মসনদ্ কিনে নেওয়া যেতে পারত! প্রকৃতপক্ষে সেই সম্পদ লুঠ করা ছাড়া জগন্নাথ সম্বন্ধে তকী খাঁর আর কোনো অভিসন্ধি ছিল না।

কিন্তু অতীতের বহু অভিজ্ঞতা থেকে তকী খাঁ বেশ বুঝেছিল মন্দির আক্রমণ ক'রে দেবতাদের লুণ্ঠন ক'রে সে উদ্দেশ্য সাধনের সম্ভাবনা অতি সামান্য। সেটা বাদ দিয়ে ছলে বলে কৌশলে যদি উদ্দেশ্যসাধন করতে পারা যায় তা হ'লে তার চাইতে ইমানদারির কাজ আর কিছু হতে পারে না। কেবল এই উদ্দেশ্যেই তো তকী খাঁ খোর্ধার রাজা রামচন্দ্রদেবকে ধর্মান্তরিত করিয়েছিল। তাঁকে হাতের মুঠোয় রেখে জগন্নাথের অতুল বৈভব হস্তগত করাই তকী খাঁর অভিপ্রায় ছিল। তা ছাড়া তাতে এক ঢিলে দুই পাখিও মারা হবে। রামচন্দ্রদেব মুসলমান হয়ে গেলে আঠারো গড়জাতের সামন্ত রাজগণ এবং অন্যান্য দুর্গপতি ও জমিদারদের তথা জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য হারাবেন এবং তার ফলে খোর্ধার রাজশক্তি হীনবল হয়ে কটকের নায়েব-নাজিমের বচস্কর হয়ে পড়বে।

কিন্তু এর মধ্যে জগন্নাথ হঠাৎ কোথা থেকে পতিতপাবন হয়ে বসলেন!

তকী খাঁর সমস্ত পরিকল্পনা ওলট পালট হয়ে গেল।

তকী খাঁ ঘুমাতে ঘুমাতে সেই-সব চিন্তা করছিল না চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল জানবার উপায় ছিল না। সে যাই হোক, একটি মাছি কোথা থেকে এসে এই ঘুমন্ত চিন্তার বাদ সাধল। তকী খাঁর মসৃণ নাসিকাগ্রের প্রতি মাছিটির অকারণ পক্ষপাত পাঙ্খাবরদার-দের ব্যস্ততা, উজীর মুস্তাফা আলি খাঁ সাহেবের নিগূঢ় কৌতুক ও স্বয়ং তকী খাঁর তন্দ্রাঘোরে পুনঃপুনঃ হস্ত-সঞ্চালনের কারণ হয়ে উঠল।

অবশেষে হঠাৎ সপদদাপে তকী খাঁ গর্জন ক'রে উঠলেন—"কম্‌বক্ত!
—লাও মেরে তল্‌ওয়ার!"

হয়তো কত্‌ল্‌ হওয়ার ভয়েই মাছিটি উড়ে গিয়ে এবার উজীর মুস্তফা আলি খাঁ সাহেবের গণ্ডদেশে একান্ত শরণ নিয়ে তাঁকে অকস্মাৎ বড়ই বিব্রত ক'রে তুলল।

তকী খাঁ সেই দৃশ্যে অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন।

তার পরে সিংহাসনে সোজা হয়ে ব'সে হাই তুলে দুই বার বললেন, "ইন্‌শাল্লাহ্‌!— ইন্‌শাল্লাহ্‌!"

হুকাবরদার সোনার পাতে মোড়া আলবোলা তকী খাঁর মুখে গুঁজে দিল। তকী খাঁ তাতে দুই টান দিয়ে অম্বুরী তামাকের খোশবায়ে মহ্‌ফিল্‌খানা মাত ক'রে ঋষভ কণ্ঠে হাঁকলেন—"শিওয়ানবিশ পেশ্‌ কর।" দুইজন খাদিম হুকুম তামিল কবতে বেরিয়ে গেল।

শিওয়ানবিশ কেরামৎ আলি খাঁ অনেকক্ষণ যাবৎ মহ্‌ফিলখানার বাইরে দরজার কাছে ব'সে ভিতরে কিরকম গুরুতর মন্ত্রণা চলেছে তাই মনে মনে কল্পনা ক'রে তার কোনো কূলকিনারা পাচ্ছিলেন না।

নায়েব-নাজিমকে রাজ্যের সমস্ত সংবাদ সম্বন্ধে ওয়াকিব্‌হাল রাখা শিওয়ানবিশের কাজ। দিল্লী-শাজাহানাবাদ, আজিমাবাদ, সর্বত্রই এমনি শিওয়ানবিশ থাকতেন। সুবায় ঘ'টে যাওয়া এমন কোনো গুপ্ত ব্যাপার নেই যা শিওয়ানবিশের অজানা। তা সত্ত্বেও কেরামৎ আলি খাঁ মহ্‌ফিলের মধ্যেকার গুপ্ত মন্ত্রণার বিষয়বস্তু আঁচ করতে না পেরে মনে মনে বড়ই অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

এখন হুজুরের কাছ হ'তে তলব আসায় কেরামৎ আলি খাঁ তাঁর পদ ও পদবীর সমস্ত গাম্ভীর্য তাঁর আবক্ষবিস্তৃত লালচে দাড়িতে ঝুলিয়ে মনে মনে "তোওবা তোওবা" বলতে উঠলেন। আঁট পাজামার মধ্যে

তাঁর সরু সরু বাঁকা পা দু'খানি ফড়িঙের পায়ের মত মনে হচ্ছিল, আবার বাঁকা হওয়াতে বেঢপ ভঙ্গীতে পা দুখানা আঁকিয়ে বাঁকিয়ে ফেলে পৃথুল গোলকার উদরে হাত বোলাতে তিনি মহ্‌ফিলখানায় গিয়ে ঢুকলেন।

নায়েব-নাজিম বাহাদুরকে যথারীতি অভিবাদন জানাবার পর তকী খাঁ আলবোলার মারফত তাঁকে আসন গ্রহণের নির্দেশ দিলে কেরামৎ আলি শেরওয়ানির পশ্চাল্লম্বিত অংশ তুলে অতি সাবধানতাসহকারে গদিমোড়া একটি কুরসিতে উপবেশন করলেন।

আলবোলা বর্জন ক'রে তকী খাঁ পার্শ্বপরিবর্তন করে হুকুম দিলেন —"খবর পেশ কর।"

তার পর দক্ষিণ কফোনি ও করতলের উপর মস্তকভার ন্যস্ত করে তিনি আবার চক্ষুদুটি অর্ধনিমীলিত ক'রে আনলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর স্থূল নাসিকাটি তার অভ্যস্ত গর্জন শুরু ক'রে দিল।

কেরামৎ আলি কিন্তু তাতে নিরুৎসাহ না হয়ে ওড়িশা সুবার যাবতীয় গুপ্ত হাল-হকিকৎ নায়েব-নাজিম বাহাদুরের সমক্ষে পেশ করতে আরম্ভ করলেন—"হুজুর নায়েব-নাজিম দীন দুনিয়ার মালিক, মুর্শিদাবাদ তখতের বাদ্‌শাহ্‌, গরীবে নওয়াজ সুজা খাঁর নিমক খেয়ে আমি বেড়েছি, হুজুরের মেহেরবানিতে আমার সব দৌলত—"

নায়েব-নাজিম বাহাদুরের নাসিকাগর্জন জমে উঠেছিল।

"ওড়িশা সুবার কোনও খানে এমন ঘটনা ঘটে না যা এ বান্দার নজরে না আসে—"

নাসিকাগর্জন হঠাৎ থেমে গেল। তকী খাঁ সোজা হয়ে ব'সে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে যে ভাবে কেরামৎ আলি খাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন তাতে কেরামৎ আলির গৌরচন্দ্রিকা অর্ধপথে বন্ধ হ'ল। তকী খাঁ

গম্ভীর গলায় বললেন, "খবর কি বাতলাও।"

কেরামৎ আলি বললেন, "আঠারো গড়জাতের রাজারা আবার খোর্ধার রাজার কাছে দৌড়াদৌড়ি করতে আরম্ভ করেছেন। এ বৎসর রথযাত্রায় যোগ দেবার জন্য এখন থেকেই সাজসজ্জা করছেন। খোর্ধার রাজা মুসলমান হওয়া ইস্তক কাফেররা রথযাত্রার সময় তাঁর 'ছেরাপইঁরা' করার উপরে রোকাওত জারি করেছিল।"

'ছেরাপইঁরা' কথাটা তকী খাঁ বুঝতে পারলেন না। তার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করায় আমিনচাঁদ বুঝিয়ে দিলেন, "রথযাত্রার সময়ে জগন্নাথ রথে ওঠার পর খোর্ধার রাজা জগন্নাথের রাজসেবক হিসাবে হাতে সোনার ঝাঁটা নিয়ে রথের চারি পাশ ঝাঁট দেন, তাকেই ছেরাপইঁরা বলে।"

তকী খাঁ তাচ্ছিল্যপূর্ণ পরিহাসে আপন পৃথুল দেহস্তূপটিকে কাঁপিয়ে বললেন, "তিনি তো তা হলে ধাঙ্গড় মেথর! বাদ্‌শাহ্‌ কিসের?"

কেরামৎ আলি দাড়ি চুমরে বললেন, "তা না তো আর কি হুজুর!"

আমিনচাঁদ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "কিন্তু তাতে খোর্ধার রাজাকে পাণ্ডা পূজকেরা আবার অনুমতি দিল কি ক'রে?"

কেরামৎ আলি বললেন, "আমার খবর এই যে কাফেরদের মৌলবীরা মুক্তিমণ্ডপ সভায় ব'সে ইনসাফ্‌ দিয়েছেন যে খোদ জগন্নাথ পতিতপাবন ব'নে খোর্ধার বাদ্‌শাহ্‌ হাফিজ্‌ কাদ্‌র্‌-এর উপরে মেহেরবানি ক'রে থাকায় রথযাত্রায় সেবা করায় তাঁর ইন্‌কার্‌ করা হবে না। তা ছাড়া, রথের উপরে কাফেরদের দেবতাকে মেথর ধাঙ্গড় যে ইচ্ছা সে ছুঁতে মানা নেই, তা হ'লে খোর্ধার বাদ্‌শাহ্‌ রথের উপরে জগন্নাথকে ছুঁলে দোষ কোথায়?"

উজীর এতক্ষণ গম্ভীরভাবে তাঁর মেহেদিরাঙা নাতিদীর্ঘ দাড়ি

চোমরাতে চোমরাতে একটা কিছু উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা করছেন এমনি ভাবে ব'সে ছিলেন। জগন্নাথ পতিতপাবন হওয়া এবং সে কথা যাত্রীগোমস্তাদের গাঁজাখুরী প্রচারে ওড়িশার এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত পল্লবিত হয়ে সাধারণ জনতার প্রাণে খোর্ধার রাজা রামচন্দ্রদেবের প্রতি এক নূতন বিশ্বস্ততা সৃষ্টি করার কথা তিনিও শুনেছেন, কিন্তু জগন্নাথ পতিতপাবন হাওয়ার ব্যাপারটা সত্যি না তা কেবল রামচন্দ্রদেবের একটা চাল এবং স্রেফ আজগবী তার সঠিক বৃত্তান্ত শিওয়ানবিশের কাছ থেকে শোনবার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু শিওয়ানবিশের প্রগল্‌ভতার মধ্যে তার কোনো হদিস্ তিনি পাচ্ছিলেন না।

তকী খাঁ কিন্তু ততক্ষণে মনস্থির ক'রে ফেলেছেন। সিংহাসনে সোজা হয়ে ব'সে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিলেন: "রথযাত্রার সময়ে কোনও গণ্ডগোল করা ঠিক নয়; কিন্তু রথযাত্রা হয়ে গেলে আমিনচাঁদ পুরীর নায়েব হয়ে বসবেন, পুরীর মন্দিরে খোর্ধা রাজার আর কোনো হুকুমৎ চলবে না, আমিনচাঁদের হুকুমে মন্দিরের সেবা পূজা চলবে।"

উজীর মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "আকবর বাদ্‌শাহের জমানা থেকে জগন্নাথ মন্দিরের উপরে বাদশাহী সনদে খোর্ধা রাজার হক্ জাহির আছে, আমিনচাঁদকে খোর্ধা রাজা মানবে কেন?"

তকী খাঁ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অপস্মার রোগীর মত কাঁপতে কাঁপতে চীৎকার ক'রে বললেন— "খোর্ধার রাজা আমাদের হুকুম মানবে না? তা হ'লে খোর্ধার উপরে আবার ফৌজ কুচ্ করবে, খোর্ধার রাজাকে আবার কয়েদ ক'রে আনা হবে!"

উজীর শঙ্কিত কণ্ঠে বললেন, "খোর্ধার রাজার হিম্মৎ কত যে সে

হুজুরের হুকুম অমান্য করবে? তবে পুরীর পাণ্ডা সেবকেরা আমিন চাঁদকে মানলে তো?"

তকী খাঁ সিংহাসনের বাহুতে একটা ঘুসি মেরে তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিলেন: "তা হ'লে জগন্নাথ মন্দির ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হবে।"

উজীর মুস্তাফা আলি এবার সুর বদলে তকী খাঁর এই আস্ফালনের সমর্থন ক'রে বললেন, "সেখানে একটা মস্‌জিদ্ তৈরি হ'লে হুজুরের নেকনাম আরও জাহির হবে।— কিন্তু বছর বছর জিজিয়া থেকে যে সাত লক্ষ টাকা খাজনাখানায় আসছে তা বন্ধ হয়ে গেলে তো মুশকিল।"

তখী খাঁ মেদস্ফীত মুখমণ্ডল কুঞ্চিত ক'রে ওষ্ঠ দংশন ক'রে বললেন, "জগন্নাথের যত হীরা জহরৎ আছে সে সব আমাদের হাতে এলে তাতে তো গোটা দিল্লী-শাজাহানাবাদ খরিদ করা যেতে পারবে! পরোয়া কিসের?"

লালবাগে এ-সব মন্ত্রণা শেষ হ'লে আমিন চাঁদ লালবাগ কেল্লা থেকে বেরিয়ে চিন্তান্বিতভাবে ঘোড়ার পিঠে রাজপথ দিয়ে ফেরার সময়ে তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছিল। জগন্নাথ মন্দির তাঁর নাগালের মধ্যে আসায় বহু আশা ও সম্ভাবনাতে তিনি মনে মনে যেমন উৎফুল্ল হচ্ছিলেন আশঙ্কা ও দ্বিধায় তেমনি আন্দোলিত হচ্ছিলেন।

শহরের প্রধান রাস্তায় পিঁপড়ের সারের মত দলে দলে যাত্রী পুরী চলেছে। কাঠজোড়ী নদীর ঘাটে নেমে নদী পার হ'য়ে মুকামেশ্বর থেকে আবার তারা জগন্নাথ সড়ক ধরবে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু বিচিত্র যাত্রীর বিচিত্র পরিধান, বিচিত্র ভাষা ও বিচিত্র যানের সপ্তরঙ্গ

স্রোত রাস্তায় বয়ে চলেছিল। আর সব পথই গেছে একটা বিশেষ অভিমুখে— সেটা পুরুষোত্তম পুরীর 'বড় দাণ্ড'। নীলাচলের উপরে সুদর্শনচক্রলাঞ্ছিত চূড়ার প্রতি দূর থেকে প্রণতি জানাবার জন্য সকল চক্ষু তৃষ্ণার্ত। কিন্তু তখনও তার অনেক বিলম্ব ছিল। জগন্নাথ সড়কের ধুলায় লুণ্ঠিত হবার জন্য কেবল এখন সকল দেহ ব্যাকুল। কিন্তু বহু কণ্ঠে উদ্‌বেলিত ভজন পদাবলী কটকের মোগল লশকর ও কোতোয়ালদের সংবেদনহীন চক্ষুর সামনে হঠাৎ নীরব হয়ে গিয়েছিল। কাঠজোড়ী পেরিয়ে মুকামেশ্বর ছাড়ালে জগন্নাথ সড়ক আবার মুখরিত হয়ে উঠবে পশ্চিমা যাত্রীদের সংগীতে। গৌড়ের বৈষ্ণবদের খোল কীর্তন আর ওড়িয়া যাত্রীদের 'জগাণে'র এক-একটি পদ তাতে মিশে তা এক মহাসংগীতে পরিণত হবে। দুস্তর পথের অরণ্য পর্বত দস্যু, জিজিয়ার ইজারাদারদের জুলুম লুণ্ঠন, ক্লান্তি ব্যাধি ক্ষুধা ও মৃত্যু প্রভৃতি সব বিপদ পদে পদে ঠেলে এগিয়ে যাবে মানুষের অপরাজেয় আত্মার অপ্রতিরোধ চৈত্র-যাত্রা।

আপাততঃ কিন্তু কটক-হাবেলী অতিক্রম করার সময়ে আশঙ্কিত নীরবতায় যাত্রীদল কাঠজোড়ীর দিকে চলেছিল। আমিনচাঁদ তাদের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে খোশ্‌-কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিলেন।

মহ্‌ফিলখানা থেকে উজীর ও শিওয়ানবিশও বিদায় নেবার পর হঠাৎ পর্দার আড়ালে রিজিয়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠে তকী খাঁ জিজ্ঞাসা করলেন, "মেজাজ শরীফ্‌ তো, বহেন্‌?"

রিজিয়া কপালের উপর থেকে বোরকা ধীরে সরিয়ে আয়ত চক্ষু দুইটি তকী খাঁর চক্ষুতে নিবদ্ধ রেখে বললেন, "গাজী পীরের কাছে আমি মানত করেছিলাম, জাহাঁপনা ভালয় ভালয় খোর্ধার লড়াই থেকে ফিরলে দোয়া দেব ব'লে। এখন আমার সেখানে যাবার ইন্তেজাম

ক'রে দিন। কাল রাত্রে আমি গাজী পীরকে স্বপ্নও দেখেছি।"

নির্ভয়ে যারা অন্যের উপর জুলুম করে তাদের তো আবার কারও কাছে ভয় থাকা চাই। তা হ'ল সর্বোপরি নিজের বিবেকের কাছে। পীর দরবেশ খোদা ও ভগবানের নামের মধ্যে সেই বিবেকই ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কেত আহরণ ক'রে থাকে। ভগবান্‌কে তারা ভালবাসে না, ভয় করে। তাই পীর ও দরবেশদের প্রতি তকী খাঁর শ্রদ্ধার চাইতে ভয়ই ছিল অতিশয় বেশি রকমের।

তকী খাঁ লম্বিত উদরে দুই হাত বোলাতে বোলাতে ঘুমন্ত গলায় বললেন, "বিলকুল! বিলকুল!"

এই আশ্বাসবাণী শুনে রিজিয়ার স্মিত ওষ্ঠাধর ও দুই আয়ত চক্ষু আবার বোরকার আড়ালে আত্মগোপন করল, তিনি স্বয়ংও জেনানার অন্তরালে অদৃশ্য হলেন।

এবং তকী খাঁর নাক আবার ডাকতে আরম্ভ করল।

অষ্টম অধ্যায়

1

কুরুলোবিশ-অ সিংহল-ব্রহ্মপুরের দধিবামন জীউর মন্দিরে স্নান-পূর্ণিমার দিন থেকে 'অনসর'-অ বিধি আরম্ভ হয়েছে। স্নানপূর্ণিমা থেকে আষাঢ় অমাবস্যা নেত্রোৎসব পর্যন্ত 'অনসর' বিধান অনুসারে এখানে সমস্ত বিধি পালিত হয়।

এই 'অনসর'-কালের মধ্যে যাত্রীদের পরমেশ্বরকে দেখা নিষিদ্ধ। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি নাকি স্বয়ং জগন্নাথের আদেশ ছিল মহাস্নানের পরে অনসরের পনেরো দিন তাঁর অঙ্গরাগবিহীন রূপ কেউ যেন না দেখে :

"ততঃ পঞ্চদশাহানি স্থাপয়িত্বা তু মাং নৃপ
অচিত্রং বা বিরূপং বা ন পশ্যেৎ কদাচন।"

মহাসামন্ত জগন্নাথ অন্য ওড়িয়াদের মতই জ্যৈষ্ঠের গ্রীষ্মের প্রকোপে মেলা স্নান ক'রে চন্দন কর্পূর মেখে ঠাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর বাধিয়ে বসেন, শরীর ভার ভার বোধ হয়। গৌড়ীয় ভক্তেরা একে ব'লে থাকেন প্রভুর জ্বরলীলা। জ্বরলীলাকালে ঠাকুর যে ওড়িয়ার মতই কেবল মিছরির পানা খেয়ে ঘর অন্ধকার ক'রে বিছানায় শুয়ে থাকেন।

এমনি সময়ে সিংহল-ব্রহ্মপুর গাঁয়ের নাথ-অ মুদুলী হঠাৎ খবর আনলে— দিল্লীর 'অমুরা'[1] পাতশা লশকর ফৌজ নিয়ে এখানে আসছে,

1. অমুরা—যবন ('মাদলা পাঞ্জি')।

দধিবামনের মন্দির ভেঙে ফেলে সেখানে মসজিদ্ বসাবে। নাথ-অ মুতুলী গিয়েছিল তার মাসীর বাড়ি শিশুপাল গড়ের কুশুকন্টা গাঁয়ে। সেখানে আবার কুটুম্ব এসেছিল কাঠজোড়ীর দক্ষিণ তীরের দলেইবাগ গ্রাম থেকে। নদীর ওপারে কটক, সেখানে জীরা ফুটলে তাদের নাকে গন্ধ পেঁাছায়। তাদের কাছে শুনে এসেছে সে, 'অমুরা' পাতশা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আসছে এই ব্রহ্মপুর গাঁয়ে! কিন্তু পরে রথীপুর মোকাম থেকে দোলেই খুন্টিআ যে খবর আনলেন তাতে জানা গেল 'অম্রা' পাতশা আসছে না, আসছে খোদ কটকের নায়েব-নাজিম তকী খাঁ।

খবর শুনে লোকেরা ঝাঁপ ফেলে দোরে তালা দিয়ে পাহাড় জঙ্গলে পালাল। সাহসী লোকেরা কেবল না পালিয়ে বাঁশবন আর কেয়া-ঝাপের ভিতব থেকে 'নউলভাইয়ের' মত চোখ জ্বল জ্বল ক'রে তাকিয়ে রইল 'অমুরা' পাতশা দিল্লী থেকে আসছে না কটক থেকে নায়েব-নাজিম তকী খাঁ আসছে তাই দেখবার জন্য।

সেদিন 'অনসর' পঞ্চমী।

শ্রীদধিবামনজীউর বিগ্রহ তিলের তেল, চুয়া, কর্পূর ও পুষ্পসম্ভারে সুরভিত করার কথা।

গাঁয়ের মাথায় শিমুল গাছের উপরে চ'ড়ে যে লোকটি আক্রমণ-কারীদের গতিবিধি লক্ষ্য কববার জন্য ব'সে ছিল সে বহু দূরে মাঠপারের দিগন্ত রেখা থেকে একদল 'অস্বআর' (অশ্বারোহী) আসতে দেখে গাছ থেকে নেমে প'ড়ে বাঁশবনের ভিতরে খবর দিয়ে এল—'অমুরা' পাতশা এসে গেছে! নায়েব-নাজিম তকী খাঁ যে নয় তাতে ভুল নেই, কারণ সে নিজে জানে লালবাগ কেল্লায় এত ঘোড়াও নেই এত 'অস্বআর'ও নেই।

অবশেষে সামনে ও পিছনে শস্ত্রধারী অশ্বারোহীর ব্যূহের মধ্যে

বনাতের পর্দাঢাকা একটি পালকি যখন গঞ্জেইশা পীরের কাছে গিয়ে থামল, তখন লোকের আর সন্দেহ রইল না যে খোদ 'অমুরা' পাতশা এসেছেন। নায়েব-নাজিম হ'লে তো ঘোড়ার পিঠে আসত। এখন 'অমুরা' পাতশা পালকি থেকে নেমে কী কাণ্ড ঘটায় দেখবার জন্য তারা সন্ত্রস্ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল।

কিন্তু পালকির ভিতর থেকে বোরকা-আবৃত এক অশরীরী ছায়া-মূর্তি বেরিয়ে যখন গঞ্জেইশা পীরের কাছে ধূপকাঠি জ্বেলে দোয়া দিল, তখন ব্যাপারটা একেবারেই অনুধাবন করতে না পেরে সকলে বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি ক'রে চুপ ক'রে রইল।

দোয়া দেওয়া শেষ হ'লে রিজিয়া আবার পালকিতে চ'ড়ে যে পথে এসেছিলেন সেই পথ দিয়ে ফিরে গেলেন। অশ্বারোহীরা ক্রমে দূরের মাঠবিলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁশবন ছেড়ে বেরিয়ে দলে দলে গিয়ে গঞ্জেইশা পীরের চারিদিক ঘিরে দাঁড়ালো। জ্বলন্ত ধূপকাঠিগুলি থেকে সমাধির উপরে ছাই ঝ'রে পড়েছিল, ধূপের গন্ধে সমগ্র স্থানটি ভরপূর হয়ে উঠেছিল।

অবশেষে একজন মুসলমানের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে এ রহস্যের কিনারা হ'ল। খোর্ধার রাজার যবনী রাণী গঞ্জেইশা পীরস্থানে এসেছিলেন— তাঁর যে হীরাবসানো আংটিটি স্নান করতে গিয়ে গোসল-খানায় হারিয়ে গিয়েছিল গঞ্জেইশার মহিমায় তা ফিরে পাওয়ায় পীরের কাছে এই দোয়া মানা।

গঞ্জেইশা পীরের নামে আবার জয়জয়কার পড়ল।

2

রিজিয়া বেগম দলবল নিয়ে কটকে ফেরার পথে রথীপুরের কাছা-

কাছি হয়েছেন এমন সময়ে আকাশে কালো মেঘ ঝড়ের জটাজুট প'রে পাগল দরবেশের মত মেতে উঠল। অগত্যা রিজিয়া বেগম তাঁর 'লাগুতিগহণ' নিয়ে সে রাতটা রথীপুর গড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। খোর্ধার রাজা রাজা রামচন্দ্রদেবও রথযাত্রার জন্য পুরী যাওয়ার পথে সেইখানে বিশ্রামের জন্য থেমেছিলেন। উভয়ের মিলন তাই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত হওয়ায় অতিশয় মধুময় হয়ে উঠল। ঝড়ে দুটি নীড়হারা পাখীর মত রামচন্দ্রদেব ও রিজিয়া সে রাতে রথীপুর গড়ে আশ্রয় পেলেন।

গবাক্ষপথে কৃষ্ণপঞ্চমীর চাঁদের দিকে চেয়ে রিজিয়া মখমলের বিছানায় দুই হাটুর উপরে চিবুকখানি রেখে ব'সে ছিলেন। রিজিয়ার রহস্যময় অতল চোখ দুটির দিকে চেয়ে রামচন্দ্রদেবের রাত্রিও অতল অতন্দ্র।

রিজিয়ার একান্ত অনুরোধ রথের উপরে জগন্নাথকে একবার দেখাবেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে তার উপায় নেই, তকী খাঁর কড়া হুকুম: গাজীশা পীরের স্থানে দোয়া দিয়ে সোজা কটকে ওয়াপস আসতে হবে। রামচন্দ্রদেবও জানেন রথযাত্রায় এবার নিজের হৃত প্রতিষ্ঠা উদ্ধারের চেষ্টার মধ্যে আবার যদি রিজিয়া বেগম গিয়ে উপস্থিত হন তা হলে নিঃসন্দেহ তা এক বিষময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

সেই বিনিদ্র প্রহরে রিজিয়া রামচন্দ্রদেবকে সতর্ক ক'রে দেবার জন্য সব বললেন— আমিনচাঁদ তকী খাঁর কাছ থেকে কেমন নির্দেশ পেয়েছেন রথযাত্রার পরে জগন্নাথ মন্দির তাঁর নিজের এখ্‌তিয়ারে আনবার, আর সেজন্য কি ভাবে মোগল লশকরদের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে, আমিনচাঁদ কেমন সঙ্গে ফৌজ নিয়ে রথযাত্রা দেখার বাহানায় পুরী অভিমুখে রওনা হয়েছেন— সব কথা।

আকাশ থেকে যে-সব মেঘ কিছুক্ষণ আগে উড়ে গিয়ে ছিল সে-সব যেন ফিরে এসে রামচন্দ্রদেবের আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিল।

সকালে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। রৌদ্রদগ্ধ গৈরিক কঙ্কর-ময় মাটি গত রাত্রির বর্ষণে হয়েছিল স্নিগ্ধ উজ্জ্বল। রিজিয়া অশ্বারোহী পরিবেষ্টিত হয়ে পালকিতে কটক ফিরে গেলেন। রামচন্দ্রদেবও ঘোড়ার পিঠে পুরীর দিকে চললেন। প্রভাত রৌদ্রে কুয়াশা ঢাকা ছায়া দূরের বনশীষের দিকে যেমন ক্রমে অপসৃত হয়ে যায় তেমনি ক'রে গঙ্গুআ নদীর ঝাঁকে রিজিয়ার শিবিকা ক্রমে অন্তর্হিত হয়ে গেল। শেষ অশ্বারোহীর উষ্ণীষ ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না।

রামচন্দ্রদেব একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুরীর পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

সকালের বর্ষাসিক্ত পবনে অগুরু আর আতরের ভীরু সুবাস··· রহস্যময়ী রিজিয়ার স্পর্শ·· দেহে না মনে কোথায় লেগে গিয়েছিল রামচন্দ্রদেব বুঝতে পারছিলেন না। কিন্তু সে-সব ভাববিলাসের সময় তখন রামচন্দ্রদেবের ছিল না। চিন্তাকুল দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে তিনি কেবল আসন্ন সঙ্কটের কথা ভাবছিলেন।

এ বৎসর মোগলের হাঙ্গামা না থাকায়, তার উপরে জগন্নাথের পতিতপাবন হওয়ায়, দূরদূরান্তরের যাত্রীরা কাতার দিয়ে রথযাত্রায় চলেছিল। 'দণ্ডবতী' (দণ্ডিখাটা) যাত্রী থেকে আরম্ভ ক'রে পদচারী তার পর ঘোড়া উট গোরুর গাড়ি ও পালকি প্রভৃতিতে যাত্রীরা বন্যার স্রোতে কাঠিকুটোর মত ভেসে চলেছিল। "জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী

ভবতু মে" প্রভৃতি ভজন থেকে "জলে বিরাজো জগন্নাথ পুরী" ইত্যাদি ছত্রিশগড়ী[1] লোকসংগীত, "চকাডোলা, আজি থকা লাগিলাগি ('চকা-ডোলা', আমি থ'কে গেছি আজ) ইত্যাদি ওড়িয়া 'জণাণ' নানা কণ্ঠে নানা ভাষায় নানা সুরে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছিল। মহাশূন্যের আকাশবেদীর দিকে সংখ্যাহীন প্রাণের আকৃতি আরতির শিখার মত উঠে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

পায়ে-চলা যাত্রীরা ঘোড়সওয়ারদের ঘোড়ার পায়ের তলায় চাপা পড়া বা পশ্চিমা বলদটানা গাড়ির চাকার নীচে পিষে যাওয়ার ভয়ে উঁচু সড়ক ছেড়ে নীচ দিয়ে কেয়াবনের ধারে ধারে সার বেঁধে চলছিল। হাঁটতে হাঁটতে অনেকের পা ফুলে গেছে। কারও কারও পা ফেটে রক্ত পড়ছে তাও হয়তো এক টুকরো নেকড়া জড়িয়ে নিয়েই চলেছে। চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে যারা কাল গাছতলা দেখে ঘুমিয়েছিল, রাত্রির বৃষ্টিতে ভিজে তারা দেখতে হয়েছে ভিজে কাগজের মত। আর কোথাও বা উঠছে ওলাউঠা রোগীর জলের জন্য কাতরানি, কোথাও বা জ্বরের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার শেষ আতনাদ। সঙ্গী লোকেরা ছেড়ে চ'লে গেছে। অচেনা মাটি, অজানা উদাসীন মানুষ, রোদে পোড়া আকাশে পালে পালে চিল শকুন— অপোড়া মাটিতে[2] চোখ বুজলে পথশ্রম সার্থক হ'ত, কিন্তু পূর্বজন্মের কোন পাপের ফলে বুঝি তাও হল না! তবু তীর্থযাত্রার পথের এই রেণুই যথেষ্ট, কপালে তাই মাখতে মৃত্যু-শীতল হাত অবশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। যারা কোনো মতে বেঁচে থাকে, জীবন্ত শ্মশানের সেই শবশয্যা থেকে উঠে ক্লান্ত দেহ টানতে

1. ছত্রিশগড়— এই অঞ্চলটি বর্তমান মধ্য-প্রদেশের অন্তর্গত।

2. অপোড়া মাটি— পুরীক্ষেত্র ; এখানে শব দাহ করা হ'ত না, স্বর্গদ্বারে নিক্ষিপ্ত হ'ত, জোয়ারের জলে সমুদ্রের গর্ভসাৎ হ'ত।

টানতে দুর্বল পদে তারা আবার সামনের দিকে পা বাড়ায়। তার সেই পদক্ষেপে এই কথাই ফুটে ওঠে যেন: জগন্নাথ, তোমার জয় হোক, একটা কালরাত্রি কেটে গেল। বেদনার, বিষাদের, অবসাদের, আর মৃত্যুঞ্জয়ী আশা ও বিশ্বাসের এমন বিচিত্র মিছিল রামচন্দ্রদেব আর কখনও দেখেন নি।

মানুষ তো সংকটের শঙ্কায় সংকুচিত পলাতক বন্য পশু নয়, মৃত্যু তার পিণ্ডকে ধ্বংস করতে পারে, আত্মাকে নয়। তার আত্মা অজেয়।

রামচন্দ্রদেবের মন হতে ভয় ও আশঙ্কার পুঞ্জমেঘ কেটে গেল। অভয়ের রৌদ্রালোকে তাঁর মন উদ্দীপ্ত হয় উঠল।

কটকের দিক থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিল প্রায় শতাধিক মোগল ঘোড়সওয়ার। তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য রামচন্দ্রদেব একটি ঝাঁকড়া বটগাছের আড়ালে চ'লে এলেন।

পায়ে-চলা যাত্রীদের মধ্যে একটি যুবতী তখন তার সঙ্গীদের খানিক পিছনে প'ড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ ঘোড়সওয়াররা এসে পড়ায় সে ভয়ে সড়কের ঢালু ধার দিয়ে দৌড়ে নীচে নামতে যাবে এমন সময়ে একজন ঘোড়সওয়ার তার রঙিন শাড়ীর আঁচলটি টেনে ধরায় অকস্মাৎ প্রবল ঝটকানি খেয়ে সে পড়তে পড়তে দাঁড়িয়ে থেকে গেল। অশ্বারোহীর চোখে হিংস্র লালসার বহ্নি। যুবতীর ভীত আর্তনাদে তাদের মধ্যে অশ্লীল পরিহাসের হাস্যরোল উঠল। তার অনাবৃত বক্ষের উপরে জোড়া জোড়া ক্ষুধিত চক্ষু নিবদ্ধ। ব্যাধভীতা হরিণীর চক্ষুর মত তার দুটি চোখে অসহায় আকৃতি। রামচন্দ্রদেব অশ্বারোহীদের উপর লম্ফ দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এমন সময়ে পিছন থেকে মেঘের ডাকের মত গর্জন শোনা গেল— "হোশিয়ার—।"

অশ্বারোহীরা পিছন ফিরে চেয়ে দেখল একটি কালো ঘোড়ার পিঠে

স্বয়ং আমিনচাঁদ। অপ্রস্তুত হয়ে তারা যুবতীকে ছেড়ে দিল, সেও সড়কের নীচে নেমে তার সঙ্গীদের কাছে ছুটে পালাল। ঘোড়সওয়াররা সেখান থেকে যাওয়া অবধি আমিনচাঁদ লাগাম ক'ষে সেইখানে ঘোড়ার পিঠে ব'সে রইলেন।

ক্রমে দূরে সড়কের নীচে কেয়াবনের আড়ালে যাত্রীরা অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘোড়সওয়ারেরাও জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে সড়কের বাঁকে লাল ধুলোর ঘূর্ণি উড়িয়ে চ'লে গেল। আমিনচাঁদ লাগামে ঢিল দিয়ে ঘোড়ার পেটে জুতাপরা পায়ের গুঁতো দিতেই ঘোড়া কদম ফেলে চলতে শুরু করল। বটগাছের আড়াল থেকে ঘোড়ার পিঠে রামচন্দ্রদেব হঠাৎ রাস্তার উপরে উঠে এলেন। আমিনচাঁদ তাঁর দিকে ফিরে চাওয়ার আগেই তিনি আমিনচাঁদের ঘোড়ার লাগামটা বাঁ হাতে টেনে ধরায় ঘোড়া হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, আমিনচাঁদ সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে টাল সামলালেন।

রামচন্দ্রদেবকে অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে দেখে আমিনচাঁদ সশ্লেষে সম্বর্ধনা জানালেন, "সেলাম আলায়কুম।"

রামচন্দ্র শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে উত্তর দিলেন "জয় জগন্নাথ"।

আমিনচাঁদ বললেন, "আপনি একা একা কোথায় চলেছেন, নবাব সাহেব?" মুগুনি পাথরে গড়া সুরক্ষিত ঋজু মূর্তির মত রামচন্দ্রদেব হাতে লাগাম নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসেছিলেন। তার মুখের রেখাগুলি তখন কঠিন ও কঠোর, চক্ষু ভাবব্যঞ্জনাহীন, ছাইয়ের নীচে দপ দপ ক'রে জ্বলতে থাকা অঙ্গারের মত।

তিনি উত্তর দিলেন, "আমি পুরী যাচ্ছি।"

"রথযাত্রা উপলক্ষে নিশ্চয়?"

"জগন্নাথের রাজসেবকরূপে খোর্ধার মহারাজাদের রথযাত্রায় একটি

বিশেষ ভূমিকা আছে হিন্দু হয়ে আপনি তা নিশ্চয়ই জানেন।"

আমিনচাঁদ বললেন, "কিন্তু আপনি যে ধর্মচ্যুত পতিত হয়ে গেছেন, নবাব সাহেব। জগন্নাথের কাছে আপনি অস্পৃশ্য।"

রামচন্দ্রদেবের মুখের রেখাগুলি আরো কঠিন হ'ল। তিনি উত্তর দিলেন, "জগন্নাথের কাছে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সালবেগের মত যবনরাও শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে জগন্নাথের করুণা লাভ করতে যেমন সমর্থ হয়েছেন, জাহাঙ্গীর বাদশার আমলের কেশোদাস মারুর মত হিন্দু ফৌজদাররাও তেমনি জগন্নাথের উপর হাত তুলে ইহকালে ও পরকালে ঘোর অভিশপ্ত হয়েছেন।— কিন্তু আপনি হঠাৎ কোন্‌দিকে কী অভিপ্রায়ে যাত্রা করেছেন, রাজা আমিনচাঁদ?"

আমিনচাঁদ হঠাৎ কোনো উত্তর দিলেন না। তারপর তাঁর চৌকা মুখের গালপাট্টার উপরে বাঁ হাতের করপৃষ্ঠ বারকয়েক বুলিয়ে অবজ্ঞাভরে বললেন, "মোগলবন্দিতে মোগল সরকারের কর্মচারীদের গতিবিধি কি খোর্ধার রাজার অনুমতিসাপেক্ষ হবে? আমিও চলেছি পুরীর রথযাত্রা দেখতে।"

"আর সঙ্গে এই লশকররা? আপনার দেহরক্ষী হিসাবেই নিশ্চয়?"

আমিনচাঁদ এগোবার উপক্রম ক'রে বললেন, "আপনার অনুমান যথার্থ, নবাব সাহেব; যথাসময়ে সব জানবেন।"

রামচন্দ্রদেব আমিনচাঁদের ঘোড়ার লাগাম পিছন থেকে ধ'রে টেনে বললেন, "আপনি জানেন, রাজাসাহেব, আকবর বাদশার সময় থেকে জগন্নাথ সড়কে তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকবে ব'লে রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয়ে এসেছে। বঙ্গ-বিহার-ওড়িশা সুবার সুবাদার উদারপন্থী সুজা খাঁ বাহাদুরও সে প্রতিশ্রুতি যাতে সম্পূর্ণভাবে পালিত হয় সেজন্য সড়কের স্থানে স্থানে চৌকি বসিয়েছিলেন।

কিন্তু অল্পক্ষণ পূর্বে আপনার লশকররা একটি অসহায়া যাত্রিণীর উপরে যে অত্যাচার করতে উদ্যত হয়েছিল তা কি সেই প্রতিশ্রুতি পালনের পরিচয় ? তা ছাড়া ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে জিজিয়ার ইজারাদারদের জুলুমে যাত্রীরা পুরী জগন্নাথ দর্শনে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশেষতঃ আপনার মত নিষ্ঠাবান হিন্দু রাজপুরুষের চোখের সামনে যে এ-সব ঘটে যাচ্ছে তা আমাদের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে ?"

আমিনচাঁদের হিন্দুত্বের প্রতি রামচন্দ্রদেবের প্রচ্ছন্ন আক্ষেপে আমিনচাঁদ কিঞ্চিৎ রুষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "আপনি তো তুচ্ছ আত্ম-রক্ষার জন্য ধর্ম ত্যাগ ক'রে মুসলমান হয়েছেন, এখন হিন্দু যাত্রীদের জন্য আপনার এত শিরঃপীড়া কেন ?"

রামচন্দ্রদেবের ওষ্ঠে বিষণ্ণ হাসির একটি বেদনাকুঞ্চিত রেখা ফুটে উঠল। বললেন, "এ রকম জুলুম মুসলমান তীর্থযাত্রীদের উপর হলেও আমি তার প্রতিবাদ করতাম। সংকীর্ণ ধর্মধারণার ঊর্ধ্বে সংস্কারমুক্ত মানুষের আরাধ্য দেবতা যে জগন্নাথ, তাঁর তীর্থযাত্রীরাও প্রত্যেকে এক-একটি মহাতীর্থ, তাদের উপরে এ জুলুম আল্লাতালাও ক্ষমা করবেন না।"

আমিনচাঁদের দুই চোখ বন্য পশুর হিংস্র চক্ষুর মত জ্বলে উঠল। কটিলম্বিত তলোয়ারের মুঠিতে হাত রেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি এইজন্য আমার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ দাবি করেন, নবাব হাফিজ্ কাদের্ সাহেব ?"

রামচন্দ্রদেব হাতের মুঠা থেকে আমিনচাঁদের ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে বললেন, "না, সে কৈফিয় আপনার মত লোকের কাছে আমি আশা করি না। সে কৈফিয়ৎ হয়তো স্বয়ং নায়েব-নাজিম তকী খাঁকে একদিন অন্যত্র দিতে হবে। কিন্তু রাজা আমিনচাঁদ, আমি তো আপনার চোখে ধর্মচ্যুত, অথচ হিন্দুস্থানে হিন্দুই আজ হিন্দুর তথা

হিন্দুধর্মের ঘোর শত্রু। হিন্দুস্থানে আজ তাই সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া মহত্তর জাতীয়তার কোনো লক্ষণ নেই, কিংবা বৃহত্তর আদর্শবাদের কোনো নিদর্শন নেই। যান এবার রাজা আমিনচাঁদ, আমায় কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন নেই। পারেন যদি, সে কৈফিয়ৎ আপনার নিজের বিবেককে দেবেন, ইতিহাসকে দেবেন।"

আমিনচাঁদ রামচন্দ্রদেবের দিকে নির্বাক্ ক্রোধে একবার তাকিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। তাঁর দুই চোখের প্রজ্বলিত দৃষ্টিতে কেবল ফুটে উঠল যেন এক সতর্কবাণী : কৈফিয়ৎ দেবার জন্য তুমিই বরং প্রস্তুত থাকো, অপরিণামদর্শী হাফিজ্ কাদ্‌র্।

কয় হাত দূরে বটগাছের ঝুড়িগুলি রাস্তার উপরে ঝুলে পড়েছিল। আমিনচাঁদ সেখানে একবার থেমে পিছন ফিরে চেয়ে দেখলেন, রামচন্দ্র-দেব তখনও ঘোড়ার পিঠে স্থাণুমূর্তির মত নিশ্চল। তার পরে কোষ হ'তে তরবারি উন্মোচন ক'রে এক আঘাতে কয়েকটি ঝুরি খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেললেন।

রামচন্দ্রদেবের নিকট হ'তে অদূরে কেয়াঝোপে কোনো তীর্থযাত্রীর শব প'ড়ে ছিল। কয়েকটি শকুন চক্রাকারে উড়তে উড়তে তার উপরে নেমে আসছিল। রামচন্দ্র ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তরবারির আঘাতে নিমেষে কয়েকটা শকুনকে দুই টুকরো ক'রে ফেললেন। তাদের দেহ থেকে মাথা ও ডানা আলাদা হয়ে কবন্ধগুলি শীতল শবদেহের উপর লুটিয়ে পড়ল। অন্য শকুনগুলি চীৎকার ক'রে উড়ে পালিয়ে গেল। শকুনের কবন্ধগুলির রক্তের পিচকারিতে শবদেহ লাল হয়ে গেল। কেয়াঝোপের মধ্যে রামচন্দ্রদেবের অলক্ষিতে একটি শেয়াল সেই রক্তাক্ত শবের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে অপেক্ষা ক'রে ছিল।

রামচন্দ্রদেবের মাথায় রক্ত চড়েছিল। তিনি অকারণ উত্তেজনায়

অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন। সেই শব্দে শেয়াল ঝোপের ভিতর লুকাল।

রামচন্দ্রদেব প্রমত্ত উল্কার মত পুরীর পথে ঘোড়া ছুটিয়ে আমিনচাঁদকে অতিক্রম ক'রে চ'লে গেলেন।

3

আমিনচাঁদ গুনে দেখলেন হাতে আর মোটে দুই দিন সময় আছে। আজ 'অণসর' দ্বাদশী। পরশু নবযৌবন দর্শন। তার পর আষাঢ় শুক্লদ্বিতীয়ায় শ্রীগুণ্ডিচা।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের নায়েবিব জন্য আমিনচাঁদ পুরীতে পৌঁছনোর দিন থেকে তাঁর চেষ্টা রামচন্দ্রদেবকে এবার কী ক'রে 'গুণ্ডিচা'য় 'ছেরাপহঁরা' প্রভৃতি রাজসেবা থেকে বঞ্চিত করা যায। আমিনচাঁদের আশঙ্কা, রামচন্দ্রদেব রথযাত্রার সময়ে যদি নির্বিঘ্নে 'ছেরাপহঁরা' 'নীতি' সম্পন্ন করতে পারেন তা হ'লে তাঁর 'চলন্তি-বিষ্ণু'ত্ব ওডিশায় জনমানসে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। পাইক, দুর্গপতি, সামন্ত তথা ওড়িশার সমগ্র জনতা আবার তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত হয়ে পড়বে। রাজসেবার অবকাশে রামচন্দ্রদেবের নিকটে উপস্থিত থাকবার জন্য আঠারো 'গড়জাতে'র সামন্ত রাজারা তাঁদের দলবল নিয়ে এসে পৌঁছে গেছেন। মোগলবন্দির বহু জমিদার এবং হরিপুর ও ময়ূরভঞ্জের ভঞ্জ রাজারাও পরম্পরাগত বিধি অনুসারে রথযাত্রার সময়ে রামচন্দ্রদেবের কাছে থেকে ছত্র চামর প্রভৃতি ধরবার জন্য এসে পৌঁচেছেন।

ওড়িশার এই রাজনৈতিক ঐক্যকে দ্বিধাক্রান্ত করবার জন্য তকী খাঁ যত কূটকৌশল প্রয়োগ ক'রে আসছিলেন সে-সব নদীর স্রোতে বালির বাঁধের মত এমনিভাবে দেখতে দেখতে ধ্বংস পড়েছে। আমিন-

চাঁদ তকী খাঁর দ্বারা প্রেরিত হয়েছেন, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের নায়েবরূপে এরই প্রতিরোধের জন্য। যদি কোনো উপায়ে ধর্মচ্যুতি কারণে রামচন্দ্রদেব পরম্পরাগত সেবাবিধি থেকে বঞ্চিত হন ও তাঁর পরিবর্তে রাজপ্রতিনিধি আমিনচাঁদ সে-সকল বিধি সম্পন্ন করতে পারেন, তা হলে তকী খাঁর উদ্দেশ্য যে কেবল সফল হ'তে পারে তা নয়, কটক থেকে মুর্শিদাবাদ এমন-কি দিল্লী দরবার পর্যন্তও আমিনচাঁদের নামে জয়জয়কার পড়ে যাবে। সেই সুবাদে কটক-সরকারে আমিনচাঁদের পদটা যে আরো হাত কয়েক উঁচুতে উঠে পড়তে পারে তাই বা অসম্ভব কি?

কেবল, জগন্নাথ হঠাৎ পতিতপাবনরূপে "ম্লেচ্ছ" রামচন্দ্রদেবের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন এই দোহাই দিয়ে মুক্তিমণ্ডপ সভার 'শাসনী' ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সমগ্র ভারতের ব্রহ্মচারিগণ রাজা 'ছেরাপহঁরা' করতে পারবেন ব'লে যেরকম সিদ্ধান্ত দিলেন তাতে আমিনচাঁদের আশা-শকটটি হঠাৎ উলটে প'ড়ে গেল।

সেইজন্য পুরীতে পৌঁছে অবধি তিনি 'বড় পরিছা' গৌরীরাজগুরুর সঙ্গে মন্ত্রণায় নিযুক্ত আছেন— কী উপায়ে রাজা রামচন্দ্রদেবকে মুক্তিমণ্ডপের সিদ্ধান্ত সত্ত্বে পরম্পরাগত রাজসেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায়। গৌরীরাজগুরু এ কাজে সহায়তা করতে পারলে তাঁকে চিলিকার তীরবর্তী অন্ধারী পরগণাটি ইনাম মিলবে ব'লে আমিনচাঁদ আশাও দিয়েছেন। কিন্তু মুক্তিমণ্ডপের সিদ্ধান্ত বড় পরিছার নির্দেশে বদলাবার নয়। তা ছাড়া বড় পরিছার পদ ও পদবী রাজার অনুগ্রহ সাপেক্ষ। তাই অন্ধারী-পরগণাপ্রাপ্তির প্রলোভন সত্ত্বে গৌরীরাজগুরু এ বিষয়ে বিশেষ কিছু করতে পারছিলেন না। তবু শ্রীমন্দিরের কোনো কোনো সেবককে ধরে আমিনচাঁদ ও গৌরীরাজগুরু রথযাত্রার আগেই সমস্ত ব্যাপারটার হাল ঘোরানোর শেষ

চেষ্টা থেকে বিরত ছিলেন না।

'অণসর' দ্বাদশীর দিনে 'দইতা', 'পতি মহাপাত্র', 'স্বাই মহাপাত্র', 'তলিছো মহাপাত্র', 'তঢ়াউ পটুনায়ক' ও 'দেউলকরণ' প্রভৃতি সেবকেরা সবাই রাজার ছোঁয়া শাড়ী পাওয়ার পরে শ্রীগুণ্ডিচার বিভিন্ন সেবার শুভারম্ভ হয়। এই উপলক্ষে সেবকেরা যদি ম্লেচ্ছ যবনধর্মী রাজার ছোঁয়া শাড়ী গ্রহণ করতে সরাসরি অস্বীকার করেন তা হ'লে মুক্তি-মণ্ডপের সিদ্ধান্ত অকেজো হয়ে পড়বে। দইতা ও পতি মহাপাত্র প্রমুখ সেবকেরা হলেন জগন্নাথের আদি সেবক। স্নানপূর্ণিমা থেকে গুণ্ডিচা বা রথযাত্রার শেষ পর্যন্ত শ্রীজগন্নাথের সমস্ত বিধির বিধায়ক তাঁরাই। সেখানে মুক্তিমণ্ডপের কোনো কর্তৃত্ব খাটে না। তাঁরা যদি আসল সময়টিতে বেঁকে বসেন মুক্তিমণ্ডপের সভার সিদ্ধান্ত সেখানে খাটবে না। সেইজন্য পতি মহাপাত্র ষেণ্ড(-অ) শুআর(-অ) হয়েছেন আমিনচাঁদের হাতের যন্ত্রস্বরূপ। এ বাবদে ষেণ্ড শুআর অগ্রিম বায়নাও কিছু পেয়ে গেছেন।

দ্বাদশীর মণ্ডপ-ভোগ 'অণসর-তাটি'র[1] আড়ালে সম্পন্ন হয়ে গেছে। এর পরে দক্ষিণ দুয়ার 'লণ্ডাবর্তে'র উপর থেকে রুপার থালায় রাজ-প্রসাদ ও পাটের ডোর নিয়ে সেবকেরা 'শ্রীনবরে'[2] যাবেন। সেইখানে রাজার ছোঁয়া শাড়ী সেবকদের দিতে যাওয়ার সময়ে তাঁরা যাতে তা প্রত্যাখ্যান করেন সে ভার পতি মহাপাত্র ষেণ্ড শুয়ার নিয়েছেন। তার সময়ও প্রায় হয়ে এসেছে, সেইজন্য আমিনচাঁদ ব্যস্ত হয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণে ষেণ্ড শুআরকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

1. অণসর-তাটি— 'অণসরে'র পনেরো দিন জগন্নাথ যে তাটি বা টাটির অন্তরালে অবস্থান করেন।

2. শ্রীনবর — রাজবাটি।

'মাজণা মণ্ডপে'[1] এক বৃদ্ধা যাত্রিণী ও তাঁর সঙ্গে কয়েকটি বিধবাকে নিয়ে দুই দল সেবকের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়েছিল। এখানে প্রতি বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীর 'মাজণা' হয়ে থাকে। রুক্মিণী-বিবাহ উৎসবও এইখানে সম্পন্ন হয়। সহস্র কুম্ভাভিষেকের স্থানও এইটি। সেইজন্য এইখানে যাত্রীদের 'অর্জনে'[2] বহু সেবকের ভাগ থাকে। 'লক্ষ্মীমাজণা'তে ভেটের কড়ি নেন 'মহাজনে'রা[3], পূজার দক্ষিণা যায় 'পূজা-পণ্ডা'দের[3] ভাগে, রুক্মিণী-বিবাহের সময়ে যাত্রীরা যা ভেট দেয় তাও ভাগাভাগি হয় মহাজন ও পূজাপণ্ডাদের মধ্যে, সহস্রকুম্ভের ভেট নেন পতি মহাপাত্রেরা। এই বিধি আবহমানকাল থেকে চ'লে আসছে। সেই জন্য অধিকাংশ দিন এইখানে যাত্রীদের দেওয়া ভেটের কড়ির ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে বিভিন্ন সেবকদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বাধে। বিশেষতঃ রথযাত্রার সময়ে যাত্রীদের দেওয়া ভেটের উপরে জোর যার মুলুক তার নীতি চলে।

একদল বিদেশী যাত্রিণীদের পূজা-পণ্ডা নিয়োগের বলিআ পূজা-পণ্ডা 'মাজণা মণ্ডপ' দেখিয়ে সেখানে মানত করলে সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, লক্ষ্মীঠাকুরাণীর মাজণার জন্য কড়ি দিলে স্বয়ং জগন্নাথ তুষ্ট হন ইত্যাদি নানা তথ্য বিকৃত পশ্চিমা বুলিতে বোঝাতে বোঝাতে চলেছিল। মাজনা-মণ্ডপের মহত্ত্ব বুঝবার পর যাত্রিণীরা আঁচলের গিঁট থেকে তাম্রমুদ্রা ও কড়ি বার ক'রে সাধ্যমত আপন আপন ভেট নিবেদন

1. মাজণা মণ্ডপ(-অ)— লক্ষ্মীর গাত্রমার্জনা বা স্নানের মণ্ডপ।

2. অর্জন— যাত্রীদের নিকট হ'তে সেবকেরা দক্ষিণা ইত্যাদি হিসাবে যা অর্জন করেন।

3. মহাজন নিয়োগ ও পূজা-পণ্ডা নিযোগ— পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দুই বিভিন্ন নিয়োগ অর্থাৎ সেবক সম্প্রদায়।

করলে। কিন্তু ভেটের পরিমাণ যাত্রিণীদের আপাত সচ্ছলতার অনুপাতে হল না। এক যাত্রিণীর হাতের ডানা ধ'রে দাম(-অ) শুআর(-অ) ভাংখোর গলায় চেঁচিয়ে উঠল— "এ মায়ী, লক্ষ্মী-ঠাকুরাণীকে ভিক্ষে দিচ্ছ নাকি গো! ফেল ফেল, রুপোর জাহাঙ্গিরী টঙ্কাও তো একটা দাও!"

বাহুমূলে অপরিচিত হাতের রূঢ় স্পর্শে যাত্রিণী চমকে উঠে অস্বস্তিকর শিহরণে কয় পা পিছিয়ে গেল। তাতে দাম শুআর সমেত আর যত সেবক ও পাণ্ডারা ঘিরে দাঁড়িয়েছিল সকলে দন্তবিকাশপূর্বক সশব্দে হেসে উঠল। যাত্রিণীদের মধ্যে যারা যুবতীবয়স্কা, ভেট আদায়ের ছলে একদল তাদের সঙ্গে এক উৎকট রসিকতাও শুরু করেছিল। কিন্তু এরা বলিআ পূজা-পণ্ডার যাত্রী। তাদের কোমরের গেঁজের মধ্যে যে টাকা ছিল না তা নয়, কিন্তু এখানেই যদি তার একটা মোটা অংশ এই ভাবে ভেট দিতেই চলে যায় তা হ'লে তাঁর ভাগে পাওনা সেই পরিমাণে কমে যাবে সন্দেহ নাই। এমনিতেই কোনও কারণে 'মহাজন নিয়োগে'র দাম শুআরের সঙ্গে বলিআ পূজা-পণ্ডার সম্পর্কটা ছিল অতিশয় তিক্ত। দু'জনেই বড়ো পালোয়ান। দুই জনেই দেখতে লোহায় ঢালাই দুটি নিরেট মূর্তির মত। বলিআ পণ্ডা তার থলথলে পেটের তলায় কোমরের গেরুয়া গামছাখানা ক'ষে দাম শুআরের হাতের ডানা ধ'রে হেঁচকা টান দিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল— "আমার যাত্রীর গায়ে হাত দেবার তুই ভণা[1] কে রে?"

তার এই আস্ফালনে দাম শুআর দেহের মাংসপেশী ফুলিয়ে নেড়া মাথায় টিকির গোছার গিঁঠটি দুলিয়ে যাত্রিণীর হাত আরো কঠিন মুষ্টিতে ধরে খেঁকিয়ে উঠল—"তুই তো একটা ফালতো কোথাকার,

1. ভণা— পূবী অঞ্চলের অশিষ্ট সম্বোধন, অর্থ ভানকারী, নেকা।

তোর আবার যাত্রী কি রে ভণ্ড ?"

এই দুইজনের রণ-প্রস্তুতির মধ্যে যাত্রিণীরা আতংকিত হয়ে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল। আমিনচাঁদ অদূরে দাঁড়িয়ে এই গ্লানিকর দৃশ্য দেখছিলেন। তকী খাঁর দ্বারা প্রেরিত হয়ে তিনি স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য জগন্নাথের পুণ্যপীঠ যবনের ম্লেচ্ছ প্রভাবে কলুষিত করতে এসেছিলেন সত্য, কিন্তু জগন্নাথের সেবকেরা জগন্নাথের দর্শনাভিলাষী এই নিঃসহায় যাত্রিণীদের নিয়ে যে কুৎসিত কলহ আরম্ভ করছিল তা আমিনচাঁদকেও ক্রোধে ক্ষিপ্ত ক'রে তুলেছিল।

তাঁর দৃষ্টি হঠাৎ যাত্রিণীদের দিকে আকৃষ্ট হ'ল। তাদের পশ্চিমা বুলি ও চাল-চলনে তারা আমিনচাঁদের অঞ্চলের লোক ব'লে স্পষ্টই মনে হচ্ছিল। আমিনচাঁদ হঠাৎ সেবকদের উপর লম্ফ দিয়ে গর্জন ক'রে উঠলেন—"তফাৎ হো !"

আমিনচাঁদের হঠাৎ এই প্রচণ্ড আবির্ভাবে সেবকপাণ্ডারা যাত্রিণী-দের কাছ থেকে স'রে দাঁড়াল। সেই অবসরে যাত্রিণীরা কল্পবটের নীচে অসহায়ভাবে অপেক্ষমানা তাদের তীর্থসঙ্গীদের কাছে ছুটে পালাল।

দাম শুআর তার হাতের মুঠো থেকে যাত্রী ফসকে যাওয়ায় আমিন-চাঁদের উপরে তার সব ঝাল ঝেড়ে চীৎকার ক'রে উঠল—"তুই আবার কেটা রে এখানে ? এ কি মুসলমান নায়েব-নাজিমের পাত চাটার জায়গা নাকি রে যে লাল চোখ দেখাবি ? এ 'কালিআ বলিআরভুজ'র আস্থান জানিস্ ?"

তার আকস্মিক উগ্রতায় আমিনচাঁদ সংকুচিত হয়ে দুই পা হটে গেলেন। দাম শুআরের মূর্তি দেখে আর এগতে তাঁর সাহসে হঠাৎ কুলাল না।

দাম শুআর ও বলিআ পূজা-পণ্ডার মামুলি কোঁদলের মধ্যে তকী

খাঁর নায়েব আমিনচাঁদ এসে পড়ায় ব্যাপারটা আরো উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। আরো অনেক সেবক রথযাত্রার বিধির নানা কাজে এসে এই দৃশ্য দেখতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আমিনচাঁদ একজন মনসব্‌দার পদবীধারী। তার উপর আবার খোদ নায়েব-নাজিম তকী খাঁ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রকে শায়েস্তা করতে। মন্দিরের পাণ্ডারা তাঁকে এইভাবে তাচ্ছিল্য ও তিরস্কার করবে এ তাঁর পক্ষে বেবরদাস্ত হয়ে উঠেছিল। সুজনীর ভিতর থেকে একখানি ছুরি বার ক'রে তিনি তেড়ে এলেন দাম শুআরের দিকে।

দাম(-অ) শুয়ার(-অ) কিন্তু এতে ভয় পাবার পাত্র নয়। বিজয়ার নেশা তো তার সপ্তমে চড়েই ছিল, তায় আবার নানা আখড়ার মাটি মেখে শরীরও তার লোহার মত কঠিন, মজবুত। সেও আমিনচাঁদের দিকে তেড়ে এসে চেঁচিয়ে উঠল—"বাছা বিছের মন্ত্র না জেনে কাল-নাগের লেজে হাত দেয় যে রে! এ কি নায়েব-নাজিমের দরবার রে 'ভণা' যে তেজ দেখাবি? এ 'বলিআরভুজ'র 'শ্রীবৎস খণ্ডাশাল' দেউল। এখানে কারো লাল চোখ দেখানো চলবে না রে 'ভণা'। আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন!"

দাম শুআর কোমরের গামছাটা আর-একবার ক'যে নিয়ে ভর হওয়া মানুষের মত নাচতে লাফাতে লাগল। অন্যান্য পাণ্ডা আর সেবায়েতরা নিজেদের মধ্যে টিপ্পনী কাটতে লাগল—"এই মুসলমানের পাত-চাটা নাকি আবার পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের দেওয়ান হবে। আরে যাঃ, যার কর্ম তারে সাজে অন্য জনে লাঠি বাজে!"

এমন সময়ে গোলমাল শুনে 'বড় পরিছা' গৌরী রাজগুরু সোনার ছড়ি হাতে নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আমিনচাঁদকে সে অবস্থায় সেখানে দেখে তাঁর হাতের ডানা টেনে ধ'রে বললেন, "আপনি

এখানে কেন, রাজা আমিনচাঁদ ? সেবকদের এমন অনর্থক ক্ষেপিয়ে দিলে আপনার উদ্দেশ্যসিদ্ধিতেই বাধা ঘটবে জেনে রাখুন।"

বড় পরিছাকে দেখে তলিছো মহাপাত্রের যেন চৈতন্য হ'ল, চেঁচিয়ে সবাইকে বললেন, "যাও যাও, ওদিকে দ্বাদশীর বিধির বিলম্ব হয়ে গেল। হো আস্থান প্রতিহারী ভেলি বড়ু, আজ কি আর 'পাহাড়া'[1] পাতা হবে না ? থালা শ্রীনবরে যাবে আর কখন ?"

তখন সব সেবকেরা 'মাজণা মণ্ডপ' ছেড়ে যে যার কাজে এদিকে ওদিকে চ'লে গেল।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে এ-প্রকার দৃশ্য অসাধারণ কিছু নয়, যাত্রা উৎসবের সময় এমনটা প্রায় রোজই লেগে থাকে।

আমিনচাঁদ ঈষৎ অপ্রতিভ কণ্ঠে কৈফিয়ৎ দিলেন, "ষেণ্ঢ শুআরকে খুঁজতে খুঁজতেই তো এখানে এসে পড়েছিলাম।"

গৌরী রাজগুরু তাঁর কানে কানে বললেন, "সে এখন 'মেরদা রোষ'(-অ)[2] নয় তো 'সর-ঘরে' ঘুমাচ্ছে হয়তো, দেখুন গিয়ে। এই পথ দিয়ে সোজা চ'লে যান।"

আমিনচাঁদ প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকে 'মেরদা-রোষে'র ষেণ্ঢ শুআরকে খুঁজতে চ'লে গেলেন। গৌরী রাজগুরু পিছন থেকে ডেকে বললেন, "ওকে শীঘ্র শীঘ্র পাঠাবেন, 'পাহাড়া'র উপরে থালা বসানোর সময় হয়ে গেল।"

দক্ষিণের প্রাচীরের গায়ে 'মেরদা রোষ' ও 'সর-ঘরে'র সারি। এ-সব সারা বছর এমনিই প'ড়ে থাকে। মন্দিরের 'রোষ-ঘর'

1. পাহাডা— বস্ত্রবিশেষ, যার উপরে রাজপ্রসাদের থালা রাখা হয়।
2. মেরদা রোষ(-অ)— মৃত্তিকা-নির্মিত অস্থায়ী রসুইশাল।

(রসুইশাল) মেরামতের সময়ে কেবল এই ঘরগুলি অস্থায়ীভাবে ব্যবহার হয়। তাই এগুলি অস্থায়ী রীতিতেই তৈরি। যেণ্ড শুআর খাজনা দিয়ে পরিছার কাছ থেকে এ ঘরটি নিজে ব্যবহারের জন্য পেয়েছেন। নিজের কোনো বিশিষ্ট যজমান বা যাত্রী এলে যেণ্ড শুআর তাদের এই ঘরে এনে রাখেন। ঘরের ভিতরটা গুহার মত অন্ধকার। দক্ষিণ দিকের তেলচিটা দেওয়ালের গায়ে মহাবীর হনুমানের সিন্দুর-চর্চিত মূর্তি। কিন্তু এই মহাবীরের কোনো নির্দিষ্ট পূজাবিধি নেই। যেদিন মহাবীরের প্রতি ভক্তি হঠাৎ উথলে ওঠে সেদিন যেণ্ড শুআর ফুল এনে জল ছিটিয়ে মহাবীরের পূজা করেন। নইলে প্রত্যহ ভাং ঘোঁটার সময় প্রথম নৈবেদ্য থেকে ফোঁটাকয়েক ক'রে পেয়েই মহাবীর সন্তুষ্ট হয়ে যেণ্ড শুআরের বৃদ্ধির উপরে নজর রেখে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেন।

সেই 'মেরদা-রোষে'র মাঝের কুঠরিতে যেণ্ড শুআর মাথায় একটি নাগেশ্বরের মালা জড়িয়ে ভাঙের নেশায় চার হাত-পা মেলে নারকেল পাতায় বোনা মাদু'রের উপরে অচেতন হয়ে প'ড়ে নাক ডাকাচ্ছিলেন। মেঝের উপরে ভাং ঘোঁটার বড় থল আর নুড়ি প'ড়ে ছিল। অন্ন মহাপ্রসাদের একটা খালি 'কুড়ুআ' আর একটি ডালের কুড়ুআর ভাঙা খাপরা প'ড়ে রয়েছে, তাতে অগনতি মাছি। মাছিগুলি যেণ্ড শুআরের দুই গাল বেয়ে গড়িয়ে-পড়া মুখামৃতের কাছে বার বার উড়ে আসছে।

পরিছার তাড়ায় ইতিমধ্যে দক্ষিণদ্বার 'সপ্তাবর্তে'র উপরে 'পাহাড়া' বিছানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ঘন্টা পেটার শব্দে যেণ্ড শুআরের চোখ ক্রমশ খুলে আসছিল। আজ অবশ্য মন্দিরে তাঁর পালা নয়, কেবল আমিনচাঁদের কার্যসাধনের জন্যই তিনি মন্দিরে এসেছিলেন। দ্বাদশীর থালা বসার অপেক্ষায় প'ড়ে থেকে থেকে

ভাঙের মৌজে চোখদুটো কখন লেগে গিয়েছিল তাঁর হুঁশ ছিল না।

ঘণ্টার শব্দে ঘুম ভাঙতে সে সময়টা দিনের কোন প্রহর তিনি ঠিক খেয়াল করতে তিনি পারছিলেন না, আর তেমনি তিনি স্বর্গ মর্ত অথবা পাতাল কোথায় আছেন তাও ঠাউরে উঠতে পারছিলেন না। মহাবীরের সিন্দূরলিপ্ত মূর্তি থেকেই অবশেষে তিনি অতি ক্ষীণভাবে ইহলোকে নিজের অস্তিত্ব ক্রমে অনুমান করছিলেন। আজ সকালে সিদ্ধির রেষারেষিতে ভাঙে ধুতুরার সঙ্গে সিদ্ধির কচি পাতার পরিমাণটা যেমন বেড়েছিল তেমনি আবার গোখরোর বিষও ফোঁটা-কয়েক তাতে মিশেছিল। তাই 'পাচন'টা আজ অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু বেশী কড়া হয়ে গিয়েছিল। ঘুম তাঁর ভেঙেছিল বটে কিন্তু নেশা তখনও কাটে নি। তিনি আস্তে উঠে বসার চেস্টা করছিলেন। কিন্তু মাথাটা অস্বাভাবিক ভারী লাগায় উঠতে পারছিলেন না। দুই-তিনটি হাই তুলে তুড়ি দেবার পর মাথাটা সামান্য হালকা মনে হ'ল। এমনি অসময়ে আমিনচাঁদ 'মেরদা-রোষে'র বারান্দায় উঠে ভিতরে উঁকি মেরে বিরক্তির সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, "যেণ্ট শুআর এখানে আছ নাকি হে ?"

যেণ্ট শুআর মাদুরশয্যালীন অবস্থাতেই ব'লে উঠলেন—"ওহো! যেণ্ট শুআরের মধুর সম্পর্ক এসে গেলেন নাকি, নাম ধরে ডাক পাড়ছেন ? যেণ্ট শুআর কলাবলিআ[1] ছাড়া আর কারও খায় না ধারে বে 'ভণা' ? যজমান হয়েছ ব'লে কি মাথা কিনে নিয়েছ রে পুতা ?"

আমিনচাদ যেণ্ট শুআরের এ-সব সম্ভাষণের মম গ্রহণ করতে পারলেন না, গলার আওয়াজে যেণ্ট শুআর ব'লে ঠাউরে ভিতরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখামাত্র যেণ্ট শুআর মাদুরের উপরে সসম্ভ্রমে উঠে বসলেন। তখন তাঁর সব কথা মনে পড়ল।

1. কলাবলিআ— কৃষ্ণবলরাম।

আমিনচাঁদ ঈষৎ রাগতভাবে বললেন, "তুমি এখানে অঘোরে ঘুমাচ্ছ, ওদিকে রাজপ্রসাদের থালা শ্রীনবরে গেল ব'লে। আর সে কাজ হবে কখন ?"

যেণ্ড শুআর আশ্বাস দিয়ে বললেন, "কিছু না, কেউ কোথাও পালাচ্ছে না 'মণিমা'। 'চউবাহা'র[1] তো পা নেই ; যাবেন কোথায় ? তুমি যাবে কোথায়, আমি যাব কোথায় ? আমরা সবাই এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে কেবল পা ছুঁড়ছি না ? ভাববেন না 'মণিমা', আমি এখনই গিয়ে সব ঠিক ক'রে দেব না ?"

কোমরের গামছাটা ক'ষে নিয়ে লম্বোদরটি কাঁপিয়ে যেণ্ড শুআর দক্ষিণদ্বারের দিকে অগ্রসর হয়েই হঠাৎ ফিরে হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আজ 'অণসর' দ্বাদশীর দিনটা সকাল থেকে একটি তামার পয়সা কি কানাকড়িটারও মুখ দেখলাম না। একটা আশ্‌রফি হুকুম হয়ে যাক, 'মণিমা'।"

আমিনচাঁদ দেখলেন এখন আশ্‌রফি একটি না দিলে কথা কাটা-কাটিতে সময় যাবে। মনে মনে রুস্ট হলেও কার্যোদ্ধারের জন্য একটি আশ্‌রফি বার করে যেণ্ড শুআরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। সেটি ট্যাঁকে গুঁজে যাত্রীর ভিড় ঠেলে যেণ্ড শুআর দক্ষিণদ্বার 'লণ্ডাবর্তে'র দিকে 'প্রবল মত্ত বারণে'র মত হেলতে দুলতে চললেন।

ততক্ষণে দক্ষিণদ্বার লণ্ডাবর্তের উপরে 'পাহাড়া' বিছানো হয়ে গিয়েছিল। 'দইতা'-'পতি'রা 'অণসর-পিণ্ডি'র[2] ভিতরে থালা নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ঘণ্টাবাদকেরা পিঠ একবার ধনুকের মত বাঁকিয়ে আবার সোজা ক'রে নেচে দুলে ঘণ্টা বাজাচ্ছিল। ভেঁপু-

1. চউবাহা— চার বাহু যার, জগন্নাথ।
2. পিণ্ডি— চাতাল, চত্বর।

বাদকেরা ভেঁপু বাজাচ্ছিল। এর মধ্যে যদিও দেখবার কিছুই ছিল না তবু যাত্রীরা 'লণ্ডাবর্তে'র চারিদিকে পিঁপড়ের মত ছেয়ে গিয়েছিল।

আমিনচাঁদ ইতিপূর্বে যেণ্ট শুআরকে একটি আশ্‌রফি বায়না দিয়েছিলেন, আবার এখন একটি আশ্‌রফি গেল। তার বিনিয়োগ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হবার জন্য আমিনচাঁদ যেণ্ট শুআরের পিছন পিছন এসে সেই যাত্রীর ভিড়ে মিশে গিয়েছিলেন।

'চাঙ্গড়া মেকাপ' ভাণ্ডার থেকে তিনটি রুপার থালা বার ক'রে এনে 'পাহাড়া'র উপরে যথাবিধি রাখলেন। থালার উপরে 'দইতা'রা পট্ট-বস্ত্র পাট ক'রে ক'রে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন। এমন সময়ে 'ঢোউ করণ' দৈত্যারি পট্টনায়ক রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, "তিনটে থালা কেন, 'মণিমা'র হুকুম চার থালা বসবে।"

'চাঙ্গড়া মেকাপ' 'ঢোউকরণে'র কথায় প্রতিবাদ করলেন, "ফি বছরই তো তিনটে থালা বসে আসছে, একটা মহারাজার, একটা মহারাণীর আর একটা 'জেনামণি'র। গেল বছর তো কেবল একটি থালা বসেছিল— বকশী বেণু ভ্রমরবরের জন্য। তিনিই 'ছেরাপহঁরা' বিধি সমাধা করেছিলেন। এ বছর চার থালা বসবে কোন্ নিয়মে?"

'ঢোউকরণ' এ প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত নন। তিনি বললেন, "আদার ব্যাপারীর জাহাজের গোঁজ কেন? ভাণ্ডার থেকে আর একটা থালা তুরন্ত নিয়ে এস।"

'চাঙ্গড়া মেকাপ' আর একটা থালা আনতে চ'লে গেলেন।

সেই অবসরে যেণ্ট শুআর 'লণ্ডাবর্তে'র কাছে সরে এসে হেঁড়ে গলায় বললেন, "আর একটা থালা কি মহারাজার যবনী বেগমের জন্য নাকি হে? নইলে ফি সন তো তিনটে থালাই বসে। এবার এ নতুন নিয়ম কেন?"

যেণ্ট শুআয়ের কথার ভঙ্গীতে সেবকেরা উচ্চহাস্য ক'রে উঠল। এতে সমর্থনের আভাস পেয়ে যেণ্ট শুআর উৎসাহিত হয়ে বললেন, "ধিক্ তোমাদের! মহারাজা জাত হারালেন, ম্লেচ্ছ হলেন, ম্লেচ্ছ যবনী রাণীর জন্য আবার থালা বসাচ্ছেন। তোমরাও আবার সেই ম্লেচ্ছ রাজার ছোঁয়া শাড়ী পেয়ে মহাপ্রভুর রথযাত্রা করাবে? ধিক্ তোমাদের!"

এখানে এই সময়ে এমন কথা উঠবে ব'লে কেউ ভাবে নি। সেবকেরা এ ওর দিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। যেণ্ট শুআর যাত্রীর ভিড়ের মধ্যে আমিনচাঁদকে দেখতে পেয়ে তাঁর দিকে চেঁচিয়ে বললেন, "এ সন শ্রীনবরে রাজপ্রসাদ যাবে না। রাজা জাত হারিয়েছেন, 'ছেরাপহরা'র জন্য তিনি রথের উপরে উঠতে পারেন না।"

'ঢোউকরণ' বললেন, "তা হলে রাজ বিধি করবেন কে?"

যেণ্ট শুআর অম্লান বদনে উত্তর দিলেন, "রাজা আমিনচাঁদ শ্রীক্ষেত্রের নায়েব হয়ে এসেছেন। গেল সনে বকশী বেণু ভ্রমরবর রাজবিধি করেছিলেন, এবছর রাজা আমিনচাঁদ সে বিধি সম্পাদন করুন।"

আমিনচাঁদের নাম শুনে মাত্র কিছুক্ষণ আগে যে সেবকেরা তাঁর কাছে লাঞ্ছনা পেয়েছেন তাঁরা কেউটের মত ফোঁস ক'রে উঠে বললেন, "জগন্নাথ পতিতপাবন হয়ে মহারাজার উপর প্রসন্ন হলেন তাতে হ'ল না, মুক্তিমণ্ডপ সভার পণ্ডিত ব্রহ্মচারীরা রাজি হলেন তাতেও হ'ল না, এখন এই মুসলমানের পাত-চাটা আমিনচাঁদ রাজবিধি করবে?"

এই কোলাহলের মধ্যে 'চাঙ্গড়া মেকাপ' আর একটি থালা এনে 'পাহাড়া'র উপর রেখে দিয়েছিলেন। অবস্থা দেখে 'সান(-অ) পরিছা'

বিষ্ণু মহাপাত্র 'অণসর-পিণ্ডি'র ভিতরে শীঘ্র থালা নিয়ে যাবার জন্য তাড়াহুড়ো করছিলেন। ঘণ্টানিনাদ আর ভেঁপুর আওয়াজের মধ্যে যেণ্ড শুআর আর অন্য সেবকদের বাদবিতণ্ডা আর শোনা যাচ্ছিল না। সেই গোলমালের মধ্যে দইতা-পতিরা থালাগুলি 'অণসর-পিণ্ডি'র ভিতরে তুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন। 'অণসর-পিণ্ডি'র ভিতর থেকে রাজপ্রসাদ নিয়ে সেগুলি অবিলম্বে আবার লণ্ডাবর্তের উপরে ফিরে আসছিল।

'তলিছো মহাপাত্র' হেঁকে বললেন, "থালা তাড়াতাড়ি ওঠাও, আজ 'নীতি' সারতে অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে।"

দইতা-পতিরা থালা তুলে কাঁধে নেবাব সময় ঘণ্টা আর ভেঁপুর বিপুল শব্দে প্রাঙ্গণ প্রকম্পিত হয়ে উঠল। খুন্টিআরা গলা ফাটিয়ে হাঁক পাড়লে—"চক্র আড়াল কর, শঙ্খে পূরে খোধার রাজা রামচন্দ্র-দেবকে রক্ষা কর হে বলিআরভুজ(-অ)।"

যাত্রীরা সমস্বরে ধ্বনি তুলল—"হরিবোল", তার সঙ্গে উঠল উলুরোল।

ঘণ্টা ভেঁপু ও মানবকণ্ঠের সম্মিলিত তুমুল নিনাদে প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠল। দইতা-পতি, স্বার্ঁই মহাপাত্র, 'ঢোউকরণ', 'দেউলকরণ' ও 'তলিছো মহাপাত্র' প্রভৃতি সেবকগণ থালা নিয়ে মিছিল বেঁধে শ্রীনবরের দিকে চ'লে গেলেন।

আসন্ন সন্ধ্যার মূর্ছিত অন্ধকার ও শ্রীনবরে রাজপ্রসাদ যাওয়ার কম-চঞ্চল কোলাহলের মধ্যে দুই জন কেবল স্থাণুর ন্যায় নির্বাক্ নৈরাশ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন— একজন 'বড় পরিছা' গৌরী রাজগুরু অন্যজন রাজা আমিনচাঁদ। যেণ্ড শুআর কিন্তু এ-সবে অতি অনাসক্ত উদাসীনের মত নিজের 'খেই'[1] পাওয়ার জন্য মিছিলের পিছু পিছু ছুটেছিলেন।

1. খই— দৈনিক দেবভোগ থেকে সেবকের প্রাপ্য অংশ।

4

আষাঢ়ের শুক্লাদ্বিতীয়া…

নীলাচলে জগন্নাথের রথযাত্রা উৎসব। বলগণ্ডি থেকে সিংহদ্বার পর্যন্ত রথদাণ্ড লোকে লোকারণ্য। বিগ্রহদেব 'পহণ্ডি'র[1] জন্য সবাই নিজ নিজ স্থানে উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। হিমাচল থেকে কুমারিকা, কামাখ্যা পীঠ থেকে দ্বারকা পর্যন্ত ভারতের নানা অঞ্চল থেকে আসা যাত্রীদের নানা বিচিত্র পরিধানে, নানা ভাষার কল-কোলাহলে, নানা রূপ ও বিন্যাসের এক বর্ণাঢ্য সমারোহ বলগণ্ডির দিক থেকে সিংহদ্বার পর্যন্ত দীর্ঘায়িত। তারই মধ্যে যাত্রা-রসিকরা রসিকতার সন্ধানে রঙিন প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াচ্ছে মন্থরগামিনী যাত্রিণীদের পিছু পিছু। যে যাত্রিণীরা ভিড়ের মধ্যে দলছাড়া হয়ে পড়েছে সেই নিতম্বিনীদের উন্মুক্ত বাহুমূলে হরিদ্রালিপ্ত সুগঠিত স্তনাংশের উপরে অপরিচিতের আকস্মিক করস্পর্শ কোথাও বা যেন কদম্বের শিহরণ সৃষ্টি করছে। তখন তাদের চকিত চক্ষুতে যে কটাক্ষ ফুটে উঠছে তাতে প্রতিবাদ আছে কিন্তু প্রতিরোধ নেই। তেমনি এক যাত্রা-রসিককে তার সঙ্গী একজন ডেকে বললে, "রথের উপরে জগন্নাথ না দেখতেই তোর ফল মিলে গেল রে, মিতে!"

যাত্রা-রসিক উত্তর দিলে, "ফল তো মিলল, কিন্তু সিংহদ্বারের 'চন্দন-অর্গলি'[2] না খুললে ভোগ হবে কিসে!"

1. পহণ্ডি— রথযাত্রার সময় বিগ্রহগণকে রথের দিকে যাত্রা করানো, মনে হয় যেন তাঁরা হেলতে দুলতে ধীর দীর্ঘ পদক্ষেপে চলেছেন।

2. চন্দন অর্গলি— মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢোকবার মুখের কাঠের আগড়।

তার পর বেপরোয়া গলায় দু'জনের হাসি।

যে যাত্রিণীর উদ্দেশে এ-সব রসিকতা তার চকিত কোমল মুখখানি রোদে ও পথশ্রমে যত না রাঙা হয়েছিল তত হয়ে উঠল এই-সব পরিহাসের বক্রোক্তিতে।

গৌড় থেকে পদব্রজে আসা বৈষ্ণবেরা বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার-রস বিবশা ভাবিনী ব্রজবধূদের মত দুই বাহু তুলে ভাবে ঢল ঢল হয়ে সেই জন-সমুদ্রের মধ্যে পদাবলী কীর্তন করতে করতে চলেছিল—'কাহাঁ তুহুঁ ব্রজেন্দ্রকুমার'।

সেই দৃশ্যে কিন্তু উৎকলীয় বৈষ্ণবটি তার হরিমন্দির-তিলকচর্চিত নাসিকা কুঞ্চন ক'রে একা একা মৃদঙ্গ বাজিয়ে ভজন গাইতে গাইতে চলেছিল—'জয় জয় অনাকার নীলাদ্রিবিহারী হে—'।

ব্যবসায়ী ও বিক্রেতারা আপন আপন পণ্যসম্ভার নিয়ে তারি মধ্যে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ মানসে ফিরছিল। ভিড় ও রোদের তাতে কোথাও কোথাও রুগ্ণ-ক্লান্ত যাত্রীরা চলতে চলতে হঠাৎ ব'সে প'ড়ে 'অপোড়া' মাটিতে দেহরক্ষা করার অন্তিম অভিলাষ সার্থক করছে। যতি ও যুবতী, সাধক ও রসিক, অবসাদ ও জীবনোচ্ছলতা, মৃত্যু ও শৃঙ্গার, ভক্ত ও প্রমত্ত, তুচ্ছ ও নিত্যের সেই বিরাট যজ্ঞের মধ্যে কিন্তু এক স্থিতপ্রজ্ঞ অটল প্রতীক্ষার অসংশয় মুদ্রা অঙ্কিত। সকলের দৃষ্টি সিংহদ্বারের রুদ্ধ কবাটের উপরে নিবদ্ধ: কখন সিংহদ্বার খুলবে, পরমেশ্বরের 'পহণ্ডি বিজে' আরম্ভ হবে। মধ্যাহ্নের আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের মধ্যেও যেন তেমনিই ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি রেষারেষি চলেছে নীলাচলের রথযাত্রার এই মহোৎসব দেখবার জন্য।

বেলা দুপুর প্রায় হল। অন্যান্য বৎসর এতক্ষণে জগন্নাথের 'পহণ্ডি' হয়ে 'ছেরাপহঁরা' বিধি আরম্ভ হয়ে যায়।

কিন্তু এ বছর কে জানে কেন 'পহণ্ডি'র অস্বাভাবিক বিলম্ব হচ্ছে। তার কারণ কী তা নিয়ে কেউ কিন্তু বিব্রত নয়, এমন-কি অমাবস্যার উপবাসীরাও না। সকলের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি কেবল সিংহদ্বারের দিকে— কখন দ্বার খুলবে, মহাসামন্ত জগন্নাথ 'পহণ্ডি বিজে' করবেন— ক্লান্ত ধূলিধূসরিত ক্লেদাক্ত পৃথিবী দেবতার অবতরণের জন্য অহল্যার পাষাণ ধৈর্যে প্রতীক্ষা করছে।

সিংহদ্বারের সামনে বলভদ্র সুভদ্রা ও জগন্নাথের তিনটি রথ 'পাটপত্তনী', চামর, পুষ্পমাল্য ও কলস প্রভৃতিতে শোভিত হয়ে দেবতাদের 'পহণ্ডি বিজে'র অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। রথগুলির মণ্ডনশোভা দেখবার জন্য সেগুলির চারিদিকে যাত্রীদের ভিড় ক্রমে বেড়ে চলেছে। অনন্ত প্রতীক্ষার শেষে প্রাপ্তির সম্ভাবনার মত রথের উপরে নিশান-গুলি মৃদু পবনে হিল্লোলিত হচ্ছে। 'চার'(-অ)[1] বেয়ে যাত্রিরা পিপীলিকার সারির মত রথের উপরে উঠছে, আবার নেমে আসছে।

হঠাৎ সেই জনসমুদ্র 'মণিমা মণিমা' চীৎকারে উদ্‌বেলিত হয়ে উঠল। শত শত চামর লহরীর ফেনচূড়ের মত আন্দোলিত হয়ে উঠল, হরিবোল ও হুলুধ্বনিতে বড় দাণ্ডের উপরকার রৌদ্রদগ্ধ আকাশ যেন ফেটে পড়ল।

মঙ্গলপুর গ্রাম থেকে এ বৎসর পহলি বিশাল সংসারের সব জঞ্জাল পিছনে ফেলে সপরিবারে রথযাত্রা দেখতে আসতে পেরেছেন। ঐ গাঁয়ের অইণ্ঠু সাহুও তার ছেলেপিলেদের নিয়ে এসেছে। দুই পরিবারের মেয়েরা সবাই একসঙ্গে আঁচলে আঁচলে গিঁঠ দিয়ে চলেছে,

1. চার(-অ)— রথে ওঠবার জন্য চওড়া মই।

নয়তো সেই প্রচণ্ড ভিড়ে দলছাড়া হয়ে হারিয়ে যাবার ভয়। সঙ্গে যাত্রীগোমস্তা কণ্ঠ মেকাপও আছেন।

অইণ্ঠু অনেকক্ষণ এদের এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে একাই গিয়েছিল মন্দিরের দিকে। অমনিই গোঁয়ার গোবিন্দ মানুষ অইণ্ঠু সাহু। ভিড় এত যে মাছি পড়লেও নয়খানা হয়ে যায়। সেই কখন গেছে, এখনও দেখা নেই। এদিকে সবাই অস্থির, ঠাকুর 'পহণ্ডি বিজে' হলেন না এখনও।

হঠাৎ দেখা গেল অইণ্ঠু আসছে হাঁপাতে হাঁপাতে। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে, হাতে একটা বেঙ-বাজনা, তাই বাজাতে বাজাতে আসছে। চৌকো চেহারার জোয়ান মরদ, দুই হাতে রুপার খাড়ু, দু' কানে সোনার মাকড়ি, গলায় দুই সারি সরু সরু কাঠের মালা বুকের ফুলে-ওঠা মাংসপেশীর উপরে এসে পড়েছে। মালাতে একটা ছোট্ট মাদুলি। মাথায় তেল চকচকে চুল ঝুঁটি ক'রে বাঁধা। নাক থেকে কপাল পর্যন্ত হরিমন্দিরের তিলক ফোঁটা।

অইণ্ঠুকে দেখে পহলি বিশ্বালের ছোট ছেলে নরি শুধালে, " 'পহণ্ডি' হ'তে এত দেরি কেন হচ্ছে অইণ্ঠু ভাই[1] ?"

অইণ্ঠু খুব বিজ্ঞের মত বললে, " 'পহণ্ডি'র আগে একশ' লটখটি আছে, সে সব মিটলে তবে তো ঠাকুর 'পহণ্ডি বিজে' হবেন। এই তো এখন, ব্যাপার কি ? না, খিচুড়ি ভোগ হ'ল। তারপর পাণ্ডা, পতি মহাপাত্র আর মুদিরস্ত মঙ্গলার্পণ করতে গেলেন, আমি চ'লে এলাম। আর একটু পরেই 'পহণ্ডি' আরম্ভ হবে, সবুর কর।"

মেকাপ বললেন, "খিচুড়ি ভোগ আর সব বছর এতক্ষণে হয়ে, 'পহণ্ডি' হয়ে, 'ছেরাপহঁরা' আরম্ভ হয়ে যায়। এ বছর বলছ খিচুড়ি ভোগ এই হল। এদিকে দেখ বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে।"

1. ভাই— অগ্রজ বা অগ্রজপ্রতিমকে সম্বোধন।

নরি অভিমানের সুরে বললে, "বা রে, তুমি এত সব দেখে এলে, আমায় একটু সঙ্গে নিয়ে গেলে না, অইণ্ঠু ভাই ?"

অইণ্ঠু কোমর থেকে পাকানো গামছা খুলে নিয়ে গা-মাথার ঘাম মুছে উত্তর দিল, " 'অণসর-তাটি'র ভিতরে সে যা মারপিট! আমার মত মানুষ কোথা দিয়ে পালাব তার পথ পাই না, তুই কেমন ক'রে সেখানে যেতিস্ রে ?"

'অণসর-তাটি'র ভিতরে মারপিটের কথা শুনে মেকাপ বটুয়া থেকে একখানা পান বার করতে করতে বললে, " 'অণসর-তাটি'র ভিতরে মারপিট কিসের লাগল হে অইণ্ঠু ? আহা, আমি যেতে পারলাম না। 'বেইপো' তোমাদের ছেলেপিলেদের যাত্রা দেখাতে দেখাতে এইখানে বয়ে গেলাম, হুঁঃ।"

অইণ্ঠু সত্যি কি 'অণসর-তাটি'র ভিতরে গিয়েছিল যে কিসের মারপিট বলবে ? সে মন্দিরের ভিতরেও যায় নি, 'অণসর-তাটি'তেও ঢোকে নি। সিংহদ্বার পর্যন্ত গিয়ে যাত্রী পাণ্ডাকে ধ'রে মন্দিরে ঢোকার চেষ্টা করবে ভেবেছিল, কিন্তু যাত্রী-পাণ্ডার দেখা না পাওয়ায় ভিতরে তার আর যাওয়া হয় নি। কয়েকবার রথ তিনটির উপরে ওঠানামা ক'রে শেষে ক্লান্ত হয়ে রথের নীচে ছায়ায় শুয়ে পড়েছিল। সেখানে আর যারা শুয়েছিল তাদের কথাবার্তার যেটুকু তার কানে গিয়েছিল তাই সে প্রত্যক্ষদর্শীর মত বয়ান করেছে মাত্র। এখনও সেইটুকুই সম্বল করেই সে বললে, " 'পহণ্ডি'র আগে জানো ঠাকুরের কাছে বারো 'কুডুআ' খিচুড়ি ভোগ লাগার কথা। কিন্তু ব্যাপার দেখ, শুআর বড়ুরা তার চারগুণ 'কুডুআ' আনলে ভোগ লাগাতে। তখন শুরু হ'ল শুআর আর পাণ্ডাদের মধ্যে ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তি, তারপর হাতাহাতি। একজন পাণ্ডা মারল এক ঘুষি যে একজন 'শুআরে'র সামনের দাঁত

দুটো ভেঙে মাটিতে প'ড়ে গেল। তার মুখ রক্তে ভেসে গেল। মন্দিরে রক্ত পড়ায় সব ভোগ মারা গেল। তারপর আবার 'দেউল-শোধ' (মন্দিরশুদ্ধি) হ'ল, আবার ভোগ পাক হ'ল। তবে গিয়ে বোঝ খিচুড়ি ভোগ হল, ঠাকুরের মঙ্গলার্পণ আরম্ভ হ'ল আমিও চ'লে এলাম।"

বিশ্বালের ছেলেরা অবাক্ মেনে বললে, "কী আশ্চর্য!"

ঠিক সেই সময়ে উটের পিঠে একদল ছাইমাখা উলঙ্গ নাগা সন্ন্যাসী চিমটা কড়া ঝনর ঝন শব্দে বাজিয়ে ভিড়ের ভিতর দিয়ে মিছিল বেঁধে সিংহদ্বারের দিকে চ'লে গেল। তাদের মহন্ত গাঁজার নেশায় রাঙা চোখ কটমটিয়ে হুঙ্কার ছাড়ছিল— "জগন্নাথজী কি জে—!" হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনি উঠছিল— "হরিবোল!" তার সঙ্গে হুলুধ্বনি। নাগাদের দেখবার জন্য ভিড় আর ঠেলাঠেলি অতি প্রবল হয়ে উঠল। পহলি বিশ্বাল ঠেলা খেয়ে প'ড়ে যেতে যেতে অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন। বিশ্বালের বড় ছেলে জগবন্ধু ব'লে উঠল, "পই পই ক'রে সবাইকে বলছি ভিড়ের মধ্যে ঢুকো না। এই মেয়েরা যেখানে থাকবে—।"

অইণ্ঠু প্রবোধ দিয়ে বললে, "ভিড়ের মধ্যে বেতের মার খেয়ে, প'ড়ে উঠে 'চকাডোলা'কে রথের উপরে না দেখলে কি 'মোচ্ছ' মেলে রে?" ভিড় কাটিয়ে বাইরে বাইরে তাদের সিংহদ্বারের কাছে নিয়ে যাবার জন্য অইণ্ঠু পথ ক'রে যেতে যেতে বললে, "আমার পিছন পিছন এস সবাই। রথের কাছে না গেলে 'পহণ্ডি' দেখতে পাবে না। আমি তোমাদের একেবারে 'পহণ্ডি'র ঠেঞে নিয়ে যাচ্ছি, চল।"

কিন্তু বেশী দূর এগতে তারা পারল না। তখন 'বীর(-অ) কাহালি'[1] আর তেলেঙ্গী বাজনা বাজিয়ে পালকিতে আমিনচাঁদ বলগণ্ডির দিক

1. বীর(-অ) কাহালি— তূরী।

থেকে সিংহদ্বারের দিকে যাচ্ছিলেন 'পহণ্ডি' দেখতে। পালকি দেখে, রাজা রামচন্দ্রদেব 'ছেরাপহঁরা' করতে আসছেন ভেবে লোকেদের "জয় খোধা রাজা রামচন্দ্রদেবের জয়", "মণিমা 'শরণপঞ্জর' চলন্তি বিষ্ণু মহাবাহু" প্রভৃতি জয়নাদ রথদাণ্ডে আর সব শব্দ ছাপিয়ে উঠল। রাজা রামচন্দ্রদেবকে পালকিতে দেখবার জন্য ভিড় আবার উলটা দিকে চেপে এল। একটু পরেই কিন্তু জানা গেল পালকিতে আসছেন রামচন্দ্রদেব নন, নায়েব-নাজিম তকী খাঁর নায়েব রাজা আমিনচাঁদ। লোকেরা তাই আবার সিংহদ্বারের দিকেই পায়ে পায়ে এগতে লাগল।

মন্দিরের ভিতর ঘণ্টা আর ভেঁপুর আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। মঙ্গলার্পণ সারা হয়েছে, এবার সিংহদ্বার খুলবে, 'পহণ্ডি বিজে' আরম্ভ হবে। ভিড়ের মধ্যে যে যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে 'পহণ্ডি বিজে' দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল।

সিংহদ্বার এখনও খোলে নি। সিংহদ্বারের গুমটি থেকে 'ঘোষরা'র[1] নীচ পর্যন্ত দর্শনাভিলাষী নিরম্বু উপবাসী যাত্রীরা পিঁপড়ের মতো ঝাঁক বেঁধে দাঁড়িয়ে। 'ঘোষরা'র উপরে দাঁড়ালে সিংহদ্বার খোলা মাত্রই সোজা জগন্নাথকে দেখতে পাওয়া যায়। সেইজন্য 'ঘোষরা'য় আর তিলধারণের স্থান নেই।

মন্দিরের ভিতরে 'সাত(-অ) পাহাচে' তখন ঠাকুরদের 'টাহিআ লাগি'[2] হচ্ছিল। সিংহদ্বার খুলতে আর দেরি নেই। 'মণিমা' 'মহাবাহু' ডাকে রথদাণ্ড উতরোল হয়ে উঠছিল।

অনন্ত যুগের প্রতীক্ষার পরে অবশেষে যেন মহাকালের রুদ্ধদ্বার

1. ঘোষ(-অ)রা— সিংহদ্বার থেকে বড দাণ্ড পর্যন্ত ঢালু পথ।

2. টাহিআ— শিরোভূষণ বিশেষ, রথযাত্রা ইত্যাদি উৎসব উপলক্ষ্যে কেতকী ফুলে তৈরি হয়।

উন্মোচিত হল, সিংহদ্বার খুলল। ঘন্টাধারীরা 'সাত পাহাচ'(-অ) থেকে 'ঘোষরা' পর্যন্ত দুই সার হয়ে দুই দিকে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে ঘন্টা বাজাতে লাগল। মাদল শঙ্খ তূরী ভেরী শিঙ্গা প্রভৃতি সব বেজে উঠল। দুই জন 'দইতা' প্রথমে 'সুদর্শন' কাঁধে করে এনে সুভদ্রার রথে চড়িয়ে দিলেন।

তার পরে মাথার প্রকাণ্ড 'কেতকী-টাহিআ' নাচিয়ে যেন কাদম্বরী-প্রমত্ত ছন্দে নাচতে নাচতে সিংহদ্বারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন বড ঠাকুর বলরাম। বলরামের পিছনে তাঁর কোমরে সিঁদুরমাখা পাকানো পাট কাপড় দিয়ে টেনে ধরেছিলেন একদল 'দইতা'। দুই পাশে তাঁর দুই বাহু ধ'রে ষোলো জন ক'রে 'দইতা' তাঁকে টেনে হেঁচড়িয়ে তুলীর[1] উপরে নাচিয়ে আছড়িয়ে 'পহণ্ডি' করিয়ে আনছিলেন। বড় ঠাকুরের মাথার সোলা আর কেতকী ফুলের 'টাহিআ' একবার উঠছিল একবার পড়ছিল বাতান্দোলিত তরঙ্গের মত। 'ঘোষরা' থেকে রথ পর্যন্ত আসার পথে 'দইতা'রা ক্লান্ত গলদ্‌ঘর্ম হয়ে 'তুলী'র উপরে বলরামকে কিছুক্ষণ এক জায়গাতেই আছড়িয়ে বিশ্রাম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা দম নিচ্ছিলেন।

এমনি সময়ে ঠাকুরের আগে আগে গজেন্দ্রগামিনী ক্ষীণমধ্যমা 'মাহারী'দের[2] নৃত্য শুরু হ'ল। তাদের কুটিল কুন্তলের কমনীয় 'লোটণি জুড়া'য়[3] কেতকীর গুচ্ছ আর চন্দ্রঝুম্পা গোঁজা। 'পহণ্ডি'র আগে আগে রথ পর্যন্ত তারা নৃত্য করতে করতে চলল। অবশেষে

1. তুলী— বিগ্রহের নাচের দিকে বাঁধা গোল গদি, যাতে 'পহণ্ডি'র ফলে বিগ্রহের ক্ষতি না হয়।

2. মাহারী— পুরী জগন্নাথ মন্দিরের দেবদাসী।

3. লোটণি জুড়া— শ্লথ কবরী, এলো খোঁপা।

বলভদ্র ঠাকুর তাঁর তালধ্বজ রথে 'বিজে' হলেন। তিনি রথে ওঠা মাত্র কয়জন 'দইতা' সুভদ্রাকে কাঁধে নিয়ে ঝটিতি তাঁকে তাঁর দেবীদলন রথের উপর নিয়ে তুললেন। বড় ঠাকুরের সামনে লজ্জাশীলা বধূটির মত কখন কোন ফাঁকে সুভদ্রা নিজের রথে গিয়ে উঠলেন তা কারও নজরে পড়ল না।

তার পর জগন্নাথ ঠাকুরের 'পহণ্ডি'। যাত্রীদের মধ্যে এবার যে প্রচণ্ড ঠেলাঠেলি আরম্ভ হ'ল তাতে কে কার পায়ের নীচে পিষে গেল, কে প'ড়ে গিয়ে আর উঠতে পারল না, কে কোথায় হারিয়ে গেল তা দেখবার অবসর তখন কারও ছিল না। মহাবাহু শরণপঞ্জর চকাডোলা পতিতপাবন ইত্যাদি আবেগস্পন্দিত সম্বোধনে যাত্রীরা জগন্নাথ দর্শনের আশে সমুদ্রতরঙ্গের মত ছুটে আসছিল। 'তুলী'র উপরে জগন্নাথকে হেঁচড়িয়ে আছড়িয়ে আনা হ'তে দেখে যাত্রীরা এ ওকে বলছিল, "আহা, প্রভু আপন ইচ্ছায়ই না টানাহেঁচড়া আছড়া খেয়ে এত কষ্ট পাচ্ছেন! নইলে মানুষ কি ছার, এক আঙুলও কি নড়াতে পারত তাঁকে!"

কোন স্মরণাতীত কালে জগন্নাথ কবে কোন সুনুপুরে আত্মগোপন ক'রে ছিলেন। তাঁকে সেখান থেকে বার ক'রে কোন ইন্দ্রদ্যুম্ন হয়তো এমনি ক'রে একদিন টেনে হিঁচড়ে নীলাচল ক্ষেত্রে এনে আবার তাঁর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ গুণ্ডিচা পহণ্ডি কি সেই প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতির পুনরভিনয়? তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকেরা সে শুখনা চানা চর্বণ করুন, কিন্তু এখানে যারা জগন্নাথের 'পহণ্ডি বিজে' দেখবার জন্য দুস্তর পথ ও শত প্রতিবন্ধক অতিক্রম ক'রে এসে ভিড় করেছিল তারা যেন

ধূলিধূসর বড় দাণ্ডে সেই মহাসামন্তের আবির্ভাবের মধ্যে শাশ্বত অবিনশ্বর ও সুন্দরের মহোদয় দেখে চর্মচক্ষু সার্থক করছিল। এই জগন্নাথ কে— বৌদ্ধ, জৈন, পাঞ্চরাত্রিক, তান্ত্রিক, না বৈষ্ণব— সে খবরে তাদের প্রয়োজন ছিল না। মরজীবনের ধূলিমলিন পথে এই মহাসামন্তের পহণ্ডি-বিজয়ের জন্য তারা যেন জন্ম জন্ম যুগ যুগ ধ'রে প্রতীক্ষা ক'রে ছিল, এরিমধ্যে তাদের মর্তজীবনের সমস্ত শূন্যতা সব অপূর্ণতা কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে অমৃতের ঐশ্বর্যে। মৃত্যু মহামারী দূরত্ব ও পথশ্রম সব তুচ্ছ ক'রে তারা তাই তাঁর সিংহদ্বারে সমাগত সম্মিলিত। তিনি মহাসামন্ত, আবার রত্নসিংহাসন ত্যাগ ক'রে তিনিই হয়েছিলেন পতিতপাবন। এক অব্যক্ত ঐন্দ্রজালিক আবেদনে জগন্নাথ যেন তাদের অবচেতনাকে স্পর্শ করছিলেন, তা তারা অনুভব করছিল, কিন্তু বুঝতে পারছিল না।

'পহণ্ডি'র সময়ে জগন্নাথের হাতখানি একবার স্পর্শ করবার জন্য জাতিধর্মনির্বিশেষে যাত্রীদের মধ্যে তুমুল ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। সেই ধস্তাধস্তির মধ্যে জগন্নাথের 'কেতকী টাহিআ' খণ্ড খণ্ড হয়ে ছিঁড়ে নীচে পড়েছিল, আর সেই ছেঁড়া 'টাহিআ'র একটি সোলার ফুল, একটি কেতকী দল, নয়তো কেবল একটুকরো কাঠিই কুড়িয়ে নেবার জন্য যাত্রীদের মধ্যে সে কি ঝটাপটি লড়াই! তিনি যে পতিতপাবন, পতিত জনের উদ্ধারণে তিনি এমনি পলে পলে তনু ক্ষয় না করলে তাদের উদ্ধার করবে আর কে?

এই ভিড়ের মধ্যে রাজা আমিনচাঁদের সমস্ত স্পর্ধা অহমিকা কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। যে পালকিতে চ'ড়ে তিনি এসেছিলেন ভিড়ের মধ্যে তা জগন্নাথবল্লভের চাইতে আর বেশী দূর এগতে

পারে নি। সেইখানে পালকি ছেড়ে পায়ে হেঁটে ভিড়ের ধাক্কা খেতে খেতে জগন্নাথের রথ পর্যন্ত কোনও মতে তিনি এসে পৌঁছালেন।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি জগন্নাথের 'পহণ্ডি' দেখছিলেন, যতই দেখছিলেন ততই তাঁর চোখে পড়ছিল জগন্নাথের নেপথ্যে ওড়িয়া জাতির এক বিরাট ঐক্য, শক্তি ও মহিমার সঙ্কেত। অনুভব করছিলেন, সেই জগন্নাথই ওড়িশার রাজাধিরাজ, সম্রাট্, ওড়িশার রাজা তাঁর সেবকমাত্র। মোগল সম্রাট্ দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা প্রবল-প্রতাপী আকবর তাঁর কাছে হার মেনেছেন, মানসিংহ টোডরমল্ল মাথা নত ক'রে ফিরে গেছেন। আর, নায়েব-নাজিম তকী খাঁ, আবার তাঁর নায়েব হিসাবে আমিনচাঁদ তো এই মহা মহিমার সিংহদ্বারে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ।

আমিনচাদ বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে এমনি চিন্তা করছেন, এক দল যাত্রী জগন্নাথের 'টাহিআ'র কেতকীদল আর 'দঅনা'র মালা ছেঁড়বার জন্য লাফ দিয়ে প্রায় তার উপরেই পড়বার উপক্রম করলে। তার দেহরক্ষী দুই জন তাদের ঠেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"তফাৎ। তফাৎ!" কিন্তু সে সময় কে শোনে তাদের এ তুচ্ছ আস্ফালন। যাত্রীদের ধাক্কায় তারা প'ড়ে যেতে যেতে কোনো মতে সামলে গিয়ে আমিনচাঁদকে সেখান থেকে একরকম টেনেই ভিড়ের বাইরে নিয়ে গেল।

জগন্নাথের 'পহণ্ডি' শেষ হ'ল। 'চারে'র উপর দিয়ে 'দইতা'রা তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে নন্দিঘোষ রথের 'পিণ্ডি'র[1] উপরে তুলে বসালেন। লক্ষ কণ্ঠে আবার উচ্ছ্রিত হ'ল 'মণিমা মণিমা' ডাক, খঞ্জনিতে 'জণাণে'র পদ, তার সঙ্গে হরিবোল আর হুলুধ্বনি। সে-সব শান্ত হ'লে ফেরিওয়ালারা আবার যে যার ডাক দিয়ে বিক্রি শুরু

1. পিণ্ডি— বেদীর মত উঁচু ক'রে তৈরি জায়গা।

করলে। ছেলেদের ভেঁপু, বেঙ-বাজনা আর ডমরুর আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। যাত্রায় এসে কার কোন দূর গাঁয়ের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বা বাপের বাড়ির 'আম্বকষি' ও 'বউল'(-অ)দের[1] সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাদের সঙ্গে সংসারের নানা সুখদুঃখের কথা হওয়ার লক্ষ কণ্ঠস্বরে রথদাণ্ড মুখরিত হতে লাগল।

ঠাকুরেরা রথে ওঠার পর 'চাঙ্গড়া মেকাপ'রা ঠাকুরের 'চকা অপসর লাগি'[2] ক'রে 'রুন্ধা'[3] করেছিলেন যাতে রথ চলার ধকলে বিগ্রহদের কোনো ক্ষতি না হয়। এখন 'ছেরাপহঁরা' হলেই রথ চলা শুরু হয়। তার আগে তবু আরো কিছু বিধি সারবার আছে। দক্ষিণদ্বারের দিক থেকে 'মহাজন'রা পালকিতে রামকৃষ্ণ ও মদনমোহনকে বসিয়ে রথের কাছে আনছিলেন। ঘণ্টা, তেলেঙ্গী বাজনা ও শিঙ্গা শুনে যাত্রীর সেই মিছিলের সঙ্গে রথের দিকে চলেছে।

লেঙ্কা ও পাইকেরা ঘণ্টা ভেঁপু বাজিয়ে স্বর্ণবণিকদের কাছ থেকে মুক্তাবসানো তাজ আনলে, সেসব তিন রথে তিন ঠাকুরের মাথায় পরানো হল। এর পর 'ছেরাপহঁরা' হ'লে 'কালবেঠিআ'রা রথের দড়ি টানবে।

জগন্নাথের 'আজ্ঞামাল'(-অ)[4] ও চিটাউ নিয়ে 'সান(-অ) পরিছা' 'শ্রীনববে' রামচন্দ্রদেবের কাছে গিয়েছেন। বালিসাহী 'উআস'(-অ)

1. 'আম্বকষি' ও 'বউল'(-অ)— মেয়েদের সইপাতানো নাম। আম্বকষি অর্থাৎ কচি আম। বউল(-অ)— মুকুল।

2. চকা অপসর লাগি— ঠাকুরদের চাকার মত গোল বালিশের উপর বসানো।

3. রুন্ধা— বিগ্রহদেব শক্ত ক'রে রথের সঙ্গে বাঁধা।

4. আজ্ঞামাল ও চিটাউ— জগন্নাথের আদেশপত্র।

একে তো জরাজীর্ণ ও বিনষ্ট। তার উপরে আবার তার ভিতরে রামচন্দ্রদেবের প্রবেশ নিষেধ। সেইজন্য বড় দাণ্ডের এক ধারে মধুপুরে, রামচন্দ্রদেবের জন্য এক অস্থায়ী 'শ্রীনবর' তৈরি হয়েছিল। 'আজ্ঞামাল' পেলে খোর্ধার রাজা সেখান থেকে 'ছেরাপহঁরা'র জন্য রওনা হবেন। 'সান পরিছা' 'আজ্ঞামাল' নিয়ে তাঁর কাছে গেছেন। 'বড় পরিছা' নিয়ে যাওয়াই অবশ্য বিধি, কিন্তু 'বড় পরিছা' কোথায় অন্তর্ধান করেছিলেন, তাকে পাওয়া গেল না, তাই 'সান পরিছা' গেছেন তাঁর বদলে।

যেমন ক'রে হোক, ছলে বলে কৌশলে রাজা রামচন্দ্রদেব যাতে 'ছেরাপহরা' থেকে বঞ্চিত হন তার ব্যবস্থা করবার জন্য তকী খাঁর নায়েব রূপে রাজা আমিনচাঁদ পুরী এসেছিলেন, কিন্তু স্রোতের মুখে বালির বাঁধের মত তার সব গোপন কৌশল মুহূর্তে পণ্ড হয়ে গেল। রামচন্দ্রদেব এবার মহাসমারোহে এসে 'ছেরাপহরা' করবেন। দীন অকিঞ্চনের মত দাড়িয়ে আমিনচাদ এই জনসমুদ্রের মধ্যে তা কেবল চেয়ে চেয়ে দেখবেন। ভিড় আর ঠেলাঠেলির মধ্যে মাথার পাগড়ি সামলাতে সামলাতে আমিনচাদ সেই ব্যর্থতার খেদ ও গ্লানির কথা চিন্তা করছিলেন।

অপরাহ্নের সূর্য পশ্চিম আকাশে চলে পড়েছিল। এতক্ষণ অন্যান্য বছর রথ বলগণ্ডিতে পৌছে বলগণ্ডির ভোগ সারা হয়ে যায়। কিন্তু এবার 'পহণ্ডি'র বিলম্বের দরুন এ পর্যন্ত 'ছেরাপহরা'ও হয় নি। বলগণ্ডিতে রথ পৌছাতে হয় তো বা সন্ধ্যা হয়ে যাবে। রথ টানার জন্য যাত্রীরা ক্রমে ধৈর্যহারা হয়ে উঠেছিল। আকাশে টুকরো টুকরো ধোঁয়ার মত মেঘ পালতোলা নৌকার মত দক্ষিণ থেকে পশ্চিমের দিকে ভেসে যাচ্ছিল। মধ্যাহ্নের গুমট গরমে সিদ্ধ হওয়ার পর এই শীতল

পবন যেন কর্পূরগোলা চন্দনের মত সকলের শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছিল।

দূরে 'বীর(-অ) কাহালি,' 'টমক'[1], জয়ঢাক, তেলেঙ্গী বাজনা প্রভৃতি বাদ্য শোনা যাচ্ছিল।

সহস্র সহস্র কণ্ঠে হঠাৎ নির্ঘোষিত হল—"এই রাজা এলেন, রাজা এলেন।" 'মণিমা' 'মহাবাহু' নাদে রথদাণ্ড আবার মুখরিত হয়ে উঠল।

বড়দাণ্ডে রামচন্দ্রদেব পালকিতে চ'ড়ে 'ছেরাপহঁরা'র জন্য মিছিল ক'রে আসছিলেন। আঠারো গড়জাতের সামন্ত রাজারা যে যাঁর পদমর্যাদা অনুসারে পালকির সামনে পিছনে ও দুই পাশে চামর পাখা ও ছত্র প্রভৃতি ধারণ ক'রে রামচন্দ্রদেবের সঙ্গে আসছিলেন। মোগল-বন্দির কয়জন জমিদার যাঁদের এই মিছিলে রাজার সঙ্গে আসবার বিধি পূর্বকাল থেকেই রয়েছে, তাঁরাও আসছিলেন। তকী খাঁর অপ্রীতি-ভাজন হওয়ার আশঙ্কা সত্ত্বে তাঁরা "জয় খোর্ধার রাজা রামচন্দ্রদেবের জয়" ধ্বনি দিয়ে চামর দুলিয়ে মিছিলের সঙ্গে চলেছিলেন।

এই দৃশ্যে আমিনচাঁদ হঠাৎ তাঁর সমস্ত আত্মপ্রত্যয় হারিয়ে ফেললেন। এ যেন কেবল 'ছেরাপহঁরা'র পরম্পরাগত মিছিল মাত্র নয়, জগন্নাথকে কেন্দ্র ক'রে অপরাজেয় ওড়িশার রাজনৈতিক ঐক্যের দৃপ্ত জয়যাত্রা। মানসিংহের মত দুর্ধর্ষ মোগল সেনাপতি অতীতে একদা এই ঐক্যকে বিড়ম্বিত করবার শত চেষ্টা ক'রেও বিফল হয়েছিলেন। আমিনচাঁদ তো সেখানে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ।

রামচন্দ্রদেবের পালকি তখন বলরামের রথের 'চারে'র নীচে এসে পৌঁচেছিল। আঠারো গড়জাতের সামন্ত ও মোগলবন্দির জমিদারদের কাছে কাছে 'তড়াউ করণ', 'দেউল করণ', রাজগুরু ও 'সান পরিছা' প্রমুখ সেবাধিকারীদের নিয়ে 'চারে'র উপর ওঠবার সময় "জয় গজপতি

1. টমক(-অ)—ডিণ্ডিম, ঢেঁটরা ঢাক।

চলন্তি বিষ্ণু রামচন্দ্রদেবের জয়" ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হচ্ছিল। সেই ভিড়ের মধ্যে আমিনর্চাদ 'বড় পরিছা' গৌরী রাজগুরুর সন্ধান করছিলেন, কিন্তু তাঁকে দেখতে পেলেন না।

সূর্যাস্তের তখনও বিলম্ব ছিল। কিন্তু দক্ষিণ দিক থেকে যে খণ্ড খণ্ড মেঘ ভেসে আসছিল তা ক্রমে ঘনীভূত হয়ে আকাশের আলো ঢেকে আনছিল। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা পুবে হাওয়ার দমকায় রথের বনাত ও পাটের সাজ ফুলে ফুলে উঠছিল, নিশানগুলি পত পত ক'রে উড়ছিল। দূরে মেঘের গর্জন গুমরে গুমরে উঠছিল।

রামচন্দ্রদেব সামন্ত রাজা ও জমিদারদের নিয়ে বলরাম ও সুভদ্রার রথে 'ছেরাপহরা' ক'রে এবার জগন্নাথের রথের 'চারে' উঠেছিলেন 'ছেরাপহরা' করতে। শালপ্রাংশু দেহে অনমনীয় ঋজুতা। পরিধানে তাঁর ক্ষীরোদি পটবস্ত্র, স্কন্ধে পীত উত্তরীয়।

এই রামচন্দ্রদেব জাত হারিয়ে যবন হওয়ার কথা তখন কারও চিন্তাকে কিন্তু স্পর্শ করছিল না। রামচন্দ্রদেব প্রথমে গরাবড়ুর হাত থেকে 'হাতুআণি' নিয়ে প্রণাম ক'রে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার সময় 'মণিমা' 'চলন্তিবিষ্ণু' 'মহাবাহু' প্রভৃতি নিনাদ আকাশের মেঘগর্জনকেও ডুবিয়ে দিচ্ছিল। বৃষ্টি আসতে থাকায় 'কালবেঠিআ'রা বলরাম ও সুভদ্রার রথ থেকে 'চার' খুলে কাঠের তৈরি সারথি ও ঘোড়ার প্রতিমূর্তিগুলি তাতে লাগাচ্ছিল। রথ আজ বলগণ্ডিতে পৌঁছাবে এমন মনে হয় না। জগন্নাথের রথে 'ছেরাপহরা' শেষ হ'তে হয়তো সন্ধ্যাই হয়ে যাবে। তবু শ্রীগুণ্ডিচার দিন রথ না চললে চরাচর সংসারের অমঙ্গল আশঙ্কা। এক হাত হলেও চলা চাই। সেইজন্য জগন্নাথের রথে 'ছেরাপহরা' রামচন্দ্রদেব শীঘ্র শীঘ্র সারছিলেন। 'ঘটুআরি' ও 'ভাণ্ডার মেকাপ' রথের উপরে রুপার পিঙ্গণ থেকে চন্দন-জল ও শুক্লফুল

ফেললেন, ঝড়ে সে সব উড়ে বাইরে গিয়ে পড়ছিল। ঝড়ের বেগ তখন ক্রমশঃ বেড়ে উঠে রথের চূড়ার মণ্ডণি উড়িয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু ঝড়ও যত বাড়ছিল 'মণিমা' 'মহাবাহু' প্রভৃতি ধ্বনিতেও রথদাণ্ড ততই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

সোনার ঝাড়ুতে রথের চারিদিক ঝাঁট দিয়ে রামচন্দ্রদেব আবার 'চারে'র উপর থেকে যখন নামলেন তখন টোপাকুলের মত বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা টপাটপ করে পড়তে শুরু করছে। এর পর কেবল রথ টানা ছাড়া আর কোনো দর্শনীয় বিধি ছিল না। 'পঞ্চকোশী যাত্রী'রা তাই বৃষ্টি আসতে দেখে যে যেদিকে পারে দৌড়ে পালাচ্ছিল। রথ-দাণ্ডের উপর মেঘের অন্ধকার আসন্ন সন্ধ্যাকে ত্বরান্বিত করছিল। ঝড় ও বৃষ্টির গর্জনের মধ্যে যাত্রীদের কোলাহলে 'টমক', 'বিজিঘোষ' প্রভৃতির বাদ্যরোল চাপা প'ড়ে যাচ্ছিল।

রামচন্দ্রদেব সেই বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে জগন্নাথের রথ থেকে 'চার' খোলা, কাঠের ঘোড়া ও সারথি লাগানো প্রভৃতি কাজের তত্ত্বাবধান করছিলেন।

শ্রীগুণ্ডিচাতে এবার রথটানা হতে না পারলে "যবন" রামচন্দ্রদেব রাজবিধি করায় পরমেশ্বরের চক্রে তাঁর রথ চলল না, বিরুদ্ধপক্ষ নিশ্চয় এমনি এক প্রচার আরম্ভ করবে। হাজার হাজার যাত্রী রথ না চলা পর্যন্ত যারা উপবাস ক'রে ব'সে আছে তারা আবার কাল রথ চলা পর্যন্ত খাড়া উপোস ক'রে থাকবে। রামচন্দ্রদেব বহু চেষ্টায় এ পর্যন্ত তাঁর হৃত প্রতিষ্ঠার যে পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন তা নিমেষের মধ্যে আবার ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তাই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে যখন 'বড় পরিছা' এতক্ষণ পরে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে 'মুদিরথ'কে সঙ্গে নিয়ে রামচন্দ্র-দেবের কাছে এসে বললেন "রথটানা আজ বন্ধ রাখতে আদেশ হোক,

কাল সকালে বৃষ্টি ধ'রে গেলে রথ চলবে", তখন তিনি সংক্ষেপে শুধু বললেন, "রথ আজ অন্ততঃ এক হাতও নিশ্চয় চলবে।"

ততক্ষণে 'চার' খোলা আর ঘোড়া সারথি লাগানো হয়ে গিয়েছিল। 'কালবেঠিআ'রা বলরামের রথের দড়ি ধ'রে কোমর বেঁকিয়ে হুঁ হাঁ শব্দ ক'রে রথটানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। শঙ্খ ঘন্টা শিঙ্গা আর মাদলের বাদ্যরোলে ঝড়বৃষ্টির প্রলয়ঙ্কর গর্জন নীরব হয়ে গিয়েছিল।

"জয় জগন্নাথের জয়" "জয় গজপতি রামচন্দ্রদেবের জয়" ইত্যাদি ধ্বনি এবং ঝড়বৃষ্টির কোলাহলের মধ্যে রথ গড় গড় ক'রে চলতে আরম্ভ করল।

এ যেন কেবল জগন্নাথের নন্দিঘোষ রথযাত্রা নয়, ওড়িশার অপরাজেয় গণমানসের, অজেয়াত্মা মানুষের, দুরন্ত চৈত্রযাত্রা।

আমিনচাঁদ আশাহত সারমেয়র মত ঝড়বৃষ্টির মধ্যে সেখান থেকে মার্কণ্ডেশ্বরসাহির লণ্ডা মঠে তার ডেরার দিকে ফিরে গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

1

চিলিকা ও সমুদ্রের মাঝখানে তণ্ডাকিনারেব কাশে ভরা অফুরন্ত বালুচর দক্ষিণে বজ্রকোট কন্দা নদীর বুঁজে যাওয়া মোহানা থেকে উত্তরে মাণিকপাটণা মোহানা পর্যন্ত মরা অজগরের মত এলিয়ে প'ড়ে আছে। তার ধারে ধারে বেনাবন, শরবন, কোথাও কোথাও একটা কচিলা গাছ নয়তো নিঃসঙ্গ একলা তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে, কিংবা কতগুলি দীর্ঘশ্বাসী ঝাউগাছ বাতাসে মাথা ঝাঁকিয়ে হাহুতাশ করছে। জগন্নাথ বলবাম সাদা ঘোড়া আর কালো ঘোড়ায় চ'ড়ে নাকি এই তণ্ডাকিনারের পথে একদিন কাঞ্চিযুদ্ধে যাত্রা কবেছিলেন ওড়িশাব রাজা পুরুষোত্তম-দেবের মানরক্ষা করতে।

সরদেঈ অলস হাতে সেই সরু বালি এক মুঠো তুলে নিয়ে কপালে মাখলে। ভিজে বালি যেন কর্পূরশীতল স্পর্শে সরদেঈয়ের অবসন্ন দেহ-মন স্নিগ্ধ ক'রে তুলল।

সবদেঈয়ের ক্লান্ত চোখের স্তিমিত দৃষ্টিতে ভেসে উঠল সেই এক-দিনের এমনি এক নির্জন বালুপ্রান্তরে দ্বিপ্রহর বেলা। তাঁর শ্বশুর-বাড়ির গ্রামে মালকুদায় খোর্ধার রাজার মূর্তি, কাঠফাটা রোদে এক ফোঁটা জলের জন্য তাঁর আকুল আবেদন। সরদেঈ তাব বাম বাহুতে মুসলমান লশকরের সেই বর্শার আঘাতের ক্ষতচিহ্নের দিকে চেয়ে

দেখল। সে ক্ষত তো বহুদিন হ'ল শুকিয়েছে, কিন্তু মোছে নি তার চিহ্ন— বেদনা ও আনন্দে মেশানো সে এক স্মৃতি।

নির্জন তণ্ডাকিনারে সমুদ্রের হাওয়াটাও যেন গুমট গরমের ক্লান্তিতে কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। দলে দলে হাঁস, বক, পানকৌড়ি কলনিনাদে কখনও চিলিকার জলে নামছে আবার উড়ে যাচ্ছে। কেবল 'এরাপক্ষী'রা[1] চরের উপরে মৌনীর মত নত দৃষ্টিতে ব'সে রয়েছে, মাঝে মাঝে কেবল ডানা মেলে যেন আড়মোড়া ভেঙে নিচ্ছে।

মাত্র কয় দিন আগে এই তণ্ডাকিনারে দক্ষিণের রথযাত্রীর দল পিঁপড়ের সারির মত পুরীর দিকে চলেছিল। সেই দক্ষিণী যাত্রীদের মধ্যে একজন সেই নিজন ঝাউগাছের তলায় মহামারীতে শেষ শয়নে শুয়েছিল। একপাল শকুন তার দেহটা টেনে হিঁচড়ে খেয়েছে। যে কঙ্কালটা প'ড়ে আছে কাল রাত্রির মধ্যেই বাতাসে উড়ে আসা বালিতে তার অধেকটা চাপা প'ড়ে গেছে। আর দুটো দিনে সবটাই বালির নীচে অদৃশ্য হবে। সেখানে কেবল সেই ঝাউগাছটা সেই অজানা তীর্থযাত্রীর জন্য পাগলের মত মাথা খুঁড়ে সোঁ সোঁ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবে। ক্রমে তার উপরে ছেয়ে যাবে নাম-না-জানা কত সবুজ লতা আর ফুলের রাশি।

একটা অবর্ণনীয় নিঃসঙ্গত। ও অনাগত মৃত্যুর আশঙ্কায় সরদেঈ মনে মনে আতনাদ ক'রে উঠল। মধ্যাহ্নের কোন বৃক্ষশাখায় নিঃসঙ্গ কপোতীর মত সরদেঈ আপন মনে ডেকে উঠল—

"জগুনি, হ্যাঁরে জগুনি— ই— ।"

সমুদ্রের দিক থেকে একটা ঝকা হাওয়া সরদেঈয়ের মর্মকাঁপানো ডাক চিলিকার আধ নীল আধ ধূসর বুকের উপরে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

জগুনি সেই সকাল থেকে নৌকা নিয়ে চিলিকার ভিতরে গেছে।

1. এরাপক্ষী— সাদা জলচর পক্ষীবিশেষ।

এখন বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে। জেলেদের তবু চিলিকা থেকে ফিরতে এখনও দেরি আছে। চটিতে যাত্রী নেই। পুরী থেকে 'বাহুড়া'[1] যাত্রা ফেরত অধিকাংশ যাত্রী এইখান থেকে নৌকায় উঠে চিলিকার উঠে চিলিকার ভিতরে মউসা-ব্রহ্মপুর দ্বীপে যায়। কবে একবার মোগলের হাঙ্গামার সময়ে জগন্নাথ পুরীক্ষেত্র ছেড়ে সেই দ্বীপে কিছুদিন আত্মগোপন ক'রে ছিলেন। নলখাগড়ার বনের ভিতরে যে 'জগতী'র[2] উপরে জগন্নাথ ছিলেন, সেই শূন্য 'জগতী' এখনও সেখানে পূজা পেয়ে থাকেন। সেইজন্য রসকুদা গাঁয়ে কয় ঘর পাণ্ডা ব্রাহ্মণ বৃত্তি পেয়ে সেখানে বসবাস ক'রে রয়েছেন। অন্ধারী পরগনায় তাঁদের জন্য খোর্ধার রাজা জমিও বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছেন। উলটা রথ ফেরত যাত্রীরা মউসা-ব্রহ্মপুর যাওয়ার সময়ে এই নীরব নিস্তব্ধ তণ্ডাকিনার আর-একবার জীবনচঞ্চল হয়ে উঠবে। চটিতে কাজ কারবার আবার কয়দিন জমে উঠবে। তখন কত দিন এমনি দু'দণ্ড নিরালায় ব'সে আপন মনে ভাববার, বুক কাঁপিয়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলার একটু সময়ও মিলবে না। এখন কিন্তু সব খালি খালি, নির্জন; নিশুতি জ্যোৎস্না রাতে সমুদ্র তীরের বালুচরে ফটিক-জল পাখীর বিলাপের মত।

সরদেঈ আপনাকে আপনি শুধালে—এ জীবনটা কি সত্যি? কতকগুলো আশা, কতকগুলো দীর্ঘশ্বাস, কতকগুলো যন্ত্রণা, আর ঐ তেপান্তরের বালির চরের মধ্যে নাম-না-জানা নীল ফুলের মত এক-একটা স্মৃতি, তাতে কাঁটা যত সুগন্ধও তত! হাত দিয়ে তুলতে গেলে তার সব পাপড়িগুলি আলাদা হয়ে ঝ'রে প'ড়ে যায়!

অনুশোচনায় সরদেঈর মন কানায় কানায় ভ'রে উঠছিল। সত্যি

1. বাহুড়া— উলটা রথ।

2. জগতী— উচ্চস্থান, যেমন পুকুরের মাঝখানে জলটুঙ্গি।

কি পাপিনী সে। এত জায়গা থেকে এত লোক রথে কালাঠাকুরকে দেখে জীবন 'মোক্ষ' করল, সে কিন্তু এমন হতভাগিনী যে এত কাছে থেকেও একবার 'চকাডোলা'কে দেখতে পেল না। ঐ তো সামনে দেখা যায় সাতপড়া ঘাটের করঞ্জাবন, সেখান থেকে পুরী মাত্র এক-বেলার পথ, নয়তো এক দিনের— রয়ে ব'সে গেলে। গোঁয়ার গোবিন্দ ছেলে জগুনিটা সেদিন বলেছিল, "চল্-না গো দেঈ, তোকে একেবারে রসকুদা ঘাটে নৌকোয় চড়িয়ে হরচণ্ডী নদী দিয়ে দিয়ে সোজা পুরীর নরেন্দ্র সরোবরে পৌঁছে দেব।"

মোগল হাঙ্গামা বাধলে ঠাকুর সেই পথে চিলিকার ভিতরে পালিয়ে আসেন।

কিন্তু তিনি তাঁর ডোরেতে না টানলে কি এ সংসারের জঞ্জাল ছেড়ে এত সহজে যেতে পারে মানুষ? সেইজন্যই তো প্রত্যেক বছরই রথ-যাত্রায় যাবার মন করলেও তার যাওয়া কখনও হয়ে উঠল না আজ পর্যন্ত। সত্যি, আর কি হয়ে উঠবে? সবদেঈর মনে পড়ল আজ তো সমাজের চোখে সে নাকি যবনভোগ্যা পতিতা, তাই বালুগাঁয় তার আর স্থান হ'ল না। রত্নবেদীর নীচে দাঁড়িয়ে 'চকাডোলা'কে একবার দু'চোখ ভ'রে চেয়ে দেখাব কি আর তার অধিকার আছে?

সরদেঈ আবার স্বপ্নে ডাকার মত ডেকে উঠল— "জগুনি, হ্যারে জগুনি— ই—।"

সমুদ্রের হাওয়াটা বুঝি কোথায় ঝাউগাছের ডালে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ জেগে উঠে সরদেঈর ডাক তেপান্তরের উপর দিয়ে চিলিকার ভিতরে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

এক ডাকের পথ এখান থেকে তণ্ডাকিনারের উপর রসকুদা গাঁ। সেখানে কয়ঘর নুলিয়া, কণ্ডরা, ওড়চষা আর ব্রাহ্মণের বাস। শরঘাস

দিয়ে ছাওয়া তাদের নিচু নিচু ঘরগুলি পোলাঙ্গ (-অ)[1] আর ঝাউ গাছের বনের ভিতরে রসকুদা গাঁ দেখতে লাগছিল যেন একতাল ঘুমন্ত অন্ধকার।

রসকুদার বাইরে দু'ডাক তফাতে কাঞ্চন ঢবা ব'লে পরিচিত এক-খানি ঘর। তণ্ডাকিনারের ধারে ধারে এমনি কতগুলি ঘর আছে, বাঁশ আর মাটি দিয়ে ছাওয়া সেগুলির ছাদ, পাথরের দেওয়াল। দক্ষিণী যাত্রী আর নৌকায় পাড়ি দেওয়া সাধবদের[2] অসময়ে আশ্রয়ের জন্য। কাঞ্চন বাঈ নামে কোন বারবনিতা নাকি আপন উপাজনের কড়ি দিয়ে জগন্নাথ-যাত্রীদের জন্য এই দুর্গম পথে এই-সব ঢবাঘর বানিয়ে দিয়েছিল। সেই ঢবাঘরগুলি এখন ডাকাত আর জাহাজী ফিরিঙ্গী বম্বেটেদের আড্ডা হয়েছে। অদূরে একটা ঢবাঘর বাতাসে উড়ে আসা সরু বালি শেওলা আর কে জানে কত বছরের বন্যার জল খেয়ে একটা ভূতকুঠির মত দেখায়। বালুগাঁ থেকে পালিয়ে এসে সরদেঈ সেই ঢবাঘরে তার নতুন চটি খুলেছে। 'কাঞ্চন বাঈ ঢবা'র বদলে লোকের মুখে এখন এ রসকুদা চটি নামে পরিচিত হয়েছে।

ঢবাঘরের পশ্চিমমুখো রোয়াকের ধাপটার নীচে সরদেঈ ক্লান্ত মনে শূন্য দৃষ্টিতে চিলিকার দিকে চেয়ে ব'সে ছিল।

ঝাঁকে ঝাঁকে বালিহাঁস, চকাচকী, কালীগউড়ুণী প্রভৃতি পাখী ঘণ্টশিলা পাহাড়ের দিকে উড়ে যাচ্ছিল। একটা বালিহাঁস অকারণে বার বার সেই ঢবাঘরের দিকে উড়ে এসে, সেখানে কী যেন খুঁজে না পেয়ে কখনও চিলিকার দিকে আর কখনও বা সমুদ্রের দিকে উড়ে পালাচ্ছিল।

1. পোলাঙ্গ (-অ)— বৃক্ষবিশেষ, এর বীজে প্রদীপ জ্বালাবার তেল হয়।
2. সাধব (-অ)— সওদাগর।
3. কালীগউড়ুণী— কৃষ্ণবর্ণ জলচর পক্ষিবিশেষ। গউড়ুণী অর্থে গোয়ালিনী।

চিলিকার ভিতর থেকে একখানি ডিঙি ঘাটের দিকে ফিরছিল। সরদেঈ আবার ডেকে উঠল— "জগুনি, হাঁারে জগুনি-ই- !"

কিন্তু সে ডিঙিতে বইঠা বেয়ে আসছিলেন রসকুদা গাঁয়ের পূজারী ব্রাহ্মণ, মাথার উপরে তালপাতার ছাতাটি তুলে। আজ তাঁর মউসা-ব্রহ্মপুর দ্বীপে জগন্নাথের শূন্য জগতীতে নিত্য-পূজার পালা ছিল।

সরদেঈ আপন মনে আবার নানা কথা ভাবতে লাগল।

আকাশ মেঘে ঢাকা, কিন্তু তাতে ছায়ার শীতলতা নেই। ছাই-ছাই ধোঁয়া-ধোঁয়া টুকরো টুকরো মেঘে আকাশ ছেয়ে রয়েছে। মেঘের ধারে ধারে দিয়ে সোনার জরির পাড় বসানো, সেখান থেকে অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে চিলিকার ওপারের পাহাড়টা এখান থেকে অস্পষ্টভাবে দেখা যায়, অথই দরিয়ার ওপারের ধোঁয়া-ধোঁয়া স্মৃতির ঝাপসা পর্দার মত। ঐ পাহাড়টার কাছেই তো বালুগাঁ, সেই তার অনাবশ্যক জীবনের কয়টা বছর সেই চটিতে দুঃখে সুখে কেটেছিল। হায় রে বিধাতা, সারা জীবনটা কি গড়া হয়েছিল এমনি ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মত উড়ে বেড়াবার জন্য ? সরদেঈর চোখ জলে ঝাপসা হয়ে উঠল।

বালুগাঁর সেই দিনিকর স্মৃতি একটা দুঃস্বপ্নের মত, ভোলবার শক্ত চেষ্টা করলেও সে চিলিকার এই ঢেউয়ের মত ফিরে ফিরে এসেছে বার বার, বার বার— সরদেঈয়ের বুকে মাথা কুটে মরতে, সরদেঈকে তিলে তিলে দগ্ধে মারতে।

যে ক্লেদাক্ত স্মৃতি ভোলবার জন্য সরদেঈ বার বার চেষ্টা করছিল সে যেন এই অতৃপ্ত বালিহাঁসটির মত বার বার ক্লান্ত ডানা নেড়ে ফিরে ফিরে উড়ে আসছিল সরদেঈয়ের কাছে।

বালুগাঁ-পেণ্ঠের সেই চটির রোয়াকের ধাপের উপর পা মেলে অকারণ অলস প্রতীক্ষায় সরদেঈ যেন কার আসা পথ চেয়ে ব'সে থাকে। চটি থেকে আঁকাবাঁকা সরু পথটি যেখানে টিকালী-রঘুনাথ-পুরের সড়কে গিয়ে উঠেছে সেই মোড়ের উপরেই হাঁড়িভাঙা বট— তার কাছে পাথর-বাঁধানো ইঁদারা— ইঁদারা থেকে একটু তফাতে একটা নিঃসঙ্গ লম্বা তালগাছ— বার বার সেই-সব নিত্য দেখা দৃশ্যের দিকে আর-একবার চেয়ে সরদেঈ কর্মহীন মুহূর্তগুলিতে সে-সবের ভিতর থেকে যেন একটা নূতন অর্থ, নূতন আশা, নূতন রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চেষ্টা করে, আর মাঝে মাঝে যেন আপন মনেই ডেকে ওঠে— "জগুনি, হ্যারে জগুনি— "

চটিতে কোনো যাত্রী থাকলে কিন্তু সেই পীড়াকর অর্থহীন প্রতীক্ষা সরদেঈকে তেমন চেপে ধরে না। কোমর দোলাতে দোলাতে কলসী কাঁখে নিয়ে দিনের মধ্যে একশো বার চটি থেকে সে বেরিয়ে যায় হাড়িভাঙা বটতলার ইঁদারা থেকে জল আনতে।

চটিতে তরুণ অথবা প্রৌঢ় বয়সের কোনো অতিথি থাকলে, আর সেও অকারণে পিপাসাবিষ্ট হয়ে থাকলে সরদেঈয়ের পিছন পিছন সেও বেরিয়ে আসে, চ'লে যায় হাঁড়িভাঙা বটতলার ছায়াঘেরা নির্জনতা পর্যন্ত। সরদেঈ পিছন-পানে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তৃষাতুর পান্থটির দিকে যখন তাকায় তখন সে আবিষ্কার করে ক্ষীণ হাসিমাখানো একটি সলজ্জ আমন্ত্রণ। সরদেঈ ইঁদারার গভীর জলে কলসী ডুবিয়ে কলসী ভ'রে দড়ি দিয়ে টেনে তোলার বেলায় তার জানু, নিতম্ব, দুই বাহু ও বক্ষোদেশের সুগোল আভাসে সে আমন্ত্রণ যেন তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। প্রতিশ্রুতিপূর্ণ নৈকট্য থেকে তৃষাতুর অতিথি দু'চোখ ভ'রে আর-একবার না দেখতেই কিংবা সরদেঈয়ের কলসী থেকে আকণ্ঠ পান করবার

জন্য অঞ্জলি প্রসারিত না করতেই সরদেঈ রসভঙ্গ ক'রে ডেকে ওঠে—
"জগুনি, হ্যাঁরে জগুনি—ই—।"

জগুনি কোথায় থাকে কে জানে, কখনো কেয়াবনের ভিতর থেকে আর কখনো বা সড়কের পাশের জঙ্গলের কোনো ঝোপের আড়াল থেকে সে চেঁচিয়ে উত্তর দেয়— "আমায় ডাকলি নাকি, দেঈ ?"

জগুনির আকস্মিক আবির্ভাবে পথিকের তৃষ্ণা বিতৃষ্ণায় পরিণত হয়।

যারা সরদেঈয়ের চটির সঙ্গে পরিচিত, সেখানে জানাশুনা অতিথি, তারা বুঝেছে যে সরদেঈয়ের অস্বীকৃতি নেই, আছে অসম্মতি। রসিকজনে তাই উপমা দিয়ে বলে সরদেঈয়ের পিছনে সেটা যেন বাত-কম্পিত পদ্মদলের উপরে উড়ন্ত ভ্রমরের সেই পদ্মের হৃদয় আবিষ্কার করার ব্যর্থ প্রয়াসের মত। পদ্মদলের কম্পনে ভ্রমরের প্রতি অস্বীকৃতি তো থাকে না, থাকে হয়তো ব্রীড়াকম্পিত ভীতি। তা অসম্মতি হোক বা ভীতিই হোক, পরিণাম একই : ভ্রমরের মধুতৃষা মেটে না। সরদেঈকে তাই জয় করার জন্য নিজেদের মধ্যে বাজি লাগিয়ে অতীতে বহু রসিক কতবার হার মেনেছে।

এক-একবার নিশুতি রাতের বিনিদ্র মুহূর্তে সরদেঈ আত্মপরীক্ষা করে দেখেছে অজানা অতিথিদের প্রতি তার আপাতনিরুত্তাপে ভয় আছে বটে কিন্তু কুণ্ঠার তো লেশমাত্র নেই। কোনো পরদেশী পান্থ যদি অকুণ্ঠ বল প্রয়োগে লুণ্ঠন করত তার সরম ও সংকোচের আবরণ, দুই ক্ষুধিত হাতে ও ওষ্ঠে যদি সবলে টেনে ফেলে দিত তার আবরু, তা হলে সে কি বাধা দিত ? হয়তো না। তবে সেই-সব রসঘন মুহূর্তে সরদেঈ চীৎকার ক'রে জগুনিকে ডেকে রসভঙ্গ করে কেন ? আগন্তুকের লুব্ধ হৃদয়ে আকুল আকাঙ্ক্ষা আরো প্রবর্ধিত করবার জন্যই

নয় তো ? সেই নিষ্ঠুর রসভঙ্গের মধ্যে কিন্তু সরদেঈ এক অনাস্বাদিত পুলক-শিহরণ অনুভব ক'রে থাকে।

সেদিন এক মোগল লশকর ঘোড়ায় চ'ড়ে চিকাবোল থেকে কটক যাওয়ার পথে হঠাৎ সরদেঈয়ের চটিতে একটা দিন ছিল। নির্জন মধ্যাহ্ন। চৈতালী হাওয়াটা অনেক নাচানাচি ক'রে নবকুসুমিত পলাশ আর শাল্মলী শাখায় দু' দণ্ড শুয়ে ঝিমুচ্ছিল। হাড়িভাঙা বটগাছের রাশি রাশি শুকনো পাতা অতীতের স্মৃতির মত ঝ'রে পড়ছিল নীচে। সরদেঈয়ের কলসীতে সেদিন দুপুরে সত্যিসত্যিই এক ফোঁটা জল ছিল না, কিন্তু কলসী নিয়ে ইঁদারা থেকে জল আনতে যেতে সেদিন তার বড় ঘৃণা হচ্ছিল। সেই লশকরটিকে দেখে অবধি কে জানে কেন সরদেঈ এক অজানা আশঙ্কায় আতঙ্কে মনে মনে সকড়ে গিয়েছিল।

তবু যেতে হল।

আঁকাবাঁকা সরু পথে কলসী কাঁখে ইঁদারার দিকে যাবার সময় সেদিন অন্যান্য দিনের মত স্বপ্নাবিষ্ট তন্দ্রালসতায় তার পা-দুটি জড়িয়ে যাচ্ছিল না, কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে পিছন দিকে চাইবার মত সে মনে সাহস খুঁজে পাচ্ছিল না। তবু কখন আপনার অজ্ঞাতসারেই বুঝি পিছন ফিরে চেয়ে ঘোড়ার পিঠে সেই লশকরকে তার অনুসরণ করতে দেখে ভয়ে সরদেঈয়ের হাত-পা সেঁধিয়ে গেল। অন্য দিন সে চীৎকার ক'রে জগুনিরে ডাকে নিষ্ঠুর রসিকতায়, সেদিন কিন্তু জগুনির নাম ধ'রে বার বার ডাকল আর্ত হয়ে, আর্তনাদ ক'রে। লশকরের দুই ক্ষুধিত চোখ ব্যাধের শরের মত তাকে বিদ্ধ করবার জন্য তার অনুসরণ করছিল। ব্যাধভীতা হরিণীর মত যতই আর্তনাদ করছিল লশকরের হিংস্র লোলুপতাও তত বেড়ে উঠছিল।

লশকরকে পথ ছেড়ে দেবার জন্য সরদেঈ এক ধারে স'রে গিয়ে মাথায় কাপড় টেনে মুখ নিচু ক'রে দাড়িয়ে রইল। আঃ···জগুনি যদি তখন অন্যান্য দিনের মত সেখানে এসে পড়ত। কিন্তু অদৃস্ট সেদিন বাদ সাধল। লশকরের কালো ঘোড়াটা দুই পা শূন্যে তুলে সরদেঈয়ের কাছেই এসে থেমে গেল। লশকর হঠাৎ লাগামটা টেনে ধরায় ঘোড়া ক্রুদ্ধ হ্রেষারব ক'রে উঠল।

সরদেঈ আহ্লাদ ক'রে উঠল— "জগুনি, ওরে জগুনি— ই— ই—।"

কিন্তু জগুনি তখন সেখানে কোথাও ছিল না। অন্য দিন সরদেঈ ডাকমাত্র কাছাকাছি কোথাও থেকে সে বেরিয়ে আসে, কিন্তু আজ তার কোনো সাড় পাওয়া গেল না।

সামনেই ঘোড়ার পিঠে লশকরকে দেখে সরদেঈ ভয়ে পাথর হয়ে গেল। সে জানে এরা চিকাকোলের ফৌজদারের লশকর, এদের লোলুপতা থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ নয়। এদের আবার সাত খুন মাপ। চটিতে স্থান না দিলে হ'ত, কিন্তু সরদেঈর মত অসহায়ার পক্ষে কি সেরকম কিছু করবার সাধ্য ছিল?

লশকরের দিকে চোখ তুলে চাইবারও তখন সরদেঈর সাহস ছিল না। মাথার ঘোমটাটা আরও নীচে টেনে দিতে দিতে বিচলিত অসতর্কতায় কাঁখের কলসী মাটিতে প'ড়ে ভেঙে গেল।

লশকর সরদেঈয়ের অসহায়তা দেখে অট্ট হেসে খাপ থেকে তলোয়ার বার করল। তলোয়ারের ডগা দিয়ে সরদেঈয়ের কপালের উপর থেকে লাল ডুরে শাড়ীর ঘোমটাটা সরিয়ে দিতেই সরদেঈয়ের শঙ্কাবিশুষ্ক মলিন পদ্মদলের মত মুখখানি বেরিয়ে পড়ল। তার যে আয়ত স্নিগ্ধ চোখ দুটি অপরিচিত পথিকের দিকে চেয়ে অন্য দিন

উজ্জ্বল প্রসন্নতায় সস্মিত হয়ে ওঠে তা আজ আশঙ্কায় আতঙ্কে শিশিরদিগ্ধ কমলের মত মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। সরদেঈর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছিল।

সরদেঈয়ের সেই ভয়ার্ত ব্রীড়ালাঞ্ছিত অসহায় মূর্তি প্রৌঢ় লশকরের সমস্ত সুপ্ত দেহকামনাকে চঞ্চল ও উদ্দীপ্ত ক'রে তুলেছিল। ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝুঁকে পড়ে বাঁ হাতে সরদেঈকে এক অসহায় শিকারের মত ছোঁ মেরে সে তুলে নিল ঘোড়ার পিঠে, তার পরেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সড়কের আর পারের অরণ্যের মধ্যে। সরদেঈ লশকরের বাহু-বন্ধনের ভিতরে অসহায় আর্তনাদ করছিল— "জগুনি, ওরে জগুনি —ই!"

অবশেষে জগুনি সরদেঈয়ের আর্ত চীৎকার শুনতে পেয়ে যখন দৌড়ে এল তখন লশকর অরণ্যের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। জগুনির ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত একটা তীর একটা শিমুল গাছের গায়ে বিঁধে গিয়ে যেন নিষ্ফল ক্রোধে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল।

সে পঙ্কিল স্মৃতি আজও সরদেঈয়ের দেহকে যেন ক্লেদাক্ত ক'রে দেয়। এক উৎকট বিবমিষায় সরদেঈয়ের মন জর্জরিত হয়ে ওঠে। কিন্তু মন থেকে সেই ক্লিন্ন স্মৃতিকে বিদায় ক'রে দিতে সে যত চেষ্টাই করুক বার বার তা ফিরে ফিরে আসে— এই তগুাকিনারের বালুচরের উপর দলে দলে বালিহাঁসের মত।

অরণ্যের মধ্যে একটা শালগাছের উপরে সাদা ফুলের একটি লতা জড়িয়ে উঠে সেখানে এক ছায়াঘন কুঞ্জ রচনা করেছিল। কোলে সরদেঈয়ের উলঙ্গপ্রায় দেহটিকে নিয়ে লশকর সেইখানে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামল। সরদেঈকে দুটি অসহায় হাতে আপন অনাবৃত বক্ষ ঢাকবার বৃথা চেষ্টা করতে দেখে লশকর যে অট্টহাস্য ক'রে উঠল

তাতে সরদেঈ ভয়ে থর থর পদে অর্ধমৃতের মত সেইখানে লুটিয়ে পড়ল।

তখন সরমে সংকোচে বাধা দেবার মত মানসিক শক্তি সরদেঈয়ের লোপ পেয়েছিল, কিন্তু লশকর সরদেঈয়ের অসহায় দেহের উপর ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে অল্পক্ষণের মধ্যে নির্বীর্যের মত অবসন্নভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এক সম্পূর্ণ অসহায়া রমণীকে অপহরণ ক'রে ঘোড়ার পিঠে নিজের কোলের মধ্যে সবলে চেপে ধ'রে এতখানি পথ নিয়ে আসবার উত্তেজনায় মধ্যে লশকরের ক্ষুদিত কামলালসার সমস্ত উদ্গার প্রায় নিঃশেষিত হয়েছিল। সরদেঈ বাধা দেবার চেষ্টা করলে, কুপিতা ব্যাঘ্রীর মত তার দেহকে পল পল ক'রে দংশন করলে হয়তো লশকরের কামনা আরও হিংস্র হয়ে উঠত! কিন্তু সরদেঈ যেমন নিরীহভাবে আত্মসমর্পণ ক'রে জড়পিণ্ডের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তাতে লশকরকে নির্বীর্যবৎ নিস্পৃহ ক'রে দিয়েছিল। সরদেঈর তখন আর জ্ঞান ছিল না।

এক অহেতুক হিংস্রতায় লশকর সরদেঈয়ের ভূলুণ্ঠিত উলঙ্গ দেহে পদাঘাত ক'রে ঘোড়ার পিঠে উঠে অরণ্য থেকে বেরিয়ে গেল।

বহুক্ষণ পরে সরদেঈয়ের চৈতন্য যখন ফিরে এল তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢ'লে পড়েছে। চৈতালী হাওয়ার মর্মর শব্দে বনভূমি মুখরিত হয়ে উঠেছিল। সরদেঈ পাগলিনীর মত বিস্রস্ত বেশবাসে টলতে টলতে চটির দিকে ফিরে চলল। জগুনিকে ডাকবার তখন তার সাহস ছিল না। ফিরে এসে জগুনিকে বরং চটিতে না দেখে সরদেঈ মনে মনে আশ্বস্ত হ'ল।

তার পরদিন কিন্তু দাবাগ্নির মত বালুগাঁ অঞ্চলে লোকের মুখে মুখে র'টে গেল সরদেঈ মুসলমান লশকরকে দেহদান ক'রে পতিতা হয়েছে।

বালুগাঁর অন্যান্য চটির যে মালিকরা প্রতিযোগিতায় সরদেঈ-চটির সঙ্গে আঁটতে না পেরে প্রায় হাত বন্ধ ক'রে ব'সে ছিল তারা এই ঘটনাকে পল্লবিত ক'রে চারিদিকে রটিয়ে দিল যে সরদেঈ যবনভোগ্যা হয়ে পতিতা হয়েছে, তার হাত থেকে জলগ্রহণেও পাতক দোষ হবে। সরদেঈ যাদের কখনও কোনও ভাবে আঘাত দিয়েছিল, নিরাশ করেছিল, তারাও সে অপবাদে টীকাটিপ্পনী জুড়ে দিতে ছাড়ল না। সেজন্য হাঁড়িভাঙা বটতলার ইঁদারার পাড়ও অগম্য হয়ে গেল। সরদেঈয়ের কাছে সমাজের সকল দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল। সে যবনোচ্ছিষ্টা ব'লে তার চটিতে পথিক যাত্রীদের আসাও বন্ধ হ'ল।

একদিন জগুনি কোথায় ঘুরে ঘুরে এসে সরদেঈকে বললে, "চল্, আমরা এখান থেকে চ'লে যাই, দেঈ।"

কিন্তু কোথায়? সে কথা জিজ্ঞাসা করতেও সরদেঈ মনে সাহস খুঁজে পাচ্ছিল না।

তারপর একদিন বালুগাঁ-পেণ্ঠে গ'ড়ে ওঠা সংসারের অবশেষ ও লাঞ্ছিত নারীত্বের বিড়ম্বনা সঙ্গে নিয়ে সরদেঈ জগুনির সঙ্গে চিলিকার বুকে নৌকা ভাসিয়ে দিয়েছিল।

এই তণ্ডাকিনারে কতদিন পরে সে খুলেছিল নতুন চটি। সেখানে তীর্থযাত্রী পথিকেরা কিংবা স্থানীয় লোকেরা কেউ জানত না সরদেঈয়ের বিড়ম্বিত অতীত। তণ্ডাকিনারে বিভিন্ন স্থানে এমনি অনেক চটি ছিল, তাদের মধ্যে এ কেবল আর-একটি নতুন চটি খুলল।

এক দল 'এরা' পক্ষী ডানা ঝাড়তে ঝাড়তে চটির সামনে বালুচরে এসে নামল।

জগুনি একটা নৌকায় লগি ঠেলে ঠেলে তীরের দিকে ফিরছিল। তার মাথার উপরে কতকগুলি বালিহাঁস গোল হয়ে উড়ছিল।

তার সঙ্গে নৌকায় আর দু'জন কে আসছিল কে জানে। তাদের কিন্তু সেখানকার লোক ব'লে মনে হয় না। নৌকা থেকে নেমে তারা চিলিকার ধার দিয়ে দিয়ে বসকুদা গাঁয়ের দিকে চ'লে গেল। তাদের ক্রমশ কাছে আসতে দেখে 'এরা' পক্ষীগুলি ডানা ঝাড়া দিল কিন্তু উড়ে গেল না। সবদেঈ অভ্যাসমত ডেকে উঠল— "জগুনি, হ্যারে জগুনি— হ—।"

কিন্তু জগুনি কোনো উত্তর না দিয়ে জালটা কেধে ফেলে হাতে দুটো মাছ ঝুলিয়ে, মাথা নিচু ক'রে চিন্তিতভাবে ফিরে আসছিল।

সবদেঈ শুধাল, "তুই কোথায় ঘুরছিলি রে জগুনি? তোর জন্য ব'সে থেকে থেকে বেলা যে ঘুরিয়ে এল সে।"

জগুনি শুধু কোনো উত্তর না দিয়ে হাত থেকে মাছদুটো থপাস্ ক'রে মাটিতে ফেলল। মাছদুটো দেখে সবদেঈ ব'লে উঠল, "আরে, এ তো 'কণ্ডল' মাছ! চিলিকায় এ মাছ মারা হ'লে দেশে আকাল পড়ে।"

জগুনি আবার চিলিকার ধারে ফিরে চলেছিল। সরদেঈ বললে, "সারা দিন না খেয়ে না দেয়ে ফিরেছিস, আবার কোথায় বেরুচ্ছিস রে জগুনি?"

পশ্চিম থেকে দমকা হাওয়া ঝড়ের সংকেত বয়ে আনছিল, সরদেঈয়ের কথা সেই হাওয়ায় সমুদ্রের দিকে উড়ে গেল। জগুনি বললে, "ঐ লোক দু'জন আমাকে সারা দিন চিলিকার মধ্যে গুরুবাঈ থেকে বরুণকুদা, বরুণকুদা থেকে মউসা-ব্রহ্মপুর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হয়রান পরেশান ক'রে দিয়েছে। কড়ি চাইলাম, তা বললে রসকুদা গাঁয়ে বলি

পধানের ঘরে এসো। সেখানেই তারা ডেরা গেড়ে আছে।"

সরদেঈ শুধালে, "কে রে ওরা ?"

জগুনি ক্লান্তভাবে উত্তর দিল, "কে জানে। বলছে তো খোর্ধার রাজার লোক, চিলিকার দ্বীপগুলোতে ঘুরে ঘুরে কী তারা খুঁজছিল, যত শুধোলাম কিছু বললে না।"

সরদেঈ ভাবল, ওরা যাত্রী হবে বা, মউসা-ব্রহ্মপুর দ্বীপে জগন্নাথের জগতীতে পুজো দিতে এসেছিল। অমন অনেক যাত্রী তো আসে এখানে, তখন তাদের নৌকার দরকার হয়। তাদের নৌকা ক'রে নিয়ে যাওয়া-আসা করা জগুনির আর-এক ব্যাবসা।

বালি ওড়ানো ঝ'ড়ো হাওয়ার মধ্যে জগুনি ততক্ষণে রসকুদা গাঁয়ের বলি পধানের ঘরের দিকে একমুখো ছুটেছে— নৌকোর কুড়ি আদায় করতে।

সরদেঈ সেই হাওয়ার মধ্যে চেঁচিয়ে বললে, "শিগ্‌গি—ই—র ফিরে আসবি রে জগুনি, ঝড় আসছে।"

নৌকার পালের মত খণ্ড খণ্ড ভাসা মেঘের ফাঁক দিয়ে অপরাহ্ণের সূর্য একবার মুখ বার করল। বালিহাঁসদের ডানায় কে যেন হঠাৎ মুঠো মুঠো আবীর মাখিয়ে দিয়েছে। জটিআ 'নাসি' আর ঘণ্টশিলার ওপারে দিগন্তরেখার ধারে ধারে উড়ন্ত শিমুল তুলোর মত মেঘগুলিতে মুঠো মুঠো ফাগ ঝলকে উঠে আবার ক্রমে ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল। চিলিকার কালো জলের উপরে লাল আলোর একটা সিঁদুরে রেখা ফুটে উঠে ঢেউয়ের ধাক্কায় খণ্ড খণ্ড হয়ে কোন অতল জলে তলিয়ে গেল। ঘণ্টশিলা পাহাড়ের দিক থেকে ঝড় বাতাস ডানা মেলে ছুটে এল।

ঘরের ভিতরে ফিরে যেতে সরদেঈর ইচ্ছে করছিল না। এমনি ঝড়-আসা চেয়ে চেয়ে দেখতে তার চিরকাল ভাল লাগে। চিলিকার

পাখির দল কলরব ক'রে চিলিকার ভিতরের দ্বীপগুলিতে উড়ে পালাচ্ছিল। ঝড় ক্রমে বাড়ছিল। ঝাউগাছগুলি পাগলের মত মাথা ঝাঁকিয়ে নাচতে শুরু করেছিল।

এক ডাকের পথ তফাতে, তণ্ডাকিনারে দুই বালিয়াড়ির মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ পথ বেরিয়ে ডাইনে মোড় ভেঙে ঘুরে এসেছে। পথের দুই দিকে দুই তালগাছ সেই বালিয়াড়ি-সংকটের জাগ্রত প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। সরদেঈ ঝড়ের দিকে মুখ ক'রে চোখ কুঁচকে দু'হাতে মুখ ঢেকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখল একজন ঘোড়সওয়ার সেই ঝড়ের মধ্যে চটির দিকে আসছে। অনেক আগে দক্ষিণের দিকে ঘোড়সওয়ারদের যাওয়া-আসা করার পথ ছিল এই তণ্ডাকিনার, কিন্তু এখন এ পথে সাধারণত তারা আর যায় না, চিকাকোল-কটক সড়ক দিয়েই এখন তাদের যাতায়াত। মালুদে মোগল ফৌজদারের ঘোড়-সওয়ার আর সিপাই লশকররা ঘাঁটি করেছে, কিন্তু এ পথে তারাও সাধারণত যাতায়াত করে না। তাই হঠাৎ একজন ঘোড়সওয়ারকে সেদিকে আসতে দেখে সরদেঈয়ের বুক অজানা আতঙ্কে কেঁপে উঠল। আর, আজও জগুনি নেই!

সরদেঈ প্রাণপণে চীৎকার ক'রে উঠল— "জগুনি, ওরে জগুনি —ই—ই—!"

কিন্তু বাতাসের শব্দের মধ্যে সরদেঈয়ের আর্ত চীৎকার ডুবে গেল। ঘোড়সওয়ার ততক্ষণে চটির কাছাকাছি এসে গেছে। হাওয়ায় তার মাথার পাগড়ি, গায়ের সুজনি ফুলে ফুলে উঠছে। আরো দু'জন ঘোড়সওয়ার একজনের পিছনে আর-এক জন আসছে মনে হল। সরদেঈ ঘরের ভিতরে পালাবে কিনা ভাবতে ভাবতে প্রথম ঘোড়-সওয়ার তার কাছে এসে উপস্থিত হ'ল।

ঘোড়াটা দেখে সরদেঈ প্রথমে একটা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে উঠল— এ ঘোড়ারও রঙ কালো! এরও মাথায় ঠিক তেমনি নাক অবধি লম্বা সাদা টিপ! বালুর্গাঁর সেই বিষাক্ত স্মৃতি সরদেঈকে অবশ ক'রে তুলছিল। কিন্তু এই ঘোড়সওয়ারের চোখে সেই লশকরের হিংস্র লোলুপতা নেই। এই দুটি চোখেও আগুন আছে, কিন্তু তাতে ফুলকি নেই। সে চোখের দৃষ্টি মর্মস্থলকে উষ্ণ করছিল, কিন্তু উত্তাপে দগ্ধ করছিল না। অশ্বারোহী নবীন যুবা। কপালের উপরে জরিদার পাগড়ি ছাপিয়ে কুঞ্চিত কেশের স্বেদসিক্ত কয়েকটি ভ্রমরকৃষ্ণ রেখা। দীর্ঘ উন্নত নাসা। তার নীচে শৈবাল রেখার মত নবজাত গোঁফের নীচে দুটি স্ফুরিত অভিমানী ওষ্ঠাধর সামান্য উন্মুক্ত। নাকের দুই পাশ দিয়ে দুটি অর্ধ বৃত্ত বলিরেখা চিবুক পর্যন্ত নেমে এসে মুখখানিকে কোমল ও সংবেদনশীল ক'রে তুলেছে। অপরিচিত অশ্বারোহীর এই অরুণ মূর্তি সরদেঈয়ের মানসপটে আর-একজনের স্মৃতি উদ্রিক্ত করছিল। সেই অন্য জন যেন বহু পরিচিত কিন্তু তাকে কবে সরদেঈ কোথায় কী ক'রে দেখেছিল তা সেই বিচলিত মুহূর্তে সে মনে ক'রে উঠতে পারছিল না।

তরুণ 'অসুআর' তার ঘোড়া থামাবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও ঘোড়াটি অসহিষ্ণুভাবে এগিয়ে আসতে যুবক হঠাৎ সবলে লাগাম কষায় ঘোড়া পিছনের পা দুটো বালিতে গেঁথে সামনের পা দুটো শূন্যে তুলে দাঁড়িয়ে উঠে চিঁহি চিঁহি রবে ডেকে উঠল। সরদেঈ সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে পালাতে গেল, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ঝ'ড়ো হাওয়া বাদ সাধলে! সরদেঈয়ের শাড়ীর লাল আঁচলটা হাওয়ায় উড়ে ঘোড়ার রেকাবে কেমন ক'রে আটকে গিয়েছিল, সরদেঈ রোয়াকের ধাপটাতে পা দিতেই পিছন থেকে হঠাৎ আঁচলে টান পড়ল। ভয়ে বিস্ময়ে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে

তাকাতেই সেই টানে সরদেঈর বাঁ দিকের বুকের আঁচল খ'সে পড়ল। উন্মুক্ত বাম স্তনের সঙ্গে দক্ষিণ স্তনমলের বর্তুল রেখাও দৃষ্টিগোচর হ'ল। কেবল মাথার চুলগুলি ঝোড়ো হাওয়ায় আলুথালু হয়ে বুকে এসে প'ড়ে তার লজ্জা নিবারণ করছিল। শাড়ীর আচল ঘোড়ার রেকাবে আটকে হাওয়ায় পত পত ক'রে উড়ছিল যেন এক প্রগল্ভ রসিকতায়। অশ্বারোহী সরদেঈয়ের অনাবৃত দেহশোভা লক্ষ্য করতে করতে স্থান ও কাল, সময় ও পরিবেশ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিল। নইলে রেকাব থেকে শাড়ীর আঁচলটি খুলে দিয়ে সরদেঈকে সেই দুর্যোগ থেকে মুক্তি দেওয়া তো মুহূর্তেকের কাজ।

কিন্তু অশ্বারোহীর চোখে কিংবা মনে সরদেঈয়ের প্রতি অঙ্গ লোলুপতার মালিন্য ছিল না। নারীর অনাবৃত অঙ্গ কামনাবতী ধরিত্রীর সুষমা নিয়ে অকস্মাৎ কখনো যদি উদভাসিত হয় তবে তা পুরুষের রূপতৃষ্ণাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলাই স্বাভাবিক, কিন্তু অশ্বারোহীর সে রসানুভূতি অঙ্গলোলুপতা হ'তে ভিন্ন। তরুণ 'অসুআরে'র চোখে সেই রসানুভূতির তন্ময়তা ফুটে উঠেছিল।

অগত্যা সরদেঈ দুটি হাত বুকের উপর চেপে দিয়ে ভীরু পদে ঘোড়ার দিকে এগুল— শাড়ীর আঁচল খুলে নেবার জন্য। অনূঢ়া কুমারীর মত যত লজ্জা যত সংকোচ যেন একসঙ্গে এসে তাকে ঘিরে ধরল।

তখন অপ্রতিভ হয়ে 'অসুআর' ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝুঁকে প'ড়ে রেকাব থেকে সরদেঈয়ের শাড়ীর আচল খুলতে গিয়ে কেমন ক'রে তার হাত সরদেঈয়ের স্তন স্পর্শ ক'রে গেল বুঝি, তাতে সরদেঈকে যত-না রোমাঞ্চিত করল এক রহস্যময় উত্তেজনায় অশ্বারোহীকে তত চঞ্চল ক'রে তুলল।

ঘোড়ার রেকাব থেকে আঁচলটি খোলামাত্র সরদেঈ নিমেষের মধ্যে ঘরের ভিতরে চ'লে এসে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। অশ্বারোহী যুবক সেই দিকে চেয়ে তখন সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিল। মুহূর্ত পূর্বের সে উত্তেজনা কেটে গিয়ে মুগ্ধ অবসাদে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইল।

অশ্বারোহীর চাইতে সরদেঈয়ের বয়স অনেক বেশি। অপরাহ্নের উদাস ছায়ার মত সেদিন তার যৌবন চ'লে এসেছে, তবু সেই উদাস ধূসরতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল এমন এক অনির্বচনীয় করুণ লাবণ্য যা অকুণ্ঠিতার রূপচাপল্যের অপেক্ষাও সেই যুবকের দৃষ্টিতে সরদেঈকে আরো স্পৃহণীয় ক'রে তুলেছিল। নিদাঘে নিশিশেষে দলিত মল্লিকা-মালার বেদনাতুর অবসন্ন সৌরভের মত সরদেঈর ম্লান দেহশ্রী তরুণ অশ্বারোহীর সংবেদনশীল অন্তরকে উদ্‌বেল করেছিল। অশ্বারোহী তার নবীন যৌবনে বহু নারীর দৈহিক সম্পর্কে আসার বৈদগ্ধ্য অবশ্য তার চেহারায় সুস্পষ্ট ছিল। তার দুই চক্ষুর বিলোলতায় স্পষ্ট ধরা পড়ছিল রূপের অরণ্যে তার মৃগয়া তখনও ফুরায় নি। কিন্তু চিলিকাতীরের তেপান্তর তণ্ডাকিনারে এই ঝড়ের সন্ধ্যায় সে আজ প্রথম দেখল নারীকে— যে জননী ভগিনী প্রেমিকা সব মিলে মিশে একাকার, অনিবচনীয়।

স্তব্ধ মুগ্ধতায় যুবক যখন ঘোড়ার উপর লাগাম টেনে ব'সে চটির দিকে চেয়ে ছিল সেই সময়ে পিছন থেকে আর-দুইজন ঘোড়সওয়ার এসে লাগাম ক'ষে সেখানে থামল।

বৃষ্টির সম্ভাবনা ঝড়ে ক্রমে উড়ে যাচ্ছিল, ঝড়ের বেগ তবু কমে নি। দক্ষিণ ও পশ্চিম থেকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও উত্তর ও পূর্ব দিকে দিগন্তরেখার উপরে দিনশেষের আলো যেন প্রভাতের মিথ্যা আভাস দিচ্ছিল। দলে দলে পাখি সেইদিক থেকে তাড়াতাড়ি পাখা

চালিয়ে চিলিকার দ্বীপগুলিতে উড়ে যাচ্ছিল।

পরে আসা ঘোড়সওয়ারদের একজন বললে, "মাণিকপাটণা মোহানা এখান থেকে আর বেশি দূর নয়। রাত একঘড়ি নাগাদ আমরা সেখানে পৌঁছে যাব। অন্ধারী গড়ের কেলু সামন্তরায় কাছে মহাদেঈ আগেই খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন। মাণিকপাটণা মোহানায় তিনি আমাদের জন্য লোক-লশকর নিয়ে অপেক্ষা ক'রে থাকবেন। রাতটা সেখানে কাটিয়ে কাল সকাল সকাল আমরা পুরী বেরিয়ে যাব।"

যুবকের মুগ্ধ আবেশ তখনও কাটে নি। একদল বালিহাঁস সমুদ্রের দিক থেকে ঝড়ের মধ্যে চিলিকার উপরে উড়ে এল।

দ্বিতীয় অশ্বারোহী অসহিষ্ণু কণ্ঠে ব'লে উঠল, "এই তেপান্তরের মাঠে আর থামলেন কেন, কুমার? কী ভাবছেন?"

যুবক খোর্ধার যুবরাজ ভাগীরথীকুমার।

আর দুইজন অশ্বারোহী ললিতা মহাদেঈয়ের দু'জন বিশ্বস্ত লোক: বংশীধর শ্রীচন্দন ও জগন্নাথ পরিছা। জন পঞ্চাশেক পাইক সঙ্গে দিয়ে মহাদেঈ তাঁদের ভাগীরথীকুমারের সঙ্গে পুরী পাঠিয়েছিলেন। নায়েব-নাজিম তকী খাঁ রামচন্দ্রদেবের নিকট হ'তে রাজসেবার অধিকার কেড়ে নেবার জন্য আমিনচাঁদকে কটক থেকে যখন পুরী পাঠান সেই সময়ে বাণপুর থেকে ললিতা মহাদেঈও অনুরূপ উদ্দেশ্যে ভাগীরথীকুমারের সঙ্গে পাইকদের দিয়ে পুরী পাঠিয়েছিলেন। তাঁরও অভিপ্রায় ছিল ভাগীরথীকুমার রথযাত্রায় 'ছেরাপহঁরা' যদি নিজে সম্পন্ন করতে পারেন তা হ'লে খোর্ধার সিংহাসনের উপরে তাঁর অধিকার স্বয়ং জগন্নাথের সমক্ষে লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। সেই-জন্য পুরীতে স্বর্গত বেণু ভ্রমরবরের অন্য সহকর্মীরা মহাদেঈকে গুপ্ত পরামর্শ দিয়ে সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলেন। ভাগীরথীকুমার যথা-

সময়ে রাজসেবা সম্পাদন করার জন্য পৌঁছাতে পারলে মুখ্য সেবকেরা তাঁকেই জগন্নাথের 'আজ্ঞামাল'(-অ) প্রথমে দিতেন। রামচন্দ্রদেব সে অবস্থায় কী করতেন কে জানে।

কিন্তু ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল অন্যপ্রকার।

পুরী এখনও বহুদূর। ওদিকে ইতিমধ্যে গুণ্ডিচা হয়ে আজ হেরাপঞ্চমী সম্পন্ন হচ্ছে হয়তো। যে অভিপ্রায়ে তারা বাণপুর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন তা সফল হবার আর সম্ভাবনা ছিল না।

কিন্তু পাইকদের নিয়ে কন্দা নদীর বুঁজে যাওযা শুকনো মোহানা পার হওয়ার সময়ে হঠাৎ মালুদের মুসলমান ফৌজদার তাদের যে আক্রমণ ক'রে বসবে, আবার খোর্দার যুবরাজ পুরী যাচ্ছেন জানতে পেরে তাদের সেখানে আটক ক'রে রাখবে এ কথা কে জানিত? এখন একমাত্র আশা উলটা রথের সময়েও অন্তত যদি ভাগীরথীকুমার রাজ বিধি সম্পন্ন করতে পারেন। কিন্তু সে আশাও মনে হচ্ছিল সুদূর-পরাহত।

বংশীধর প্রায় বিরক্তির সুরেই বললেন, "বেলা শেষ হ'ল। ঝড়ের রাত। বিলম্ব করবার সময় নেই, কুমার।"

ভাগীরথী ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমে প'ড়ে বললেন, "এমনি রাতের অন্ধকারে কন্দা নদী পার হতে গিয়েই তো মালুদের ফৌজদারের হাতে আমরা বন্দী হয়েছিলাম। আমি এই অন্ধকারের মধ্যে আর মাণিকপাটণা যেতে পারব না। আপনারা এগিয়ে যান, মাণিকপাটণায় নৌকা ও লোকজন প্রস্তুত রাখবেন, আমি কাল সকালে সেখানে পৌঁছে পার হব। তা ছাড়া যে পাইকেরা পায়ে হেঁটে আসছে তাদের কারও তো এখনও দেখা নেই। এইটা বোধ হয় একটা চটি, আজ রাতটা আমি এইখানে থাকব।"

বংশীধর জানেন ভাগীরথীকুমার যা জেদ ধরেন তাই। তাঁকে বোঝানো যায় না। আসল কথা নাচগানের আমোদ ছেড়ে ললিতা মহাদেঈ়য়ের তাড়নায় একটা নীরস শুষ্ক ব্যাপারে তাঁকে পুরী যেতে হওয়ায় তাঁর মনটা বড়ই বিরস, বিরক্ত। রাজনীতির এ-সব হিংস্র তুচ্ছতায় তাঁর রুচি ছিল না। তবু খোর্ধার সিংহাসনের লোভ ও জননী ললিতা মহাদেঈর প্রতি একপ্রকার সভয় আনুগত্য তাঁকে ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মত পুরীব দিকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উড়িয়ে নিচ্ছিল। কুমার যখন বলছেন কাল সকালে মাণিকপাটণা যাবেন তখন কোনোমতেই তাঁকে বুঝিয়ে রাজী করানো যাবে না। তাই বংশীধব আর কথা কাটাকাটি না ক'রে জগন্নাথ পরিছার সঙ্গে মাণিকপাটণার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। ভাগীরথীকুমার নিজের ঘোড়াব লাগাম ধ'রে টানতে টানতে সরদেঈয়ের চটির দিকে এগোলেন।

সরদেঈ কবাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে দরজা খুলবে কি খুলবে না যতই ভাবছিল কোনো কলকিনারা পাচ্ছিল না। অন্য পাইকেরা যেমন পাশের কুঠরিতে থাকে এই 'অসুআর'ও তেমনি রাতটা সেখানেই থাকবে। অনেকেই তো তাই থাকে, এমন-কি, ফিরিঙ্গী বোম্বেটেদেরও সরদেঈ এই চটিতে জায়গা দিয়ে সামলে রেখেছে। তা হ'লে এই 'অসুআর'টির বেলা কেন এত ভেবে অস্থির হচ্ছে ?

তার কোনো সদুত্তর কিন্তু সে খুজে পাচ্ছিল না। কবাটের ফাঁক দিয়ে ঝ'ড়ো হাওয়া সো সো গর্জন ক'রে সরদেঈর শাড়ীর আঁচল বার বার উড়িয়ে নিচ্ছিল। তার গা থেকে শাড়ীটা উড়িয়ে না নিলে যেন তার সাধ মিটবে না। সরদেঈ আঁচলটা দাঁতে চেপে ধ'রে যেন ঝড়ের বিরুদ্ধে ক্ষীণ প্রতিরোধ জানাচ্ছিল।

যুবক 'অস্নু স্নার' তার ঘোড়াটি একটা কাজুবাদাম গাছে বেঁধে চটির বারান্দায় উঠে এল।

বাণপুরে যুবরাজ ভাগীরথীকুমারকে বন্দী করবার জন্য তকী খাঁর আদেশে ফৌজদার হাশিম খাঁ বঙ্কাড়, নীলাদ্রিপ্রসাদ, চম্পাগড়, কুহুড়ি ও ছত্রগড় প্রভৃতি বিভিন্ন দুর্গ একটির পর একটি তছনছ ক'রে ফেলে তবু তাঁদের সন্ধান পান নি। কিন্তু সেই ভাগীরথীকুমার, আবার তার উপর মহাদেঈয়ের দক্ষিণহস্তস্বরূপ বংশী শ্রীচন্দন ও জগু পরিছা এমন সহজে জালে মাছ পড়ার মত ধরা পডবে তা কে ভেবেছিল? বাণপুর থেকে বেরুবার সময়ে হাশিম খাঁকে এডাবাব জন্য ভাগীরথীকুমার খোর্ধার রাস্তা ছেড়ে বজ্রকোট ঘাটে চিলিকা পার হয়ে তণ্ডাকিনারের ধার দিয়ে দিয়ে পুরী আসছিলেন। এ পথে মোগলের হাঙ্গামা থাকে না, তাই এ পথে ভাগীরথীকুমারের দল মোগলের নজরে পড়বে এমন আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু রথযাত্রার সময়ে দক্ষিণ থেকে আসা যাত্রীদের কাছ থেকে জিজিয়ার কর আদায় করবার জন্য মালুদেব ফৌজদার কন্দা নদীর মোহানায় যে ঘাঁটি বসিয়েছিল সে কথা তাঁদের জানা ছিল না।

ভাগীরথীকুমার বজ্রকোটে পার হয়ে সেখানে যখন পৌঁচেছিলেন তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। সাধারণতঃ আষাঢ় মাসের গোড়ায় কন্দা-নদীর মোহানায় জল থাকে না। কন্দানদী পার হ'তে গেলে কোথাও হাঁটুভর কোথাও কোমরভর মাত্র জল। কিন্তু শ্রাবণ মাস হ'লে চিল্কিার জল বাড়ে,মরা সাপের মত প'ড়ে থাকা কন্দা নদীর মোহানা আবার ভয়ংকর ফেনিল তরঙ্গস্রোতে মেতে ওঠে। পূর্বকালে নাকি বড়

বড় নৌকা সমুদ্র থেকে এই মোহানার পথে চিলিকার মধ্যে আসতে পারত, কিন্তু কালক্রমে মোহানাটি বালি ও পলিমাটিতে ভ'রে ওঠায় এক কর্দমাক্ত প্রান্তরে পরিণত হয়েছিল। পুরীর যাত্রীরা এ সময়ে পায়ে হেঁটেই কন্দা-মোহানা পার হয়। মালুদের ফৌজদার তাই সেইখানে জিজিয়া আদায়ের ঘাটি বসিয়েছিল।

দক্ষিণ থেকে যে যাত্রীরা পুরী আসে তারা সাধারণতঃ পায়ে হেঁটেই আসে। ভাগীরথী যখন ঘোড়ায় চেপে সঙ্গে লোক-লশকর ও রসদের গাড়ী প্রভৃতি নিয়ে কন্দা-মোহানায় পৌঁছলেন, ফৌজদারের লশকেরা সহজেই বুঝল এরা সাধারণ যাত্রী নয়। তারা তাই কুমার ও সঙ্গের সবাইকে রাত্রে সেখানে আটক রেখে, সকালে ফৌজদারের কাছে চালান দিল। তাঁদের পরিচয় পেতে ফৌজদারের মুহূর্তও বিলম্ব হ'ল না, সে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কয়েদ ক'রে কটকে তকী খাঁর কাছে খবর পাঠিয়ে দিল যে পুরী যাবার পথে ভাগীরথীকুমার ও তাঁর সেনাপতিরা বন্দী হয়েছেন। হাশিম খাঁ যা পারেন নি, মালুদের ফৌজদার তা অনায়াসে ক'রে ফেলতে পারায় তকী খাঁর সুবিচারে যাতে তাঁর মনসবদারির পদবৃদ্ধি হয় এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়।

কিন্তু ইতিমধ্যে খোর্ধা সম্বন্ধে তকী খাঁর কুটনীতির যে পরিবর্তন ঘটেছিল তা মালুদের ফৌজদারের জানা ছিল না।

রাজনীতি অতি বিচিত্র। গণিকার প্রণয় অথবা জ্যোৎস্নার ছায়ায় বরং স্থিরতা থাকে পারে, কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে বন্ধুতা ও শত্রুতা দুইই উড়ো মেঘের মত অস্থির। যে ছুরিটা এতকাল শাণিত হয়েছিল শত্রুর গলার জন্য, নিমেষের মধ্যে তা মিত্রের গলায় এসে পড়ে। রাজনীতি সুবিধাবাদের এক মহারণ্য, আত্মরক্ষা ও স্বার্থই সেখানে একমাত্র ধর্ম।

খোর্ধার মিত্ররাজা রামচন্দ্রদেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন ক'রে থাকায় যে ভাগীরথীকুমারকে বন্দী করবার জন্য তকী খাঁ হাশিম খাঁকে বাণপুর পাঠিয়েছিলেন, এখন পুরী শ্রীক্ষেত্র থেকে রামচন্দ্রদেবকে প্রতিষ্ঠাচ্যুত করবার অভিপ্রায়ে সেই ভাগীরথীকুমারের প্রতি তকী খাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গিয়েছিল। পুরী থেকে আমিনচাঁদও খবর পাঠিযেছিলেন যে ভাগীরথীকুমার 'ছেরাপহরা' করবার জন্য পুরী আসতে পারলে রামচন্দ্রদেব রাজসেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে কুমার যাতে তা সম্পন্ন করতে পারেন সেজন্য তিনি সবপ্রকার সাহায্য করবেন। পিতাপুত্রের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হ'লে পরিণামে তৃতীয়পক্ষরূপে আমিনচাঁদেরই তো লাভ হবার সম্ভাবনা।

তাই ভাগীরথীকুমার পুরী যাবার পথে সদলবলে মালুদের ফৌজদারের হাতে বন্দী হয়েছেন এ বার্তা পেয়ে ইনাম পাঠানোর পরিবর্তে তকী খাঁ কড়া হুকুম পাঠালেন বন্দীদের মুক্তি দিয়ে অবিলম্বে তাদের পুরী যাওয়ার ব্যবস্থা না করলে ফৌজদার নিজে বন্দী হবেন।

হাশিম খাঁ সে সময়ে লালবাগে উপস্থিত ছিলেন। তার মত দাঁতালো সেনাপতি যা না পারলেন একজন সামান্য ফৌজদার তা পারায় তিনি মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করছিলেন সন্দেহ নেই। তিনি তাই তকী খাঁর ক্রোধানলে ইন্ধন জুগিয়ে বললেন, "সেইজন্যই তো খোদাবন্দ্, আমি একবার ভাগীরথীকুমারকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছি, নইলে তার কী ক্ষমতা আমার হাত থেকে পালায়। এখন মালুদের ফৌজদারের বেকুবির জন্যেই না মতলবটা এমন মাটি হয়ে গেল!"

তকী খাঁ নিষ্ফল ক্রোধে সপদদাপে চীৎকার ক'রে উঠলেন—"বস বস্, চুপ কর, তোমার কেরামতিও বেশ মালুম আছে আমাদের!"

কিন্তু ভাগীরথীকুমার-প্রমুখ সকলের মুক্তির পরোআনা নিয়ে মালুদের লশকর যখন ফিরে এল তখন পুরীতে শ্রীগুণ্ডিচা সারা হয়ে গেছে।

ঝড়ের বেগ শান্ত হয়ে এসেছে। ছেঁড়া ছেঁড়া খণ্ডমেঘের ভিতরে শুক্লাসপ্তমী তিথির চাঁদ এক-একবার ভেসে উঠছিল। চিলিকার জলরাশি মেঘের ছায়া আর জ্যোৎস্নার আলোর লুকোচুরির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার ফেনিল ঊর্মি আর কয়েকটি অশান্ত বলিহাঁসের চোখে তবু ঘুম ছিল না। চাঁদ একবার একখানা কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ল, মেঘের সমস্তটা ধার ঘিরে যেন কোন ঐন্দ্রজালিক পরিয়ে দিল রুপালি জরির কিংখাব। মেঘ যতই ঘন কালো হোক তার চারিদিকে আলোর দীপ্তিও আছে— সব দুর্যোগের মধ্যেও সুদিনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে।

তা না হলে তেপান্তর তণ্ডাকিনারের এই চটিতে এমন অনুভূতি আজ ভাগীরথীকুমার পেতেন কেমন করে?

ভাগীরথীকুমার বিনিদ্র নয়নে চাঁদ আর চিলিকার দিকে চেয়ে সেই কথা ভাবছিলেন। বিস্তীর্ণ বালুচরের উপরে কয়েকটি বালিহাঁস যেমন উড়ে বেড়াচ্ছিল, তেমনি ভাগীরথীকুমারের সমস্ত চেতনা ও ভাবনা সরদেঈয়ের দিকে ছুটে যাচ্ছিল বার বার। কিন্তু বাণপুর গড়ে আবার ফেরার কথা মনে আসা মাত্র ভাগীরথীকুমারের ভাবনায় হঠাৎ রসভঙ্গ হচ্ছিল। ললিতা মহাদেঈ একেই কোপন-স্বভাবা, তায় ভাগীরথীকুমারকে খোর্ধার সিংহাসনে বসাবার জন্য তিনি যে ব্রত

নিয়েছেন তাতে ভাগীরথীকুমার তো নিমিত্ত মাত্র। যে রামচন্দ্রদেব যবনী বিবাহ ক'রে তাঁকে লাঞ্ছিতা করেছেন— তাঁকে খোর্ধার সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করবার জন্য মহাদেঈ যেন পাঞ্চালীর পণ করেছেন।

ললিতা মহাদেঈ তো বুঝবেন না কন্দা নদীর মোহানায় মালুদের ফৌজদার তাঁদের কেমন ক'রে আটক ক'রে রাখল। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন— সঙ্গে তা হলে পাইকরা গিয়েছিল কেন, খেমটা নাচতে? সেই আসন্ন সন্ধ্যায় অচেনা তেপান্তরের মাঠে ফৌজদারের লশকরদের প্রতিরোধ করা যে তাদের সাধ্য ছিল না সে কথা মহাদেঈ বুঝবেন কোথা থেকে? তারপর যখন তিনি শুনবেন যে এ-সবের পরেও কুমারের অবহেলার দরুন তাঁরা যথাশীঘ্র পুরী পৌঁছাতে পারলেন না তখন তিনি কী করবেন সেই চিন্তা ভাগীরথীকুমারকে অবসন্ন ক'রে ফেলছিল।

পাশের ঘরে সরদেঈয়ের চোখেও ঘুম ছিল না। তৃষিত চকোরের মত তার প্রাণও এই মুহূর্তে আকাশে উঠে পরমুহূর্তে আবার নীচে নেমে পড়ছিল— আশা-নিরাশার শত দ্বন্দ্বের মধ্যে।

আজ সন্ধ্যায় সেই নবীন 'অসুআর'কে দেখে অবধি সরদেঈর সুপ্ত নারীত্ব কখন হঠাৎ জেগে উঠেছিল শ্রীরামের স্পর্শে পাষাণী অহল্যার মত তা সে জানত না।

বাতান্দোলিতা লতার মত তার উন্মেষিত নারীত্ব যেন কোনও অবলম্বন খুঁজছিল।

মালকুদা গাঁয়ে তার শ্বশুরবাড়ীর পরিত্যক্ত ভাঙা ভিটেখানির ছবিও যেন তার চোখে ভেসে উঠছিল। লড়াইয়ের হাঙ্গামায় কত বড় গ্রামখানা ছারখার হয়ে গেল। ঝড়-বাতাস রোদ-বৃষ্টিতে সে ঘর এতদিনে হয়তো মাটিতে মিশে গেছে। গাব, ফণীমনসা, নাগকেশর

গাছের জঙ্গলে সাত পুরুষের ভিটে কোথায় হারিয়ে গেছে এতদিনে। সেই গাঁয়ে একদিন সে বউ হয়ে গিয়েছিল নতুন সংসার গড়তে— 'সাধব-বহূ'র[1] মত লাল টুকটুকে, তেমনি লাজুক, অঙ্গে জড়ানো লাল কস্তার শাড়ী, পায়ে লাল আলতা, মাথায় সিঁদুর, ঠোঁটদুটি পানের রসে লাল।

'চউঠির'[2] রাত না পোহাতে পাইকদের বসতি সেই গাঁয়ে বেজে উঠেছিল লড়াইয়ে যাবার ঢাকের বাজনা আর শিঙ্গা, ঘরে ঘরে পড়েছিল সাজ সাজ রব—সরদেঈর তিন ভাসুর আগেই কত লড়াইয়ের হাঙ্গামায় কোন অজানা বিভুঁয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন— পাইকের ছেলে তাঁরা, লড়াইয়ে মাথা দেবার কড়ারে জন্ম তাঁদের— একটির পর একটি তিন ছেলেকে হারিয়ে সরদেঈয়ের শাশুড়ী পাগলিনী হয়েছিলেন— ছোট ছেলেকে তাই লড়াইয়ে যেতে না দিয়ে আগলে ব'সে রইলেন —নতুন বউ সরদেঈর কানে কানে বললেন, "ওলো সর্বখাকী মেয়ে, তুই ঘরে পা না দিতেই তো ছেলে যেতে বসেছে লড়াইয়ে, আর কি সে সর্বনেশে লড়াই থেকে ছেলে ফিরবে? ও তিনটে তো অমনি লড়াইয়ে কোথায় ম'রে হেজে গেল তার কোনো ঠিকানা নেই। এখন এই অলপ্পেয়ে লাফাচ্ছে লড়াইয়ে যাবে ব'লে— আমার মানা তো সে তিনটে মানলে না, আর এই বা মানবে কেন? তুই না-হয় ওকে আটকিয়ে রাখ্।"

1. সাধব-বহূ— ইন্দ্রগোপ কীট বা মখমলী পোকা। এর গা লাল মখমলের মত বলে এর নাম সাধব-বহূ অর্থাৎ 'সাধবে'র (সওদাগরের) ঘরের বউ, হাত দিলেই তার ছয়টি পা পেটের তলায় গুঁজে ফেলে, তাই লাজুক বলা হচ্ছে।

2. চউঠি— বিবাহের চতুর্থ দিবস, যেদিন বিশেষ উৎসবকৃত্য পালিত হয়।

তার স্বামীর চেহারাও তখন ভাল ক'রে দেখে নি সরদেঈ। ঝাপসা মত মনে পড়ে শুধু কালো মুগুনী পাথরে কোঁদা চৌকো মুখ, কাঁধে নেমেছে কোঁকড়ানো বাবরী চুলের গোছা, দুই কানে দুটো মাকড়ি, চোখ দুটি যেন ছেলেমানুষের, তাতে সকালের সদ্য ফোটা ফুলের নির্মল সজীবতা, দুই গালে গালপাট্টা জুলপি।

সরদেঈ স্বামীকে তার মুখ খুলে তখন কীই-বা কেমন ক'রে বলত? স্বামীর পা দুখানি ধ'রে কাটা গাছের মত নীরবে সে কেবল লুটিয়ে প'ড়ে ছিল। সেও তো পাইকের ঘরের মেয়ে, সেও জানে লড়াইয়ের ডাকে যারা ঘর ছেড়ে বেরোয় তারা আর ফেরে না। তার বাপ, কাকা, দাদাও তেমনি ক'রে একদিন লড়াইয়ের ডাকে গিয়েছিল, আর ফেরে নি।

পাইকের মেয়ে সে, পাইকের রক্তে তারও দেহমন গড়া, তবু তার সঙ্গে নতুন সংসার করবার জন্য সে এই অজানা গাঁয়ে পা দিয়েছিল, নিজের হাতে তিলক সিঁদুর পরিয়ে, ধান দূর্বা দিয়ে বরণ ক'রে নিশ্চিত মরণের মুখে স্বামীকে ঠেলে দিতে তার অন্তরাত্মা আর্তনাদ ক'রে উঠছিল।

কিন্তু তার শ্বশুর, বউয়ের কান্নাকাটিতে ছেলের মন পাছে বাঁধা প'ড়ে যায় ব'লে ঠাকুরের ভর হওয়ার মত উঠানে নাচতে নাচতে চীৎকার করলেন—"আরে তোরা পাইকের ছেলে না 'বেহেবাণী'র ছেলে রে? পাইক আমরা, লড়াইয়ে প্রাণ দেব ব'লে মাথা বিকিয়েছি। মুসলমান এসে বড় দেউলে হানা দিয়েছে। ওড়িয়া জাতির মউড়মণি খোর্ধার রাজা দেশের ইজ্জত ইষ্টদেব জগন্নাথের মান বাঁচাতে বনে কান্তারে ঘুরছে। লড়াইয়ের ডাক শুনে তোরা মেয়েমানুষের আঁচলের নীচে লুকোচ্ছিস কোথায় রে! হা, ধিক্ তোদের মরদপনা!"

তলোয়ার উঁচিয়ে শ্বশুর এমনি ক'রে নাচলেন। লড়াইয়ের বাজনা, তূরী ভেরী শুনলে সে বয়সেও তিনি অমনি ক'রে নাচতেন।

অবশেষে সরদেঈ স্বামীর কপালে তিলক সিঁদুর, গলায় কালীজাঈ ঠাকুরাণীর প্রসাদী মালা গলায় পরিয়ে, ধান দূর্বা দিয়ে বরণ ক'রে গাঁয়ের অন্যান্য পাইকদের সঙ্গে স্বামীকে লড়াইয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল। লড়াইয়ের মিছিলের তূরী ভেরী শিঙ্গা জয়ঢাক আর পাইকদের গর্জন ক্রমে গাঁয়ের সীমায় মিলিয়ে গেল। তারপর সরদেঈ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই কাটাগাছের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল।

বহুদিন বহু প্রতীক্ষার পরে অবশেষে একদিন ফিরেছিল তার স্বামী তো নয়, স্বামীর ঢাল-তলোয়ার, কোমরবন্দ্ আর রক্তে ভেজা শিরোপা— সরদেঈর বধূজীবনের শেষ অবশেষ।

তার স্বামী যাওয়ার আগে প্রথম ও শেষ সম্ভাষণরূপে যা বলেছিলেন আজও ভোলে নি সে—"বাঁচলে এ জীবনে, আর তা নইলে আর জন্মে আবার দেখা!"

সেই অন্তহীন প্রতীক্ষায় সরদেঈ বেঁচে ছিল। আবার কি আর-একটা জন্ম আছে, এই জন্মের পরে? সরদেঈ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল।

তণ্ডাকিনারের উপরে রাত্রি গভীর হয়েছে। জগুনি তবু ফেরে নি। প্রদীপের আলোর ছায়া বাইরের হাওয়ায় ঘরের দেওয়ালে নাচছে। অবলম্বনহীন নিঃসঙ্গ তার মত দেওয়ালে যে একদিন গেরিমাটি ভুসো হরিতকী দিয়ে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার যে পট এঁকেছিল তা থেকে থেকে প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সরদেঈর অনাবৃত স্তন

প্রদীপের আলোয় ছায়া ফেলে দুইটি পাহাড়ের চুড়োর মত ভেসে উঠছে পটের উপরে। সমাজের এক আশ্চর্য অবুঝ মনোভাবের দরুন সে আজ কুলনাশিনী, সমাজচ্যুতা। জগন্নাথের দেউলে তার প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু হৃদয়ের জগন্নাথকে তার থেকে বঞ্চিত করবে কে?— জগুনি তো জেদ ধরেছিল রথযাত্রায় তাকে পুরী নিয়ে যাবে ব'লে— মন্দিরের ভিতরে কে চিনবে তাকে বালুগাঁর চটির সেই সরদেঈ ব'লে? কিন্তু কেউ না চিনুক, সেই 'চকাডোলা' জগন্নাথ তো চিনবেন— অন্তর্যামী তিনি, কোন কথাটা তাঁর অজানা? কিন্তু তা হলে তিনি কি বোঝেন নি বিধবা হওয়া অবধি ব্রতচারিণীর মত সরদেঈ যে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক হয়ে থেকে এসেছে— নিজের জ্ঞাতসারে তো সে মুসলমান লশকরের কাছে দেহ দিয়ে আপনাকে কলুষিত করে নি। মনের ছলকে-ওঠা জলে কত ছায়া অবশ্য কত সময়ে পড়েছে, কিন্তু সেই মনেরই অথই দরিয়ায় সে-সব ছায়া আবার তেমনি নিঃশেষে মিলিয়েও গেছে।

বাইরে ঝড় থেমে গেলেও জটিআ 'নাসি'র দিক থেকে মেঘ গুমরে গুমরে উঠছিল। জগুনি তবু তখনও ফিরল না। আজকাল প্রায়ই সে কোন-না-কোন অজানা লোকেদের সঙ্গে চিলিকার ভিতরে কোথায়-না-কোথায় জানি চ'লে যায়, সরদেঈ যতই তাকে শুধায় ভাল ক'রে কিছু বলে না। তা ছাড়া বালুগাঁর সেই অঘটনের পর থেকে জগুনি যেন মনে মনে সরদেঈয়ের প্রতি কেমন নিস্পৃহ উদাসীন হয়ে গেছে। আগে যেমন সে তার প্রত্যেকটি কথা সরদেঈকে না বলা অবধি স্থির থাকতে পারত না আজকাল আর তেমন মন খুলে কথা বলে না, সরদেঈয়ের থেকে দূর দূরে থাকতে পারলেই তার যেন সোয়াস্তি।

সরদেঈর দুই চোখ থেকে দুই ফোঁটা জল ঝরে পড়ে, মাটিতে যেন এঁকে দিল দুটি ছোট ছোট কালো বৃত্ত। বৃত্ত দুটি ক্রমে বড় হয়ে উঠল,

অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাটিতে আঁকা হয়ে রইল দুটি কালো চোখের মত।

সরদেঈয়ের চোখে আবার ভেসে উঠল সেদিন নির্জন দুপুরে মালকুদা গাঁয়ের পথের উপরে সেই অজানা 'অসুআরে'র তৃষ্ণার্ত মূর্তি। তার চক্ষু দুইটিও সেদিন এমনি শূন্য ও উদাস লেগেছিল দেখতে। তেমনি অসহায় আশ্রয়কাঙাল স্নেহতৃষিত চোখ সরদেঈ বুঝি আর কখনও দেখে নি। দেখা মাত্রই কে জানে কেন এক অহেতুক মমতায় সরদেঈর অন্তঃস্থল সেদিন কোমল হয়ে উঠেছিল। সেই অচেনা 'অসুআরে'র উত্তপ্ত কপালের উপরে আঙুল বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে, আঁচল দিয়ে বাতাস ক'রে তার কপালের স্বেদবিন্দু মুছিয়ে দিতে তার হাত যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

এখনও কোনো কোনো দিন উদাস বিরল মুহূর্তে সেই দুই চক্ষু চিলিকার জলের উপরে কালো মেঘের ছায়ার মত ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যায়।

আজ আবার এ আর-এক 'অসুআর'!

—এতক্ষণে সরদেঈর মনে পড়ল ঠিক এমনি দুইটি আয়ত চক্ষু সেই নির্জন দুপুরে মালকুদায় পথের উপরে সেদিন সে দেখেছিল।

কিন্তু এই চোখ দুটি বন্য, তাতে সেদিনের সেই চোখের স্নেহতৃষিত অসহায়তা নেই কিংবা সুদূরের পিয়াসও নেই।

সরদেঈর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। কবাটের ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ায় গা শিউরে উঠছে ভেবে সরদেঈ তার অনাবৃত বক্ষ ঢেকে উরুর উপরেও আঁচলটা টেনে দিল।

রাত অনেক হয়েছে। জগুনি আর এতরাতে ফিরবে না হয়তো। তাও তো সেদিন কোথায় গিয়েছিল, ফিরল শেষ রাতে, ভোরের পোয়াতে তারাটা তখন মাণিকপাটণার সমুদ্রের দিক থেকে উঠে আসছিল।

ঘুম না আসা রাতে শুয়ে শুয়ে আগেকার মনে পড়া নানা কথা ভাবতে সরদেঈব হঠাৎ ভারী ভাল লাগছিল।

সন্ধ্যা থেকেই আঁচলের গিঁঠে বাঁধা আংটিটি আর-একবার দেখবার জন্য সরদেঈযের আঙুলগুলি যেন বার বারই সেই দিকে চ'লে যাচ্ছিল, কিন্তু কী জানি কেন গিঁঠ খুলে আংটিটি দেখবার সব সাহস তার মুহূর্তের মধ্যে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছিল।

সন্ধ্যার সময়ে চটিতে আসা সেই অচেনা 'অসুআর' সরদেঈয়ের কাছ থেকে দুধ আব ছানা কিনে দাম বাবদে সেই আংটিটি বাঁধা দিয়েছিল, দাম দেবাব কড়ি ছিল না তার কাছে। তখন সন্ধ্যা ক্রমে গড়িয়ে গিযে মেঘলা জ্যোৎস্নাব কোমল আলো-আঁধার চারিদিক ঘিরে এসেছিল। সবদেঈ তাব কুটরিটিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে ও-ঘরে অচেনা 'অসুআর'টির অশান্ত পাযচাবিব শব্দ উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল। জগুনিই সাধাবণতঃ চটিব অতিথিদের দেখাশোনা করে। কিন্তু আজ জগুনি না থাকায় সরদেঈ বাধ্য হযে ও-ঘরেব ভিতরে গিয়ে প্রদীপটি জ্বেলে দিয়ে এসেছিল, এক কলসী জলও বেখে দিয়ে এসেছিল। রাত্রে সেই অচেনা পথিক হাতে বেঁধে খাবে না সরদেঈ রেঁধে দেবে শুধাতে ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু কেন জানি সে কথা মুখে এনেও বলতে পারল না সে। যার খিদে পাবে সে তো নিজেই মুখ খুলে বলবে, সরদেঈর কী দরকার এত কথা বলতে যাবার ?

কতক্ষণ পরে কবাটে কারো আস্তে টোকা মারার মত শব্দ শুনে সরদেঈ চমকে উঠেছিল— এ তো হাওয়ার শব্দ নয়, ঝড় তখন থেমে গিয়েছে। সরদেঈ সন্তর্পণে উঠে দরজা খোলামাত্র প্রদীপের আলোয় দেখল সেই অচেনা 'অসুআরে'র মূর্তি।

অমন সময়ে তাকে ওখানে দেখে সরদেঈ কবাটের পিছনে নিজেকে

আড়াল ক'রে রইল। কবাটের গায়ে তার কয়েকটি শুখিয়ে আসা চাঁপার কলির মত আঙুল আর কবাটের নীচে তার দুইখানি পা ছাড়া যুবকের আর কিছু দৃষ্টিগোচর হ'ল না। কিন্তু যুবককে সরদেঈ কবাটের আড়াল থেকে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিল।

যুবক শুধাল, "দই আছে— দেবে ?"

কতবার এই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তির পর সরদেঈ উত্তর দিল, "দই তো নেই, দুধ দুই কেঁড়ে আছে।"

যুবক 'অসুআরে'র দুই ঠোঁটে দুষ্টামিভরা হাসির একটি রেখা ফুটে উঠে ক্রমে সরব হাসিতে পরিণত হ'ল।

যুবক এমন হেসে উঠল কেন তা ভাবতে গিয়েই সরদেঈর নিজের কথায় নিজেরই লজ্জা ক'রে উঠল! যুবক তাকে লক্ষ্য করতে পারলে দেখতে পেত লজ্জায় সরদেঈর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে।

ঠোঁটে দুষ্টামির হাসিটা এবার চেপে 'অসুআব' শুধালে, "দুধে জল নেই তো ?"

সরদেঈয়ের সংকোচ এই রূঢ় সম্মুখীনতায় আপনিই কেটে গিয়েছিল। কবাটের আড়াল থেকে বেরিয়ে যুবকের দুই চোখের দিকে চেয়ে সে বললে, "নিজের গোঠের দুধে তো জল থাকে না, আর সব দুধে একবার হলেও জল তো মেশে।"

সরদেঈয়ের নিরীহ সরলতায় 'অসুআর' আবার হেসে উঠল। যুবকের জলের কথায় যে শ্লেষ ছিল তা বুঝি সরদেঈ বুঝতে পারে নি তা হলে!

'অসুআরে'র উচ্চহাস্যে সরদেঈ আবার লজ্জায় জড়সড় হয়ে পড়ল।

'অসুআর' এবার বললে, "আচ্ছা, যা আছে দাও।"

সরদেঈ ঘরের ভিতরে গিয়ে দুই কেঁড়ে দুধ আর এক কেঁড়ে ছানা

এনে কাঁপা-কাঁপা হাতে চটির বারান্দায় রেখে দিল। যুবক বোধ হয় দাম দেওয়া-নেওয়ায় অভ্যস্ত নয়, দুধ আর ছানার কেঁড়েগুলি নিয়ে সে ও-ঘরে চ'লে যায় দেখে সরদেঈ বললে, "কড়ি দাও।"

আকাশ থেকে প'ড়ে যুবক বললে, "সত্যি তো! তা, আমার কাছে কড়ি নেই। বিপদে প'ড়ে আমি আজ রাতটা এইখানে থেকে গেছি যে।"

তার পরে আঙুল থেকে নীল পাথর বসানো একটা আংটি খুলে সরদেঈয়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "এই আংটি বাঁধা রইল, ফিরতি পথে কড়ি দিয়ে ছাড়িয়ে নেব।"

চটির পসারিনী সরদেঈ, কড়ির বদলে আংটি বাঁধা রাখতে তার রাজী না হবার কী আছে?

সরদেঈ এবার মমতাভরা গলায় বললে, "তুমি কোথাকার 'অসুআর'? একাই যাচ্ছ, না সঙ্গে আর কেউ আছে?"

যুবক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "এক আমি, একাই যাচ্ছি! আর তুমি?"

সরদেঈ প্রদীপের আলোয় আংটিটির দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে বলল, "আজ রাতে জগুনিটা আর ফিরবে মনে হয় না।"

'অসুআরে'র দুই পাতলা ঠোঁটে তলোয়ারের ধারের মত সেই বাঁকা হাসি আর-একবার ফুটে উঠেছিল।

সরদেঈয়ের মুখ লজ্জায় আবার রাঙা হয়ে উঠেছিল।

সরদেঈ বাঁ হাতের তেলোয় গাল রেখে প্রদীপের দিকে তাকিয়ে নিজেকে নিজে ধিক্কার দিচ্ছিল তার সেই সন্ধ্যাবেলায় বলা কথাটির

জন্য—"আঃ, আজ রাত্রে আমি একা আছি ব'লে দিলাম, ও কী না-জানি ভাবল।"

বাইরে বাতাসটা আবার উঠছিল, তার সঙ্গে নামছিল বৃষ্টি। কবাটের ফাঁক দিয়ে থেকে থেকে দমকা হাওয়া দীপশিখাটিকে কাঁপিয়ে নাচিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। দরজার কবাটে কার আস্তে আস্তে টোকা দেওয়ার শব্দ শুনতে পেল যেন সরদেঈ, পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার হঠাৎ উত্তেজনায় কেঁপে উঠল।

শব্দটা থেমে গেল। দেওয়ালে আঁকা জগন্নাথের পটের উপরে ছায়া নেচে উঠল।

আবার সেই শব্দ। নিশুতি রাতে সরদেঈ একাকিনী জেনে 'অসুআ'র কবাটে টোকা মারছে হয়তো, সেই আশঙ্কায় কবাট খুলতে সরদেঈয়ের সাহসে কুলাল না। কিন্তু কবাটে আঘাতের শব্দ ক্রমে বাড়ছে। অগত্যা সরদেঈ মনে সাহস এনে কবাট খুলে দিল। সেদিন বালুগাঁর জঙ্গলের ভিতরে মুসলমান লশকর সরদেঈকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় তুষার-শীতলতায় সরদেঈর শরীর যেমন অসাড় শিলাখণ্ডে পরিণত হয়েছিল এখনও ঠিক তেমনি তার সমস্ত চেতনা নিস্পন্দ হয়ে পড়েছিল।

সরদেঈ দরজা খোলামাত্র ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত হু হু ক'রে ভিতরে ঢুকল। বাইরে কিন্তু কেউ নেই। শুক্লপক্ষের চাঁদ অনেকক্ষণ অস্ত গিয়েছিল।

চটির বারান্দার নীচে 'অসুআরে'র ঘোড়া একটা কাঠচাঁপা গাছে বাঁধা ছিল, ঘোড়াটা গাছের গায়ে পা ছোঁড়ার সময়ে কবাটে কেউ শব্দ করছে ব'লে মনে হয়েছিল সরদেঈর। পাগল হাওয়ায় চিলিকা আর সমুদ্রের গর্জন একাকার হয়ে গিয়েছিল। জগুনি এতক্ষণ পর্যন্ত কোথায়

রয়েছে কে জানে।

মুখ আর বুকের উপর ছড়িয়ে পড়া চুলের জটিলতা এড়িয়ে সরদেঈ গলা ছেড়ে চীৎকার ক'রে উঠল—"জগুনি, হ্যাঁরে জগুনি—ই—ই—।"

সরদেঈয়ের ডাক ক্ষেপা হাওয়ায় উলটে উড়ে এল চটির দিকেই।

কতক্ষণ পরে সরদেঈ ঘরের ভিতরে ফিরে এসে আবার দরজা বন্ধ করতে যাবে, শুনতে পেল বারান্দায় জগুনির ডাক—"দেঈ"—

দোর খুলতে তর সইছিল না সরদেঈর। জগুনি ভিতরে ঢুকেই ট্যাঁক থেকে একটা টাকা বার ক'রে মেঝেয় ফেলে দিয়ে বললে, "নে, এই টাকাটা কোথাও লুকিয়ে রাখ্। আরো টাকা দেবে বলেছে তারা।"

টাকাটা নূরজাহানী চাঁদির টাকা, সাধারণ লোকের ঘরে এ টাকা দেখা স্বপ্নের সামিল। এ টাকা কিসের, কে দিল, কেন দিল— মনের মধ্যে জাগা এ-সব প্রশ্ন সরদেঈ জিজ্ঞাসা করবার আগেই জগুনি মেঝেতে একটা মাদুরে গড়িয়ে প'ড়ে শুধাল, "বাইরে ঘোড়া বাঁধা রয়েছে কার?"

সরদেঈ কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দিল, "কে একজন 'অসুআর' সাঝের বেলায় এসে ও-ঘরে আজ রাতটা রয়েছে। তুই তো কোথায় চ'লে গিয়েছিলি, আমি হয়রান হয়ে গেলাম।"

জগুনি বললে, "তা হলে তো তারা ঠিক বলছিল।"

সরদেঈ আশ্চয হয়ে বলল, "কারা কী বলছিল?"

জগুনি তার উত্তর না দিয়ে বললে, "ও কে জানিস্?"

সরদেঈ বললে, "না তো! আমি জানব কেমন করে? চটিতে তো এমনি অজানা অচেনা লোক এসে থাকে, আবার চ'লে যায়।"

জগুনি বললে, "আমায় একবার যে খোর্ধার রাজার কাছে খত দিয়ে পাঠিয়েছিলি না? এ 'অসুআর' সেই খোর্ধার রাজার ছেলে, বাপের

সঙ্গে লড়বার জন্যে বাণপুর থেকে পুরী যাচ্ছে।"

সরদেঈ বললে, "বাপ-ছেলেতে লড়াই? তুই এ-সব জানলি কোত্থেকে? তোকে বললে কে?"

সরদেঈ আঁচলের গিঁঠ খুলে আংটিটা জগুনিকে দেখাবে ব'লে যে ভেবেছিল, আর দেখাল না। তার সবই একটা ধাঁধার মত লাগছিল।

শুধাল, "তুই এই কিছুদিন হ'ল কোন সব অচেনা লোকেদের সঙ্গে চিলিকার ভিতরে ঘুরছিস্ রে জগুনি? তারা কে সত্যি ক'রে বল্, আমার দিব্যি।"

জগুনি একটা হাই তুলে প্রদীপটা নিবিয়ে দিয়ে বললে, "তুই আমায় আর কিছু জিগ্যেস করিস্ না, দেঈ। ও-সব কথা বলতে মানা আছে। আমি দু'দণ্ড ঘুমিয়ে নিই, সকাল বেলা উঠে আবার যেতে হবে।"

প্রদীপ নেবা মাত্র জগুনির নাক ডাকতে আরম্ভ করল। কিন্তু সরদেঈর চোখে ঘুম ছিল না। পাগল হাওয়ারও বিরাম ছিল না।

দশম পরিচ্ছেদ

1

আজ হল নবমী। কাল উলটো রথ, 'বাহুড়া' যাত্রা। পরশু 'অধরপণা ভোগ'[1]। তার পরদিন 'নীলাদ্রি-বিজে', জগন্নাথ দেউলে 'বিজে' করবেন, রথযাত্রা শেষ হবে।

কিন্তু তার পরে?

রামচন্দ্রদেবের মুখের রেখাগুলি কঠোর হয়ে উঠল। ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হয়ে এল; দুই চক্ষুর দৃষ্টি সাতপড়া দ্বীপের হিন্তাল বনের দিকে প্রসারিত হ'ল।

অপরাহ্নের স্তিমিত আলোকে দূর বনরেখা স্নিগ্ধ কোমলতায় প্রলিপ্ত হয়ে শান্তিঘন হয়ে উঠেছিল। পুবে হাওয়ায় রামচন্দ্রদেবের বিষণ্ণ কপালের উপরে অসংলগ্ন অযত্নবিন্যস্ত কয়গাছি রুক্ষ কেশ চোখের উপরে উড়ে এসেছিল।। অক্ষৌরিত অস্নাত মুখের শ্মশ্রু রুক্ষভাবে বেড়ে তাঁর চেহারা বিষণ্ণ ও মলিন ক'রে তুলেছিল।

সানপরিছা বিষ্ণু পশ্চিম কবাট মহাপাত্র বাঁ হাতের উপর মুখ রেখে

1. অধরপণা ভোগ—উলটা রথের পর জগন্নাথ শ্রীমন্দিরে ফিরে সিংহদ্বার বন্ধ দেখে রথেই থাকেন, একটা তুম্বিতে ক'রে ছানা আর কলা চটকানো মিছরির পানা ভোগ দেওয়া হয়, কিন্তু তাতে জগন্নাথ অধর স্পর্শ করা মাত্র তুম্বি প'ড়ে গিয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে যায়।

চিন্তাকুল দৃষ্টিতে চিলিকার জলরাশির দিকে চেয়ে ব'সে ছিলেন, রামচন্দ্রদেবের অলক্ষ্যে তাঁর দিকেও মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছিলেন। কয়েকটি অনুচ্চারিত জটিল প্রশ্ন যেন তাঁকে ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন ক'রে তুলেছিল, কিন্তু মুখ খুলে তিনি কিছু বলতে পারছিলেন না।

বরুণকুদা দ্বীপ বাঁয়ে রেখে গুরুবাঈ দ্বীপ ডাইনে কাটিয়ে নৌকাটি উত্তর-পূর্ব দিকে ফিরল। সামনে থেকে পুবে হাওয়া ঠেলতে থাকায় চিলিকার জলরাশি পশ্চিম পানে ফুলে ফুলে শত শত ফেনিল তরঙ্গ তুলে ধেয়ে আসছিল। প্রতিকূল পবন ও স্রোতের আঘাত এখনও এসে লাগে নি, নৌকাটি তাই এখনও স্বচ্ছন্দ গতিতে ভেসে চলেছিল, কিন্তু এর পর উজান বাইতে হবে। জগুনি কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত শরীর দুলিয়ে ঝুঁকিয়ে দুই হাতে দুটো বইঠা বাইতে লাগল। তার দুই বাহুর মাংসপেশী চিলিকার জলের মত ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

চিলিকা-বক্ষ নির্জন। মাছধরা নৌকাগুলি বহুক্ষণ হল তীরে ফিরে গেছে। জগুনি পিছন ফিরে চাইল। বৃক্ষপাদপহীন কালীজাঈ পাহাড়ের উপর সূর্যদেব নেমে এসেছেন। চিলিকার নীল জল দুইভাগ করে অস্তগামী সূর্যের লাল আলোর ছায়া সৌভাগ্যবতীর সিঁথির সিন্দূর রেখার মত দীর্ঘায়িত হয়ে গেছে। পূর্ব দিক থেকে দলে দলে পাখি কলরব করে শরবনের দিকে উড়ে যাচ্ছে।

সেই যন্ত্রণাদায়ক প্রশ্ন যা রামচন্দ্রদেব বার বার নিজেকে জিজ্ঞাসা করেও এ পর্যন্ত কোনো সদুত্তর পান নি, আবার তাঁকে উদ্‌বিগ্ন ক'রে তুলতে লাগল— তার পরে ?

বরুণকুদা দ্বীপ পিছনে পড়ল। গুরুবাঈ দ্বীপের হিন্তালবন ও শরবন একটানা অন্তহীন সংগীতালাপের মত দীর্ঘায়িত হয়ে চ'লে গেছে। রামচন্দ্রদেব সেই ঘন বনের দিকে তাকিয়ে তার দুর্ভেদ্যতা

মনে মনে অনুধাবন করছিলেন। মোগল ফৌজ অনেক খুঁজেও এখানে এর ভিতরে এসে পৌঁছাতে পারবে কিনা তাই তিনি নিপুণ সেনাপতির মত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করছিলেন।

বেনা আর শরের ঘাস কোথাও কোথাও চিলিকার বুকের উপরে ঝুঁকে প'ড়ে ছায়াঘেরা নীড় রচনা করেছিল। একটা নিঃসঙ্গ তালগাছ জাগ্রৎ প্রহরীর মত সেখানে দাঁড়িয়ে সে নীড়ের অনাহত প্রশান্ত রহস্যের সুরক্ষায় ব্যাপৃত।

এক ঝাঁক 'কালীগউড়ুনী' সাতপড়া দ্বীপের দিক থেকে কলরব ক'রে শরবনের ছায়াঢাকা জলের উপরে এসে নামল। এরাই যেন অনাহত আনন্দের সন্তান, এদের আশঙ্কা নেই উদ্‌বেগ নেই দুশ্চিন্তা নেই মৃত্যুভয় নেই। দেশে মোগল হাঙ্গামা বেধেছে এরা জানে না, জগন্নাথ চিলিকায় কোথায় আত্মরক্ষা করবেন তারা বোঝে না— তাদের কেবল নিশ্চিন্ত সন্তরণ আর কাকলি।

রামচন্দ্রদেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চিলিকার দিকে চেয়ে রইলেন।

ক্রমে মউসা-ব্রহ্মপুর দ্বীপ দূরে একটা কুমীরের পিঠের মত যেন জলের উপর ভেসে উঠল। ওড়িশার ইতিহাসের বহু বিপর্যয় ও বিড়ম্বনা, বহু নীচ বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহের লাঞ্ছনা এই নামহীন দ্বীপটিতে যেন মুদ্রিত হয়ে ছিল।

রামচন্দ্রদেব সেই দ্বীপের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে বললেন, "কালাপাহাড় পুরী আক্রমণ করছে শুনে পরিছা দিব্যসিংহ পট্টনায়ক জগন্নাথকে মাণিকপাটণা মোহানার পথ দিয়ে এই দ্বীপে 'পাতাল' ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু অন্ধারীর দান(-অ) পাহান্তা সিংহ অর্থের লোভে কালাপাহাড়কে সে সন্ধান ব'লে দিয়েছিল। কালাপাহাড় এইখানে জগন্নাথকে খুঁজে বার ক'রে হাতীর পিঠে ফেলে গৌড়ের রাজপথে নিয়ে

গিয়েছিল। দান পাহান্তা সিংহ কালাপাহাড়ের কাছ থেকে বিশ্বাস-ঘাতকতার ইনাম পেল শিরোপা, আর রবিশকুদ ও রাহাঙ্গা এই দুই জায়গির। তা ছাড়া নাআপাহান্তা সিংহ উপাধি। হায়, আজও তেমনি কত পাহান্তা সিংহ মোগলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিল তিল ক'রে ওড়িশার সর্বনাশ করছে।"

তাদের কি শাস্তি নেই জগন্নাথ ?

দলে দ'লে পাখি মউসা-ব্রহ্মপুর দ্বীপের দিকে কলরব করতে করতে উ'ড়ে যাচ্ছিল। গোপলির রাঙা আলোয় চিলিকার জল রক্তের সমুদ্রের মত লাল হ'য়ে উ'ঠেছিল। গুণ্ডিচার পরে বহু দক্ষিণী যাত্রী মাণিক-পাটণার ঘা'টে পার হ'য়ে তণ্ডাকিনারের পথে দেশে ফিরছিল। এক-এক জায়গায় পিঁপড়ার সারির মত আর কোথাও বা চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়ে তারা চলেছিল, আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলোয় তাদের ছায়া-চিত্র ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

রামচন্দ্রদেব অধস্বগতভাবে ব'লে উঠলেন—"আজ নবমী, কাল বাদে পরশু 'অধরপণা ভোগ' তার পরে নীলাদ্রি 'বিজে' তার পরে—?"

আবার সেই যন্ত্রণাদায়ক প্রশ্ন।

সান পরিছা বিষ্ণু পশ্চিমকবাট মহাপাত্র কিন্তু চিলিকার রহস্যময় জলরাশির দিকে চেয়ে অন্য কথা চিন্তা করছিলেন। এই অতল জল-রাশিরও বুঝি একটা জীবন আছে, হৃদয় আছে, ভাবনা আছে—তার পরিচয় নেই, কিন্তু এই আপাত ঊর্মিচপলতার মধ্যে, সপ্ততাল জলের নীচে সে রহস্যময় জীবন ও হৃদয় প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, প্রত্যেক মানুষের শত শত প্রচ্ছন্ন ভাবনা ও চিন্তার মত। সে-সব যদি চোখে দেখা যেত, অন্য প্রতিবেশী মানুষটির হৃদয়কন্দরের প্রচ্ছন্ন রহস্যরাজি যদি উদ্‌ঘাটিত করতে পারা যেত!— রামচন্দ্রদেব কী

ভাবছেন ? সান পরিছা তাঁর দিকে চাইলেন।

রামচন্দ্রদেব সুপ্তোত্থিতের মত অসংলগ্নভাবে বললেন, "তার পরে ?"

সান পরিছা এই নিগূঢ় রহস্যময় প্রশ্নটির তাৎপর্য হঠাৎ বুঝতে পারলেন না। বললেন, "মউসা-ব্রহ্মপুর দ্বীপে এখনও জগন্নাথের সে জগতীর চিহ্ন রয়েছে।"

জগুনি তাঁদের কথাবার্তা শুনছিল। এখন নৌকার দিক্‌পরিবর্তনের ফলে অনুকূল পবনে বইঠা বাওয়া অনেক সহজ হয়ে এসেছিল। সে বললে, "পুরী ফেরত অনেক যাত্রী রসবুদ' ঘাট থেকে মউসা ব্রহ্মপুর যায়। আমি এখন তোমাদের সঙ্গে এমনি চিলিকার মধ্যে ঘুরছি, নইলে নৌকো ক'রে যাত্রীদের আনা-নেওয়া করতে করতে আমার দু'দণ্ড ফুরসৎ থাকে না।"

বিষ্ণু মহাপাত্র জগুনির কাছে গলুইয়ের উপরে ব'সে ছিলেন। জগুনির পিঠ চাপড়ে তিনি ব'লে উঠলেন, "সেজন্য ভাবিস্ না জগুনি, তোর লোকসান হবে না। যাত্রী বয়ে যত কড়ি পেতিস্ আমরা তোকে তার চেয়ে অনেক বেশি কড়ি দেব। তবে এ-সব কথা কাউকে বলিস না যেন, বুঝলি ? কেউ যেন জানতে না পারে আমরা গুরুবাঈ দ্বীপ গিয়েছিলাম ব'লে।"

জগুনি মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে বলল, "আহা, কেন এত কথা আমি কাউকে বলতে যাব ? আমি জগন্নাথের দ্রোহী হব না, তা তোমরা কড়ি দাও আর নাই বা দাও।"

রামচন্দ্রদেব জগুনির দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে একবার চাইলেন। আজ কয়দিন হয়ে গেল এই ছেলেটি তাঁদের সঙ্গে চিলিকার মধ্যে নৌকা নিয়ে ঘুরছে, কিছুতে তার ক্লান্তি নেই, আপত্তি নেই। তার

প্রতি একপ্রকার স্নেহ ও মমতায় রামচন্দ্রদেবের অন্তঃস্থল স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। জগুনির দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "তোকে কোথায় দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে রে জগুনি!"

জগুনির গলা অভিমানে ভারী হয়ে উঠল। বইঠা জোরে জোরে টানতে টানতে বললে, "তুমি আপনি বড় লোক, রাজ্যের রাজা, তুমি আপনি আমায় দেখলেও মনে রাখবে কেন?"

রামচন্দ্রদেব বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি রাজা ব'লে তুই কী ক'রে জানলি রে জগুনি?"

জগুনি বড় বড় চোখ ক'রে চেয়ে বললে, "সেকি, আমি যে বালুগাঁ পেণ্ঠের চটি থেকে একবার সরদেঈয়ের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে খোর্ধাগড়ে তুমি আপনির কাছ গেছিলাম।"

জগুনি মাথা ঝাকিয়ে কপালের উপর থেকে কয়গাছি চুল পিছনের দিকে সরিয়ে দিল। বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে এবার জগুনির সেই একদাদৃষ্ট মূর্তি রামচন্দ্রদেবের চোখের সামনে ক্রমে ভেসে উঠল। এই ছেলেটি সেদিন মহারাণী ললিতা মহাদেঈকে লেখা বকশী বেণু ভ্রমরবরের গুপ্ত পত্র নিয়ে খোর্ধাগড়ে তাঁর কাছে এসেছিল। মন্ত্রপূত কবচের মত সেই পত্রখানি তাঁকে কম বিপদ ও বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা করে নি। তার কে এক সরদেঈ সে চিঠিখানা বালুগাঁ-পেণ্ঠের কোন চটিতে বকশীর পাইকদের কাছ থেকে কৌশলে কী ক'রে হস্তগত ক'রে জগুনির মারফতে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। জগুনি কিন্তু স্পষ্টভাবে তখন বলতে পারে নি কে সে সরদেঈ, কোথায় সে চটি। সেই বালুগাঁ-পেণ্ঠের চটি ছেড়ে জগুনি আজ এখানে কেন দিনরাত চিলিকার মধ্যে পাড়ি দিচ্ছে রামচন্দ্রদেব কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাঁর এ-সব প্রহেলিকার মত মনে হ'ল। কিন্তু এই উপকারী পুরস্কার-প্রত্যাশাহীন বালকটিকে

এ পর্যন্ত চিনতে পারেন নি বলে রামচন্দ্রদেব মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়লেন।

সাতপড়া ও মউসা-ব্রহ্মপুরের মধ্যে চিলিকা একটা পরিখার মত মাণিকপাটণা মোহানা ও হরিচণ্ডী নদীর খালকাটি-পাটণার মোহানা পর্যন্ত চ'লে গেছে। দুই দিকে ঘন শরবন ও হিন্তালবন। পালে পালে 'এরা' পক্ষী দুই দিকের বনের উপরে ডানা মেলে নেমে আসছিল। অস্তসূর্যের রক্তিম আলো তাদের ডানায় ডানায় আবীর গুলাল ছড়িয়ে দিচ্ছিল যেন। কয়েকটি বালিহাঁস রামচন্দ্রদেবের মাথার উপরে ঘুরে ঘুরে উড়ছিল। অনেক পিছনে গুরুবাঈ দ্বীপ প'ড়ে রইল। বরুণকুদা দ্বীপটাও আর দেখা যায় না। কালীজাঈয়ের নেড়া পাহাড়ের উপরেও কে যেন কুয়াশার মত আঁধার মেশানো একটা পরদা টাঙিয়ে দিয়ে গেছে।

সম্মুখে মাণিকপাটণা মোহানা অনিশ্চিত অন্ধকারের মত রহস্যময় দেখাচ্ছে। মোহানা নিকট হওয়ায় চিলিকার তরঙ্গ এখানে অপেক্ষাকৃত উদ্বেল। ঢেউয়ের আঘাতে নৌকাটি ক্রমে আরো বেশী দুলতে লাগল।

জগুনি দুইহাতে বইঠা বেয়ে নৌকা সামলাতে সামলাতে দূরে তণ্ডাকিনারের রসকুদা ঘাটের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, "ঐ যে ঐটে আমাদের চটি। ঐ ঝাউগাছের কাছে চিলিকার ধারে যে দাঁড়িয়ে আছে ও ই সরদেঈ হবে।"

তণ্ডাকিনারের উপরে সরদেঈয়ের চটিখানি দেখাচ্ছিল যেন একরাশ অন্ধকার কোথা থেকে ছিঁড়ে প'ড়ে আছে নীচে।

রামচন্দ্রদেব সে দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, "তুই আমাদের সঙ্গে চিলিকার মধ্যে জগন্নাথের জন্য জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিস এ কথা সরদেঈকে বলিস্ নি তো? ও কথা এক কান থেকে দু'কান

হলেই তো সর্বনাশ।"

জগুনি বার বার মাথা নেড়ে জানাল, "না, না," তার পর মুখে বলল, "সরদেঈ যতই আমাকে নানান রকম ক'রে জেরা করছে, আমি খালি ওকে এ কথা সে কথা ব'লে ভুলিয়ে দিচ্ছি। আমার উপরে ও গোসা করেছে মনে মনে। তা করুক, আমি কি তাই বলে জগন্নাথের দ্রোহী হব!"

কাল ভোর রাতে যখন জগুনি আবার বেরুল, নৌকা নিয়ে গুরুবাঈ যাবে ব'লে, সরদেঈ তার পথ আগলে অনেক কান্নাকাটি ক'রে অনেক চোখের জল ফেলে, দিব্যি দিয়ে শপথ করিয়ে শুধিয়েছিল, "তুই এই কতদিন ধ'রে খেপা পাগলের মত চিলিকার ভিতরে কোথায় না কোথায় যাচ্ছিস আমাকে সত্যি করে খুলে বল্ জগুনি, নইলে আমার মাথা খাস্।"

সরদেঈয়ের মনে মনে এক ভয় ছিল জগুনি হয়তো যাত্রীদের উপর লুঠপাট করতে যায়, নয়তো তণ্ডাকিনারের এক-এক জায়গায় যে ডাকাতের আড্ডা আছে তাদের দলে ভিড়ে গঞ্জা বন্দরের দিকে যাতায়াত করা নৌকার উপর ডাকাতি করে। তণ্ডাকিনারের উত্তরে নৃসিংহপাটণার কিছুটা দক্ষিণে কলাবন্ত খোল, আবার দক্ষিণে জগাই-মাধাই খোল গঞ্জাগড়ের সীমানা ঘেঁষে। এখানে ডাকাতরা অসহায় যাত্রীদের উপরে নয়তো সওদাগর আর ফিরিঙ্গীদের নৌকার উপরে ডাকাতি করে তার নানা লোমহর্ষণ কাহিনী সরদেঈ এখানে আসা অবধি শুনছে। ডাকাতরা এক-একদিন সরদেঈয়ের চটির কাছেও শিকারের সন্ধানে আসে। সরদেঈ তাদের মধ্যে কাউকে ধর্মবাপ, কাউকে ধর্মমামা, কাউকে ধর্মভাই ব'লে ডেকে মহাপ্রসাদ দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত বশ ক'রে রেখেছে। তারা চটিতে আসে, মদ খায়, লুঠের ধন নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে, তারপর যে যার পথে চলে

যায়। এক-এক দিন ভাগের সময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধলে সরদেঈকে তারা সালিস মানে। সে সময়ে জগুনি তাদের অনেক সেবাযত্ন করে। এখন জগুনি তাদের দলেই ভিড়ল নাকি— এই ভয় সরদেঈয়ের।

জগুনি কিন্তু সরদেঈয়ের সমস্ত দিব্যি আর অনুরোধ উপরোধ নীরবে উপেক্ষা ক'রে বইঠা দু'খানা কাঁধে ফেলে ঘাটের দিকে বেরিয়ে পড়েছিল। মাণিকপাটণার দিকে প্রভাতী তারা আকাশে একটা উজ্জ্বল দীপশিখার মত জ্বলজ্বল করছিল। বালিহাঁসদেরও তখন ঘুম ভাঙে নি। সরদেঈ পিছন থেকে ডেকে বলেছিল, "পুরী ফেরতা যাত্রীর ভিড় এখন চটিতে বাড়বে, আমি একা আর কত সামলাব বল তো?" সরদেঈর গলা কান্না অভিমানে ভারী। জগুনি কিন্তু ততক্ষণে লম্বা লম্বা পা ফেলে বালির উপর দিয়ে রসকুদা ঘাটের দিকে চলতে শুরু করেছিল।

এখন সরদেঈ সেই তেপান্তরের ঘাটে বেলাশেষের শেষ আলোয় চিলিকার গভীর কালো জলের দিকে চেয়ে জগুনির প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল।

রসকুদা ঘাট ক্রমে একটা বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হ'ল। সন্ধ্যা হতে আর অল্পই বাকী। কুমীরের হাঁয়ের মত হাঁ-করা দুইখানি কালো মেঘের ভিতরে কখন নবমীর অপরাহ্ণের সাদাটে চাঁদ ফুটে উঠেছিল।

অরখ(-অ)কুদা তখনও বহু দূরে, মাণিকপাটণা ঘাটে নেমে ঘোড়ার পিঠে যেতে হবে সেখানে।

বিষ্ণু পশ্চিমকবাট মহাপাত্র বহুক্ষণের নিরুদ্ধ ভাবনা হঠাৎ প্রকাশ ক'রে বললেন, " 'ছামু' আশঙ্কা করছেন তাই ; নইলে তকী খাঁ আর শ্রীক্ষেত্র আক্রমণ করবে তা আমার মনে হয় না।"

রামচন্দ্রদেব চিন্তান্বিতভাবে প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু এমন অনুমানের কারণ ?"

বিষ্ণু মহাপাত্র বললেন, "প্রথম কথা, মুর্শিদাবাদ মসনদে সুজা খাঁ আসীন থাকা পর্যন্ত তাঁর আমলে জগন্নাথ সম্বন্ধে যে উদার নীতি আচরিত হচ্ছিল তা বলবৎ থাকাই স্বাভাবিক।"

রামচন্দ্রদেব টিপ্পনী করলেন, "কিন্তু সুজা খাঁ কটকে নায়েব-নাজিম থাকা কালে মোগল শাসকের স্থিতি সঙ্কটাপন্ন হয় নি, জগন্নাথকে আশ্রয় ক'রে ওড়িশায় আবার এক রাজনৈতিক ঐক্য সে সময় গ'ড়ে উঠে নি।"

"সে কথা অবশ্য সত্য। কিন্তু দীর্ঘকাল ধ'রে ওড়িয়া পাইকেরা মোগলশক্তির সঙ্গে লড়াই ক'রে আজ যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তকী খাঁর সে কথা অজানা নেই। তকী খাঁ তাদের আশঙ্কায় আর আশঙ্কিত নয়।"

"তোমার এ যুক্তির সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। এ সব ছাড়া আর কোনো কারণ চিন্তা করেছ ?"

"জগন্নাথযাত্রীদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আজও মোগল রাজস্বের একমাত্র উৎস। তকী খাঁ জিজিয়া কর আবার বসানোর দিন থেকে বার্ষিক প্রায় সাত লক্ষ টাকা আদায় হয়ে মুর্শিদাবাদে যাচ্ছে। তা ছাড়া এই সূত্রেই ইজারাদার ও অন্যান্য কর্মচারীদের উপরি পাওনারও পথ রয়েছে। জগন্নাথকে ধ্বংস ক'রে তারা রাজস্বের এমন লাভজনক পথটি বিনষ্ট করবে কেন ?"

তণ্ডাকিনার ও মাণিকপাটণার মধ্যে চিলিকার মোহানায় জল-

প্রণালী ক্রমে সংকীর্ণ হয়ে আসায় প্রতিকূল স্রোত ও ঢেউয়ের বেগ বাড়ছিল। সন্ধ্যার আগেই জোয়ারও শুরু হয়েছিল। নৌচালনার পক্ষে এ মোহানাটি সাধারণতঃ বড় বিপজ্জনক। কোথাও কোথাও ঘূর্ণি আছে, তার মধ্যে পড়লে নৌকা প্রায়ই উল্টে যায়। সেইজন্য অভিজ্ঞ ও সেইখানে যাতায়াতে অভ্যস্ত নৌচালক না হ'লে জোয়ারের সময়ে এখানে কেউ নৌকা নিয়ে যেতে সাহস করে না, কিন্তু যারা এ সবের সঙ্গে পরিচিত তারা দূর থেকেই কোথায় কোথায় ঘূর্ণি হয় তা ঠাউরে ঘূর্ণি বাঁচিয়ে নৌকা বেয়ে নিয়ে যায়।

হঠাৎ একটা বড় ঢেউয়ের মাথায় উঠে নৌকাটি আবার হুস্ ক'রে নীচে নামল। জগুনি "জয় মা কালীজাঈ" ব'লে চেঁচিয়ে উঠে তণ্ডা-কিনারের দিকে নৌকা কাটিয়ে নিল। তার পরে কিছুক্ষণ নৌকাটি শান্ত জলরাশির মধ্যে অনুচ্চ তরঙ্গমালার মৃদু হিল্লোলে আন্দোলিত হয়ে নিথর জলে হাঁসের মত সমানভাবে কিছুদূর গেল। তণ্ডাকিনারের বালুপ্রাচীরের ওপারে সমুদ্রের গর্জনের মধ্যে আর সব শব্দ নীরব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

রামচন্দ্রদেব বললেন, "সেইজন্য এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করা তকী খাঁর মতলব। শ্রীমন্দির আক্রমণ ক'রে মোগল খাজনাখানাকে জিজিয়ার আয় থেকে বঞ্চিত করা অবশ্য তার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু জগন্নাথের নিকটে আমি পুনঃসংস্থাপিত হওয়াতে খোর্ধার গদির চারিদিকে ওড়িশার রাজনৈতিক ঐক্য যে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তাকে অমনি উঠতে দেওয়াও তার অভিপ্রায় নয়। সেই-জন্য আমিনচাঁদ আসছে পুরীর মন্দিরের নায়েব হয়ে। সে হিন্দু, মুসলমান তো নয়। তাই তার কর্তৃত্বে জগন্নাথের লাঞ্ছনার আশঙ্কা নেই। কিন্তু তার ফলে খোর্ধার রাজা জগন্নাথের সেবকত্বের অধিকার

থেকে বঞ্চিত হ'লে ওড়িশার সামন্তরাজগণ ও দুর্গপতিরা তাঁর অধি-নায়কত্ব স্বীকার করতে যাবেন কেন ? এতে আমি যদি আমিনচাঁদের বিরোধিতা করি তা হ'লে খোর্ধার সিংহাসন থেকে আমাকে বিতাড়িত করে যুবরাজ ভাগীরথীকুমারকে হাতের পুতুল ক'রে বসানো হবে। এই খবর বাণপুরে চ'লেও গেছে। যুবরাজ সেদিন এই তণ্ডাকিনারের পথে পুরী গেছেন সে সংবাদ আমি পেয়েছি।"

চিলিকার বুকে চন্দ্রালোক আলেপিত হয়ে গিয়েছিল। তরঙ্গের ফেনিল চূড়া ও স্রোতের বিচিত্র আবর্ত যেন আলোকের এক মহা-প্লাবনের মত দেখাচ্ছিল, কিন্তু তার পাশে পাশেই ছিল ঘনকৃষ্ণ অতলান্ত অন্ধকার। চপল হংসবলাকা আশঙ্কা-উদ্‌বেগহীন আনন্দের বুদ্‌বুদের মত আলোক ও অন্ধকারের সেই মহাস্রোতের মধ্যে উড়তে উড়তে কখনও উপরে কখনও নীচে ওঠা-নামা করছিল।

রামচন্দ্রদেব বললেন, "এ পর্যন্ত মোগল ফৌজ জগন্নাথের লাঞ্ছনা করেছে, এবার কিন্তু আমিনচাঁদের মত হিন্দু কুলাঙ্গারের হাতে জগন্নাথ ঘোর লাঞ্ছিত হবেন। কিন্তু তুমি তো আর পরিছা হয়ে থাকবে না সে লাঞ্ছনা দেখবার জন্য। বড় পরিছা গৌরী রাজগুরু এতে আমিন-চাঁদকে সাহায্য করলে মোটা ইনাম আর মহাল পাবেন এমন প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন, তবে তুমি যে সানপরিছা হয়ে আর মন্দিরে থাকবে তার কিন্তু কোনো সম্ভাবনা নেই। অবাধ্যদের তালিকায় তোমার নাম বহুদিন হ'ল উঠেছে।"

সানপরিছা বিষ্ণুমহাপাত্র যুবাবয়সী, তাতে ওড়িয়াত্বের অভিমানে দৃপ্ত। জগন্নাথ এবং পুরীর মন্দিরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্মরণাতীত পরম্পরার উপরে প্রতিষ্ঠিত। অতীতে তাঁর পূর্বপুরুষগণ জগন্নাথকে মোগল লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য কম অকুতোভয়তা ও

দুঃসাহসের পরিচয় দেন নি। সেই-সব স্মৃতি ও অভিমানের উদ্‌বোধন তিনি যেন তাঁর প্রতি রক্তকণিকায় শুনতে পাচ্ছিলেন।

মোহানা আর অল্পদূর। দিক্‌চিহ্নহীন আলোকের মহাপ্লাবনের মধ্যে সবকিছু হারিয়ে গেছে। তারি মধ্যে জগুনি তণ্ডাকিনারের তীর ছেড়ে মাণিকপাটণার ডাঙার দিকে নৌকার মুখ ঘোরাল।

অদূরে একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণি সহসা আত্মপ্রকাশ করল। জ্যোৎস্নার আলোয় জগুনি দেখতে পেল তার ক্রমবর্ধমান পরিধি আর তার মাঝখানের ভয়াবহ ঘূর্ণ্যমান গহ্বর। সেই পরিধির অনিবার্য আকর্ষণে নৌকাটি তার মধ্যে প'ড়ে প্রবলবেগে ঘুরতে আরম্ভ করল। জগুনি "জয় মা কালীজাঙ্গী" ব'লে ডাক পেড়ে প্রাণপণে দুই হাতে বইঠা বেয়ে স্রোত কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। ঘূর্ণির কেন্দ্রের গহ্বরটি ক্রমেই গভীর হচ্ছে, তাতে পড়লে কোন অতলে নিয়ে যাবে কে জানে! নৌকাটি ঘুরতে ঘুরতে ক্রমে সেই ভয়ংকর গহ্বরের নিকটবর্তী হচ্ছে!

হঠাৎ উলটা দিক থেকে আসা এক প্রবল তরঙ্গের অভিঘাতে নৌকাটি ঘূর্ণি থেকে মুক্তি পেয়ে তণ্ডাকিনারের দিকে পিছিয়ে এল।

সানপরিছা স্বস্তির একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলেন— "জয় মা কালীজাঙ্গী!"

জগুনি বইঠা তুলে নিয়ে বললে, "জোয়ার না ছাড়লে ওপারে আর নৌকা নেওয়া যাবে না।"

রামচন্দ্রদেব সম্মোহিতের মত ঘূর্ণির সেই করাল গহ্বরের দিকে চেয়ে ছিলেন। নৌকায় একখানি লগি প'ড়ে ছিল, সেটা তুলে নিয়ে রামচন্দ্রদেব সানপরিছাকে ডেকে বললেন, "তুমি বইঠা ধরো। আমি নৌকা কাটিয়ে নেব।"

জগুনি গলুইয়ের কাছে ব'সে চেঁচিয়ে উঠল, "জয় মা কালীজাঙ্গী!"

পরিণামজ্ঞানহীন উন্মত্তের মত রামচন্দ্রদেব লগি ঠেলে নৌকা আবার তীর থেকে মাঝের দিকে নিয়ে চললেন। মৃত্যুগর্ভা জলভ্রমির সেই ভয়ংকর গহ্বরের দিকে নৌকাটি একটি মুগ্ধা রাজহংসীর মত নাচতে নাচতে ভেসে চলল।

2

মাণিকপাটণা মোহানায় রামচন্দ্রদেব যখন তরঙ্গস্রোতের ক্রুদ্ধ আক্রমণ ও ঘূর্ণাবর্তের করাল ভ্রূকুটির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে অরখকুদা ঘাটের দিকে নৌকা বাইছিলেন, সেই সময়ে পুরীর চূড়ংসাহীতে সুনা মাহারীর বাড়ীতে একটি 'গম্ভীরা'র ভিতরে আমিনচাঁদ মখমলের গদির উপরে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে, সুরাস্পন্দিত কণ্ঠে ভাগীরথী-কুমারকে সম্ভাষণ জানিয়ে বলছিলেন, "আসতে আজ্ঞা হোক, কুমার। আপনি কিন্তু বহু বিলম্বে এলেন। আপনি এসে না পৌছানোয় ধর্মচ্যুত খোধার রাজা জগন্নাথ মহাপ্রভুর 'ছেরাপহঁরা' করলেন। এ ব্যাপার কিন্তু প্রত্যেক ধর্মভীরু হিন্দুর প্রাণে গভীর আঘাত দিয়েছে কেবল তা নয়, হিন্দুধর্মের ম''াদাও ক্ষুণ্ণ করেছে।"

সুনামাহারী আমিনচাঁদের অদূরে ব'সে পানের বাটা নিয়ে পান সাজছিল। তার কাজলপরা চোখ দুইটি আপাতদৃষ্টিতে পানের ডালার দিকে নিবদ্ধ থাকলেও বঙ্কিম ভ্রূযুগলের নীচ থেকে তার সস্মিত অপাঙ্গ দৃষ্টি ভাগীরথীকুমারের চোখের সঙ্গে যে লুকোচুরি খেলছিল তা অন্ততঃ ভাগীরথীকুমারের অজানা ছিল না। সুনামাহারী জানে তার আকর্ণবিস্তৃত দীর্ঘায়ত নয়নের অগ্নিশিখায় ভাগীরথীকুমারের মত বহু চপল পতঙ্গ ঝাঁপ দিয়েছে, ভাগীরথীকুমারও অনঙ্গের সে আমন্ত্রণ

এড়াতে পারবেন না।

ভাগীরথীকুমারের পুরী পৌঁছাতে বাস্তবিক বহু বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। আমিনচাঁদকে সেজন্য যে-কোনো কৈফিয়ৎ দিলেই তো চলবে, কিন্তু মহারানী ললিতা মহাদেঈকে কী কৈফিয়ৎ দেবেন তা ভাবতেও তাঁর শঙ্কা উপস্থিত হচ্ছিল। অবশ্য কন্দা নদীর মোহানায় মালুদের ফৌজদার তাঁকে আটক করে না রাখলে ভাগীরথীকুমার হয়তো যথাসময়ে এসে রথযাত্রায় 'ছেরাপহঁরা' বিধি সম্পাদন করতে পারতেন। কিন্তু তেপান্তর তণ্ডাকিনারে সরদেঈয়ের চটি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতে তো তাঁর দু' দিন লেগে গিয়েছিল! তার কোন সমীচীন সদুত্তরও তাঁর ছিল না— সেদিন ভোর রাত থেকেই যেমন ফিরে ফিরে বার বার বৃষ্টি হতেই থাকল, অভিমানভরা চোখের মত আকাশে কালো মেঘ যেমন সব কিছু ঢেকে ব'সে রইল, তাতে চটি থেকে বেরনো একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ল— সে-সব হয়তো কৈফিয়ৎ হিসাবে বল' যেতে পারে, কিন্তু এই সব সামান্য প্রতিবন্ধক অতিক্রম করা যার পক্ষে সম্ভব হয় না তার পক্ষে খোর্ধার সিংহাসনের জন্য আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কি হতে পারে?

ভাগীরথীকুমারের যথাসময়ে পুরী পৌঁছাতে না পারাটা মহারানী ললিতা মহদেঈ যে কদাপি ক্ষমা করবেন না তা তিনি ভাল ক'রেই বুঝেছিলেন।

সুনা মাহারী হঠাৎ লীলায়িত ভঙ্গীতে উঠে 'গম্ভীরা' থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল। অমনিভাবে চ'লে যাওয়ার কারণ আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য ছিল ব্রীড়া ও সঙ্কোচ, তবে শ্রোণিভারে সে যে গজেন্দ্রগমনা, আবার মত্ত হস্তিনীর মত সে যে বহু হৃদয়ের কমলবন দলন করেছে সে বিষয়ে ভাগীরথীকুমারকে সচেতন ক'রে দেওয়াও কি সুনা মাহারীর অভিপ্রায়

না! তা না হ'লে সে উঠে যাবার সময়ে তার দক্ষিণী ছাঁদে রচা কবরী থেকে একটি কেতকীর পাপড়ি কুমারের অদূরে খ'সে পড়ল কেন? দক্ষিণী কাছা ছাড়িয়ে তার দুই গুরু নিতম্বের অমন তরঙ্গভঙ্গই বা হ'ল কেন? আবার গম্ভীরার বাইরে অদৃশ্য হবার পর মৃগশাবকটি জালে পড়ল কিনা ব্যাধ যেমন ক'রে চেয়ে দেখে তেমনি গ্রীবাভঙ্গী ক'রে পিছনপানে সর্বাঙ্গ নুইয়ে ভাগীরথীকুমারের দিকে অমন চকিত কটাক্ষই বা হানত কেন?

পুরীর প্রসিদ্ধ রূপজীবা সুনা মাহারী। তার অন্য দুই ভগিনী জগন্নাথের সেবাদাসী, বড়শিঙ্গারের পর তারা অন্যান্য সেবাদাসীদের সঙ্গে গীতগোবিন্দ গান করে। সুনা মাহারীর মা কেতকী মাহারী তার যৌবনে কটক সুবার নায়েব-নাজিম সুজা খাঁকেও ছিপে মাছ খেলানোর মত অবলীলাক্রমে অনেক খেলিয়েছিল। সুজা খাঁর নেক নজরে পড়ার জন্য সে সময়ে বহু রাজা জমিদার কেতকী মাহারীর দ্বারস্থ হতেন বশংবদতার অর্ঘসম্ভার নিয়ে।

এমনও শোনা যায় যে মহারাজা দিব্যসিংহদেবের সাধনসঙ্গিনী ছিল এই কেতকী মাহারী। বালিসাহী 'উআসে'র সাধন-গম্ভীরায় কেতকী মাহারীর সঙ্গে দিব্যসিংহদেব দিনের পর দিন রাতের পর রাত অতিবাহিত করতেন।

দিব্যসিংহদেবের সাত অঙ্কে সুজা খাঁ একবার শ্রীমন্দির আক্রমণের উদ্দেশ্যে পুরীর অভিমুখে সৈন্যচালনা করেছিল। দিব্যসিংহদেব আক্রমণের প্রতিরোধ করার জন্য চন্দনপুরে ঘাঁটি আগলে ছিলেন।

ছাউনিতে দিব্যসিংহদেবের সঙ্গে সেখানেও এসেছিল কেতকী মাহারী। সুজা খাঁ ভার্গবী নদীর তীরে দিব্যসিংহদেবের ছাউনির উপরে সহসা আক্রমণ ক'রে তাঁকে বন্দী করতে যখন এল তখন দিব্যসিংহদেব আর সেখানে ছিলেন না। পরিত্যক্ত ছাউনিতে কেতকী মাহারী যেন সুজা খাঁর প্রতীক্ষায় ছিল একাকিনী। সুজা খাঁকে দেখে কেতকী মাহারী কুর্নিস জানিয়ে নীরবে অধোমুখে দাঁড়িয়ে রইল। বাম পদাঙ্গুষ্ঠে ভূমিতে রেখাঙ্কন ব্যতিরেকে তার সর্বাঙ্গ স্থির, নিঃস্পন্দ।

সুজা খাঁ তার দক্ষিণ হস্তে কেতকীর তিলচিহ্নিত চিবুকটি তুলে ধ'রে জিজ্ঞাসা করেছিল, "খোর্ধার রাজার তুমিই নাকি সেনাপতি?"

কেতকী মাহারীর আরক্তিম মুখে ভয়ের লেশমাত্র ছিল না। প্রত্যুত্তরে সে কেবল একটু হেসে সুজা খাঁর হাত থেকে চিবুকটি আবার নামিয়ে নিয়েছিল।

তার পরে সুজা খাঁ নাটকীয় ভঙ্গীতে কোমরবন্ধ থেকে খাপসুদ্ধ তলোয়ার কেতকী মাহারীর পায়ের কাছে রেখে সস্মিত দৃষ্টিতে বলেছিল, "বেশ বেশ, এই আমি বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলাম।"

সেই অবসরে কিন্তু শ্রীমন্দির থেকে দেববিগ্রহ কোকল গড়ে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর সুজা খাঁর আমলে পুরীর উপর আর মোগল আক্রমণ হয় নি।

সেই কেতকী মাহারীর কন্যা সুনা মাহারীও অতি হৃদয়বিদারক রকমের মনোহারিণী। পুরী থেকে কটক, মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত সর্বত্র তার রূপের জয়জয়কার।

সুনা মাহারী 'গম্ভীরা' থেকে চ'লে গেল, ভাগীরথীকুমারের মুগ্ধ চেতনায় কিন্তু তার পায়ের মঞ্জীরধ্বনি নীরব হ'ল না। 'গম্ভীরা'র

বাহিরে অন্ধকারের ভিতর থেকে ক্ষণে ক্ষণে তার কঙ্কণ ও মঞ্জীরের নিক্কণ অব্যক্ত বেদনার মর্মসংগীতের মত অনুরণিত হয়ে কুমারের কানে এসে বাজছিল, তিনি আর আমিনচাঁদের প্রতি মনোযোগ করতে পারছিলেন না। আমিনচাঁদও অর্ধনিমীলিত নেত্রে কী যেন চিন্তা করছিলেন। ভাগীরথীকুমার তাই ইতিমধ্যে অতি সন্তর্পণে সুনা মাহারীর কবরীস্খলিত সেই কেতকীদলটি হাতে তুলে নিয়ে আঘ্রাণ করছিলেন, আবার সেটিকে তিল তিল ক'রে ছিঁড়ে অন্যমনস্কভাবে মখমলের গদির উপরে ছড়াচ্ছিলেন। তঞাকিনারের চটির সরদেঈয়ের দুই চোখের সঙ্গে সুনা মাহারীর দুইটি চোখের তিনি মনে মনে তুলনা করছিলেন। বন্যার মেঘের ছায়াঢাকা চিলিকার গভীর কালো জলের মত সরদেঈয়ের চোখ— তাতে অতল গভীরতা, তাতে নিমজ্জিত হওয়া যায়। কিন্তু সুনা মাহারীর হাস্যবিলোল চক্ষুতে স্রোতের চঞ্চলতা, তাতে কেবল ঝাঁপ দিয়ে সন্তরণ করার আমন্ত্রণ।

আমিনচাঁদ চোখ মেলে চেয়ে হঠাৎ যেন ভাগীরথীকুমারের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন। স্খলিত কণ্ঠে তিনি পূর্ব কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, "আপনি কিন্তু বহু বিলম্বে এলেন, কুমার।"

ভাগীরথীকুমার অকারণে হেসে উঠে উত্তর দিলেন, "সে তো আপনাদের মালুদের ফৌজদারের কীর্তি! আমরা কন্দা নদীর মোহানা পার হওয়ার সময়ে তার ঘাটিয়ালরা আমাদের আটক না করলে আমরা তো কবে পুরী পৌঁছাতাম।"

'গম্ভীরা'র বাইরে সুনা মাহারীর নূপুর ও কঙ্কণ আবার শিঞ্জিত হ'ল। ভাগীরথীকুমারের চঞ্চল দৃষ্টি সেই দিকে ধাবিত হল। আমিনচাঁদও আবার দুই চক্ষু অর্ধমুদ্রিত ক'রে যেন সেই মধুর শব্দ মুগ্ধ নীরবতায়

শ্রবণ করলেন। তারপর গলা ঝেড়ে পাশে প'ড়ে থাকা আলবোলার নলটি মুখে তুলে এক মুখ ধোঁয়া টেনে বললেন, "মালুদের ফৌজদার বদ্‌তমীজ, নেহাত বেঅকুফ। এর জন্য নায়েব-নাজিম তার উপর বহুত খাপ্পা হয়েছেন। তবে, আপনি খোর্ধায় সদর রাস্তা ছেড়ে চিলিকার রাস্তায় আসছিলেন কেন?"

ভাগীরথীকুমার অপ্রতিভভাবে হেসে উত্তর দিলেন, "খোর্ধার রাস্তাতেও ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে হাশিম খাঁর লশকররা আমাদের বন্দী করার জন্য ওত পেতে ব'সে ছিল। সে রাস্তায় এলেও নিস্তার ছিল কই?"

আমিনচাঁদ আসল কথাটা কি ভাবে আরম্ভ করবেন বুঝতে পারছিলেন না।

একটা অনির্দিষ্ট "হুঁ" ব'লে আলবোলার নলটা নামিয়ে রেখে তিনি গদির উপর সোজা হয়ে বসলেন, তারপরে আর-একবার গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললেন, "ঐ প্রকার আশঙ্কা করা আপনার পক্ষে ঠিক নয়। আজ খোর্ধা রাজ্যে আপনাকে বাদ দিলে আর কেউ নায়েব নাজিমের সুনজরে নেই। হাশিম খাঁ বাণপুরের উপরে আক্রমণ করেছিল সত্য, কিন্তু সে কেবল যারা অবাধ্য হয়ে উঠেছিল তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য। সে আপনাকে কয়েদ করবে কেন?"

ভাগীরথীকুমারের ভাবনা তখন এ-সকল কূটনৈতিক তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে অন্তঃপুরচারিণী সুনা মাহারীর দিকে বারংবার প্রধাবিত। তার বেশ-চূড়ার কেতকীদলটির শেষাবশেষ তিনি অন্যমনস্কভাবে দাঁতে কেটে কেটে ছিঁড়ছিলেন। আমিনচাঁদ বললেন, "আপনি জেনে রাখবেন কুমার সাহেব, খোর্ধার গদিতে আপনাকে বসাবার জন্য নায়েব-নাজিম বাহাদুর অত্যন্ত ব্যগ্র। আপনি তাঁকে ভুল বুঝবেন না।"

খোর্ধার সিংহাসনের প্রতি ভাগীরথীকুমারের আকাঙ্ক্ষা বহুদিন যাবৎ ললিতা মহাদেঈয়ের প্রোৎসাহ বর্ধিত হয়েছিল, আর মহারাজা রামচন্দ্রদেবের প্রতি এক অহেতুক ঘৃণায় তাঁর হৃদয় বিষাক্ত হয়েছিল বটে, তবু আপন পিতাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে খোর্ধার গদি অধিকার করবার চিন্তাও তাঁর কাছে এক-এক সময়ে ঘোর অস্বস্তিকর ঠেকছিল। সে কথা ললিতা মহাদেঈয়ের নিকট ব্যক্ত করবার সৎসাহস অবশ্য তাঁর ছিল না, কিন্তু আমিনচাঁদের কাছে তা প্রকাশ করায় কোনো বাধা ছিল না। তিনি বললেন, "কিন্তু মহারাজা বর্তমানে খোর্ধার গদিতে আমি কী ক'রে বসতে পারি?"

মন্ত্রণাটি ঈপ্সিত পথে অগ্রসর হচ্ছে না দেখে আমিনচাঁদ ঈষৎ বিরক্তভাবে বললেন, "আপনি কাকে মহারাজা বলছেন, কুমার? আপনার পিতা যবনীর পাণিগ্রহণ ক'রে হিন্দুধর্মচ্যুত হয়েছেন। মুক্তি-মণ্ডপ সভার এক অন্যায় নিষ্পত্তি অনুসারে তিনি রথের উপরে 'ছেরাপহরা'র অধিকার পেয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু শ্রীমন্দিরের ভিতর তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ। মন্দিরে সর্বপ্রকার রাজসেবার অধিকার থেকে তিনি আজ বিচ্যুত হয়েছেন।"

ভাগীরথীকুমারের চিন্তায় আমিনচাঁদের এই সমস্ত মন্ত্রণা কোনো রেখাপাত করছিল না। তিনি পূর্ববৎ দাঁতে কেতকীদলের ছিন্নাবশেষ ছিঁড়তে ছিঁড়তে অন্তঃপুরবর্তিনী সুনা মাহারীর কঙ্কণমঞ্জীরশিঞ্জন শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে ব'সে ছিলেন।

পুরীতে পৌঁছাবার পর গুণ্ডিচাবাড়ীতে আমিনচাঁদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হওয়া অবধি তাঁর প্রতি একপ্রকার বিবমিষায় ভাগীরথীকুমার অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলেন। আমিনচাঁদের মাংসল নিষ্করুণ মূর্তিতে এমন এক সঙ্কীর্ণ জাগতিকতার মুদ্রাঙ্কিত ছিল যা তাঁর অন্তরে এক কটু

ও বিস্বাদ অনুভূতির উদ্রেক করছিল। আমিনচাঁদ গোড়া থেকে স্বীয় ভাবে ভাগীরথীকুমারের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান ও সদিচ্ছা প্রকাশ ক'রে উচ্ছ্বসিত শুভাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক স্থাপন করতে ভাগীরথীকুমার স্পৃহা বোধ করেন নি। কিন্তু ইতিমধ্যে মহারানী ললিতা মহাদেঈ বাণপুর থেকে স্বতন্ত্র বার্তাবহের মারফতে ভাগীরথীকুমারের নিকটে এক পত্রে জানিয়েছিলেন, "রাজা আমিনচাঁদ আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী বলিয়া জানিবে। তিনি যেমন পরামর্শ দিবেন সেইমত কার্য করিবে।"

ভাগীরথীকুমার মহাদেঈয়ের সেই নির্দেশ শিরোধার্য ক'রে গুণ্ডিচা-বাড়ীতে রাজসেবাবিধি সম্পাদনের পরে আমিনচাঁদের সঙ্গে পরামর্শের জন্য এসেছিলেন। সে-সব মন্ত্রণা যে রামচন্দ্রদেবের বিরুদ্ধেই হবে তাতে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আপন পিতার বিরুদ্ধে এ সমস্ত কুৎসা একজন অপরিচিত বা সদ্যপরিচিতের নিকট থেকে শোনবার জন্য তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না।

ভাগীরথীকুমার ভালমন্দ কিছুই না ব'লে চুপচাপ ব'সে আছেন দেখে আমিনচাঁদ বললেন, "হিন্দুধর্মচ্যুত, জগন্নাথের সেবা থেকে বঞ্চিত যবন হাফিজ্ কাদর্-এর খোর্ধার সিংহাসনে কোনো অধিকার থাকতে পারে না, যুবরাজরূপে আপনিই খোর্ধার সিংহাসনের যথার্থ অধিকারী। নায়েব-নাজিম তকী খাঁরও তাই অভিলাষ।"

ভাগীরথীকুমার কঠোর দৃষ্টিতে পিত্তল পিলসুজের উপরে নিস্পন্দ দীপশিখার দিকে চেয়ে বললেন, "মহারাজা রামচন্দ্র স্বেচ্ছায় ধর্মচ্যুত হন নি, তাঁকে বলপ্রয়োগে ধর্মচ্যুত করা হয়েছে।"

আমিনচাঁদ হুঁকার নলটা ওষ্ঠাধরে চেপে কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান করলেন। তারপরে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির সুরে বললেন, "বেশ, তা হ'লে

আমি মহারানী ললিতা মহাদেঈকে জানিয়ে দেব যে কুমার খোর্ধার সিংহাসনে অভিলাষী নন। তারপর নায়েব-নাজিম অবশ্য খোর্ধার জন্য অন্য উত্তরাধিকারী স্থির করবেন, উত্তরাধিকার-প্রার্থীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু হাফিজ কাদ্‌র্‌ যে আর খোর্ধার সিংহাসনে থাকবেন না এ সুনিশ্চিত।"

এক কথায় খোর্ধার সিংহাসন এইভাবে হাতছাড়া হয়ে যাবে সে-জন্যও ভাগীরথীকুমার প্রস্তুত ছিলেন না। আবার মহারানী ললিতা মহাদেঈয়ের রোষকষায়িত দুই বিশাল চক্ষু তাঁর বিভ্রান্ত দৃষ্টির সামনে যেন ভেসে উঠল। ভাগীরথীকুমার উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, "খোর্ধার সিংহাসনের জন্য আমার অভিলাষ নেই এমন কথা তো আমি বলি নি। মহারাজা স্বেচ্ছায় ধর্মচ্যুত হয়ে থাকুন বা বলপ্রয়োগে হয়ে থাকুন খোর্ধার সিংহাসনের পরম্পরা এই যে, জগন্নাথের রাজসেবকই রাজা হয়ে থাকেন। আজ মহারাজা যখন সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তখন খোর্ধার সিংহাসনের উপর আর তাঁর দাবি থাকতে পারে না। আমিই বর্তমানে তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। নায়েব-নাজিম এ সম্বন্ধে চোখ বুজে থাকবেন কেমন ক'রে?"

আমিনচাঁদ দেখলেন কুমার ক্রমে পথে আসছেন। সিংহাসনের জন্য কিন্তু যে-সব শর্ত পূরণ করা আবশ্যক তা তাঁকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য আমিনচাঁদ মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। শ্রীমন্দিরের পরিচালনার অধিকার হতে ভাগীরথীকুমার সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হবেন ও আমিন-চাঁদ সেই অধিকার লাভ করবেন— এই মূল্যটি ভাগীরথীকুমারকে দিতে হবে। কিন্তু তা হঠাৎ প্রকাশ না ক'রে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় আমিনচাঁদ আবার অনাসক্তভাবে ধূমপান করতে লাগলেন।

আমিনচাঁদের মনে হ'ল গলাটা শুকিয়ে এসেছে, একবার ভিজানো দরকার। রসিকতাভরে ডাকলেন, "সুনা, ওগো সুনা, কাকে লজ্জা ক'রে তুমি আড়ালে লুকোলে ? একটু 'অধরপণা' আনো, গলা শুকিয়ে গেল যে। কুমারের তৃষ্ণাটাও বেড়েছে বোধ হয়, না কি বলেন কুমার ?"

'গম্ভীরা'র পার্শ্বস্থ অলিন্দ কঙ্কণ ও নূপুরের রিনিঝিনিতে আমোদিত হয়ে উঠল। ভাগীরথীকুমার চঞ্চল চক্ষে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, আমিনচাঁদ তা যত্নসহকারে লক্ষ্য করলেন।

একটু পরে সুনা মাহারী তরঙ্গায়িতা সর্পিনীর মত বঙ্কিম ছন্দে সর্বাঙ্গ দুলিয়ে হাতে সুরার ফেনিলোচ্ছল দুটি রুপার পেয়ালা নিয়ে ভিতরে ঢুকল। তার প্রতিটি ভঙ্গিমায় উচ্চারিত হচ্ছিল সুকোমল শয্যার তন্দ্রাতুর আমন্ত্রণ। সুনা মাহারী পেয়ালা দুটি গদির উপর রেখে অহেতুক নিতম্ব আন্দোলিত করতে করতে আবার চ'লে যাচ্ছিল, আমিনচাঁদ তার একখানি হাত ধরে টেনে বললেন, "আ—ঃ, এখানে দু' দণ্ড বসো-না, সোনা। তোমার 'গম্ভীরা'য় এসেছেন স্বয়ং খোর্ধার মহারাজা— হাঁ, মহারাজা নন তো আর কি ?— তুমি তাঁর একটু সেবাযত্ন করবে না ?"

গদির উপর ব'সে পড়ার সময় গদির কোমলতাও যেন কোমলাঙ্গী সুনাকে পীড়া দিচ্ছে এমনি অভিনয় ক'রে কপট যন্ত্রণায় সুনা ব'লে উঠল—"আঃ— !"

তার পর ভাগীরথীকুমারের দিকে সম্মোহন-দৃষ্টি হেনে মোগল মজলিসের বাঈজীদের ভঙ্গীতে কুর্নিস করল।

ভাগীরথীকুমার ধীরে ধীরে অভিভূত হয়ে পড়ছিলেন। এক উৎকট নেশায় যেন তাঁর প্রত্যেক স্নায়ুতন্ত্রী উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। কিন্তু এমনি সময়ে হঠাৎ রসভঙ্গ ক'রে 'গম্ভীরা'র মধ্যে অত্যন্ত ক্লান্ত ও

চিন্তিতভাবে এসে ঢুকলেন বড় পরিছা গৌরী রাজগুরু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অন্ধারী গড়ের কেলু সামন্তরায় মহাপাত্র, আর বাণপুরের বংশীধর শ্রীচন্দন ও জগন্নাথ পরিছা। রামচন্দ্রদেবের বিরুদ্ধে ষড়-যন্ত্রে এঁরাই আমিনচাঁদের প্রধান সহযোগী। তাঁরা আসামাত্র সুনা মাহারী উঠে ভিতরে চ'লে গেল।

আমিনচাঁদ কিন্তু তাঁদের এই সময় এইখানে মোটেই প্রত্যাশা করেন নি। তাই অকস্মাৎ তাঁদের সবাইকে একসঙ্গে আসতে দেখে তিনি উদ্‌বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "খবর কি? আপনারা হঠাৎ এই অসময়ে?"

আমিনচাঁদের প্রশ্ন শেষ হ'তে না হতেই ভিতরে এসে ঢুকল আর-এক জন— লালবাগ থেকে নায়েব-নাজিম কতৃক প্রেরিত আমিনচাঁদের এক পরিচিত পাইক। কটক থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে হয়তো সে এক রাহায় পুরী এসেছে, লণ্ডামঠে তাঁকে না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে এসে পৌঁচেছে সুনা মাহারীর বাড়ীতে। তার মুখ ও কপাল থেকে বর্ষাবিন্দুর মত ঘাম ঝরছিল, গায়ের আঙ্গরাখা স্থানে স্থানে ভিজে কালো দেখাচ্ছিল।

আমিনচাঁদ বুঝলেন পাইক টি সম্ভবত কোনও গুরুতর সংবাদ নিয়ে কটক থেকে এসেছে। তিনি শুধালেন, "খবর কি? তুমি হঠাৎ এমনভাবে এসে উপস্থিত যে?"

পাইক বললে, "খোর্ধা থেকে দেওয়ান লোধুমিঞা খবর পাঠিয়েছেন মহারাজা রামচন্দ্র কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছেন। শিওয়ানবিস দারোগারাও এ পর্যন্ত তাঁর কোনো হদিশ পান নি। উজীর মুস্তাফা আলি খাঁ আপনার নিকট আমায় পাঠিয়েছেন এই খবর দিয়ে।"

মহারাজা রামচন্দ্রদেবের অন্তর্ধানের আকস্মিকতায় বড় পরিছা

গৌরী রাজগুরু প্রমুখ সকলেও অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পড়েছিলেন।

আমিনচাঁদও কম বিস্মিত হন নি। রামচন্দ্রদেব তা হলে আমিনচাঁদের অভিপ্রায়ের কোনো সূচনা পেয়েছেন ? রথযাত্রা শেষ হবার পরে রামচন্দ্রদেব পুরী শ্রীক্ষেত্র থেকে বিতারিত হবেন ব'লে কেউ কেউ অবশ্য অনুমান করেছিল, কিন্তু তার প্রতিরোধ করতে গেলে খোর্ধার সিংহাসন থেকেও নির্বাসিত হয়ে তাঁকে বারবাটীর বন্দীশালায় আজীবন কারারুদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এই সুপরিকল্পিত ব্যাপারটার কোনো আঁচ পাওয়া তো সম্ভব নয় রামচন্দ্রদেবের ! গৌরী রাজগুরু প্রমুখ অবশ্য জানেন আমিনচাঁদ ছলে বলে কৌশলে মহারাজা রামচন্দ্র-দেবকে পুরী থেকে নির্বাসিত করবার জন্য বদ্ধপরিকর, কিন্তু তার পিছনে যে আরো গভীর চক্রান্ত ছিল তা তো খোদ তকী খাঁর দরবারেও অনেকেই জানেন না। কাজেই খোর্ধা গড ছেড়ে রামচন্দ্রদেবের হঠাৎ এমন নিরুদ্দেশ পলায়নের কোনো সম্ভাব্য কারণ ছিল না। এমনিতে রামচন্দ্রদেবের হঠাৎ কোনো বিপদের বিশেষ আশঙ্কাও ছিল না। বড় পরিছা গৌরী রাজগুরুর সহায়তা সত্ত্বে মন্দিরের সেবকেরা আমিনচাঁদের প্রতি যে তীব্র বিরুদ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন তাতে আমিনচাঁদ বেশ বুঝেছিলেন যে রামচন্দ্রদেব যদি সম্মুখ সংঘর্ষে তাঁর বিরোধিতা করতেন তবে আমিনচাঁদের পক্ষে ব্যাপারটি আদৌ সহজ হ'ত না। তা হ'লে রামচন্দ্রদেবের হঠাৎ নিখোঁজ হওয়ার কারণটা কি ?

গৌরীরাজগুরু বললেন, "ভিতরছো মহাপাত্র, ধনী পড়িআরী, সান পরিছা বিষ্ণু পশ্চিমকবাট মহাপাত্র আর কয়জন পতিমহাপাত্রেরও পুরীতে কোনো পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। কাল অষ্টমী রাত্রে বড় শিঙ্গারের পরে দইতা মহাপাত্রদের খোঁজা হয়েছিল— কাল যে দুজনের পালা ছিল। কোথায় কোন 'জেগা ঘরে' (আখড়া) ভাঙের ঘোরে হয়তো

প'ড়ে আছেন ভেবে সে-সব জায়গায় তাঁদের তল্লাস করা হ'ল, তখন দেখ্ দেখ্ ভিতরছো মহাপাত্র আর ধনী পড়িআরীও উধাও হয়েছেন! তাদের বাড়ীর লোকে বললে সপ্তমীর দিন রাত্রে গুণ্ডিচাবাড়ীর সামনে ব্রাহ্মণ ভোজনের পর তারা 'গোটিপুঅ'র নাচ দেখতে গিয়েছিল, নাচ দেখে তারা আর ফেরে নি। সান পরিছার কর্তব্য এ-সবের তত্ত্ব নেওয়া। সেবকেরা দিন দিন অবাধ্য হয়ে উঠছে, 'সেবানীতি'তে অনেক ব্যাঘাত হচ্ছে। তা, সান পরিছার খোঁজ ক'রে দেখা গেল তিনিও নিখোঁজ! তাঁর বাড়ীর লোকও কিছু বলতে পারছে না।"

আমিনচাঁদ মনে মনে হঠাৎ সিদ্ধান্ত ক'রে ফেললেন রামচন্দ্রদেব মারাঠাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার জন্য হয়তো নাগপুরের দিকে বেরিয়ে গেছেন। মারাঠারা আজকাল বাংলা সুবার চারিদিকে ঘুর ঘুর ক'রে বেড়াচ্ছে। ওড়িশায় অবশ্য তারা এখনো দেখা দেয় নি, কিন্তু রামচন্দ্রদেব তাদের সহায়তায় তকী খাঁকে ওড়িশা থেকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে ভাস্কর পণ্ডিতের কাছে উকিল পাঠিয়েছিলেন এমন একটা কথা শিওয়ানবিসদের দেওয়া খবরে জানা গিয়েছিল। তবে সে খবরের আর কোনো সমর্থক না থাকায় তা উড়ো খবর বলেই বিবেচনা করা হচ্ছিল।

কটক থেকে উজীর মুস্তাফা আলি খাঁ আমিনচাঁদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। পাইক তার কুর্তার খোলের ভিতর থেকে গালা দিয়ে মোহর করা চিঠিখানা বার ক'রে আমিনচাঁদের হাতে বাড়িয়ে দিলে।

ফারসীতে লেখা চিঠিতে মুস্তাফা আলি নির্দেশ দিয়েছিলেন ভাগীরথীকুমার ইতিমধ্যে যদি পুরীতে পৌঁছে থাকেন তা হ'লে তাঁকে যথাশীঘ্র সম্ভব খোর্ধায় পাঠিয়ে সেখানে সিংহাসনে তাঁকে অভিষিক্ত করতে হবে, আর অভিষেকের আগে পরম্পরাগত বিধান অনুসারে

ভাগীরথীকুমার যেমন জগন্নাথের নিকট শাড়ী বাঁধার কথা তা যেন যথাযথভাবে পালিত হয়, কারণ জগন্নাথের কাছে শাড়ী বেঁধে 'আজ্ঞা-মাল'(-অ) না পেলে খোর্ধার সিংহাসনে তিনি কারও স্বীকৃতি পাবেন না।

চিঠিখানি প'ড়ে নিজের পোষাকের জেবের মধ্যে সযত্নে রেখে আমিনচাঁদ ভাগীরথীকুমারের দিকে তাকালেন। এই অপোগণ্ড অব্যবস্থিতচিত্ত দুর্বলমনা যুবকের খোর্ধার সিংহাসনে অভিষিক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আমিনচাঁদকে ভাগীরথীকুমারের প্রতি হঠাৎ ঈর্ষান্বিত ক'রে তুলল।

নীরবে চক্ষু মুদ্রিত ক'রে আমিনচাঁদ কয়েক মুহূর্ত কী চিন্তা করলেন। পুরী ক্ষেত্রে আমিনচাঁদের প্রভুত্ব ভাগীরথীকুমার স্বীকার না করা পর্যন্ত তাঁকে কেবল খোর্ধার সিংহাসনে অভিষিক্ত করায় কোনো কূটনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। ভাগীরথীকুমার অভিষিক্ত হবার পরে এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন, তার বিরোধিতাও করতে পারেন। তাঁর মত দুর্বলচিত্ত লোককে নিয়ে বিপদই এই। বিচারসম্মত যুক্তির চাইতে খেয়ালই তাদের সিদ্ধান্তকে অধিক প্রভাবিত ক'রে থাকে। অতএব এ-বিষয়ে প্রথমে বড় পরিছা গৌরী রাজগুরু এবং বাণপুর-আগত মহারানী ললিতা মহাদেঈর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করাই যুক্তিযুক্ত। আমিনচাঁদ 'গম্ভীরা'র বাহিরে সুনা মাহারীর উদ্দেশে একবার দৃষ্টি প্রেরণ করলেন, তারপরে ভাগীরথীকুমারকে বললেন, "আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, কুমার সাহেব, আমরা অল্প ক্ষণের মধ্যে ফিরে আসছি। কিছুটা বিলম্বও হ'তে পারে। বিষয়টি কেমন গুরুতর তা তো অবশ্যই বুঝতে পারছেন?"

'গম্ভীরা'র বাহিরে সুনা মাহাবীর নূপুর ও কঙ্কণ আবার শিঞ্জিত হ'ল। আমিনচাঁদ প্রমুখ সকলে উঠে গেলেন।

ভাগীরথীকুমার যথাসম্ভব কোমল কণ্ঠে ডাকলেন— "সোনা— "

কিন্তু বাহিরের অন্ধকারের ভিতর থেকে সুনার কঙ্কণের রিনিঝিনি মাত্র ভাগীরথীকুমারের আকুল আহ্বানের উত্তরে ভেসে এল। বহু আমন্ত্রণ আহ্বানের পরে সোনা কৃত্রিম নিদ্রাতুরতায় কঞ্চুলীপিনদ্ধ পীন স্তনযুগ তরঙ্গিত ক'রে আলস্য ত্যাগ করতে করতে ভিতরে এল। আমিনচাঁদ প্রমুখ সকলে অন্যত্র গেছেন এবং ফিরতে বিলম্ব হবে এমন সূচনা দিয়ে গেছেন তা সুনা মাহারীর অজানা ছিল না। তবু সে অসহায়া অবলা নারীর নিরীহতার অভিনয় ক'রে ঠোঁট ফুলিয়ে কপট অভিমানের সুরে বললে, "ঐ যা, রাজা আমিনচাঁদ নেই। আমাকে এই নির্জন রাতে একলা ফেলে কোথায় গেলেন তিনি? বাড়ীতে আমি ছাড়া আব কেউ নেই যে।"

নায়িকার পরোক্ষ আমন্ত্রণের এমনি আলংকারিক রীতি ভাগীরথী-কুমারের অপরিচিত ছিল না। তিনি স্মিত হেসে উত্তর দিলেন, "সেই জন্যই তোমায় দেখবার দায়িত্ব তিনি আমায় দিয়ে গেছেন!"

জগন্নাথ-বলরাম কাঞ্চিযাত্রার কালে মাণিক(-অ) 'গউড়ুণী'র[1] সঙ্গে সাক্ষাতের এক চিত্রপট দেওয়ালে ঝোলানো ছিল। ভাগীরথীকুমারের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সেই চিত্রপটের দিকে তাকিয়ে সুনা বললে, "তুমি যদি তস্কর হয়ে থাক? যে দিনকাল পড়েছে তাতে কাকে আর কী বিশ্বাস যে—!"

1. গউড়ুণী— গোযালিনী।

ভাগীরথীকুমার হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, "তস্কর সোনা চুরি না করলে গৃহস্থ সোনার মূল্য বুঝত কোত্থেকে ?"

সোনা ভাগীরথীকুমারের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তার দুই আয়ত চক্ষুর মোহিনী দৃষ্টি ভাগীরথীকুমারের প্রতি নিবদ্ধ ক'রে তার কবরী থেকে একটি বাসিফুল ছুঁড়ে বললে— "যাঃ— !"

নারী যেখানে কল্যাণময়ী সেখানে সে অশ্রুমুখী, বিষাদের প্রতিমা। কিন্তু নারী যেখানে জ্বালাময়ী সেখানে সে এমনি লাস্যময়ী, রসময়ী কামনার বিগ্রহ। সে লাবণ্যের উজ্জ্বল প্রতিমা নয়, রূপের জ্বালাময়ী শিখা। আবার নারী যেখানে ছলনাময়ী, তার গোপন কুটিলতা প্রকাশ পায় তার চটুল হাস্যে, বিলোল দৃষ্টিতে। পুরুষকে তা মুগ্ধ করে, অন্ধ করে, বিভ্রান্ত করে।

ভাগীরথীকুমারকে সুনা তেমনি বিভ্রান্ত ও সম্মোহিত করেছিল। তখন তার জন্য যে-কোনো উচ্চ মূল্য দিতেও ভাগীরথীকুমার কুণ্ঠিত ছিলেন না।

প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোতেও সুনা মাহারীকে লাগছিল জ্বালাময়ী অগ্নিশিখার মত। অন্যমনস্কতার ভান ক'রে দুই হাতে অশোক ফুলের একটি কঁড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে সুনা বললে, "রাজা আমিনচাঁদের কথা তো তুমি রাখলে না, আমি তোমার কথা কেন শুনব ?"

রাজা আমিনচাঁদ এমন কী বলেছেন যা রক্ষা করতে ভাগীরথীকুমার রাজী নন ? সেজন্য তো তিনি সর্বদা প্রস্তুত। সুনার ভুল ধারণা দূর করার জন্য ভাগীরথীকুমার বললেন, "রাজা আমিনচাঁদকে আমার একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী বলে জানি, তাঁর কথা অন্যথা করব কি ক'রে ?"

সুনা মাহারী বললে, "তা হলে খোর্ধার মহারাজা হ'তে তুমি কেন রাজী নও ?"

ভাগীরথীকুমার উত্তর দিলেন, "বাঃ রে! আমি রাজা হব না কেন? মহারানী তো সেইজন্যই আমায় পুরী পাঠিয়েছেন। তবে কি জানো গো সোনা, মহারাজা হওয়ার অনেক ঝঞ্ঝাট, মনের ফুর্তিতে দু'দণ্ড আয়েস করার ফুরসৎ মেলে না।"

খোঁপা থেকে একটা জুঁই ফুলের মালা খুলে নিয়ে ডান হাতের তর্জনীতে ঘোরাতে ঘোরাতে সোনা আবদারের সুরে বললে, "কাঁটা নেই এমন ফুল কোথায় পাবে গো?"

জুঁই ফুলের আঘাতে প্রদীপ নিভল। 'গম্ভীরা'র ভিতর অন্ধকার।

বহুক্ষণ পরে আমিনচাঁদ একাকী ফিরে এলেন। তিনি লক্ষ্য করলে দেখতে পেতেন 'গম্ভীরা'র ভিতরে যে প্রদীপটি তখন জ্বলছিল সে অন্য এক প্রদীপ। ভাগীরথীকুমার তাঁর সুগোল চিবুকে একটি ক্ষতচিহ্ন আমিনচাঁদের দৃষ্টি থেকে গোপন করবার বহু প্রয়াস করছিলেন। কিন্তু সে-সব তুচ্ছতার দিকে দৃষ্টি দেবার তখন আমিনচাঁদের সময় ছিল না। বাণপুর থেকে মহারানীর প্রতিনিধি যাঁরা এসেছিলেন বহু তর্ক-বিতর্কের পর তাঁরা আমিনচাঁদের শর্তে সম্মত হয়েছিলেন। বড় পরিছা গৌরী রাজগুরুও তাতে অসম্মত নন। খোর্ধার সিংহাসনে ভাগীরথীকুমার অভিষিক্ত হবেন, কিন্তু পুরীক্ষেত্রে তাঁর কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না, রাজা আমিনচাঁদের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণাধীনে মন্দির পরিচালিত হবে। রাজা আমিনচাঁদ মন্দিরের সমস্ত রাজসেবা করবেন, কিন্তু খোর্ধার মহারাজা বা তাঁর পরিবারবর্গ মন্দিরে এলে পরম্পরাগত রীতি অনুযায়ী

আসবেন এবং তার পূর্বে 'দেউলশোধ' (মন্দিরশুদ্ধি) হবে। কিন্তু প্রতি সংক্রান্তিতে মন্দিরচূড়ায় মহাদীপ ওঠার সময় কেবল আমিনচাঁদের নামে ডাক পড়বে, খোর্ধার মহারাজার নামে নয়।

আমিনচাঁদ ক্লান্তভাবে গদির উপরে গা ঢেলে দিয়ে বললেন, "আপনি প্রস্তুত থাকুন, কুমার সাহেব। 'নীলাদ্রিবিজে'র পরদিন খোর্ধার সিংহাসনে আপনার অভিষেক হবে।"

ভাগীরথীকুমার এ সুসংবাদে নির্বোধের মত উচ্চহাস্য ক'রে উঠলেন।

3

ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ভিতর দিয়ে শুক্লপঞ্চমীর চন্দ্র ভেসে চলেছিল না চাঁদেব উপর দিয়ে মেঘগুলি ভেসে যাচ্ছিল— সে যেন এক প্রহেলিকা। কিন্তু সে সবের দিকে চেয়ে দেখার মত মানসিক অভিনিবেশ তখন ভাগীরথীকুমারের ছিল না। কালো মেঘের আড়ালে যখন চাঁদ কিছুক্ষণের জন্য মুখ লুকাচ্ছিল তখন তার সুবিস্তীর্ণ ছায়ায় বড়দাণ্ড পাতলা অন্ধকারে ঢাকা পড়ছিল। মেঘের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে চাঁদ আবাব যখন নির্মল আকাশের নীলস্রোতে গা ভাসাচ্ছিল তখন বড়দাণ্ডের দুইধারে নারকেল গাছের পাতাগুলি জ্যোৎস্নার আলোয় চিকচিক করে উঠছিল। রাত্রির পাখী হঠাৎ ঘুম ভেঙে ডেকে উঠছিল। বড়দাণ্ডের ধারে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা যাত্রীদের সেই আলোয় গতাসু শবপিণ্ডের মত মনে হচ্ছিল।

কাল 'বাহুড়া' দশমী। 'বাহুড়া' উৎসব দেখবার আশে অর্ধেক যাত্রী তখনও শ্রীক্ষেত্রে থেকে গিয়েছিল। 'বাহুড়া'র পরে এদের মধ্যে

অনেকে ফিরে যাবে, যারা থাকবে তারা ফিরবে একেবারে ঠাকুরের 'নীলাদ্রিবিজে' দ্বাদশীর উৎসব শেষ ক'রে।

বড়দাণ্ড নির্জন। ম্লান জ্যোৎস্না, উতলা পবন। লাস্যময়ী সুনা মাহারীর সম্মোহিত পরিমণ্ডল ত্যাগ ক'রে এত শীঘ্র বালিসাহী 'উআসে'র সেই জীর্ণ বিষাদ-জর্জরিত পরিবেশের মধ্যে ফিরে আসতে ভাগীরথীকুমারের মন সরছিল না।

'বাহুড়া'র যাত্রীরা বড়দাণ্ডের উপরে এখানে ওখানে দলে দলে শুয়ে। যাদের চোখে তখন ঘুম ছিল না তারা কেউ বা একা কেউ বা সমস্বরে 'জণাণ' গান করছিল, কিন্তু তাদের খঞ্জনিতে অনুরণিত হচ্ছিল ঘুমে ভারী হয়ে আসা চোখের পাতার স্পর্শ।

'বাহুড়া'র কারণে 'গুণ্ডিচা' মন্দিরে সেবকদের কর্মব্যস্ত কোলাহল তখনও স্তব্ধ হয় নি। নবমীর রাত্রিতে 'বড় শিঙ্গারে'র পর থেকে 'বাহুড়া'র রথটানা আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত সেবকদের এক দণ্ডও অবসর থাকে না।

'সুআঁসিআ'রা রথে 'চার'(-অ) বাঁধা আরম্ভ করেছে। গুণ্ডিচা মন্দিরের সামনে মশালচিরা যে-সব মশাল জ্বেলে তাদের আলো দিচ্ছে তাতে বড়দাণ্ডের সেই অংশটা কিঞ্চিৎ আলোকিত হয়েছে। মশালের আলোয় রথ তিনটি দূর থেকে তিনটি ছায়াচিত্রের মত দেখা যাচ্ছে।

রাঘবদাস মঠ থেকে ঠাকুরের জন্য 'শুক্লসজ'(-অ), ঘণ্টা, শিঙ্গা ও তেলেঙ্গীবাদ্য বাজিয়ে রথদাণ্ড দিয়ে আসছে। জনকয়েক দইতা হেলতে দুলতে সেই ছোট মিছিলটির পুরোভাগে চলেছেন।

রথের 'চার' বাঁধা শেষ হতে হতে রাত পুইয়ে যাবে, তার পরে আরতির ধুমধাম শুরু হবে। তার পরে সকাল সকাল সূর্যপূজা দ্বারপালপূজা সেরে সকালের খিচুড়িভোগ শেষ করতে হবে। এমনি

বহু 'নীতি'-নির্ঘণ্টের মধ্যের সেবকরা নবমীর সারা রাতটা জাগরে কাটান।

ভাগীরথীকুমারের মনে প'ড়ে গেল মহারাজা রামচন্দ্রদেব আকস্মিকভাবে কোথায় অন্তর্ধান করেছেন, কাল 'বাহুড়া' যাত্রার 'ছেরাপহঁরা' 'নীতি' তাই আমিনচাঁদ সম্পন্ন করবেন। সেই শর্তেই কেবল ভাগীরথীকুমারকে খোর্ধার সিংহাসনে মহারাজা বলে স্বীকৃতি দিতে তকী খাঁর প্রতিনিধিরূপে রাজা আমিনচাঁদ সম্মত হয়েছেন।

বাণপুর থেকে যে দু'জন এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে জগন্নাথ পরিছা এ শর্তে প্রথমে অবশ্য রাজী হন নি। পরে ভাবলেন, করুন গিয়ে রাজা আমিনচাঁদ রথের উপরে 'ছেরাপহঁরা', সে কী বা এমন একটা রাজসুলভ মহৎকর্ম! তিনি আর কথা বাড়ালেন না।

সুনা মাহারীর বাড়ীতে আবার সেইসব আলোচনা শুরু হয়েছিল। বহু বিলম্বে রাজা আমিনচাঁদ, গৌরী রাজগুরু, বংশী শ্রীচন্দন ও জগন্নাথ পরিছার সঙ্গে খোর্ধার সিংহাসন লাভের শর্ত হিসাবে যখন জানিয়ে দিলেন যে পুরীক্ষেত্রে ভাগীরথীকুমারের আর কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না, জগন্নাথের নিকটে পরম্পরাগত রাজসেবার অধিকার থেকেও তিনি বঞ্চিত হবেন এবং সেই অধিকার বর্তাবে রাজা আমিনচাঁদের উপরে, তখন তার মর্ম ভাগীরথীকুমার বুঝতে পারেন নি। বাণপুর ছেড়ে বেরনোর পর থেকে এ পর্যন্ত এত অপ্রত্যাশিত সব ঘটনা ঘটে গেছে, বিশেষতঃ তণ্ডাকিনারে সরদেঈয়ের সঙ্গে বিচিত্র অবস্থার মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ, পুরীতে সুনা মাহারীর সঙ্গে আকস্মিক মিলন, সর্বোপরি এমন সহসা সত্য সত্যই একেবারে সিংহাসনলাভের প্রতিশ্রুতি তাঁকে সম্পূর্ণ অভিভূত করে ফেলেছিল। জগন্নাথের কাছে রাজসেবার সামান্য অধিকার নিয়ে বিতর্ক বাড়িয়ে সিংহাসনপ্রাপ্তির উজ্জ্বল সম্ভাবনা নষ্ট

করতে ভাগীরথীকুমার আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না।

কিন্তু জগন্নাথ পরিছার মন এই শর্তে পুরোপুরি সায় দেয় নি। তিনি বলেছিলেন—"তা কি হয়? মহারাজা অনঙ্গভীমদেবের সময় থেকে এই বিধি চ'লে আসছে যে ওড়িশার গজপতি সিংহাসনে কোনও রাজা অভিষিক্ত হবেন না। জগন্নাথই কেবল ওড়িশার রাজচক্রবর্তী, তাঁর সেবকরূপে গজপতি রাজা ওড়িশায় শাসন পরিচালনা ক'রে থাকেন মাত্র। সূর্যবংশী সম্রাট কপিলেন্দ্রদেবও গঙ্গা হ'তে কাবেরী পর্যন্ত ওড়িশার সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রে 'বীর শ্রীগজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটিকর্ণাটকলবর্গেশ্বর বীরাধিবীরবর' ইত্যাকার বিরুদাবলীতে[1] শোভিত হয়েও শ্রীমন্দিরের জয়বিজয়দ্বারের শিলালেখতে ঘোষণা করেছিলেন, 'তুই যাকে অনুগ্রহ করিস্ এ সিংহাসন তারই'। এ সব হল ওড়িশার গজপতি সিংহাসনের পরম্পরা। রাজা যদি সেবক না হন তা হলে ওড়িশার সিংহাসনে তাঁকে মহারাজা ব'লে স্বীকার করবে কে? তা হলে ভাগীরথীকুমার সে অধিকার ছেড়ে দেবেন কী ক'রে?"

গৌরীরাজগুরুকে প্রদীপের ম্লান আলোয় ক্ষুধিত বাজপাখীর মত নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর দেখাচ্ছিল।

এ-সকল পরম্পরার সঙ্গে :কউ যদি সুপরিচিত থাকে তবে সে গৌরী রাজগুরু। কিন্তু রাজা আমিনচাঁদ জগন্নাথের নিকট রাজসেবার অধিকার পেলে রাজগুরুকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করবেন ব'লে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাতে তাঁকে এ সব সম্মানিত পরম্পরা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তিনি বললেন, "জগন্নাথের নিকট রাজসেবার অধিকার রাজার, এ কথা ঠিক; কিন্তু এও তো চোখে দেখা যে রাজার অনুপস্থিতিতে 'মুদিরথে'রাই বিভিন্ন রাজসেবা সম্পন্ন ক'রে থাকেন।

1. বিরুদ(-অ)— গদ্যে পদ্যে মেশানো স্তুতি।

আবার এই মহারাজারই আমলে বকশী বেণুভ্রমরবর মন্দিরে কিছুদিন রাজসেবা সম্পাদন করেছিলেন। এখন রাজা আমিনচাঁদ সে সব সেবা করবেন, তার জন্য এত কথা কেন? এমন আকাশ থেকে পড়ার এতে কি আছে? 'মুদিরথ' যদি রাজসেবা করতে পারেন তা হলে রাজা আমিনচাঁদ তা না পারবেন কেন?"

জগন্নাথপরিছা উত্তর দিলেন, "ওহে রাজগুরুমহাশয়, তুমি আমি বললেই কি হ'ল? 'নীলাদ্রিমহোদয়ো'ক্ত[1] ইন্দদ্যুম্নের প্রতি ব্রহ্মবাক্য অনুসারে এ সব বিধিবিধান আবহমান কাল হ'তে আচরিত হয়ে আসছে। মুদিরথ রাজসেবা করবে ব'লে একটা কিছু প্রতিষ্ঠিত অধিকার আছে এমন তো নয়। মুদিরথ সর্বশাস্ত্রবিৎ হবেন, আবার রাজার প্রতিনিধিরূপে রাজা তাঁকে স্বীকৃতি দেবেন, তবে তো?

'এবং মহোৎসবং কুর্য্যাৎ পূজয়াং চ রমাপতে
বিধিমেতাদৃশং কর্ত্তুং ন শক্যং চেদ্‌যদা নৃপ
তদা প্রতিনিধিং কুর্য্যাদ্‌বিপ্রং কিঞ্চিৎ সুধার্মিকং
তব প্রতিনিধিঃ যোঽয়ং সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ'

এই হ'ল নীলাদ্রিমহোদয়ের ব্রহ্মবাক্য। এতে প্রতিনিধি কথাটা বিচার ক রে দেখুন, তা হলে আমার কথার মর্ম বুঝতে পারবেন।"

গৌরী রাজগুরু তাচ্ছিল্যভরে বললেন, "হাঁঃ, প্রতিনিধি তো! আমিনচাঁদকে প্রতিনিধিরূপে রাজা স্বীকার করলে শাস্ত্র অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে কোথায়?"

আমিনচাঁদ এ পর্যন্ত একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আলবোলায় ধূমপান করছিলেন, অম্বুরী তামাকের মিঠাকড়া খোশবুতে 'গম্ভীরা' আমোদিত হয়ে উঠেছিল। এখন তিনি ব'লে উঠলেন, "রাজত্বের

1. নীলাদ্রিমহোদয়— প্রাচীন পুথি বিশেষ।

সঙ্গে ধর্ম, সেবা, এ সবের সম্পর্ক কি? ভাগীরথীকুমার সিংহাসনে বসবেন, তাতে ধর্মকর্মের কথা উঠছে কেন?"

জগন্নাথ পরিছা গম্ভীর স্বরে বললেন, "এমন কথা বলবেন না রাজা আমিনচাঁদ। গজপতি সিংহাসন উপরে যতখানি নীচেও ততখানি! উপরে আছে রাজত্ব, নীচে পোঁতা আছে ধর্ম; তা নইলে এত পাঠান-মোগলের আক্রমণের মধ্যে ওড়িশা কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।"

পাঠান-মোগলের আক্রমণের প্রতি এই উল্লেখ আমিনচাঁদের কাছে অসহ্য মনে হ'ল। তিনি ঈষৎ রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, "এ-সব আলোচনা বাড়িয়ে লাভ নেই। মোট কথা, খোর্ধার সিংহাসন এখন শূন্য প'ড়ে আছে। ভাগীরথীকুমারকে কেউ অবশ্য বাধ্য করছে না, তিনি মহারাজা হ'তে রাজী হ'লে ভাল কথা, তা না হ'লে খোর্ধা খাস হয়ে যাবে জানবেন। একজন হিন্দু হিসাবে জগন্নাথকে আমি তকী খাঁর নজর থেকে বাঁচাবার জন্যই এত চেষ্টা করেছি। তা, সে না হয় নাই হল। সেজন্য আমার খেদ নেই। গীতা-বাক্য হচ্ছে— কর্মতেই না মানুষের অধিকার, ফলে অধিকার কোথায়? ভাগীরথীকুমার তো সব কথা শুনলেন, এখন তিনি কী কথা বলছেন বলুন।"

গুণ্ডিচা মন্দিরে কোনও 'নীতি' উপলক্ষে বাজনা বাজছিল। ঘণ্টা ও শিঙ্গার শব্দে নিশুতি রাত হঠাৎ জেগে উঠল। তারি মধ্যে যেন কোন অব্যক্ত সুদূরের আহ্বান প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

ভাগীরথীকুমার উত্তর দিলেন, "আপনার শর্তে আমি রাজী।"

আলোচনার সেইখানেই সমাপ্তি।

ভাগীরথীকুমার বালিসাহী 'উআসে'র দিকে এগোলেন। ম্লান জ্যোৎস্নার আলোয় রহস্যাবৃত গাম্ভীর্যে শ্রীমন্দির শত জয়পরাজয়, গৌরব-লাঞ্ছনা, উত্থান-পতনের মধ্যে ওড়িয়া জাতির অনমনীয় দৃঢ়তা ও

বিশ্বাসের এবং অন্তিম বিজয়ের সঙ্কেতের মত দাঁড়িয়ে ছিল। ওড়িয়া জাতির গর্ব অভিমান যেন দৃপ্ত নিঃশঙ্কতায় সুদর্শনলাঞ্ছিত এই পতাকার মত নীলগিরির উপরে উড়ছিল।

ভাগীরথীকুমারেব মনে পড়ল জগন্নাথ পরিছার কথা— "গজপতি সিংহাসন উপরে যত নীচে তত। উপরে রাজত্ব, নীচে পোঁতা ধর্ম।"

কপালের উপরে উড়ে পড়া কয়গাছি চুল হাত দিয়ে পিছন দিকে সরিয়ে দিয়ে স্বগতোক্তি করলেন ভাগীরথীকুমার— "দেউলে রাজসেবা কী এমন একটা মহৎ কর্ম ?"

খোর্ধাব সিংহাসনে অভিষিক্ত হওয়ার চিন্তা তাঁকে বেশ উত্তেজিত ক'রে তুলেছিল। আর, সুনা মাহারীর দুই সম্মোহন চক্ষু সে উত্তেজনায় এনেছিল এক মাদকতা।

অকারণ ঘোড়াব পিঠে চাবুক ক'ষে ভাগীরথীকুমার বালিসাহী 'উআসে'র দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

1

'বাহুড়া' যাত্রা ফুরাল।

কাল 'অধরপণা' একাদশী, পরশুদিন দ্বাদশী— 'নীলাদ্রিবিজে'। 'বাহুড়া'র পরে যাত্রীর দল আরো পাতলা হয়ে গেছে। 'অধরপণা' একাদশী ও 'নীলাদ্রিবিজে' দ্বাদশীতে 'পঞ্চকোশী' (স্থানীয়) যাত্রী এবং গৌড় দেশ থেকে আসা বৈষ্ণব মহাজন[1] ভক্তের সংখ্যাই বেশী। পশ্চিমা যাত্রীরা গুণ্ডিচার পর থেকেই শ্রীক্ষেত্র ছাড়তে শুরু ক'রে থাকেন। এ বৎসর কিন্তু 'বাহুড়া'র পর থেকে হঠাৎ একটা সোর কোথা থেকে কেমন ক'রে উঠেছে: "জগন্নাথ শ্রীক্ষেত্রে নেই, শ্রীক্ষেত্র ছেড়ে চ'লে গেছেন।"

জগন্নাথ গুণ্ডিচাবাড়ী থেকে এসে দেউলের সিংহদ্বারে রথের উপরে 'চকা ডোলা' মেলে ব'সে আছেন, দ্বাদশীতে নীলাদ্রি প্রবেশ করবেন। সকলেই দেখছে, জগন্নাথকে স্বচক্ষে দেখেও সকলে সেই শোনা কথাটাই কেবল বিশ্বাস করছে— তকী খাঁ-মোগলের নায়েব পশ্চিমা আমিনচাঁদ 'ছেরা পহঁরা'র জন্য রথে যখন থেকে উঠেছেন তখন থেকেই জগন্নাথ পুরী ছেড়ে চ'লে গেছেন। শূন্য পুরুষ শূন্য হয়ে গেছেন— ঘট ছেড়ে চ'লে গেছেন— কায়া প'ড়ে আছে— এমনি নানা মুখে নানা কথা।

1. মহাজন— প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতাদের মহাজন বলা হ'ত।

আর কেউ কেউ, যাদের অন্তর্দৃষ্টি প্রখর, তারা জগন্নাথকে দেখিয়ে আর-সবাইকে ডেকে বলছে, "দেখ দেখ, কালো শ্রীমুখের কালো উবে গেছে!"

এবার 'বাহুড়া'য় কিন্তু যাত্রীদের মনে যেন আনন্দ ছিল না। এক অনিশ্চিত অনির্দেশ্য আশঙ্কায় পুরীক্ষেত্রের অন্তঃস্থল চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। খোর্ধার রাজা রামচন্দ্রদেবের আকস্মিক অন্তর্ধানের সংবাদ ইতিমধ্যে সহস্র মুখে ডালপালা মেলে চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল। তাতে অবশ্য প্রথমটা কেউ তেমন বিচলিত হয় নি। কেউ বলল, মহারাজা টিকালী গেছেন। আর কেউ বলল, মোগল-হাঙ্গামার ভয়ে তিনি পালিয়েছেন কোদলা আঠগড়, তাঁকে খাঁচায় পুরে বারবাটী কটকে কয়েদী ক'রে নিয়ে যাওয়ার জন্য নাকি লশকেরা পুরী আসছিল— বড় জেনামণি ভাগীরথীকুমার খোধার সিংহাসনে রাজা হবেন, দেখলে না সেইজন্য গুণ্ডিচা মন্দিরে নবমীর দিন ভাগীরথীকুমার জগন্নাথ ঠাকুরের মাথায় গোপপুণ্ডরীক শাড়ী বাঁধলেন? কিন্তু এমন সব ঘটনা একটির পর একটি ঘটতে লাগল যাতে সকলের মনে ক্রমে একটা অব্যক্ত অস্বস্তি ঘনীভূত হয়ে উঠল।

'বাহুড়া'র দিন সকালবেলা ঠাকুরদের 'পহণ্ডি' আরম্ভ হবে, এমনি সময়ে হঠাৎ একটা শকুন কোথা থেকে উড়ে এসে বড় ঠাকুরের তাল-ধ্বজ রথের উপর ব'সে পড়ল। শিঙ্গা ঘণ্টা ও যাত্রীদের কোলাহলেও তাকে বিশেষ বিচলিত মনে হ'ল না। ধীরে সুস্থে দুই ডানা ঝেড়ে একবার এদিকে একবার ওদিকে দু'দণ্ড চেয়ে তারপর সোঁ ক'রে আবার উড়ে গেল শ্রীমন্দিরের দিকে। সেখানে লক্ষ্মীর মন্দিরের চূড়ায় শকুনটা সেদিন গিয়ে বসেছিল এ কথা সেবকদের কাছ থেকে পরে জানা গিয়েছিল। এদিকে রথের চূড়ায় শকুন বসায় 'পহণ্ডিবিজে'র বিলম্ব

ঘটল। 'দেউলশোধ' হ'ল, রথ শোধ হ'ল, তার পরে গিয়ে বড় ঠাকুরের 'পহণ্ডি' আরম্ভ হ'ল। তখন বেলা গড়িয়ে গেছে।

রথের চূড়ায় শকুন বসার সঙ্গে খোর্ধার রাজা রামচন্দ্রদেবের আকস্মিক অন্তর্ধানের অবশ্য কোনো সম্বন্ধ ছিল না, কেবল কাকতালীয় ছাড়া!

'বাহুড়া'র দিনে এমনি সব অশুভ লক্ষণ দেখে আসন্ন অমঙ্গলের আশঙ্কায় শ্রীক্ষেত্রের মর্মস্থল বিপদাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। অবচেতনায় নিমজ্জিত বহু স্মৃতি ও বিস্মৃতি গভীর কালো নিথর জলের কোন অতল থেকে ওঠা বুদ্‌বুদের মত ভেসে উঠছিল।

বুড়োরা সব বললে, "মহারাজ দিব্যসিংহদেবের সাত 'অঙ্কে'র ঋষভ মাসে[1] একবার একটা শকুন এমনি উড়ে এসে নীলচক্রের উপরে বসেছিল। সে বৎসর শ্রীক্ষেত্রে ভারী মোগল হাঙ্গামা লেগেছিল। দেশে আকাল পড়েছিল। ধানের 'ভরণ' পঁচিশ কাহণ হয়েছিল। মানুষে মানুষের মাংস খেয়েছিল। সে বৎসর দিল্লীর পাতশা আওরঙ্গ শার ফৌজদার এক্‌রাম্ খাঁ ওড়িশায় হামলা করেছিল, দেউলের সিংহ-দ্বার বন্ধ ক'রে দিয়েছিল, চন্দন যাত্রা, রুক্মিণীরহরণ প্রভৃতি পরমেশ্বরের উৎসব কিছু হ'ল না। একাদশীতে মহাদীপ ওঠাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেবার দেবস্নান স্নানমণ্ডপে না হয়ে মন্দিরের প্রাঙ্গণেই কাঠের সিংহাসনের উপরে কোনোমতে সারা হ'ল, কিন্তু ধূপের[2] সময়ে ঘণ্টা বাজা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর গুণ্ডিচা যাত্রা হয়েছিল ভোগমণ্ডপে।"

এখন সেই সব দুর্ঘটনার স্মৃতি ও আশঙ্কা যাত্রীদের মনে আবার

1. ঋষভ মাস— জ্যৈষ্ঠমাস, যখন সূর্য ঋষভ অর্থাৎ বৃষ রাশিতে থাকেন।
2. ধূপ(-অ)— ভোগ-আরতি।

জাগছিল। 'পহণ্ডি'র তখনও অনেক দেরি। তালধ্বজ রথের চুড়া থেকে শকুনটা উড়ে যাওয়ার পর যাত্রীরা এক-এক জায়গায় ঘোঁট পাকিয়ে সেই আলোচনায় ব্যাপৃত। বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধপ্রপিতামহেরা তাতে ছিলেন প্রগল্‌ভ বক্তা, কনিষ্ঠেরা উৎসুক শ্রোতা।

রথীপুরের নীলকণ্ঠ পট্টনায়ক মহাশয় প্রতিবৎসর রথযাত্রায় পুরী আসেন, এ বছরও সপরিবারে পুরী এসেছেন, 'নীলাদ্রিবিজে' দ্বাদশীর পরে তিনি স্বগ্রামে ফিরবেন। তিনি দিব্যসিংহদেবের আমলের লোক, বয়স চার কুড়ি পেরিয়েছে। পুরীর মন্দিরে একরাম্ খাঁর আক্রমণের একজন ভুক্তভোগী তিনি নিজে। বার্ধক্যে তাঁর স্মৃতি মলিন হয় নি, কিংবা কণ্ঠ শিথিল হয় নি! গলায় কপালে ও বাহুর লোল চর্মে শিরাপ্রশিরাগুলি কেবল স্ফীত হয়ে উঠেছিল। যখন কথা বুলেন, গলার তিন সার তুলসী মালার নীচে চাপা পড়া শিরাগুলি দাঁড়িয়ে ওঠে। নীলকণ্ঠ পট্টনায়কের চারিদিকে যাত্রীদের একটি দল সেই সব কাহিনী শোনবার জন্য এসে ঘিরে ছিল। মহারাজা দিব্যসিংহদেবের আমলে দেউলের উপরে শকুন বসার কথা তিনি স্মৃতি ও কল্পনা থেকে আহরণ ক'রে বয়ান করছিলেন।

কাঁপা কাঁপা গলায় বলছিলেন নীলকণ্ঠ: "এ একটা ভারী অশুভ লক্ষণ। সেবার দিব্যসিংহ মহারাজার সাত 'অঙ্কে' জগন্নাথকে আবার একবার চামড়ার দড়িতে বেঁধে গৌড়ের 'দাণ্ডে' তো প্রায় টেনে নিয়েই গিয়েছিল আর কি। তাইতে মহারাজা দিব্যসিংহদেব এক বুদ্ধি করলেন। একরাম্ খাঁর ভাই মরমস্ত্ খাঁ গোটা পঞ্চাশ 'অসুআর' নিয়ে সিংহদ্বার ভেঙে যখন 'বাইশ পাহাচে'র উপর উঠল, কাঠের একটা জগন্নাথ প্রতিমা দেখিয়ে দিব্যসিংহ মহারাজা বললেন—এই হলেন জগন্নাথ। মোগলেরা ভোগমণ্ডপের চুড়ো থেকে চক্র তুলে নিয়ে আর

সেই কাঠের জগন্নাথ-মূর্তি নিয়ে চন্দনপুর ফিরে গেল। সেবার চন্দন-যাত্রা রুক্মিণীহরণ সবই বন্ধ হয়ে গেল। একাদশীতে মহাদীপও উঠল না। কিন্তু জগন্নাথ ছিলেন মন্দিরের বেঢ়ার[1] মধ্যেই বিমলা ঠাকুরাণীর মন্দিরের পিছন দিকে।"

শ্রোতাদের সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি শোনা গেল—"কি রকম ?"

পট্টনায়ক মহাশয়ের কাহিনী বেশ জ'মে আসছিল। তিনি বলে চললেন—"মোগলেরা বুঝলে তারা প্রমেশ্বরকেই নিয়ে গেছে। কিন্তু 'বলিআরভুজ'(-অ) রইলেন সেই দেউলের 'বেঢ়া'র মধ্যেই !"

একজন শ্রোতা শুধালেন, "এ কেমন কথা। প্রমেশ্বর দেউলের মধ্যে রইলেন আর মোগলেরা তাঁর কোনো সুরুক-সন্ধান পেলে না ?"

নীলকণ্ঠ বললেন, "আরে, এক্‌রাম্ খাঁ মরমস্ত্ খাঁ কাঠের জগন্নাথকে প্রমেশ্বর ভেবে তো মহা উল্লাসে তাল ঠুকতে ঠুকতে হাতীর পিঠে ফেলে নিয়ে গেল। তারা বুঝলে ঠাকুর আর নেই আর কি। 'শ্রীবৎস খণ্ডাশাল দেউলে'র সিংহদ্বারে তালা পড়ল। তাতে মোহর মেরে বন্ধ করা হ'ল। দেউল প'ড়ে রইল যেন প্রাণপাখী উড়ে গেলে পিণ্ড প'ড়ে থাকাপ্রায়। যাত্রীদের যাওয়া-আসাও থেমে গেল। মোগলেরা ভাববে কেন যে প্রমেশ্বর দেউলে আছেন বলে ? ওদিকে কিন্তু বুঝলে 'বেঢ়া'র মধ্যেই ঠাকুরের সব 'নীতি' চলতে লাগল। সে বছর গুণ্ডিচা যাত্রা ভোগমণ্ডপে হ'ল। এমনি চলতে চলতে দিব্যসিংহ মহারাজার পঁচিশ 'অঙ্কে', কন্যাব[2] দশ দিন কৃষ্ণএকাদশী বৃহস্পতিবারে দিব্যসিংহ মহা-রাজার আজ্ঞাক্রমে আঠারো গড়ের 'খণ্ডায়তে'রা এসে সিংহদ্বারের মোহর ভেঙে আবার সিংহদ্বার খুললে। সেইদিন থেকে সন্ধ্যার 'ধূপে'র

1. বেঢা— চতুর্দিকের প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত সমুদায় চৌহদ্দি।
2. কন্যা— আশ্বিন মাস, যখন সূর্য কন্যা রাশিতে থাকেন।

ঘণ্টা আবার বাজল। বড় দেউলের উপর আবার মহাদীপ উঠল। এ সব তো আমাদের চোখে দেখা রে বাপু— একি আর শোনা কথা?"

শ্রোতাদের মধ্যে নীলকণ্ঠের সমবয়স্ক বৃদ্ধ একজন ছিলেন। সব শুনে তিনি বললেন, "আহা, আসল কথাটাই তো বাদ দিয়ে গেলে, 'সমুদী'[1]। মোগলেবা বড় দেউলের উপর থেকে নীলচক্র উপড়ে ফেলে দিয়েছিল। 33 'অঙ্ক' কুম্ভ[2] 4 দিনে পাত্র পরমানন্দ পট্টনায়কের ছেলে ধরমু হরিচন্দন মহাপাত্রের 'উদিষ্ঠানে'[3] বড় দেউলের উপরে নীলচক্র নতুন ক'রে গড়িয়ে আবার বসানো হ'ল, তবে গিয়ে ইন্দ্র বৃষ্টি দিলে, খোর্দা রাজ্যে আবার সুদিন এল, ফলন হল।"

নীলকণ্ঠ পট্টনায়ক ঠক ঠক শব্দে পান ছেঁচছিলেন, এখন বৃদ্ধের কথায় আরো দুটো কথা জুড়ে দিয়ে বললেন, "সে যা আকাল পড়েছিল, প্রমেশ্বরের কৃপায় কেবল দেশটা বাঁচল যা, নইলে একটা তেঁতুলপাতাও থাকত না। বাঁশের গোড়া খুঁড়ে খুঁড়ে সারা দেশটা খনি-খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। ঘাস পাতা কিছু বাকি ছিল না, মানুষের পেটে ভস্ম হয়েছিল সব। তাও যখন ফুরাল, মানুষ ম'রে গাদা গাদা হয়ে প'ড়ে রইল সব। উঃ, সে আকালের কথা মনে পড়লে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে রে বাপু!"

অন্য বৃদ্ধ নীলকণ্ঠের কথায় আবার একপ্রস্থ কথা জুড়ে বললেন, "প্রমেশ্বরের রথের চাকা তো নড়ল না, হবে না দেশে আকাল, লাগবে না মড়ক? এই আবার নীলধ্বজ রথের উপরে শকুন বসল। রামচন্দ্র মহারাজা দেশান্তরী হয়ে কোথায় চ'লে গেছেন। দেখ

1. সমুদী— বৈবাহিক ; বযোজ্যেষ্ঠদেব মধ্যে পরস্পরের প্রতি সম্বোধন।
2. কুম্ভ— ফাল্গুন মাস, যখন সূর্য কুম্ভরাশিতে থাকেন।
3. উদিষ্ঠানে— জীবদ্দশায়। ('মাদলা পাঞ্জি'র ভাষা)

তোমরা আবার কী ঘটে, আমরা তো যেতে বসেছি।"

যেখানেই যাত্রীরা জড় হয়েছে সেখানেই এই কথা নিয়েই নানা স্মৃতি ও প্রসঙ্গের আলোচনা চলেছে।

ইতিমধ্যে গুণ্ডিচা দেউল ও রথ প্রভৃতি 'শোধ' হয়ে খিচুড়ি ভোগ হয়ে গিয়েছিল। মন্দিরের ভিতর থেকে তেলেঙ্গী বাজনা শিঙ্গা ও ঘণ্টাধ্বনিতে রথদাণ্ড নিনাদিত হয়ে উঠেছিল। 'পালিআ' ও 'খুন্টিআ'-দের "মণিমা মণিমা" ডাকে সকলের মনে আবার যেন 'মাভৈঃ' বাণী উদ্‌ঘোষিত হয়ে উঠছিল। রথদাণ্ডে ভিড় করা যাত্রীরা আসন্ন অমঙ্গলের আশঙ্কা দুশ্চিন্তা নিমেষে ভুলে "মণিমা মহাবাহু" রোল তুলল।

প্রথমে সুদর্শন 'দইতা'দের কাঁধে ক'রে এসে সুভদ্রার রথে 'বিজে' হলেন। তার পরে মহাসমারোহে দর্পিত ভঙ্গীতে 'বড় ঠাকুরের' 'পহণ্ডি বিজে' আরম্ভ হ'ল।

এ যেন দেবতার নিষ্প্রাণ বিগ্রহ নয়—প্রবলের শত আক্রমণ, দুর্বিনীতের শত অত্যাচার, প্রমত্তের শত তাড়নার মধ্যে অপরাজিত মানুষের অপরাজেয় আত্মার মহান্ প্রতীক। ওড়িয়া জাতির উপরে অতীতে অগণিত পাঠান-মোগলের আক্রমণের ঝড় বয়ে গেছে, তাতে ওড়িয়া জাতি সাময়িকভাবে নুয়ে পড়েছে, কিন্তু ভেঙে পড়ে নি। এ যেন ওড়িয়া জাতির সেই প্রাণশক্তির প্রেরণা, রূপ পরিগ্রহ করেছে। আবার যদি এখন অশুভ অমঙ্গল আক্রমণের জোয়ার আসে তো আসুক, ওড়িয়া জাতি অতীতে তার থেকে বেঁচে উঠেছে, এখনও বেঁচে থাকবে—এই বরাভয় যেন ফুটে উঠছিল বড় ঠাকুরের মাথার 'টাহিআ'র সুদক্ষিণ আন্দোলনে, 'পহণ্ডি'র সদর্প পদক্ষেপে।

যাত্রীরা দ্বিগুণ উৎসাহে চীৎকার করছিল— " 'বলিআরভুজ'(-অ)

মণিমা মহাবাহু হে—।"

ঠাকুরদের পহণ্ডি একে একে যথাবিধি সম্পন্ন হল।

গুণ্ডিচার সময়ে রথের উপরে যেসব 'নীতি' হয়, বাহুড়ার সময়েও সে সবের পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে সামন্ত-রাজগণ স্বগ্রাম হ'তে অন্যত্র যাত্রা করলে যেমন কারণে অকারণে হাঁকডাক প'ড়ে যায়, সবাই মিলে বেরুবার সময়ে কেউ হয়তো পিছনে প'ড়ে রইল দেখে যেমন তাকে খুঁজে আনবার জন্য তাড়াহুড়া লাগে, আবার দাঁতন থেকে চাল-চিঁড়ে কাপড়-গামছা সব সঙ্গে না নিলে যেমন যাত্রার শুভারম্ভ হতে পারে না, ঠাকুরের যাত্রায় তেমনি এই সব লৌকিক 'নীতি' মূলতঃ সেই সবেরই অনুকরণ মাত্র! তাতে কোনো বৈচিত্র্য ছিল না বা আধ্যাত্মিক সংকেতও ছিল না।

তবু বিদেশী যাত্রীদের তো কথাই নেই, 'পঞ্চকোশী' যাত্রীরাও প্রতি বৎসর এই এক দৃশ্য দেখে আসতে থাকলেও সেই সব 'নীতি' ও বিধি উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে দেখছিল। মাঝে মাঝে 'পালিআ' ও 'খুন্টিআ'রা 'মণিমা মণিমা' ডাক ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারাও গলা মিলিয়ে প্রাণপণে যে রকম "মহাবাহু হে বলিআরভুজ(-অ)" ধ্বনি দিচ্ছিল তাতে সমুদ্রের গর্জনকেও ছাপিয়ে যাচ্ছিল।

এর পরে তিন রথের উপরে 'পাট খণ্ডুআ'[1] 'মইলম লাগি'[2] হবে, 'মালফুল লাগি' হবে। তার পরে 'ছেরাপহঁরা'। সাধারণতঃ এই সব প্রস্তুতিতে ঠাকুরদের রথে বসা থেকে 'ছেরাপহঁরা'র মধ্যে বহু সময় অতিবাহিত হয়ে থাকে। কারণে অকারণে সেবকদের রথের উপরে

1. পাট খণ্ডুআ— পাট কাপড় ও স্ত্রীলোকের মাথার ওড়না।

2. মইলম লাগি — ঠাকুরকে বেশভূষা পরিধান করানো।

বার বার ওঠানামা যজমান যাত্রীদের রথের উপরে নিয়ে গিয়ে দর্শন করানো ও তাদের কাছ থেকে পাওনা আদায় করা— এই সব ছাড়া তখন তাঁদের অন্য কাজ থাকে না। এই বিরতি-কালের মধ্যে যাত্রীরা আবার এক-এক দল এখানে ওখানে জড় হয়ে নতুন ক'রে আর-এক বার রথের উপরে শকুন বসার প্রসঙ্গ থেকে শুরু ক'রে দূর গাঁয়ের আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ায় নানা সুখদুঃখের কথা বলা আরম্ভ ক'রে দিল, কোলাহলে রথদাণ্ড মুখরিত হতে থাকল।

এমনি সময়ে সেই জনসমুদ্রে কোথা থেকে ভেসে এল এক জনরবের ঢেউ: এ বছর তকী খাঁব নায়েব রাজা আমিনচাঁদ 'বাহুড়া' রথের উপরে 'ছেরাপহঁরা' করবে। জেনামণি ভাগীরথীকুমার থাকতে এ আমিনচাঁদ আবার কে? সে কেন 'ছেরাপহঁরা' করবে? রাজসেবা করবার তার কী অধিকার আছে? জেনামণি যদি খোর্ধাই চ'লে গেছেন, তবে 'মুদিরথ' তো 'ছেরাপহঁরা' করতে পারেন? এমনি বহু জিজ্ঞাসায় রথদাণ্ড আলোড়িত হয়ে উঠল। রাজনীতির খবর যারা রাখে তেমন লোকে বললে, "আমিনচাঁদ এবার থেকে পুরীর নায়েব হল যে। সেই শর্তে রাজী হয়েই না বড় জেনামণি ভাগীরথীকুমার জগন্নাথের মাথায় 'গোপপুণ্ডরীক' শাড়ী বেঁধে খোর্ধা যাত্রা করেছেন— সিংহাসনের অভিষেক হতে। কাজেই আমিনচাঁদ ছাড়া আর 'ছেরা-পহঁরা' করবে কে?"

'ছেরাপহঁরা'র জন্য আমিনচাদ বুঝি পালকিতে চ'ড়ে আসছিলেন। মার্কণ্ডেশ্বরসাহীর লণ্ডামঠের দিক থেকে তেলেঙ্গী বাজনা আর শিঙ্গার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

নীলকণ্ঠ পট্টনায়ক মহাশয় এই অঘটনে উত্তেজিত হয়ে বললেন, "যে জগন্নাথের রাজসেবক, সেই কেবল ওড়িশার গজপতি, খোর্ধার

রাজা। এই হল পরম্পরা। জেনামণি যদি রাজগদির জন্য জগন্নাথের সেবক পদ বিকিয়ে দিলেন তবে খোর্ধার গদিতে তাঁকে রাজা ব'লে আর মানবে কে ? কেন মানবে ?"

'ছেরাপহঁরা' বিধিতে তলিছো মহাপাত্রের কিছু করবার থাকে। সেইজন্য তিনি রথে উঠতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় পূর্বপরিচিত নীলকণ্ঠ পট্টনায়কের সঙ্গে দেখা, 'তলিছো মহাপাত্রে'র কুশল জিজ্ঞাসার উত্তরে নীলকণ্ঠ ঐ কথাগুলি বললেন। 'তলিছো মহাপাত্র' মুখে একটা রহস্য-জড়ানো হাসি ফুটিয়ে উত্তর দিলেন, "ওহে, শাস্ত্রে বলেছে যে বংশ-লোপের কালে ঘোড়ামুখো পুত্র জন্মায়। আচ্ছা দেখ, 'বলিআরভুজে'র কী ইচ্ছা। আসছে বছর রথযাত্রা আর হচ্ছেই কিনা দেখ।"

'তলিছো মহাপাত্র' বড় ঠাকুরের রথের উপরে উঠে গেলেন। নীচে রেখে গেলেন লোকের মুখে এক অসমর্থিত রহস্য প্রশ্ন— আগামী বৎসর রথযাত্রা আর হচ্ছে কি না দেখ, ব'লে গেলেন 'তলিছো মহাপাত্র', শুনলে তো ?

জগন্নাথ পুরীক্ষেত্র ছেড়ে চ'লে গেছেন ব'লে যে জনরব তা এইখানে প্রথম অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমে সহস্রমুখে পল্লবিত হয়ে সমস্ত শ্রীক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল।

তখন রথের উপরে জগন্নাথের মালাপরা হ'তে থাকায় যাত্রীর ভিড় 'নন্দিঘোষ' রথের কাছেই ছিল বেশী। নীলকণ্ঠ পট্টনায়ক 'তালধ্বজ' রথের 'চারে'র নীচে এ সকল অনাচারের বিরুদ্ধে নিষ্ফল উত্তেজনায় রাজা আমিনচাঁদ ও বড় জেনামণি ভাগীরথীকুমারের উপর অভিশাপ বর্ষণ করছিলেন। কিন্তু তাঁর চারিদিকে যাত্রীদের ভাবনায় সেসব কোনও রেখাপাত করছিল না।

রাজা আমিনচাঁদ 'ছেরাপহঁরা'র জন্য মিছিল ক'রে ততক্ষণে বলগণ্ডী

পার হয়ে এসেছিলেন। 'ছাটিআ'রা[1] বেত আফসে চীৎকার করছিল—"তফাত! —তফাত!"

প্রথম পালকিতে রাজা আমিনচাঁদ ও তাঁর পিছন পিছন 'বড় পরিছা' গৌরী রাজগুরু অন্য পালকিতে আসছিলেন।

আজ রাজা আমিনচাঁদের বহুদিনের পোষিত একটা অভিলাষ পূর্ণ হ'তে চলেছে। জগন্নাথের মত রাজস্ব উপার্জনের একটা এত বড় মহল জলে না নেমেও মাছধরার মত বিনামূল্যে তিনি পেয়ে গেলেন। তাই তাঁর স্থূল মাংসল মুখমণ্ডল ও হাতীর চোখের মত দুই ক্ষুদ্র চক্ষুতে আহ্লাদ উপচে পড়ছিল। পিছনের পালকিতে গৌরী রাজগুরুর গ্রন্থিল মুখ ও শাণিত চক্ষুতে কিন্তু ফুটে উঠেছিল শবমাংসলোলুপ শৃগালের ধূর্ত সতর্কতা।

আমিনচাঁদের পালকির দুই পাশে যে সেবায়েত ও পাইকেরা আসছিল তারা জয়ধ্বনি করল—"মহারাজা আমিনচাঁদকে শঙ্খে পূরে চক্র আড়াল কর হে 'বলিআরভূজ'(-অ) মহাবাহু!"

যাত্রীরা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সাধারণতঃ ধ্বনি দিয়ে থাকে— "খোর্ধার রাজার কল্যাণ কর হে জগন্নাথ!" কিন্তু আজ পাষাণ-নীরবতায় যাত্রীরা এখন আমিনচাঁদের মিছিলের পথ ছেড়ে নিস্পৃহদৃষ্টিতে কেবল চেয়ে রইল। সেই অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ হ'ল যখন পিছন থেকে কে একজন ভাঙের নেশাধরা গলায় চীৎকার ক'রে উঠল—"এটা আবার কে রে 'ভণ্ডা'!"

1. ছাটিআ— মন্দিরের প্রতিহারী।

যাত্রীদের বিদ্রূপ ও পরিহাসের হাস্যরোলে তেলেঙ্গী বাজনা পর্যন্ত কিছুক্ষণ চাপা প'ড়ে গেল। আমিনচাঁদকে কে 'ভণ্ডা' বলল তাকে খোঁজ খোঁজ বলে আমিনচাঁদের পাইক ও অন্যান্য অনুচরেরা যাত্রীদের ভিড়ে খানিক ঠেলাঠেলি করে খুঁজল। অপরাধীকে ধরবার উদ্দেশ্য তাদের যত না ছিল তত ছিল আমিনচাঁদকে সন্তুষ্ট করা ও সেইসঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে আমিনচাঁদের অসপত্ন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন করিয়ে দেওয়া। সে উদ্দেশ্য সফল হোক বা না হোক তা'রা খুব খানিকটা গোলমাল হইচই করে বেত আস্ফালন করে আবার আমিন-চাঁদের পালকির কাছে ফিরে এল।

যাত্রীদের ভিড়ের ভিতর থেকে আবার কে চেঁচিয়ে বললে, "আরে, এটা একটা ভণ্ড রে! সুনা মাহারীর ঘরে গিয়ে প'ড়ে ছিল, ভণ্ডটার গা থেকে হলুদের দাগ যায় নি রে।"

পরিহাসের অট্টহাসে রথদাণ্ড কেঁপে উঠল।

রাজা আমিনচাঁদ রথের উপরে উঠে যখন প্রণাম করতে গিয়ে স্ফীতোদর ভেকের মত তাঁর স্থূল দেহটি নোয়ালেন তখন যাত্রীদের হাস্যরোল উত্তরোল হয়ে উঠল। কিন্তু আগুনে জল পড়ার মত সে হাস্যরোলে হঠাৎ ছেদ পড়ল যখন প্রণামের পরে আরতির জন্য 'ভণ্ডার মেকাপ' আমিনচাঁদের হাতে কর্পূর আরতির সোনার প্রদীপ-খানি বাড়িয়ে দিতে গিয়ে অসাবধানে তা হঠাৎ আমিনচাঁদের হাত থেকে নীচে প'ড়ে গেল।

আরতির সময়ে হাত থেকে আরতি-প্রদীপ প'ড়ে যেতে কেউ কখনও দেখে নি বা এমন কথা কেউ শোনেও নি, বুড়োবুড়ীরাও না। সকালে তালধ্বজ রথের চূড়ায় শকুন বসা যাত্রীদের মনে যে সব অশরীরী আশঙ্কার ছায়াপাত করেছিল এখন এই অশ্রুতপূর্ব অঘটন সে-সব

আরো ঘোরালো করে তুলল।

এক সময়ে কিন্তু যাত্রীদের নিরুদ্ধ উদ্‌বেগ কেটে গিয়ে তাদের উচ্চহাস্যে আবার রথদাণ্ড উচ্চকিত হ'ল— আমিনচাঁদ তখন জগন্নাথের রথে ছেরাপহঁরা করছিলেন!

একদা হয়তো 'ছেরাপহঁরা' অর্থ ছিল রথযাত্রার সময়ে দাণ্ড পরিষ্কার করা, এবং রাজসেবকরূপে তা উৎকলের গজপতি রাজাদের কর্তব্য ছিল। এই ছিল উৎকলভূমিতে রাজতন্ত্রের বিশিষ্ট আদর্শ— প্রজাবর্গ এখানে দর্পিত সম্রাটের অভিযাত্রার পথ মার্জনা করে না, সম্রাটই জনতারূপী জনার্দনের সেবকরূপে প্রজাগণের আধ্যাত্মিক অভীপ্সা তথা সাংসারিক কল্যাণের পথ পরিষ্কার করবার জন্য সম্মার্জনী হাতে রথদাণ্ড মার্জনা করেন। এই ছিল 'ছেরাপহঁরা'র মর্ম। কিন্তু পরে সম্ভবতঃ যখন ক্রমে রাজত্বের অভিমান সেবকের দৈন্যে সন্তুষ্ট থাকল না তখন রথদাণ্ডে 'ছেরাপহঁরা'র পরিবর্তে রথের উপরে 'ছেরা-পহঁরা' বিধি পালিত হতে লাগল।

সে যাই হোক, বিধিটি অত্যন্ত ক্লান্তিকর। আবার, একটি একটি ক'রে তিনটি রথের উপরেই তার পুনরাবৃত্তি আরো ক্লান্তিকর।

বড় ঠাকুর ও সুভদ্রার রথে এই বিধি সমাপন ক'রে আমিনচাঁদ জগন্নাথের রথে 'ছেরাপহঁরা'র জন্য যখন উঠলেন তখন তিনি প্রায় চলৎশক্তিরহিত। 'ছেরাপহঁরা' করতে করতে তিনি এক সময়ে কোমরে বাঁ হাতের ভর দিয়ে মুখ বিকৃত ক'রে সেই অবস্থাতেই থেকে গেলেন। হঠাৎ তাঁর কোমরে খিল ধরে গিয়েছিল হয়তো! কোমর দুমড়নো, ডান হাতে সোনার ঝাড়ন, বাঁ হাতে কোমরে ভর দেওয়া তার হাস্যোদ্দীপক ভঙ্গীটি যাত্রীদের মধ্যে একটা হাসির ঝড় বইয়ে দিল। যে 'ছেরাপহঁরা' বিধি যাত্রীরা বিস্ময় ও ভক্তিতে প্রায় রুদ্ধশ্বাস

হয়ে সকলে চেয়ে দেখতে থাকে তাতে আমিনচাঁদের, অপ্রত্যাশিত, অবাঞ্ছিত এবং অনভ্যস্ত ভূমিকা তাদের মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিবর্তে কেবল উপহাসেরই উদ্রেক করছিল।

নন্দিঘোষ রথে বসে 'বলিআরভুজ'(-অ) জগন্নাথ দুই প্রকাণ্ড 'চকা ডোলা' মেলে এ সকল বিড়ম্বনা যেন অতিশয় নিস্পৃহ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিলেন। তিনি সর্বদ্রষ্টা, কেবল দেখা ছাড়া তাঁর যেন আর কিছু করবার নেই। কিন্তু যাত্রীরা এ ওকে ডেকে বলাবলি করছিল— "দেখ দেখ, কালো শ্রীমুখের সব কালো কেমন উবে গেছে, কালো শ্রীমুখ তো কখনো এমন মলিন দেখায় না!"

'বাহুড়া' যাত্রা দেখার মধ্যে কারো আর যেন অন্তরের টান রইল না, রথের দড়িতে একবাব করে হাত দিয়ে ছুঁয়ে যাত্রীরা নিরানন্দ মনে যে যার ফিরে যেতে লাগল।

'অধরপণা' একাদশীর ভোর রাত থেকে আকাশে মেঘের ঘনঘটা শুরু হয়েছে। পালতোলা নৌকার মত মেঘগুলি পূর্ব থেকে পশ্চিমে ভেসে চলেছে। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়ার দমকায় আছে ঝড়ের সূচনা। সমুদ্র থেকে বাতাস এক-একবার সোঁ সোঁ ক'রে ছুটে আসছে, নারকেল গাছের বালদোগুলি সব এক দিকে কাত হচ্ছে, গাছ নুয়ে পড়ছে। যাত্রীদের থাকবার জন্য রথদাণ্ডের দুই ধারে পাণ্ডারা যে-সব চালাঘর তুলেছিলেন সেগুলির চাল থেকে খড়কুটো উড়ে ঘূর্ণি হাওয়ায় চারিদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে। বাতাসের বেগ যদিও খুব বেশী নয়, তবু তাতে আছে ঘূর্ণি ঝড়ের পূর্বাভাস।

ঝড়বৃষ্টি আসার লক্ষণ দেখে 'পঞ্চকোশী' যাত্রীরা ক্ষেত্র ছেড়ে ত্বরায় ফিরে চলেছিল। জগন্নাথ আর শ্রীক্ষেত্রে নেই ব'লে জনরব, খোর্ধার রাজা রামচন্দ্রদেবের আকস্মিক অন্তর্ধান, আবার তকী খাঁর নায়েব হয়ে আসা রাজা আমিনচাঁদ বড় ঠাকুরের রথে 'ছেরাপহঁরা' করবার সময় তাঁর হাত থেকে সোনার কর্পূর-আরতির দীপ প'ড়ে যাওয়া, আর তালধ্বজ রথে শকুন বসা নিয়ে অনিশ্চিত অমঙ্গল-আশঙ্কার মধ্যে পুরীর বড় দাণ্ড ক্রমে জনবিরল হয়ে পড়ছিল।

কখন কী হয়! তায় আবার যদি মোগলের হাঙ্গামা লেগে যায় তা হলে দূরের যাত্রীদের দুর্দশা হবে সকলের চাইতে বেশী। জগন্নাথ-সড়কের উপর একবার গিয়ে দাঁড়াতে পারলে অবশ্য কতক রক্ষা, কারণ জগন্নাথ-সড়কে দূরাগত যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য সুজা খাঁর আমল থেকেই কড়া নির্দেশ রয়েছে। সেইজন্য মোগল লশকরেরা জগন্নাথ-সড়কে যাত্রীদের উপরে লুঠতরাজ করতে ভরসা পায় না। সেই সড়কে জায়গায় জায়গায় সরকারী চৌকিও বসেছে। কিন্তু মোগল সৈন্য যদি হঠাৎ শ্রীক্ষেত্র আক্রমণ করে তা হলে এসব দূরের যাত্রীদের ধনপ্রাণ বিপন্ন হয়ে পড়বে। অতীতে বার বারই এমন হয়েছে। অবশ্য হঠাৎ মোগল-হাঙ্গামা লাগবার মত অবস্থা যে ছিল তা নয়, কিন্তু তা না থাকলে তালধ্বজ রথের উপরে, আবার লক্ষ্মীর মন্দিরের চূড়ায় শকুন বসবে কেন? জগন্নাথ রুষ্ট না হ'লে আমিনচাঁদের হাত থেকে আরতি-প্রদীপ প'ড়ে যাবে কেন?

এ সবের উপর আবার 'বাহুড়া'র দিন থেকে ক্ষেত্রে বিসূচিকার আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। বিমলা ঠাকুরাণী নাকি কোন পাণ্ডাকে 'স্বপ্নে বলেছেন, তকী খাঁর নায়েব আমিনচাঁদ ঠাকুরের রথে 'ছেরাপহঁরা' করল তার প্রতিশোধ নিতে তিনি ক্ষেত্র থেকে অর্ধেক মুছে নিয়ে যাবেন।

তাঁর কোপ থেকে রক্ষা নেই। এমন কথা প্রচারের পর আর কি বিদেশী যাত্রীরা পুরী ক্ষেত্রে থাকে? তাই 'অধরপণা' একাদশীর দিন পুরীক্ষেত্র প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। যাত্রীবিরল নির্জন রথদাণ্ডের উপর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ঝড়ের সঙ্কেত বহন ক'রে হু হু ক'রে বয়ে যাচ্ছিল।

গুণ্ডিচার দিন জগন্নাথ সুভদ্রাকে নিয়ে রথে চ'লে গেলেন, লক্ষ্মী এত ঘোর কুপিতা ও ঈর্ষান্বিতা! এই কথাটিকে ভিন্ন আঙ্গিকে সাধারণ ওড়িয়া গৃহস্থের পারিবারিক জীবনের চিত্রের ভিতর দিয়ে এক তাত্ত্বিক রূপ দেওয়া হয়েছে।

জগন্নাথের সিংহদ্বারে মানুষ দেবতারূপে যেমন কল্পিত হয়েছে, দেবতাও তেমনি মানুষে পরিণত হয়েছেন। তাই লক্ষ্মী যেমন ঈর্ষাপরায়ণা অভিমানিনী স্বকীয়া নায়িকা হয়েছেন জগন্নাথও তেমনি পত্নীনিগৃহীত এক অনুতপ্ত অসহায় স্বামীতে পরিণত হয়েছেন।

জগন্নাথ রথ থেকে নামামাত্র লক্ষ্মী শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বার ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিলেন। লক্ষ্মী আজ কুপিতা, অভিমানিনী; দুর্জয় তাঁর অভিমান। সিংহদ্বারের বাহিরে রথের উপরে জগন্নাথ উপোসী প'ড়ে রইলেন। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য স্বমন্দিরে যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই, অথচ সে পথ বন্ধ। লক্ষ্মীর কোপের ফলে 'অধরপণা' একাদশীর গোটা দিনটা তাই বিধবার মত নিরম্বু উপবাসে কেটে গেল। বহু চেষ্টায় মিছরি ছানা ও কলা চটকানো পানা এক হাঁড়ি মিলল, তাও জগন্নাথকে দেওয়া হ'ল তুম্বির মত একটা সরুমুখো হাঁড়িতে ক'রে। তাতে জগন্নাথ তাঁর রাঙা অধর স্পর্শ করলেন, কিন্তু তাতে বিশ্বাত্মার তৃষ্ণা মিটল না। লক্ষ্মীর কোপে সে তুম্বিও রথ থেকে প'ড়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে গেল। দ্বাদশীর দিনটাও বুঝি এমনি উপবাসেই কাটে! তবু লক্ষ্মীর দুর্জয় অভিমান ভাঙবার লক্ষণ নেই।

প্রাক্‌বৈদিক সমাজে মন্ত্র ও তন্ত্র প্রভৃতি অভিচার সহকারে যে পর্ণ-শবরী পূজা প্রচলিত ছিল উত্তরকালে তার সাধিকা ছিল জ্ঞানদেঈ মালুণী[1], নিতাই ধোবুণী[2], গাঙ্গী গউড়ুণী[3], খুআ তেলুণী[4], লহুকুটী লোহারুণী[5], পত্রপিঙ্কা শউরুণী[6], ও স্মুকুটী চমারুণী[7]। এরা সকলে সম্ভবতঃ সহজিয়া কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নুপা'র চর্যাগীতিকার সাধন-নায়িকা ডোম্বী ও শবরীদের পরবর্তী রূপান্তর। লক্ষ্মী একদা এই পর্ণ-শবরী তন্ত্রে উপাস্যা দেবী ছিলেন। শ্রিয়া চণ্ডালুণী[8] ছিল তাঁর সাধিকা। পরে জগন্নাথকে নিয়ে সর্ব ধর্ম ও তন্ত্রের যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল, শ্রীয়াসেবিতা পর্ণ-শবরী লক্ষ্মী সেই সমন্বয়ের মধ্যে বিষ্ণুপত্নী সাগরদুহিতা লক্ষ্মীতে পরিণত হলেন। তবে সেই সমন্বয়কে এক সাংস্কৃতিক সংঘষের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়েছিল। বৈদিকেরা জগন্নাথকে অবশেষে গ্রহণ করলেও জগন্নাথ-ক্ষেত্রে পর্ণ-শবরী লক্ষ্মীকে গ্রহণ করতে যেমন কুণ্ঠিত ছিলেন অবৈদিকেরাও তেমনি লক্ষ্মীকে পতি-আজ্ঞা-শিরোধার্যকারিণী জগন্নাথ-গৃহিণীতে পরিণত করতে অনিচ্ছুক ছিলেন বস্তুতঃ মাতৃপ্রধান অবৈদিক সমাজের মাতৃদেবী লক্ষ্মীর প্রাধান্যই এই সংঘষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। জগন্নাথের মন্দিরপ্রবেশ নিষিদ্ধ করার এই অভিনয়ের মধ্যে সেই সংঘষ ও সমন্বয়ের স্মৃতিকে এক ধর্মীয় আচারের আবরণ দেওয়া হয়েছে মাত্র। জগন্নাথ একদা যে তুম্বিধারী নাথ সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতা ছিলেন এখানে তাও লক্ষ্য করা যেতে পারে।

1. মালুণী— মালিনী।
2. ধোবুণী— ধোপানী।
3. গউড়ুণী— গোয়ালিনী।
4. তেলুণী— তেলেনী।
5. লোহারুণী— লোহরনী।
6. শউরুণী— শবরী।
7. চমারুণী— চামারনী।
8. চণ্ডালুণী— চণ্ডালিনী।

হিন্দুধর্মাচরণে তত্ত্বের নীরস ক্লিষ্টতা নেই, কাব্যব্যঞ্জনায় তা রসময়। তাই এই ঐতিহাসিক ব্যাপারকে কাহিনী ও কাব্যের আঙ্গিকে ধর্মাচরণপদ্ধতির ভিতর দিয়ে জীবন্ত রাখা হয়েছে। লক্ষ্মী এখানে হয়েছেন খণ্ডিতা স্বকীয়া নায়িকা আর জগন্নাথ হয়েছেন পরকীয়ালুব্ধ ধূর্ত নায়ক। জগন্নাথ সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন কিন্তু লক্ষ্মীকে নিলেন না। এমনি অপত্নীক গুণ্ডিচাযাত্রায় গিয়ে পত্নী-পাহারা-বিমুক্ত জগন্নাথ কোনো পরকীয়ার প্রীতি আস্বাদন ক'রে এলেন কিনা কে জানে! অন্ততঃ ঈর্ষিতা লক্ষ্মীর এমনি মনে হল। জগন্নাথের এই কল্পিত পরকীয়া-বিলাসে লক্ষ্মী সাধারণীর মতই কুপিতা হয়ে জগন্নাথকে মন্দিরের ভিতরে ঢুকতে না দিয়ে দ্বার রুদ্ধ করেছিলেন।

'নীলাদ্রিবিজে' দ্বাদশীর বিধিতে এমনি সব সাংস্কৃতিক তথা আধ্যাত্মিক সংযম ও সমন্বয়ের বিভিন্ন পর্যায় অভিনীত হয়ে থাকে। তা দেখতে অন্যান্য বছর মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে যাত্রীর ভিড়ে তিলধারণের স্থান থাকে না। কিন্তু এবার দ্বাদশীর দিন সিংহদ্বারের সামনে প্রায় জনমানব ছিল না। ঝড়বৃষ্টি ও আতংকের তাড়নায় যাত্রীরা ক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে পলায়ন করেছিল। জনশূন্য রথদাণ্ডের উপরে যাত্রীদের পরিত্যক্ত বাসাবাড়িগুলির চালের খড়-কুটা উড়িয়ে নারকেল গাছের মাথাগুলিকে প্রমত্ত কাপালিকের জটাজূটের মত দুলিয়ে ঝড়ো বাতাস সো সো করে বয়ে যাচ্ছিল।

তায় কাল আবার পঞ্চগ্রহকূট লাগছে।

সন্ধ্যা না হতেই আকাশে যেন অমাবস্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

অপরাহ্নে এক পসলা প্রবল বর্ষণের পর আর বৃষ্টি হয় নি বটে, কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনায় আকাশ তবু অন্ধকার হয়ে ছিল। ঘন ঘন বিজলী-চমকে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ভয়ংকরতা বাড়ছিল বই কমছিল

না। বিকালের প্রচণ্ড বৃষ্টির জলস্রোত তখন কলকল শব্দে রাস্তার দুই পাশের নয়ানজুলি দিয়ে 'আঠারো নালা'র দিকে ছুটে চলেছিল। বাতাসের বেগও কিছুমাত্র কমে নি।

সন্ধ্যাধূপ[1] শেষ হওয়ার পরে ঠাকুরদের 'পহণ্ডি' শুরু হয়। কিন্তু ঝড়ো বাতাসের ফুৎকারে মশাল যেমন নিবে যাচ্ছে বেশী বিলম্ব করলে অন্ধকারের মধ্যে 'পহণ্ডি' সমাধা করতে হবে। তাই দিনের আলো থাকতে থাকতেই ঠাকুরদের কাছে জয়মঙ্গল আরতি সারা হ'ল। আরতির পরে ঠাকুরদের 'মইলম লাগি'তে বহু সময় যায়। 'পশু-পালকেরা' ঠাকুরদের বেশভূষা করেন। 'খুন্টিআ' জগন্নাথবল্লভ বাগান থেকে ফুলের মালা ও অলংকারাদি যা আনেন 'পশুপালকে'রা তাই দিয়ে শ্রীঅঙ্গ মণ্ডন করেন। কিন্তু এবার উপস্থিত অবস্থায় সে-সকল বিধি যেন তেন প্রকারেণ সারা হ'ল। 'পহণ্ডি' শীঘ্র শীঘ্র আরম্ভ করার জন্য সেবকেরা ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন। যাত্রীর ভিড় থাকলে এ-সমস্ত বিধি অযথা দীর্ঘায়িত করে দর্শনী ও পাওনা বাবদে সেবকদের বেশ দু'পয়সা 'অর্জন' হয় কিন্তু এবার তো আজকের দিনে রথদাণ্ডে বেড়াল-ছানাটিরও দেখা নেই! সিংহদ্বারের গুমটে আমিনচাঁদ ও 'বড় পরিছা' গৌরী রাজগুরু দাঁড়িয়ে শীঘ্র শীঘ্র 'পহণ্ডি' আরম্ভ করার জন্য ঘন ঘন তাগাদা করছিলেন।

ঝড়ো বাতাসের হাহাকার ও মেঘাচ্ছন্ন আকাশের বিষণ্ণতার মধ্যে 'পহণ্ডি'র 'বিজয় কাহালি' হঠাৎ বেজে উঠল। রাঘবদাস মঠ থেকে ঠাকুরদের জন্য যে কেতকী ফুলের 'টাহিআ'গুলি এসেছিল সে সব পরানো হয়ে গেল। ঠাকুরেরা 'পহণ্ডি' ক'রে প্রথমে বলভদ্র ও তার পরে সুভদ্রা দেউলের মধ্যে চ'লে গেলেন। তার পরে জগন্নাথ সিংহদ্বারে

1. ধূপ— ভোগ ও তৎসংশ্লিষ্ট আরতি।

পৌঁছানো মাত্র বিধি অনুসারে দেবদাসীরা ভিতর থেকে সিংহদ্বারের কবাটে খিল দিয়ে দিলে। 'নীলাদ্রিবিজে' দ্বাদশীতে তাদের অখণ্ড কর্তৃত্ব। রাজা আমিনচাঁদ ও 'বড় পরিছা' গৌরী রাজগুরুকেও তারা সিংহদ্বারের গুমটের ভিতর থেকে বাইরে ঠেলে দিতে কুণ্ঠিতা হ'ল না।

সুনা মাহারী কপট ক্রোধে আমিনচাঁদকে তার দুটি কাঁকনপরা হাতে ঠেলবার সময় কাঞ্চন, কেতকী, ও সারীআ প্রভৃতি অন্যান্য মাহারীরা খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।

সুনা মাহারীকে আমিনচাঁদ সেখানে দেখে প্রথমে চিনতে পারেন নি। মাহারীর বিলাসিনী বেশ ছেড়ে দেবদাসীর অঙ্গসজ্জায় সুনা নিজেকে যেমন সজ্জিত করেছিল তাতে তাকে দেখে আমিনচাঁদের মত ঘোর স্থূলরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিরও কামনাদিগ্ধ অন্তরে চিত্তবিকারের লেশ ছিল না। এ যেন আর-এক সুনা মাহারী, মহালক্ষ্মীর পরিচারিকা। পরনে নারঙ্গী রঙের পাটশাড়ী, মাথায় পাথর-বসানো সোনার জালি, বুকে ইন্দ্রগোবিন্দ কাঁচুলি, কোমরে রত্ন-'ওড়িআণী'[1], নাকে মুক্তার 'বসণি'[2], দুই কানে হীরার কুণ্ডল, গলায় দুই-নরী 'চিনামাল'(-অ)[3], পায়ে নূপুর, দুই চোখে অর্ধনিমীলিত অনৈসর্গিক চাহনি। আমিনচাঁদ মন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত সে প্রকার অনেক মূর্তি দেখেছেন, কিন্তু রক্ত-মাংসের নারীমূর্তিতে এমন দেবত্বের প্রকাশ কখনো দেখেন নি।

জগন্নাথ 'পহণ্ডি' ক'রে সিংহদ্বারের নিকটবর্তী হলে দেবদাসী ও পাণ্ডাদের মধ্যে 'দায়িকা বোলা'য়[4] অনেক সময় অতিবাহিত হয়।

1. ওড়িআণী— কোমরের গোটের গহনা, কাঁকালের উপরে পড়ে।
2. বসণি— পানপাতার আকৃতির নাকছাবি।
3. চিনিমাল(-অ)— সরু দানার হার।
4. দায়িকা— লক্ষ্মীর পক্ষ থেকে মাহারীদের জগন্নাথের বিরুদ্ধে

তবে আজ ঝড়বৃষ্টি ক্রমে ঘনিয়ে আসতে দেখে তার জন্য কারও বিশেষ উৎসাহ ছিল না। কিন্তু অবশেষে জগন্নাথ ভিতরে এসে যখন জয়বিজয়দ্বারে পৌঁছালেন তখন 'দইতা'দের বিভ্রান্ত করে দেবার জন্য দেবদাসীরা 'বচনিকা'[1] আরম্ভ ক'রে দিলে। বাহিরের অন্ধকার, ঝড়বৃষ্টি দুর্যোগের ভ্রূকুটি, এ সব কিছুই তাদের তিলমাত্র বিব্রত করতে পারছিল না।

মন্দিরের দক্ষিণ 'বেঢ়া'র বাহিরে যে প্রকাণ্ড বটগাছটা ছিল, ঝড়ে তার একটা ডাল ভেঙে পড়ল বুঝি। ডাল ভেঙে পড়ার সময় একটা বজ্রপাতের শব্দে মন্দির-প্রাঙ্গণ কেঁপে উঠল। বাজটা কাছেই কোথাও পড়ল হয়তো। অন্যান্য বছরের মত এবারেও 'বচনিকা' বলার আগ্রহ দেবদাসীদের কিছু কম ছিল না, কিন্তু সেবকদের এবার তার ধৈর্য ছিল না। জয়বিজয়দ্বার খোলার পর জগন্নাথ রত্নসিংহাসনে 'বিজে' হওয়ার আগেও অনেক বিধি আছে। দ্বার খোলার পরে ভাণ্ডারের দ্বারে ভাণ্ডারের দিকে মুখ ফিরিয়ে অভিমান ক'রে বসে থাকা লক্ষ্মীর কাছে জগন্নাথ প্রথমে 'বিজে' হন। সেখানে বরণ ও ভোগের পর সেখানে ঘষা 'বিড়িআ'[2] গ্রহণ করা হ'লে জগন্নাথ রত্নসিংহাসনে 'বিজে' হ'ন। তার পরে 'বড় শিঙ্গার' বেশ এবং 'ধূপ' হবে। তারপর খাটে শয্যা পাতা হবে, বীণাবাদন ও গীতগায়ক হবে, পুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি হবে। তার পরে গিয়ে 'পহড়'(-অ) পড়বে, দেউল বন্ধ হয়ে দ্বারে

অভিযোগ ও জগন্নাথের পক্ষ থেকে পাণ্ডাদের দ্বারা তার খণ্ডন; সমস্তই গীত ছন্দে।

1. বচনিকা— লক্ষ্মীর হয়ে মাহারীদের জগন্নাথের প্রতি বচনবাণ।

2. ঘষাবিড়িআ— ছেঁচা 'বিড়িআ' অর্থাৎ পান (চুন খয়ের বাদে শুধু সুপারি লবঙ্গ ও অন্য মশলা সমেত)।

মোহর মারা হবে। এ সমস্ত বিধি সমাধা হতে হতে ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারে হয়তো মাঝরাত হয়ে যাবে। সেবকেরা সেইজন্য শীঘ্র এই সব বিধি সারবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

কিন্তু এই সব 'বচনিকা'য় এদিকে অন্যথা সময় অতিবাহিত হ'তে থাকায় একজন 'দইতা' জয়বিজয় দ্বারের কবাটে ধাক্কা মেরে বললেন, "এই সুনা, এই কাঞ্চন, হয়েছে গো হয়েছে। ঝড়বাতাসে জগন্নাথ এদিকে কালিয়ে গেলেন যে। একবার দুয়ার খোল।"

জয়বিজয়দ্বার খুলল। কিন্তু দ্বার খোলা মাত্র দমকা বাতাসে রত্নসিংহাসনের কাছে জ্বলছিল যে অখণ্ড-প্রদীপ সেটি হঠাৎ নিভে গেল। অখণ্ড-প্রদীপ নিবতে দেখে অখণ্ড 'মেকাপ' আর্তস্বরে ব'লে উঠল, "বাহুড়া'র সময় থেকে একটার পর একটা অঘটন লেগে রয়েছে। এর পরে আরো কী আছে প্রভুই জানেন। নইলে অখণ্ডদীপ তো নেববার নয়।"

গৌরী রাজগুরু, রাজা আমিনচাঁদের সঙ্গে ভিতরে কাঠের আগড়ের কাছে দাঁড়িয়ে জগন্নাথের 'নীলাদ্রিবিজে'র বিধি দেখছিলেন। 'অখণ্ড মেকাপে'র কথায় আমিনচাঁদের 'ছেরাপহঁরা'র সম্বন্ধে আক্ষেপের ভাব লক্ষ্য ক'রে আমিনচাঁদ বিরক্তভাবে বললেন, "ঝড়ো হাওয়ায় অখণ্ডদীপ নিবে গেছে, তা নিয়ে এত কথা কেন?"

'অখণ্ড মেকাপ' আর-একবার অখণ্ড প্রদীপ জ্বেলে রত্নদীপাধারের উপরে রেখে দিলেন।

মন্দিরের ভিতরে আসার পর লক্ষ্মীর কাছে জগন্নাথ ও রুক্মিণীর গাঁঠছড়া খোলবার কথা। বিধি অনুসারে 'ভিতরছো মহাপাত্র' এই গাঁঠছড়া খোলেন। কিন্তু 'ভিতরছো মহাপাত্র'কে তখন সেখানে পাওয়া গেল না। আসল সময়টিতে 'ভিতরছো মহাপাত্র' কোথায় স'রে

পড়লেন ? আজ পালা ছিল নরেন্দ্র মহাপাত্রের। তাঁর অনুপস্থিতি লক্ষ্য ক'রে গৌরী রাজগুরু উত্ত্যক্ত হয়ে চীৎকার করলেন, "কোথায় গেলেন নরেন্দ্র ভিতরছো মহাপাত্র ? সেবকদের যথেচ্ছাচারিতা দিন দিন যেরকম বেড়ে চলেছে তাতে জগন্নাথের বিধি পালন করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল যে।"

ছুটোছুটি ক'রে 'ভিতরছো মহাপাত্র'কে খুঁজতে খুঁজতে সবাই হাঁপিয়ে উঠেছে এমন সময় জয়বিজয়দ্বারে তাঁর ছেলে মহাদেব মহাপাত্রকে হঠাৎ দেখতে পাওয়া গেল। একজন 'দইতা' তাকে শুধালেন, "তোর বাপ কোথায় রে মহিআ ?"

মহিআ ওরফে মহাদেব ব'লে, "বাবার বাতজ্বর, আমায় পাঠিয়েছেন তাঁর পালাটা সেরে নিতে।"

একযোগে বহু কণ্ঠে মহাদেবের উদ্দেশে উচ্চারিত হ'ল—"আচ্ছা, খোল্ খোল্, রুক্মিণীর গাঁঠছড়া খুলে ফেল্। জগন্নাথ রত্নসিংহাসনে বসলে 'বড় শিঙ্গার' হবে।"

রুক্মিণীর গাঁঠছড়া খোলা হলে বরণ ভোগ 'বিড়িআ মণোহি'[1] প্রভৃতি সারা হ'ল। তারপরে সেবকেরা জয়ধ্বনি করলেন—"রত্ন-সিংহাসনে 'বিজে' কর হে 'মণিমা' মহাবাহু!"

'বড় শিঙ্গার' ভোগ যখন সারা হ'ল তখন মাঝ রাত। বাইরে ঝড়ের বেগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল। তারপর 'খট-শেয লাগি'[2] আরতি, গায়িকাদের

1. মণোহি— (দেবতা কর্তৃক) ভোগ উপচার গ্রহণ।
2. ·ট(-অ) শেয(-অ) লাগি— খাটে শয্যা পাতা।

গীতগোবিন্দ গান, 'পইড় মণোহি'[1], বিড়িআ লাগি, কর্পূর আরতি প্রভৃতি বিধি একটির পর একটি হয়ে গেল। শয়নঠাকুরেরা পালঙ্কে শুয়ে ভাণ্ডার ঘরে 'বিজে' হয়ে গেলেন। 'পালিআ' পড়িহারী জয়বিজয়দ্বার ভেজিয়ে দিলেন। ভিতরের দক্ষিণদ্বার বন্ধ হ'ল। অখণ্ড দীপ রত্ন-সিংহাসনের বড় পিলসুজ থেকে নামিয়ে নীচে এনে রাখা হল। তারপর 'পালিআ মেকাপ' 'মণিমা মণিমা' ডাক পেড়ে সিংহাসনের চারিপাশে একবার ঘুরে দেখে গেলেন।

কয়েকটা ইঁদুর সিংহাসনের পিছনে দেওয়ালের ধারে ধারে এ ওর পিছনে তাড়া ক'রে 'পাদুকা-নালের'[2] ভিতরে পালাল। 'পালিআ মেকাপ' নিধি মুদুলী বললে, " 'পোখরিআ'র[3] ভিতরে ইঁদুর হয়েছে। 'তলিছো মহাপাত্র' তো কল বসাচ্ছেন না, ইঁদুরের উৎপাত দিন দিন বেড়ে চলেছে।"

'দইতা পতি' গোবিন্দ মহাপাত্র ভাঙের নেশা ধরা গলায় বিড় বিড় ক'রে উঠলেন— "এ যে ঢোলের ভিতর ইঁদুর[4] রে বাবা, এর সঙ্গে পেরে উঠবে কে? আচ্ছা দেখ, 'বলিআরভুজে'র ইচ্ছা কী দেখ।"

গৌরী রাজগুরুর চোখ দুটোতে যেন একখানি শাণ দেওয়া ক্ষুর চক্‌চক ক'রে উঠল। তিনি একবার রাজা আমিনর্চাদের দিকে চেয়ে আবার অন্য দিকে মুখ ফেরালেন।

1. পইড়— ডাব।

2. পাদুকা-নাল(-অ)— চরণামৃত বাহিরে বয়ে যাবার নালা।

3. পোখরিআ— বাহিরে যেখানে চরণামৃত ইত্যাদি গিয়ে পড়ে।

4. ঢোলের ভিতর ইঁদুর— ওড়িয়া প্রবচন : 'ঢোল (-অ) ভিতরে মুষা' অর্থাৎ বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

মুদুলী যথাবিধি ‘কলাহাট দুয়ার’ বন্ধ ক’রে তালা ফেললেন। তালার উপরে যথাবিধি মাটি দিয়ে বোজানো হলে ‘তলিছো মহাপাত্র সেই মাটির উপরে মদনমোহনের মূর্তি আঁকা মোহর বসাবেন, তবে গিয়ে রাতের ‘পহড়’ পড়বে।

মুদুলী তালার উপরে মাটি দিয়ে বোজানোর পর ‘তলিছো মহাপাত্র’ মোহরটি মাথায় ঘষে নিয়ে মাটির উপরে ছাপ মেরে দিলেন। তারপর দক্ষিণ দুয়ার বন্ধ ক’রে তাতে তালা দিয়ে তার উপরেও তেমনি মাটি দিয়ে মোহর বসানো হ’ল।

গৌরী রাজগুরু ও আমিনচাঁদের পিছন পিছন সেবকেরা মন্দিরের ভিতর থেকে ঝড়ের মধ্যে এক-এক জন ক’রে বাইরে বেরোলেন। ঝড়-বৃষ্টির বেগ ক্রমেই বাড়ছিল। মুদুলী, বড় দুয়ার পড়িআরী ও দেউল-জাগা ছাড়া আর কেউ ‘পহড়’ পড়ার পর মন্দিরের ভিতরে থাকা নিয়ম নয়। তাঁরাই কেবল পালা ক’রে রাত জাগেন। অন্য সেবকেরা সবাই মন্দিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে ‘বাইশ পাহাচ’ দিয়ে নেমে বাইরে চ’লে গেলেন।

সিংহদ্বার বন্ধ হ’ল।

রাত্রে ঝড়ের বেগ আরো বাড়ল। কল্পবট থেকে দুটো বড় বড় ডাল ভেঙে ইন্দ্রাণী দেউল থেকে মুক্তিমণ্ডপ পর্যন্ত এখানে ওখানে ছড়িয়ে প’ড়ে রইল। মন্দিরের চূড়া থেকে নীলচক্রও উড়ে লক্ষ্মীর মন্দিরের কাছে গিয়ে পড়ল। ভোরের দিকে কিন্তু ঝড় থেমে গেল, বৃষ্টিও ধ’রে গেল। ঝড়ের প্রকোপে মন্দির-প্রাচীরের ভিতরে ও বাহিরে যেন এক

বিধ্বস্ত যুদ্ধভূমির ভ্রম উপস্থিত হচ্ছিল। শেষ রাত্রে বজ্রপাত হয়ে জগন্নাথ বল্লভের কয়েকটা গাছ জ্বলে গিয়েছিল। ভোরবেলা ঝড়বৃষ্টি থেমে গেলেও দূরাগত মেঘগর্জনের গুরু গুরু শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এক-এক সময় দমকা হাওয়া জনহীন রথদাণ্ডের উপর দিয়ে হু হু ক'রে ছুটে যাচ্ছিল।

আর-একটু বেলা হ'তে আকাশ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে এল।

খুব সকালেই 'বড় পরিছা' গৌরী রাজগুরু, রাজা আমিনচাঁদ, পতিহারী, 'ভিতরছো মহাপাত্র', 'মুদুলী', 'অখণ্ড মেকাপ', 'পালিআ মেকাপ', 'খট(-অ) শেয(-অ) মেকাপ,' 'পালিআ শুআরবড়ু', 'খুণ্টিআ', 'গরাবড়ু', 'বলিতা যোগাণিআ'[1], পশুপালক প্রভৃতি সেবকেরা দ্বার উন্মোচন ও আরত্তির জন্য মন্দিরে এলেন।

প্রতিহারী, মুদুলী, ভিতরছো মহাপাত্র, অখণ্ড মেকাপ ও পালিআ মেকাপেরা প্রথমে জয়বিজয়দ্বারে গিয়ে গত রাত্রির মোহর পরীক্ষা করলেন। তার পরে 'মুদুলী' চাবি খুললে সেবকেরা প্রদীপ নিয়ে 'কলাহাট দুয়ারে'র নিকটে এলেন। এই দুয়ারের মোহরও যাচাই ক'রে দেখার পর প্রতিহারী "মণিমা পহড় ভাঙ" ডাক দিয়ে 'কলাহাট দুয়ার' খুললে। অখণ্ড ও পালিআ মেকাপ হাতে নয়টি প্রদীপ নিয়ে রত্ন সিংহাসনের কাছে আসামাত্র তাঁদের হাত থেকে পিতলের সে প্রদীপ-গুলি ঝনঝন শব্দে প'ড়ে গেল।

রত্নসিংহাসন শূন্য!!

দেবতারা কোথায় অন্তর্ধান করেছেন।

বাইরে থেকে তালা বন্ধ, তালার মোহরগুলিও ভাঙা হয় নি, মুদুলী ও বড় দুয়ার পড়িআরী মন্দিরে শুয়েছিলেন। ঠাকুরেরা বাহিরে যাবেন

1. বলিতা যোগাণিযা— যে দীপাদির পলিতার যোগান দেয়।

কি ক'রে ?

কালোঠাকুর শূন্যদেহী, শূন্যপুরুষ। তিনি কি তোমার আমার মত ছায়াদেহী[1] যে যাবার সময়ে মুদুলী-পড়িআরী-দেউলজাগারা তাঁকে দেখতে পাবেন ? এমনি নানা কথা এবং কথাকাটাকাটিতে মন্দিরের শূন্য গর্ভগৃহ প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল।

জগু পড়িআরী থেমে থেমে বলছিলেন— "তোমাদের কাছে মিথ্যে, আমার কাছে সত্যি। খুব ভোরে যখন একটা বড় বাজ পড়ল, আমি বরাহমন্দিরে মণ্ডপে ব'সে আছি, দেখলাম কি দেউলের 'বেঢ়া' আলোয় আলো হয়ে উঠল, যেন লক্ষ চাঁদাবাজি জ্বলে উঠল। আর, গরুড় পক্ষীর মত এক পাখী ডানা ঝাড়া দিয়ে উপরে উড়ে গেল। তারপর চারিদিক্ আবার আঁধার হয়ে গেল। সেই তখন থেকে আমার সারা গা কাঁপছে! এই কথা আমি মুদুলীকে বলতে সে আমার কথা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বললে কি না— বুঝলে ভাই, তোমার মৌতাতের নেশাটা বোধ হয় ভাল ক'রে কাটে নি!"

কিন্তু মুদুলী তা অস্বীকার ক'রে বললেন, "আমি তোমাকে ওকথা বললাম কখন ? আমি তো দেখেছি গরুড়পক্ষী যখন উড়ে গেল। তার ডানা কল্পবটে লাগল তাই না গাছের দুটো ডাল মড় মড় ক'রে ভেঙে মাটিতে পড়ল।"

রাজা আমিনচাঁদ ক্রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলেন— "জগন্নাথ গেলেন কি ক'রে ? কোথায় গেলেন ? এর জবাব কে দেবে ?"

বড় পরিছা গৌরী রাজগুরু শূন্য রত্নসিংহাসনের দিকে চেয়ে মনে মনে ভাবছিলেন: জগন্নাথ অতীতে বার বার রত্নসিংহাসন ছেড়ে গিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু এমনভাবে তো আর কখনও শূন্যে অন্তর্ধান করেন নি!

1. ছায়াদেহী— যার দেহের ছায়া পড়ে, নরদেহী।

কিন্তু সে কথা তিনি প্রকাশ্যে বলতে পারছিলেন না।

জগন্নাথকে এক লাভজনক মহলরূপে হাতের মধ্যে পেয়েও এমনভাবে হারাতে হবে তা রাজা আমিনচাঁদ কখনও আশঙ্কা করেন নি। সেবকদের উপরে নিষ্ফল ক্রোধে বারবার তিনি বিস্ফোরণ ক'রে উঠছিলেন।

'পশুপালক' বলিআ পাণ্ডা আমিনচাঁদের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল— "শূন্য মহাশূন্যে মিশে গেলেন! পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড হয়ে গেল! ষোলকলা ষোলকলায় মিশল! আপনি কিছু না বুঝেই কিসের এত চীৎকার ছাড়চেন হে রাজা আমিনচাঁদ? জগন্নাথ কোথায় গেলেন তার উদ্দেশ তো মহা মহা যোগীরাও পান নি, আমরা দেব কোত্থেকে? জগা-বলিআর কথা জগা-বলিআকে জিজ্ঞাসা করো।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

1

চার দিন চার রাত নাগাড় ঝড়বৃষ্টির পরে শান্ত আকাশে সকালের আলো আবার ফুটে উঠছিল।

ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার আগের দিন থেকে সরদেঈ তার চটিতে জ্বরে বিছানা নিয়েছিল। সেই জ্বরজ্বালার মধ্যেই কেটে গেল চার দিন চার রাত ধ'রে অবিরাম ঝড় আর বৃষ্টি। কাল জ্বর একটু কমের দিকে মনে হচ্ছিল, কিন্তু বেলা প'ড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে জ্বরটা বাড়তে শুরু করেছিল। জ্বরের প্রকোপে সরদেঈয়ের চেতনা ক্রমে লোপ পেল।

সরদেঈয়ের মনে পড়ে— চৈতালী সকালের কুয়াশার মত কুয়াশা-ঢাকা আঁধারে চারিদিক ঘিরেছিল। তার মধ্যে কতকগুলি মরা মানুষের মুখ— সেই অচেতন অবস্থায় সরদেঈ মরে হেজে যাওয়া কত মানুষের মুখ স্বপ্নে দেখেছিল। কেউ তাকে হাতের ইশারা ক'রে ডাকছে, কেউ বা তার দিকে চেয়ে হাসছে। বালুগাঁর সেই হাঁড়িভাঙা বটতলায় সেই লশকরের অসুরের মত মূর্তিটাও জ্বরের ঘোরে তার বিভ্রান্ত চেতনায় কতবার ভেসে উঠেছিল। সরদেঈ চীৎকার ক'রে উঠে দু'হাত মুঠো ক'রে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

তার অনেকক্ষণ পরে সরদেঈ যেন কতকগুলো মশালের আলো দেখতে পেয়েছিল, কিসের যেন মেলা হৈচৈ শুনেছিল। চটির

ঘরখানার ভিতরে যেন হাজার চাঁদাবাজি জ্'লে উঠেছিল। চারিদিক যেন চন্দন কস্তুরী আর নাম-না-জানা কত ফুলের গন্ধে মউ মউ ক'রে উঠেছিল। কার শীতল হাতের ছোঁয়ায় যেন তার জ্বরো কপাল স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। রাত তখন কোন্ প্রহর কে জানে।

সরদেঈ চোখ মিট মিট ক'রে চারিদিকে চেয়ে দেখল। দরজার কবাট আধখোলা হয়ে রয়েছে। সেই খোলা দরজা দিয়ে সকালের ঝিরঝিরে বাতাস এসে তার গায়ে মুখে কপালে মমতাভরা স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছিল।

সমুদ্রের তরঙ্গের গর্জন, ফেঁপে ওঠা চিলিকার ঢেউয়ের ছলছল শব্দ, বালিহাঁস আর অন্যান্য পাখীদের কাকলি যেন ঝড়বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত তগুাকিনারকে নবজীবনের সংগীত শোনাচ্ছিল।

গতরাত্রির সেই সুরভি সকালের হাওয়া থেকে এখনও মুছে যায় নি। 'সর'র দুর্বল দেহ ও অবশ মনকে তা যেন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে চপল পাখায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। মৃত-সঞ্জীবনীর মত তা যেন তার প্রতিটি স্নায়ু ও জীবকোষকে সঞ্জীবিত ক'রে তুলছিল।

সরদেঈয়ের তেষ্টা পেয়েছিল। কলসীতে জল আছে কি না কে জানে। আর কিসে জল থাকতে পারে ভাবতে ভাবতে তার শিয়রে একটা পাথরবাটিতে জল আছে দেখতে পেল সরদেঈ। এ পাথর-বাটিতে জল এল কোত্থেকে ? তার তো মনে পড়ে না তাতে জল রেখেছিল ব'লে। তেমন পাথরবাটিও তো নেই তার চটিতে। সর(-অ) দুই কম্পিত হাতে বাটিটা তুলে আকণ্ঠ জল পান করলে, তার পর সেইটুকুতেই ক্লান্ত হয়ে আবার বিছানায় লুটিয়ে পড়ল।

চিলিকার ঘটনাবলি একটি একটি ক'রে তার মনে ভেসে উঠছিল যেন।

চিলিকার উপরে তণ্ডাকিনারে সেই চটি—

গত কয়েকদিন জ্বরের দাপটে সর(-অ) আর বিছানা ছেড়ে ওঠে নি। সেই জ্বরজ্বালার মধ্যে কেটে গিয়েছিল সেই অবিশ্রান্ত একনাগাড়ে বর্ষাবাদল। এখন জ্বরটা একটু কম মনে হওয়ায় চটির বারান্দায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সর(-অ) বেদনাতুর উদাস চোখ মেলে সামনের জলপ্লাবনের দিকে চেয়ে ব'সে ছিল।

পশ্চিম আকাশে ভালেরী 'নাসি'র উপরে মেলা মেঘের ভিড়ের ভিতর থেকে মেঘলা অপরাহ্নের পানসে আলো এসে পড়েছিল। সেই আলোয় চিলিকার অথই ধূসর জল কেমন ভয়ংকর দেখতে লাগছিল। চিলিকায় এসে পড়েছে যে-সব নদী— দয়া, ভার্গবী, পালিআ— সেগুলি বন্যায় ফেঁপে ওঠায় চিলিকার জলও ফুলে উঠেছিল। সাতপড়া বলভদ্রপুর ও মাণিকপাটনা দ্বীপগুলিতে লোকেদের ঘরগুলি বন্যার জলে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন শতশত দ্বীপের মত লাগছিল। তণ্ডা-কিনারের ধার বরাবর জহ্নিকুদা, রসকুদা প্রভৃতি গ্রামগুলিও বন্যায় ডুবু ডুবু হওয়ায় সে-সব গাঁয়ের লোকেরা আর আর বছরের মত অন্ধারী পরগনায় পালিয়ে গিয়েছিল। তণ্ডাকিনারের এক এক জায়গা ডুবে গিয়ে সমুদ্র চিলিকা একাকার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সমুদ্রের নীল জল আর চিলিকার ঘোলা জলের মধ্যে সীমারেখা থেকেই কেবল তণ্ডাকিনারের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছিল। এখানে ওখানে বুক-ভর কাশের ঝোপ জলে ডুবে গিয়ে উপরটুকু কেবল দেখা যাচ্ছিল। ঠাণ্ডা পশ্চিমে হাওয়া যখন ঝড়ের আভাস দিয়ে আবার হু হু ক'রে ছুটে আসছিল, চিলিকার উচ্ছল লহরীতে বেনার ঝোপের আগাগুলি দুলে উঠে ডুবন্ত মানুষের অসহায় হাত নাড়ার মত দেখাচ্ছিল। তণ্ডাকিনারের তীরভূমির ঝাউ, পোলাঙ্গ(-অ), ও

কাজুবাদাম গাছের ডালগুলি ঝড়ের দাপটে চিলিকার বুকে মাথা আছড়াচ্ছিল। জেলে ও নুলিয়াদের কয়েকটি নৌকা চিলিকার ভিতরে কোথায় বানচাল হয়ে ভেসে এসে তণ্ডাকিনারের ধারে মরা কুমীরের মত মুখ থুবড়ে প'ড়ে ছিল। চিলিকার ঘোলা জলের ঢেউগুলি সেই উপুড় হয়ে থাকা নৌকাগুলিকে বার বার আঘাত ক'রে আবার চিলিকার ভিতরে ফিরে যাচ্ছিল, রেখে যাচ্ছিল শুধু ফেনা আর কাঠিকুটোর ক্ষতচিহ্ন।

চটি থেকে মাত্র হাতকয়েক দূরেই এমনি একটা নৌকা বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে ছিল। একটা 'এরা' পক্ষী কোথা থেকে উড়ে এসে তার উপরে ব'সে ডানা ঝাড়ল। একটা ঢেউ এসে নৌকার উপরে ভেঙে পড়ল, তার ধাক্কায় নৌকাটা কয় হাত সরে গেল, 'এরা' পক্ষীও ডানা নেড়ে উড়ে পালাল।

সেই নির্বিঘ্ন নিঃসঙ্গ বিবিক্ত পরিবেশের মধ্যে কোথা থেকে উড়ে আসা সেই 'এরা' পক্ষীটি ছাড়া জীবনের আর কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। মেঘম্লান আকাশ, বন্যাস্ফীত ধূসর— সবখানেই শুধু যেন সব-ফুরানোর, সব-হারানোর সুর।

সৃষ্টি ও সংসারের বুঝি এইখানেই শেষ— এর পরে শুরু সব-হারানোর দেশ। 'এরা' পক্ষীটি উড়ে যাবার পরে এক অসহ্য শূন্যতার ভারে সরদেঈ অস্ফুটে কাতরোক্তি ক'রে উঠল।

"জগুনি— ই" ব'লে ডাকবার জন্য সরদেঈয়ের কণ্ঠের মাংসপেশী-গুলি টান হয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু জ্বরের প্রকোপে, দুর্বলতায় কণ্ঠে যে ডাকবার শক্তি নেই সে কথা সরদেঈ জানত না। "জগুনি" ডাক অস্ফুটে তার গলা থেকে বেরুতে না বেরুতেই আবার নীরব হয়ে গেল।

জিভে নেই স্বাদ, কণ্ঠে অশেষ পিপাসা, ঠোঁট দুটো শুকনো। সরদেঈ অসহায়ভাবে মাথার উপরে হাত বুলিয়ে কপালের উপর থেকে এলোচুলগুলি সরাল। আবার জ্বর আসবে নাকি! সর্বাঙ্গে ব্যথা, হাতে কপালটা গরম ঠেকছিল।

ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া সরদেঈয়ের বুকের মলিন অঞ্চলখানি সহসা উড়িয়ে নিল। সরদেঈ ত্রস্তে আবার আঁচলে গা ঢেকে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসল।

তিন দিন হ'ল জগুনি কোথায় গিয়েছে, ফেরে নি। এ বছর চটির কারবার একেবারে বন্ধ। জগুনির কী যে হয়েছে, সে কী যে করে তা সেই কেবল জানে। সাত সকালে চিলিকার ভিতরে কোথায় চ'লে যায়, ফেরে কোনোদিন এক ঘড়ি রাতে, কোনোদিন বা ফেরেই না। শুধালেও কিছু বলে না। বালুগাঁর চটির সেই জগুনি এর মধ্যে যেন একেবারে বদলে গেছে, সর(-অ) তার কোনো কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছিল না। প্রথম প্রথম জগুনির উদাসীনতায় সরদেঈর অভিমান হত, তার পরে এসেছিল এক অহেতুক ঈর্ষা ও কৃপা। কিন্তু এখন তাও ছিল না, ছিল কেবল এক নিস্পৃহ উদাসীনতা। তবু যে জগুনি ছিল তার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র অবলম্বন, এই তেপান্তর তণ্ডা-কিনারে এই নির্জন চটির মত। সে হঠাৎ এমনি গা-ছাড়া দেওয়ায় সরদেঈ সব আত্মপ্রত্যয় ও প্রফুল্লতা আর তার সঙ্গে সঙ্গে কর্মপ্রেরণাও হারিয়ে বসেছিল।

চটিতে যাত্রী এলে অনেক ঝঞ্ঝাট থাকে। সরদেঈ কুয়ো থেকে কলসীতে জল বয়ে এনে দেবে, রান্না ক'রে দেবে, কিন্তু সাতপড়ার বাজার থেকে রান্নার জোগাড় এনে দেবে কে? কাঠ এনে দেবে কে? সে-সব জগুনির কাজ। কিন্তু খ্যাপা বাউলের মত যেদিন থেকে সে কোথায় না কোথায় ঘুরে বেড়াতে শুরু করল সেদিন থেকে চটির কারবার প্রায় বন্ধ হ'ল। তা ছাড়া রসকুদা গাঁয়েই দুটো নতুন চটি খুলেছে এ বছর। জগুনির মনে কী আছে সেই জানে, তণ্ডাকিনারের পথে যত যাত্রী আসে জগুনি তাদের নিজের চটিতে ডেকে আনার বদলে সেই নতুন চটির দিকে যেতে ব'লে দেয়।

সেদিন খুব সকালে জগুনি কোঁচড়ে কোঁচড়ভরতি হুড়ুম নিয়ে, দুই কাঁধে দুই বইঠা ফেলে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল, সরদেঈ জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল, "জগুনি, আমার জ্বর—দেখছিস্ তো। কত যাত্রী এসে ফিরে যাচ্ছে। এখন বাহুড়ার সময়, তুই ঘরে থাক্, যাত্রীদের দেখাশোনা করিস্।"

জগুনি বলে গেল একটু পরে ফিরবে, কিন্তু ফিরল না। সে যাওয়ার দিন বিকালে ঝিপ ঝিপ ক'রে প্রথম আরম্ভ হল নাগাড় বৃষ্টি, তার পর দিন থেকে ঝড়ের সঙ্গে ঘোর বর্ষা।

তারপর দিন একাদশী, সরর নির্জলা উপোস। জ্বর গায়ে ডুব দিয়ে স্নান করায় জ্বরটা বাড়ল। বাইরে ঝড় আর থেকে থেকে বৃষ্টি। কয়জন যাত্রী সেই ঝড়বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এসে চটিতে সে রাত্রে আশ্রয় নিয়েছিল।

তাদের কথাবার্তায় সর কেবল শুনেছিল জগন্নাথ নাকি পুরী ক্ষেত্র ছেড়ে কোথায় গয়বী হয়ে গেছেন, বড় ঠাকুরের তালধ্বজ রথের উপরে কোত্থেকে গরুড় পক্ষীর মত প্রকাণ্ড একটা শকুন নাকি উড়ে এসে

বসেছিল, ডানা দুটো কুলোর মত, ঠোঁটটা এক হাতেরও বেশী লম্বা —এমনি নানা কথা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল— এ ঝড়-বৃষ্টি নাকি আর থামবে না, আঁধার পোহাবে না, সমুদ্র চিলিকা একাকার হয়ে যাবে, পৃথিবী তার মধ্যে কোথায় ডুবে যাবে, জগন্নাথ পৃথিবীতে ছিলেন ব'লে না পৃথিবী ছিল। এখন জগন্নাথ পৃথিবী ছেড়ে গেছেন, কলিযুগ শেষ হ'ল জেনো, তা না হ'লে এমন নাগাড় ঝড়বৃষ্টি কেউ কখনো দেখেছিল ?

জ্বরের দাপটে সরর জ্ঞান আবার লোপ পেল। সকালে সে যাত্রীরা আর ছিল না, ভোরবেলা ঝড়বৃষ্টি একটু কমতেই তারা যে যার পথে চ'লে গিয়েছিল। কলিযুগ শেষ হওয়ার আগে আপন পরিবার-পরিজনদের একবার শেষ দেখা দেখতে তাদের বোধ হয় তর সইছিল না।

কিন্তু সরর মনে কথাটা লেগে রইল— জগন্নাথ আর পুরীক্ষেত্রে নেই। শ্রীবৎস খণ্ডাশাল দেউলের রত্নসিংহাসনের বাড় বাড়ন্ত ছেড়ে তিনি আবার কোথায় গয়বী হয়ে গেলেন ?

ওঃ কী পাপিনী ! জগন্নাথ শেষে গয়বী হলেন অথচ সে একবার তাঁর কালো শ্রীমুখ দেখতে পেল না। এই তণ্ডাকিনারের পথে কত যাত্রী গেল, ফিরে এল ; চটিতে সে তাদের সেবাযত্ন করল, তাদের পুরী ক্ষেত্রে পাঠাল, অথচ তাদের সঙ্গে একবার পুরী যেতে পারল না। জগন্নাথ যে পতিত পাবন হয়েছিলেন, কত পাপী কত পতিত তাঁর দর্শন পেয়ে রথের উপরে তাঁর শ্রীঅঙ্গ ছুঁয়ে মোক্ষ পেয়ে গেল, অথচ তার কপালে সে সৌভাগ্য একবারও হল না। যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রথের উপরে 'চকানয়ন'কে চেয়ে দেখলে কেই বা তাকে চিনতে পারত বালুশাঁর চটিউলী কুলনাশিনী সেই সর-অ ব'লে, মোগল লশকর

এরই জাত নিয়েছে ব'লে ?

মোগল লশকরের সেই বীভৎস অলক্ষুনে মূর্তি সরর চেতনায় একখানা কালো মেঘের ছায়া ফেলেছিল যেন।

সর রোগদুর্বল ক্ষীণ কণ্ঠে আর্তনাদ ক'রে উঠেছিল— "জগুনি— ই —, ওরে জগুনি—ই— !"

ঠাণ্ডা দমকা হাওয়ায় তার গলার স্বর চিলিকার বুকে ভেসে গিয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল।

আবার জ্বর এসেছিল বোধ হয়। সর(-অ) বুকে মাথায় হাত দিয়ে দেখল গায়ের তাতে খই ফুটছে। দূর দিগন্তে মেঘ সারি সারি পালতোলা নৌকার মত ভেসে চলেছিল। ধোঁয়াটে মেঘ ক্রমে পাঁশুটে হয়ে তারপর মিশকালো হয়ে আসছিল। মেঘের গায়ে বেল ফুলের মালার মত ধবধবে সাদা বকের সারি উড়ে আসছিল চিলিকার দ্বীপগুলি থেকে তণ্ডাকিনারের দিকে।

সরদেঈ তারপর আর বেশীক্ষণ ব'সে থাকতে পারে নি। পা দুটো তার থরথর ক'রে কাঁপছিল। টলতে টলতে সে কোনোমতে ঘরে উঠে এসে বিছানায় অচৈতন্য হয়ে গড়িয়ে পড়েছিল। তারপর জ্বরের ঘোরে আবার সে দেখেছিল কত মরা মানুষের মুখ।

স্বপ্নে দেখা সেই মুখগুলো আজ এই সকালেও সরদেঈয়ের ক্লান্ত চোখের সামনে ভেসে উঠছে যেন। অন্ধ কালা তার শাশুড়ীর মুখ— গায়ের চামড়া শুকিয়ে ঝুলে পড়েছে, মাথার চুল পেকে শণের নুড়ি হয়েছে, হাতে বাঁশের লাঠি নিয়ে অন্ধকারে সে "ওলো বউ, ওলো সর(-অ)" ব'লে ডাক পাড়তে পাড়তে সরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু মুখে তার নিত্যিদিনের সে অনর্গল গাল পাড়া নেই, শিয়রে দাঁড়িয়ে বুড়ী মমতাভরা সুরে বলছে, "তোকে কত আদরে বউ ক'রে ঘরে এনেছিলাম

লো মেয়ে। বিয়াই একবার এসেছিলেন যে বলেছিলেন— এই সারিআ তোমার বউ নয় তো, মেয়ে; তাকে তেমনি করেই রেখো। এ সংসারে তুই অনেক জ্বালা সয়েছিস্ লো মেয়ে; আহা, 'সোনার বাড়ন আমার কালো কাঠ হয়ে গেছে'[1] গো। তোকে আমি নিতে এসেছি লো মেয়ে। আয়, আমার সঙ্গে আয়, তোর এই যন্ত্রণা থেকে তোকে পথ কাটিয়ে নিয়ে যাই।"

সে মূর্তি কুয়াশার মত ধোঁয়াটে অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল, তার স্বামীর মুগুনি পাথরে খোদাই চৌকো মুখখানা স্বপ্নে ভেসে উঠেছিল। সরদেঈ তার স্বামীকে ভাল ক'রে না চিনতেই স্বামী চ'লে গিয়েছিল লড়াইয়ে, তবু স্বামীর সেই যে ঢুটি চক্ষু সরর মনের পটে আঁকা ছিল তাতে 'চউঠি'[2] রাতের স্বপ্নমাখা দৃষ্টি ছিল না, তা থেকে ছুটে বেরুচ্ছিল যেন আগুনের ফুলকি— তার স্বামী তাকে সেই কুয়াশাঢাকা অন্ধকারের ভিতরে ঠেল দিয়ে বলছিল— "যা, পালা এখান থেকে, এখানে ঠাঁই হবে না তোর, তুই জাত হারিয়েছিস্। চটিউলী তুই, রাস্তার লোকের কাছে মন বিকিয়েছিস্ নয়তো ইন্দ্রনীল-বসানো আংটি তোর আঙুলে পরাতে যেত কেন কেউ ?"

সর(-অ) পাতলা অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলে সেই আংটিটা কোথায় মনে করতে চেষ্টা করছিল। মনে পড়েছিল আংটিটা সে তার পেটরার মধ্যে বন্ধ ক'রে রেখে দিয়েছে।

সরর আবার জ্ঞান লোপ হয়েছিল। নিশ্চেতনার অথই জলের মধ্যে একটা বুদ্‌বুদের মত সে দেখতে দেখতে কোথায় মিলিয়ে

1. ওড়িয়া মেয়েলী বাকরীতি।

2. চউঠি— বিবাহের চতুর্থ দিন, সেদিন বরের গৃহে বিশেষ উৎসবকৃত্য পালিত হয়, যেমন বাঙালীদের বউভাত।

গিয়েছিল যেন। অনেকক্ষণ পরে কখন আবার তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল।

কিন্তু সে-সব কি সে স্বপ্ন দেখছিল? না সত্যি ঘটেছিল সে-সব? সর ভেবে ঠিক করতে পারছিল না।

বাইরে ঝড়ের কোলাহল তখনও থামে নি। হঠাৎ চারিদিকের আঁধার চিরে যেন জ্বলে উঠেছিল লক্ষ চাঁদাবাজি। অনেক লোকের অনেক গলার আওয়াজ, তার মধ্যে কে কী বলছিল সর তা স্পষ্ট শুনতেও পাচ্ছিল না, বুঝতেও পাচ্ছিল না। তগুাকিনারে অনেক জাহাজী বোম্বেটের আড্ডা। এক-এক সময়ে রাত্রে সমুদ্রের বুকের নৌকা লুঠের পরে চটির কাছে এসে লুঠের ধন ভাগ-বাঁটোয়ারার সময়ে তারা এমনি গোলমাল করে; তারাই হয়তো এসেছে। এই ভেবে সর দুই কানে আঙুল দিয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে বিছানায় প'ড়ে ছিল।

কিন্তু সে-সব স্বপ্ন না সত্যি? সর তখনও স্থির করতে পারছিল না।

তারই মধ্যে জগুনির গলা কেমন ক'রে কোত্থেকে শোনা যাচ্ছিল কে জানে! জগুনি সে বোম্বেটে দলের সর্দারের মত চীৎকার করছিল— "আ— স্তে, সামলে, ধী— রে, সামনে ঐ যে চটি— না না, ওদিকে নয়— খবরদার, ও ঘরে নয়, তার পাশে ঐ কুঠরিতে— না না, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ নেই।"

এক দল লোক কী সব ভারী ভারী জিনিস যেন তগুাকিনারের বালি থেকে তুলে চটির বারান্দায় বয়ে নিয়ে আসছিল, তাদের মশালের

আলোয় চারিদিকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

না, স্বপ্ন নয়! স্বকর্ণে শোনার মত, স্বচক্ষে দেখার মত সে সব ব্যাপার আস্তে আস্তে মনে প'ড়ে আসছিল।

চারিদিক হঠাৎ কী এক অপূর্ব সৌরভে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। যখন সকাল হ'ল, সেই সকালের হাওয়াতে তখনও সেই সুগন্ধ লেগে ছিল যেন। সর কি পাগল হয়ে যাবে নাকি? স্বপ্ন আর সত্যের মধ্যেকার সীমানা ঠাউরে উঠতে পারছিল না সে।

সেই লোকেদের মধ্যে কে একজন যেন বলছিল, "এখানে থাকলে সকালবেলা কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়বে, রাতারাতিই চিলিকার মধ্যে অদৃশ্য হওয়া ভাল।"

তার গলাটা কানে যেন কেমন চেনা চেনা লাগছিল।

ক'বে কতদিন আগের কোন বিস্মৃতির গর্ভ থেকে সে কণ্ঠস্বর বৃষ্টির মেঘের সঙ্গে ভেসে আসছিল, মনে হচ্ছিল সরদেঈর। কিন্তু কোথায় কবে সে স্বর কি ক'রে সে শুনেছিল তা মনে করতে অনেক চেষ্টা ক'রেও মনে পড়ছিল না তার। বেশী ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে উঠছিল, সব যেন অন্ধকাব হয়ে আসছিল।

তার পর—

জগুনির গলা শোনা গেল— "এই ঝড় জল অন্ধকারে চিলিকার মধ্যে পথ ঠাওর হবে না। ঝড়টা থেমে আসছে মনে হচ্ছে, পোয়াতে তারা উঠলে এখান ছেড়ে আমরা চিলিকার ভিতর চ'লে যাব।"

এরা বোম্বেটে নিশ্চয়। ভয়ে আতঙ্কে সর(-অ) আবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, তবু ঝাপসা-মত মনে পড়ে কে যেন সেই সময় সেই অবস্থায় সরর কাছে এসে তার কপালে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল, মুখে এক ফোঁটা জলও দিয়েছিল— কিন্তু সেও স্বপ্ন হতে পারে।

আজ সকালের ঝিরঝিরে হাওয়া সরর উত্তপ্ত কপালের উপরে স্নেহাতুর স্পর্শের মত ছুঁয়ে যাচ্ছিল।

আকাশে মেঘ কেটে গিয়ে সকালের প্রথম নরম রোদ এক মুঠো সোনালী ফুলের মত ছড়িয়ে পড়ছিল চারিদিকে। সর আস্তে আস্তে তার বিছানায় উঠে বসল। শরীর থেকে তার হঠাৎ যেন সব ক্লান্তি ও অবসাদের ভার গত রাত্রে কে নামিয়ে নিয়েছিল। সর দেওয়ালে হাতের ভর দিয়ে উঠে টলতে টলতে ঘরের বারান্দায় এল।

স্যাতসেঁতে অন্ধকারের ভিতর থেকে বাহিরের আলো আর বাতাসের মধ্যে এসে সর যেন অবাক্ হয়ে থমকে দাঁড়াল।

কাল রাত্রে জ্বরের ঘোরে যখন সে অজ্ঞানের মত প'ড়ে ছিল তখন যে চন্দন কস্তুরী আর নাম-না-জানা কত ফুলের সুবাসে চারিদিক ছেয়েছিল সেই সুবাস যেন সকালের শীতল বাতাসে এখনও লেগে রয়েছে।

আঃ··· এত আলো, এত আনন্দ, এত কাকলি, এত শিহরণ সর তার দুঃখময় কালিপড়া জীবনে আর কখনো বুঝি দেখে নি, শোনে নি, অনুভব করে নি। এমনি পুলক, এমনি বেপথু সর বোধ হয় জীবনে আর একবার মাত্র অনুভব করেছিল—'চউঠি'র রাতে যখন তার বর 'চউঠি'র দীপ ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিয়েছিলেন।

'চউঠি'র দীপ নেবানো অবিধি।

ঘোমটার নীচে সরর মুখ থেকে একটা অস্ফুট আর্তনাদের মত বেরিয়ে আসতে চাইছিল : " 'চউঠি'র দীপ নিবিয়ে দিলে ?"

কিন্তু সে সন্ত্রস্ত আপত্তি ব্রীড়ায় সংকুচিত হয়ে ঘোমটার আড়ালে লীন হয়েই রইল। আজ সেই সব স্মৃতি যেন জীবন্ত হয়ে সরর ক্লান্ত চোখে ভেসে উঠছিল। কিন্তু তাতে বেদনার জ্বালা ছিল না, এক অপূর্ব পুলকে সরর দেহমন উল্লসিত হয়ে উঠছিল।

আজ এ কি সুপ্রভাত ।

চার দিন চার রাতের অবিশ্রান্ত ঝড়বৃষ্টির পর আজ সকালে আকাশে কালো মেঘ আর ছিল না। চিলিকার ক্ষ্যাপা ঢেউগুলিও শান্ত। বিলাসিনীদের নর্তিল বাহুলতার মত চিলিকার শান্ত ঊর্মিমালা নেচে নেচে ভেসে যাচ্ছিল— কোথা থেকে কেউ জানে না। সবদিকে কেবল উচ্ছল আনন্দের অফুরন্ত ফেনিলতা।

এত পাখী কোথায় ছিল ? চিলিকার বুক আর তণ্ডাকিনারের ভিজে বালির উপরে বালিহাঁস, চকোর, চক্রবাক্, 'এরা', 'কালীগউড়ুণী' কত জাতের পাখীই এসে নামছিল দলে দলে, আবার উড়ে যাচ্ছিল। আনন্দের ভাণ্ডার লুঠ করবার জন্য যেন তর সইছিল না তাদের।

সকালের আলোয় সরর চোখ পড়ল তার মলিন বেশবাসের উপর। অসুখে বিনা স্নানে বিছানায় প'ড়ে থেকে থেকে আজ উঠে এই আনন্দময় সৌরভময় জগতে নিজেকে তার বড় কুশ্রী ক্লিন্ন মনে হচ্ছিল।

তেমনি কাঁপা কাঁপা টলমলে পায়ে ঘরের ভিতর ফিরে এসে সে তার পেটরাটি খুলে বসল।

কিশোরী বয়সের পুতুলের বিয়ের খেলনা পুতুল থেকে আরম্ভ ক'রে লড়াইয়ের মাঠে পাওয়া তার স্বামীর রক্তে ভেজা শিরোপা

আর সেদিনের সেই অচেনা 'অনুআরে'র দুধের দামের কড়ি বাবদে বাঁধা রাখা ইন্দ্রনীলমণি বসানো আংটিটি পর্যন্ত— তার জীবনের বহু পাওয়া ও পেয়ে হারানোর ঐশ্বর্য ও বেদনা তাতে সযতনে তোলা রয়েছে। আজ পেটরা খুলে সর(-অ) ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব দেখতে লাগল। যেন সে আজ প্রথম দেখছে সে-সব।

ছেঁড়া নেকড়ার গিঁঠ খুলে আংটিটা বার ক'রে সরদেঈ বাঁ হাতের 'পরি'[1] আঙুলে পরল। জ্বরে শরীর শুকিয়ে গিয়েছিল, আংটিটা আঙুলে ঢিলে হয়ে বসল। তার পরে সর উলটে পালটে বার করল বাসন্তী রঙের একখানি লালপাড় শাড়ী। শ্বশুর বাড়ী স্বামীর ঘর করতে আসার সময় এই শাড়ীটি সে পেটরায় ক'রে এনেছিল, কিন্তু শ্বশুর বাড়ীতে সে শাড়ী পরার কোনো উৎসবক্ষণ সরদেঈয়ের জীবনে আর এল না। সরদেঈ তার সেই শাড়ীখানি যত্ন ক'রে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল জগুনির বউ এলে তাকে দেবে বলে। আজ কিন্তু সেই শাড়ীখানি সে বের করল নিজে পরবে ব'লে। দেওয়ালের কুলুঙ্গি থেকে একটি ফাটা আয়না আর কাঠের চিরুনি বের ক'রে ঘরের মাঝখানে তার উস্কখুস্ক এলো চুল আঁচড়াতে বসল। ক্লান্তি আর দুর্বলতায় তার মাথা ঘুরছিল। সব ফেলে দিয়ে মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়তে চাইছিল যেন তার শরীর, কেবল তার মন তাতে সায় দিচ্ছিল না। আজকের এই আনন্দময় সকালবেলায় সেই মলিন রোগশয্যায় ফিরে যেতে তার মন চাইছিল না কিছুতেই।

অনেকক্ষণ ধ'রে ব'সে ব'সে সরদেঈ আস্তে আস্তে সযত্নে মাথায় সিঁথি কাটল। মাথায় চিরুনি চালাতে গিয়ে কয়গাছি করে রুগ্ণ রুক্ষ চুল উঠে আসতে লাগল। নিজের মুখ এমন খুঁটিয়ে আয়নায় দেখবার অবসর

1. পরি— ক'ড়ে আঙুলের আগের আঙুল, অনামিকা।

আর কখনও সরদেঈয়ের যেন হয় নি। ভুই ভুরুর মাঝখানে কোন উলকি আঁকানী কবে একটি যে তিলফুল এঁকে দিয়েছিল আজ সেটি সরর ফ্যাকাশে মুখে সকালের মরা চাঁদের মত এমন ফুটে উঠছে কেন কে জানে। চুল আঁচড়ে সরদেঈ শাড়ীটা কাঁধে ফেলে কাঁখে কলসী নিয়ে তণ্ডাকিনারের কুয়োতলায় গা ধুতে টলমলে পায়ে বাইরে বেরুল।

এক দল বালিহাঁস আকাশে ছুটোছুটি ক'রে সমুদ্রের দিক থেকে চিলিকার বুকের উপরে উড়ে এল। কুয়োর কাছে শেওড়া গাছে এক ঝাঁক 'কালিকা' পাখী উড়ে এসে বসেছিল। আজ সকালে এই 'কালিকা' পাখী এল কোত্থেকে? বালুগাঁ ছেড়ে আসার পর থেকে সরদেঈ আর দেখে নি, তাদের গানও শোনে নি। এই পাখীর দলে সকলেই গায়ক, শ্রোতা হ'তে কেউই রাজী নয় তারা।

চটির সামনে ভিজে বালির উপরে অনেক্ লোকের পায়ের চিহ্ন। সমুদ্রের দিক থেকে সেই চিহ্নগুলি এসে পৌঁছেছিল চটির কাছে। চটির সামনে সেগুলি লেপে পুঁছে একাকার হয়ে আবার চ'লে গিয়েছিল চিলিকার দিকে। কাদের পায়ের চিহ্ন এ-সব? কাল রাত্রির সেই-সব অজানা হঠাৎ-আসা যাত্রীদের না বোম্বেটেদের? রাত্রির স্মৃতি সরদেঈয়ের সর্বাঙ্গে আবার রোমাঞ্চের শিহরণ তুলল।

আ মরি! এই জাতিপুষ্পের মালা, 'সম্পুট'(-অ)[1], এ-সব এই তেপান্তরে এল কোত্থেকে? বালির উপরে ছড়িয়ে প'ড়ে ছিল রাশি রাশি বাসী সেবতী ফুল, 'দঅণা'র ছেঁড়া মালা, নাগেশ্বর ফুলের তোড়া, আর কেতকীর 'টাহিআ' থেকে খ'সে পড়া কেতকীর দল। 'দঅণা'র ভীরু সুবাসে চারিদিক আমোদিত হয়ে উঠছিল। জগন্নাথের অতিপ্রিয় এই 'দঅণা' ফুলের ছড়া এখানে কোত্থেকে কি করে এল সরদেঈ ভেবে

1. সম্পুট(-অ)— ফুলের তোড়া।

পাচ্ছিল না। সরদেঈ ভিজে বালির উপর ব'সে প'ড়ে দুর্লভ মণিমুক্তার মত সেই ফুল কুড়োতে লাগল।

কাল রাত্রে এই তেপান্তর তণ্ডাকিনারে এসেছিল কে? পিছনে সে রেখে গেছে খালি ফুল আর গন্ধ, আলোক আর কাকলির পদচিহ্ন। হায় হতভাগিনী— এত কাছে বর্ষারাতে কোন রূপময় রসময় আশ্রয় খুঁজতে এসেছিলেন, সর তবু জাগল না, একবার তাঁকে দেখতে পেল না।

সরদেঈয়ের মাথা আবার ঘুরে উঠল, সারা গা ঝিম ঝিম ক'রে উঠল। মনে পড়ল জগুনির কথা— ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার আগে থেকেই সে কোথায় গিয়েছিল, এখনও ফেরেনি। সরদেঈ অভ্যস্ত কণ্ঠে ডেকে উঠল— "জগুনি, হ্যাঁরে জগুনি—ই—।"

নিজের অজানতে সরদেঈয়ের চোখ থেকে অশ্রুর ধারা নেমে ভিজে বালিতে শুষে যেতে লাগল।

পাশের ঘরের কবাট খোলা প'ড়ে আছে।

সবদেঈ কষ্টে গা ধুয়ে সেই বাসন্তী রঙের শাড়ীখানা প'রে বাবান্দাব উপরে উঠে আসতে আসতে আব উঠতে পারল না পা-দুখানি তাব যেন হঠাৎ চলৎশক্তিবহিত হয়ে পড়ল। সেইখানে অসহায়ভাবে লুটিয়ে পড়ল সে। বষাভেজা ফুলের মত সরর মুখখানি তার ভিজে চুলে আধখানি ঢাকা পড়েছিল।

চন্দন কস্তুরীর গন্ধে ঘরের ভিতরেব বাতাস তখনো ভারী হয়ে আছে। সারা মেঝেতে ছড়িয়ে প'ড়ে আছে 'দঅণা', নাগেশ্বর, মালতী, কুন্দ আর কেতকীর মালা আর পাপড়ি। একটা কালো ভোমরা কোত্থেকে এসে সেই ফুলগুলির উপর উড়ে বেড়াতে বেড়াতে সরর মুখের উপরেও একবার উড়ে এল, কিন্তু হাত নেড়ে ভোমরা তাড়াবার শক্তি

তখন সরদেঈয়ের ছিল না। তার অবশ হাত দুখানি তেমনিই লুটিয়ে প'ড়ে আছে। বুকের উপর থেকে আঁচলটা স'রে গেছে, সেটা টেনে দিয়ে বুক ঢাকবার শক্তিটুকুও নেই সরদেঈর।

ঘরের দেওয়ালে সে কবে সরদেঈ গেরিমাটি ভুসো হরিতাল আর পিঠালি দিয়ে যে জগন্নাথের পট এঁকেছিল, সেই ছবি আজ বড় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে সরর ক্লান্ত চোখে। তাই দেখে সরদেঈয়ের মনে পড়ল জ্বরের ঘোরে যাত্রীদের মুখ থেকে শোনা সেই কথা— জগন্নাথ কোথায় গয়বী হয়েছেন, শূন্যময় শূন্য হয়েছেন।

কিন্তু এখন সরর মনে হ'ল সে-সব মিথ্যে কথা, যাত্রীদের মনগড়া গল্প সে-সব। জগন্নাথ শূন্য হন নি, মিলনের মিথুনলগ্নে আজ মহাশূন্য বুঝি হয়েছেন মহাপূর্ণ। জগন্নাথের দুই চাকা নয়নে সে অতল মহাশূন্যতা তো নেই, আছে যেন নবীন প্রেমিকের মেদুর দৃষ্টি। সেই দুই পদ্মনেত্র তাঁর যেন নিবদ্ধ সরদেঈয়ের উন্মুক্ত স্তন ও কুটিল কবরী ঘেরা মুখখানির উপরে। অভিমানে সরদেঈর দুটি শীর্ণ ঠোঁট স্ফুরিত হ'ল— "হে নিঠুর, কোন ছলে এসে তুমি কোন ছলে চ'লে যাও? পিছনে রেখে যাও কেবল জন্মজন্মান্তরের অসীম আকুতি আর অফুরন্ত চোখের জল!"

সরদেঈয়ের চেতনা আবার লোপ পেয়ে আসছিল। তাকে ঘিরে চারিদিকে আবার যেন নেমে আসছিল ঝাপসা কুহেলির পরদা। কার নিবিড় আলিঙ্গনে সরদেঈর সর্বদেহ মথিত হচ্ছে, নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে— সে মৃত্যু। মহামরণ!

সরদেঈ চোখ মেলে আর বেশীক্ষণ চেয়ে থাকতে পারল না, তার দুই চোখের পাতা আস্তে আস্তে বুঁজে এল, আর খুলল না।

যে দুই ফোঁটা জল দুঃসহ বেদনায় চোখের কোণে টলটল করছিল, তাই এখন কেবল ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ছিল রাত্রির শিশিরের মত।

2

শরঘাস আর হিন্তাল বনে ঘেরা গুরুবাঈ দ্বীপ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাণপুরের শেষ রাজা হরিসেবক মানসিংহ খোর্ধার রাজার দ্বারা নীলাদ্রিপ্রসাদ হতে বিতাড়িত হয়ে এখানে রাজধানী স্থাপন না করা পর্যন্ত একটি জনমানবহীন নির্জন দ্বীপ মাত্র ছিল। কেবল শর বেনা 'জেউলা' প্রভৃতি বন্য গুল্ম ও হিন্তাল সুঁদরি ইত্যাদি বৃক্ষের দুর্ভেদ্য অরণ্য। মাণিকপাটনার মোহানা দিয়ে পালুর ও গঙ্গা বন্দরে যে-সব নৌকা যাতায়াত করত তাদের উপর লুঠপাট করত যে-সব ফিরিঙ্গী বোম্বেটেরা, তারাই শুধু এই দ্বীপটিকে চিনে নিয়েছিল এক সাময়িক ঘাঁটি হিসাবে। আর চিনেছিল চিলিকার অগনতি 'এরা' পক্ষীর দল।

সেই গুরুবাঈ দ্বীপ এখন তকী খাঁর আক্রমণ হ'তে জগন্নাথের আত্মরক্ষার আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিল। হিন্তাল আর 'জেউলা'র অরণ্যের বৃক্ষশীষের উপরে সকালের কোমল আলো ধীরে ধীরে প্রলিপ্ত হয়ে আসছিল। তবু বনভূমির অভ্যন্তরে গত রাত্রির মেঘবৃষ্টির অন্ধকার যেন তখনও বাসা বেঁধে ছিল। চিলিকার পক্ষীকুল আকাশে নূতন সূর্যকে অভিনন্দন জন্যই যেন অকারণ পুলকে সেই বনভূমির উপরে ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছিল। পাখায় তাদের ক্লান্তি ছিল না, কাকলিরও বিরাম ছিল না।

সাতপড়া-বলভদ্রপুরের দিক থেকে চিলিকার একটি অপ্রশস্ত খাঁড়ি হিন্তালবন চিরে এই দ্বীপের ভিতরে ঢুকে এসেছে। হিন্তাল, 'জেউলা' ও শরঘাসে খাঁড়ির দুই তীর এমন আচ্ছন্ন যে বাহির থেকে তার গতিপথ সহজে ঠাহর করা যায় না। সেই খাঁড়ি দিয়ে নৌকায় কিছুদূর

আসার পর একটা বালিয়াড়ির উপরে এক বিশাল বটগাছ কোন অনন্ত কাল থেকে অসংখ্য শাখাপ্রশাখা মেলে ঝুরি নামিয়ে যেন আর-একটি ছায়ায় অন্ধকার ঘন বনের সৃষ্টি করে রেখেছিল। সেই বট গাছের তলায় ইতিমধ্যে একটি পাথরের বেদী তৈরী হয়েছিল। জগন্নাথের উপরে তকী খাঁর শ্যেনদৃষ্টি পড়াব সূচনা পাওয়া অবধি রামচন্দ্রদেব বহু অন্বেষণের পরে এই স্থানটিকে জগন্নাথের শেষ আশ্রয়স্থল নির্বাচিত ক'রে সেখানে একটি বেদী তৈরী করিয়ে রেখেছিলেন। জগন্নাথের কয়েকজন বিশ্বস্ত সেবক, কয়জন অনুগত খণ্ডায়ত ও জগুনি ব্যতীত এ স্থানের সন্ধান আর কেউ জানত না।

ভোরের আলো ফুটতেই গতরাত্রে জগন্নাথকে এনে সেই বেদীর উপরে স্থাপনা করা হয়েছিল। রামচন্দ্রদেব, 'সান-অ পরিছা' বিষ্ণু মহাপাত্র, রাজগুরু লক্ষ্মীপরমগুরু ও দুইজন 'দইতা' ছাড়া আর সকলে তার পর সেখান হতে ফিরে গেলেন। বেদীমূলে অখণ্ড দীপ ছিল না। একটা গাছে দড়ির আগুনটা জ্বলছিল। সকালের আলোয় সেটি সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ।

হিন্তাল বনের সেই স্তব্ধ গহ্বরের মধ্যে কোথায় একটা হাঁড়িচাঁচার ডাক ছাড়া অন্য কোনো শব্দ ছিল না। বটগাছের ডাল থেকে একটা দাঁড়কাক এক-এক সময়ে হাঁড়িচাচার ডাকের প্রত্যুত্তর দিচ্ছিল।

রামচন্দ্রদেব মলিন কপালের উপর থেকে কয়গাছি কটা চুল ক্লান্ত হাতে সরিয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন— এমন নির্জনতা, এমন নিঃসঙ্গতা, এমন শূন্যতা এর পূবে তিনি আর কখনও অনুভব করেন নি।

মঙ্গল আরতি সারা হয়ে এখন এটা 'মইলম লাগি'র সময়, কিন্তু আরতির জন্য সোনার আরতি-প্রদীপ কিংবা ঘিয়ের বাতি প্রভৃতি

কিছুই ছিল না। 'মইলম লাগি'র জন্য তেমনি 'তড়প'(-অ)[1], উত্তরীয় ও 'খণ্ডুআ'[2] প্রভৃতিও ছিল না। দৈনন্দিন 'নীতি' সম্পাদনের জন্য যে-সব উপকরণ একটি সিন্ধুকে বোঝাই হয়ে নৌকায় আসছিল সে নৌকাটি মাণিকপাটনা মোহানায় ঝড়ে ডুবে যাওয়াতে আর এসে পৌঁছাতে পারে নি। তা ছাড়া টানা-হেঁচড়া আছড়ানিতে বিগ্রহদের শ্রীঅঙ্গের 'তড়প'-অ ও উত্তরীয় মাটি কাদায় নোংরা হয়ে গিয়েছিল। কণ্ঠের মালা, মাথার চূড়া সব ইতস্ততঃ খসে প'ড়ে শ্রীঅঙ্গ নিরাভরণ দেখাচ্ছিল। কিন্তু দইতারা শ্রীঅঙ্গ থেকে কাদামাটি লাগা কাপড় খুলতে যেন ভরসা পাচ্ছিলেন না। পরস্পরের দিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে তারা শুধু দাঁড়িয়ে ছিলেন।

বেদীর কাছেই রামচন্দ্রদেব অত্যন্ত ক্লান্তভাবে নির্বাক্ স্তম্ভিত দৃষ্টিতে জগন্নাথের কর্দমাক্ত বিগ্রহের দিকে চেয়ে মাটির উপরে বসে ছিলেন। তাঁর বুঝি মনে হচ্ছিল ওড়িয়া জাতির ভাগ্যেও আজ ঠিক এমনি অবস্থা— 'টানা-হেঁচড়া মরার বাড়া'[3] হয়েছে, ওড়িয়া জাতিও এমনি ভাবে আজ নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত। সব গেছে, আছে শুধু এক দুর্জয় অভিমান।

গত কয়েকদিন ধ'রে ক্রমাগত পরিশ্রম উত্তেজনা উৎকণ্ঠা আশঙ্কা ও অনিয়মের মধ্যে তাঁর শালপ্রাংশু দেহ বাত্যাক্রান্ত বনস্পতির মত অবসন্ন ও শীর্ণ দেখাচ্ছিল। অযত্নবর্ধিত শ্মশ্রু, রুক্ষ কেশ আর কোটরগত আরক্ত চক্ষু তাঁর রূপে এক ভ্রষ্ট কাপালিকের ভ্রম সৃষ্টি করছিল।

1. তড়প(-অ)— উৎকৃষ্ট বস্ত্র।
2. খণ্ডুআ— স্ত্রীলোকের মাথার ওড়না।
3. ওড়িয়া প্রবচন।

জগন্নাথও আজ মহাভৈরব।

রত্নসিংহাসনের সমারোহ ত্যাগ ক'রে ওড়িয়া জাতির অভিমান, বিশ্বমানবের জগন্নাথ এ কোন বনভূমিতে এসে পড়লেন তা চিন্তা করা মাত্র রামচন্দ্রদেব যুগপৎ বিস্ময় ও বিষাদে মুহ্যমান হয়ে পড়ছিলেন। তাঁর নিকটে 'সান পরিছা' বিষ্ণু পশ্চিমকবাট মহাপাত্র ক্লান্তিতে মাটির উপরে ব'সে থাকতে থাকতে কখন নিদ্রায় অচেতন হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। 'দইতা' সেবক দুইজনও প্রাণহীন পুত্তলিকার মত ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় বেদীর নীচে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

এখন প্রভুর 'মইলম লাগি' ও 'অবকাশ' নীতি কি ক'রে সম্পন্ন হবে তাঁরা ভেবে পাচ্ছিলেন না।

এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় স্থাণুত্বের মধ্যে লক্ষ্মী পরমগুরু বেদীর সম্মুখে মাটিতে ব'সে উদাত্ত স্বরে আবৃত্তি করছিলেন—

"নীল জীমূতসঙ্কাশঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ
শোণাধরধরঃ শ্রীমান্ ভক্তানামভয়ঙ্করঃ ॥
বলভদ্রস্তথা সপ্তফণাবিকটমস্তকঃ
কুন্দেন্দুশঙ্খধবলঃ প্রকাশোঽম্বুজলোচনঃ ॥
গুপ্তপাদকরাম্ভোজ সমুত্তোলিতসদ্ভুজঃ
ভক্তানাম্বনায়েব তথা ভদ্রাপি ভদ্রদা ॥

রামচন্দ্রদেবের দুর্ভাবনা কিন্তু তত ছিল না যত ছিল বিস্ময়।

কোন অসমাহিত গহন রহস্যের প্রতিরূপ এই জগন্নাথ? সৃষ্টির কোন আদিম প্রভাতে প্রলয়পয়োধিজলে কোন ধ্বংসলীলার মধ্য থেকে একখানি দারু রূপে ভেসে এসেছিলেন এই নীলমাধব?

উপকথার যবন রক্তবাহু এবং ইতিহাসের মহাপদ্ম নন্দ থেকে মোগল সেনাপতিরা পর্যন্ত কত আক্রমণই না হয়ে গেছে— এই

অসমাহিত রহস্য উন্মোচনের জন্য।

জগন্নাথ কখনো পলায়ন করেছেন দুর্গম বনকান্তারে, কখনো 'পাতালী' হয়েছেন বসুন্ধরার গর্ভে, কখনো ঝাঁপ দিয়েছেন আবার প্রলয় পয়োধিজলে। তথাপি শূন্যমঞ্চ থেকে সেই রহস্যের যবনিকা অপসারিত হয় নি, সেই মহাশূন্য রূপ প্রকটিত হয় নি। তিনি যে অবিনশ্বর আত্মার বিগ্রহ, দুর্বিনীতজনে তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

প্রবলের শত অত্যাচার ও পীড়নের মধ্যে মানুষের দেহ বারংবার বিনষ্ট হয়েছে, তার আত্মা রয়েছে অজেয়। মৃত্যুর শত ফুৎকার তুচ্ছ ক'রে যে জীবনদীপ রয়েছে অনির্বাণ, ধ্বংসের শত প্রমত্ত তাণ্ডবের মধ্যে সৃষ্টির যে প্রেরণা-উৎস রয়েছে চির-অতলান্ত— জগন্নাথ যেন সেই মহামুক্তি, সেই মহাপূর্ণ, আর সেই মহাশূন্যের অনির্বচনীয় আদিঅন্তহীন চিরন্তন ভাবমূর্তি।

জগন্নাথ ওড়িয়া জাতির অভিমান, তার অপরাজেয়তার ইষ্টদেব, তার সব মঙ্গল-অমঙ্গলের "জয় জগন্নাথ"।

নিজের তুচ্ছ মানরক্ষার জন্য তিনি সেই জগন্নাথকে শ্রীবৎস খণ্ডাশাল দেউলের রত্নসিংহাসন থেকে চিলিকার মধ্যে হিন্তালবনের এই কান্তারে মাঝধরা ডিঙিতে বয়ে নিয়ে আসার জন্য রামচন্দ্রদেব মনে মনে অনুতপ্ত হচ্ছিলেন।

বরং তিনি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের উপরে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিতই হতেন, রাজা আমিনচাঁদের প্রাধান্যই না-হয় শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হ'ত; কিন্তু সেইজন্য জগন্নাথকে ক্রীড়াপুত্তলীর মত এখানে নিয়ে আসা ঘোর অপকর্ম ব'লে মনে হচ্ছিল তাঁর। 'সান পরিছা'র সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে যে প্রকার তঞ্চকতার সাহায্যে তিনি জগন্নাথকে পতিত-পাবন করিয়েছিলেন সে-সব ভাবতে গেলে রামচন্দ্রদেবের অনুতাপ

আরো গভীর ও দুর্বিষহ হয়ে উঠছিল।

কিন্তু জগন্নাথ যে ওড়িয়া জাতির অপরাজেয়তার প্রতীক। তুচ্ছ নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় সেই জগন্নাথকে তিনি এক দল মানবদ্রোহীর হাতে লাঞ্ছিত হ'তে দিতেন কেমন ক'রে?

কিন্তু তিনি নিজে কি?

ধর্মদ্রোহী হাফিজ্ কাদর্ না জগন্নাথের রাজসেবক রামচন্দ্রদেব?

ইতিহাসে হয়তো তিনি লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবেন দুর্বলমনা ধর্মদ্রোহী জগন্নাথদ্রোহী রূপে, কিন্তু ইতিহাসের ঊর্ধ্বে যে অন্তর্যামী আছেন তিনিই কেবল বুঝবেন রামচন্দ্রদেবের আত্মসংঘর্ষ, তাঁর সংকট, গ্লানি, অন্তর্দাহ।

'দইতা'রা আপনাদের মধ্যে অনুচ্চ কণ্ঠে তর্ক করছিলেন— এখন বিগ্রহদের অঙ্গ হতে এই ধূলিকর্দমলিপ্ত বস্ত্র ও উত্তরীয় উন্মোচনের পর পরাবেন কী? অথচ ধুয়ে সে-সবের মলিনতা ক্ষালন না করলেও তো চলে না।

লক্ষ্মী পরমগুরু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "আর দাঁড়িয়ে দেখ কি মহাপাত্র? ওড়িয়া জাতির মত জগন্নাথও আজ বনবাসে। মন্দিরে থাকলে 'মইলম লাগি' হয়ে এতক্ষণে গোপালবল্লভ ভোগ হবার কথা 'তড়প'(-অ) উত্তরীয় সব খুলে ফেল।"

একজন 'দইতা' বললেন, " 'তড়প' ধুয়ে শুখানো পর্যন্ত ঠাকুর কি লেংটা হয়ে থাকবেন?"

অট্টহাস্য ক'রে লক্ষ্মী পরমগুরু বললেন, "ওহে মহাপাত্র, সমুদ্র তাঁর 'তড়প'(-অ), পবন তাঁর উত্তরীয়, গগন তাঁর 'খণ্ডুআ'। নাও নাও, আর কথা কাটাকাটি না ক'রে শীঘ্র শীঘ্র নীতি সমাধা কর।"

একজন 'দইতা' বেদীর উপরে উঠে বিগ্রহদের দেহ থেকে মালা

চূড়া বস্ত্র উত্তরীয় সমস্ত একটি একটি করে খুলে অন্য 'দইতা'র হাতে দিতে লাগলেন।

নিরাবরণ বিগ্রহগুলি বিশ্বের উলঙ্গ আত্মার মত উদ্‌ভাসিত হ'ল। সেবকেরা বিমূঢ় স্তব্ধতায় দাঁড়িয়ে রইলেন। এর পরে কী করবেন তাঁরা ভেবে পাচ্ছিলেন না। ইনি তো পীতাম্বর-পরিহিত নীল-জীমূত রসরাজ জগন্নাথ নন— ইনি যে উলঙ্গ মহাভৈরব।

এব পর 'অবকাশ' 'নীতি' হবার কথা। 'পাণি আপট'রা ঘড়া ঘড়া তীর্থজল আনেন। পিঁড়ি জিভছোলা ও সুবর্ণপাত্র সব ভাণ্ডারের শুআরবড়ুরা এনে ঠাকুরের কাছে রাখেন। খাটুলি-সেবক খাটুলি আনেন। 'দর্পণিআ' দর্পন জোগান। 'অঁলা ঘটুআরী' অঁলা (আমলকী) দেন। 'পশুপালক' চন্দনমুখপখাল(-অ) (মুখ প্রক্ষালনের জন্য চন্দন) জোগান। কর্পূর দেন 'ভাণ্ডার মেকাপ'। পটিআরী আনেন 'মুতুরির'[1] দাঁতন— দন্তধাবনের জন্য।

সব কিছু এখন না-হয় 'নাই হ'ল, তবে জগন্নাথ অন্ততঃ দন্তধাবন, মুখপ্রক্ষালনও কি করবেন না?

জগুনি গিয়েছিল 'মুতুরি'র দাঁতন আর পায় যদি তো ফলমূল আনবে ব'লে— গোপালবল্লভ ভোগের জন্য। সেবকেরা সেই সব সমস্যা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন।

রামচন্দ্রদেব জগন্নাথের উলঙ্গ নিরাভরণ মূর্তির দিকে চেয়ে ভাবছিলেন— কোথায় ললাটে মণিময় তিলকের সে শোভা? কোথায় নবীননীরদসদৃশ সে মেদুর অঙ্গকান্তি? কোথায় অরুণাধরে রহস্য-বিজড়িত মন্দহাস্যের সে চন্দ্রিকা?

জগন্নাথ নিখিল মানবের আত্মার মত সব আড়ম্বর পরিহার ক'রে

1. মুতুরি— কাঁটালতা বিশেষ, দাঁতনের জন্য প্রশস্ত।

এই দুর্গম বন কান্তারে সত্যের অকপটতা ও সংগ্রামের অপরাজেয়তার মধ্যে আজ যেন এক কঠোর উজ্জ্বলতায় প্রতিভাত হয়েছেন।

জগন্নাথ সেই অভিশপ্ত মানবের মত যার সংগ্রামকঠোর জীবনে মুক্তির অন্বেষণের বিরাম নেই, আঁধারের প্রভাত নেই, দুর্গম কান্তার পথের শেষ নেই।

কিন্তু হে মহাবাহু, তুমি তো সেই পথভোলা পথিকের দিশারী, অকূল পারাবারের কাণ্ডারী, জীবনরথের সারথি।

মানুষের জীবন যদি নিঃস্ব, তুমি তবে নিঃস্বতর। জীবন যদি বঞ্চিত, তুমি তবে আরো বঞ্চিত।

রামচন্দ্রদেবের দুই চক্ষু তাঁর অলক্ষিতে কখন এক আবেশে অশ্রু-সজল হয়ে উঠেছিল। আবেগস্পন্দিত অশ্রুধারা তাঁর শীর্ণ মলিন চিবুকের উপরে গড়িয়ে পড়ছিল।

বনের লতাপাতার ভিতর থেকে একটা খস্‌খস্ শব্দ শুনে সকলে চকিত দৃষ্টিতে সেইদিকে চাইলেন। জগুনি একখণ্ড জামগাছের ডাল কাঁধে ফেলে, হাতে 'মুতুরি' লতা আর অনেক বনফুল নিয়ে পরম উল্লাসে ফিরছিল হনুমানের মত। মাথার চুলগুলি তার মুখে চোখে কপালে ঝুলে পড়েছিল। মুখের ভাবে গড় জয় করে ফেরার ভঙ্গী।

জামের ডালটা মাটির উপর ফেলে দিয়ে সে বললে, "এই কালো-জাম ছাড়া এই বনে আর কিছু মিলল না।"

জামের ডালে থোকা থোকা বর্ষাধোয়া কালোজাম। এতে গোপালবল্লভ ভোগ হবে। এতেই জগন্নাথের সকালের 'ধূপ', মধ্যাহ্ন 'ধূপ' মায় বড় শিঙ্গার 'ধূপ' পর্যন্ত ছাপান্ন ভোগ চালাতে হবে।

সেবকেরা দন্তমার্জন স্নান প্রভৃতি 'নীতি' সমাধা ক'রে একটি পাতার দোনায় কালোজামের নৈবেদ্য দেবার জন্য বেদীর নিকটে পূজার

আয়োজন করছিলেন। পঞ্চোপচার পূজায় কালোজাম ভোগ দেবার আগে একজন সেবক মাটির উপরে জলের ছড়া দিচ্ছিলেন।

রামচন্দ্রদেব বেদীর কাছে ঘেঁষে এসেছিলেন বুঝি।

রথের উপরে 'ছেরা পহঁরা' ও রাজবিধি সম্পাদন এক কথা, বেদীর উপরে জগন্নাথের পূজা অন্য কথা। সে সময় তিনি বিগ্রহদের স্পর্শ করবেন কেমন ক'রে? তাঁর যবনত্বের প্রায়শ্চিত্ত তো শেষ হয় নি।

একজন সেবক বললেন, "এবার 'পন্তিভোগ' হবে, আপনি একটু সরে বসুন, ছামু।"

বেত্রাহতের মত রামচন্দ্রদেব সেখান থেকে সরে বসলেন। অভিমানী বালকের মত রুদ্ধ উচ্ছ্বাসে তিনি মনে মনে অনুযোগ করছিলেন—"হে স্বপ্নসম্ভব, কাছে যখন থাক তখনই তুমি থাক সুদূরতম হয়ে। আবার আপন ইচ্ছায় যেদিন ফিরে আস কাছে সেদিন অঞ্জলি শূন্য হয়ে যায়, কেবল অশ্রুতে হয় তোমার নীরাজনা।"

লক্ষ্মী পরমগুরু বনভূমি নিনাদিত ক'রে মন্ত্রপাঠ করছিলেন—

"ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বন সন্তোষধি মধুনক্তং মৃতোৎসখৌ
মধুমানো বনস্পতে মধুমান্ পাথিবো রজঃ
মধুদ্বিরোষ্টিনো পিতা মাধ্বেগাবৌ ভবন্তু নঃ
ওঁ মধু মধু মধু"

যা হোক, জগন্নাথ এখানে অন্ততঃ সাময়িকভাবে নিরাপদ। মালুদের ফৌজদার অথবা আমিনচাঁদ কেউ সহজে এ স্থানের সন্ধান পাবে না।

কিন্তু এর পর তিনি যাবেন কোথায়?

রামচন্দ্রদেব সেখান থেকে সরে এসে চিলিকার ধূসর জলরাশির দিকে চেয়ে সেই প্রশ্নটাই মনে মনে চিন্তা করছিলেন। হিন্তাল বনের ধারে চিলিকার ঢেউয়ে একটি নৌকা উঠছিল পড়ছিল। একটা দুর্ভর বোঝা রামচন্দ্রদেবের মাথা থেকে নেমে গিয়েছিল, কিন্তু স্বস্তির প্রফুল্লতা ছিল না তাঁর।

কিন্তু কোথায় বিশ্রাম ? তিনি যাবেন কোথায় ?

চিলিকার জলরাশি হিন্তাল বনের ধারে ধারে ছল ছল ক'রে উঠছিল। জগুনি তাঁর পিছন পিছন আসছিল। রামচন্দ্রদেব তা লক্ষ্য করেন নি।

জগুনি শুধাল, "কোথায় যাবে ?"

জগুনির দুই কাঁধে দুটো বইঠা। সেও যাবে ব'লে বেরিয়েছে— কোথায় কে জানে।

বৃষ্টিধোয়া হিন্তালবন আর 'শিআলি'র লতাকুঞ্জের ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে রামচন্দ্রদেব মনে মনে ভাবছিলেন, এখানে এই ছায়াঘন শীতল প্রশান্তি— কিন্তু তিনি যে এখানে অপাঙ্‌ক্তেয়, তাঁর জন্য এখানে স্থান কোথায় ? সম্মুখে সংগ্রামের অন্তহীন প্রান্তর।

জলের ধার থেকে একটি 'এবা' পক্ষী ক্লান্ত ডানা নাড়তে নাড়তে উড়ে গেল।

রামচন্দ্রদেব চিলিকার মধ্যে নৌকা ভাসিয়ে দিলেন : কিন্তু কোন্ দিকে ? তা তিনি জানেন না।

জগুনি হিন্তালবনের ধারে ধারে বইঠা চালাতে চালাতে কেবলই শুধায় : "কোথায় যাবে ? কোথায় ?"

সম্মুখে অকূল অথই ধূসর চিলিকা, উপরে নির্মেঘ আকাশ— এক নীল মরুভূমি।

বাংলা অনুবাদে ব্যবহৃত
ওড়িয়া ও অন্যান্য শব্দ বা পদগুচ্ছের তালিকা।

[সমস্ত অকারান্ত শব্দের উচ্চারণও অকারান্ত, যথা— জণাণ (-অ)]

অখণ্ড দীপ— অনির্বাণ দীপ।

অখণ্ড মেকাপ— যে 'মেকাপ'(-অ) বা তত্ত্বাবধায়ক অখণ্ড দীপের তত্ত্বাবধান করেন।

অঙ্ক— যখন যিনি রাজা হন তাঁর সিংহাসনারোহণ থেকে গণিত অব্দ, কিন্তু এই গণনায় 1,6,16,20,26,30 প্রভৃতি সংখ্যাগুলি ডিঙিয়ে যাওয়া হয়।

অচ্যুত— (স্ত্রীসম্ভোগ সত্ত্বে) ব্রহ্মচর্যে স্থির।

অছিণ্ডা পাবচ্ছ— সিঁড়ি বা ধাপের বদলে ঢালু পথ, তাই 'অছিণ্ডা' অর্থাৎ ছেদহীন।

অণসর— স্নানপূর্ণিমা ও নেত্রোৎসব অমাবস্যার মধ্যবর্তী পনেরো দিন কাল, এই সময়ে জগন্নাথ রুদ্ধদ্বারের অন্তরালে থাকেন, যাত্রীদের দর্শন দেন না।

অণসর-তাটি—'অণসর' কালে জগন্নাথ যে 'তাটি' বা টাটির আড়ালে থাকেন।

অতিবড়ী— অতি বড় ; সন্তকবি জগন্নাথ দাশকে শ্রীচৈতন্যের দেওয়া নাম।

অধরপণা ভোগ— ছানা আর কলা চটকানো মিছরির পানা। উলটা রথে যাত্রা ক'রে ফিরে এসে জগন্নাথ শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বার বন্ধ দেখে রথেই থাকেন, তখন একটা তুম্বিতে ক'রে তাঁকে এই পানা দেওয়া হয়, কিন্তু জগন্নাথ তাতে অধরস্পর্শ করা মাত্র তুম্বি প'ড়ে গিয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে যায়।

অপোড়া মাটি— পুরীক্ষেত্র। এখানে শব দাহ করা হ'ত না, স্বর্গদ্বারে নিক্ষিপ্ত হ'ত, জোয়ারের জলে সমুদ্রের গর্ভসাৎ হ'ত।

অমুরা— যবন ['মাদলা পাঞ্জি']।

অর্জন— যাত্রীদের নিকট হ'তে সেবকেরা দক্ষিণা ইত্যাদি হিসাবে যা অর্জন করেন।

অসুআর— অশ্বারোহী।

আজ্ঞামাল ও চিটাউ— স্বয়ং জগন্নাথের আজ্ঞাপত্র।

আপু— আফিম।

আপুড়ি— আফিমখোর।

আম্বকষি— মেয়েদের সইপাতানো নামবিশেষ, অর্থ কচি আম।

উআস—রাজবাটী, প্রাসাদ।

উদিষ্ঠানে— জীবদ্দশায়। ['মাদলা পাঞ্জি']

উপেন্দ্র ভঞ্জ— ওড়িশার অষ্টাদশ শতাব্দীর মহাকবি, স্বকীয়া প্রীতিজনিত আদিরস ও অলোকসামান্য কাব্যালংকারচ্ছটার জন্য প্রসিদ্ধ।

ঋষভ মাস - জ্যৈষ্ঠ মাস, যখন সূর্য ঋষভ বা বৃষ রাশিতে থাকেন।

এরা পক্ষী— সাদা জলচর পাখীবিশেষ।

ওড়িআণী— কোমরের গোটের গহনা, কাঁকালের উপরে পরে।

কদম-রসুল— কটকের সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম পীঠস্থান, সেখানে রসুল বা হজরৎ মোহম্মদের কদম অর্থাৎ পদচিহ্ন আছে এই প্রসিদ্ধি।

কন্ধ— আদিবাসী পার্বতীয় জাতিবিশেষ।

কন্যা— আশ্বিন মাস, যখন সূর্য কন্যা রাশিতে থাকেন।

কলাবলিআ— জগন্নাথ-বলরাম।

কাঁঠাল খেয়ে অন্যের মাথায় আঠা মাখানো— ওড়িয়া প্রবচন। যার মাথায় আঠা সে-ই কাঁঠাল খেয়েছে এমনি প্রতীতি হয়, ফলে প্রকৃত ভক্ষক ধরা পড়ে না।

কাঠি লাগি — ঠাকুরদের দাঁতন জোগানো।

কালবেঠিআ— যারা রথ চালানোর সমস্ত ব্যবস্থা করে ও রথ টানে।

কালীজাঈ— চিলিকার মধ্যে এক দ্বীপে কালীজাঈ ঠাকুরাণীর আস্থান।

কালীগউড়ুণী— কৃষ্ণবর্ণ জলচর পক্ষীবিশেষ। গউড়ুণী অর্থে গোয়ালিনী।

কাহালী— তূরী।

কুড়ুআ— মাটির গভীর পাত্র যাতে মন্দিরের ভোগ পাক হয়।

কুম্ভ— ফাগুন মাস, যখন সূর্য কুম্ভরাশিতে থাকেন।

ক্ষীরোদ্রি পাট— সাদা পাটকাপড়।

খট শেষ লাগি— ঠাকুরের জন্য খাটে শয্যা পাতা।

খণ্ডায়ত— জাতিবিশেষ; শান্তির সময়ে কৃষিকর্ম ও যুদ্ধের সময়ে রাজসেনাদলে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করা এদের জাতিধর্ম, সেইজন্য প্রতি খণ্ডায়তগৃহে খণ্ডা অর্থাৎ খাঁড়ার পূজা হ'ত।

খণ্ডুআ— স্ত্রীলোকের মাথার ওড়ণা।

খপুরি— মন্দিরের মাথার ঢাকনির মত অংশ।

খেই— দৈনিক দেবভোগ থেকে সেবকের প্রাপ্য অংশ।

খোর্ধা— এই উপন্যাসবর্ণিত কালে ওড়িশার উপকূলস্থ এক স্বাধীন রাজ্য; ইদানীন্তনকালে পুরী জেলার অন্যতম মহকুমা।

গউড়ুণী— গোয়ালিনী।

গঞ্জড়— গাঁজাখোর।

গঞ্জেই— গাঁজা।

গড়জাত— প্রাচীন ওড়িশার বিভিন্ন স্ব স্ব প্রধান বনপর্বত-সমাকীর্ণ ছোট ছোট রাজ্য। এগুলির রাজবাটী গড় বা দুর্গের মধ্যে অবস্থিত থাকত। ব্রিটিশ আমলে এগুলি করদ রাজ্যে পরিণত হয়, যেমন— ময়ূরভঞ্জ, কেওনঝর, বলাঙ্গির ইত্যাদি।

গম্ভীরা— একান্তগৃহ, মন্দিরের গর্ভগৃহ।

গম্ভীরি ঘর— 'গম্ভীরা'।

গরাবড়ু— 'গরা' বা ঘড়া যার হেঁপাজতে থাকে।

গম্হা পূর্ণিমা — ঝুলন পূর্ণিমা।

গুণ্ডিচা — জগন্নাথের প্রতিষ্ঠাতা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের রানী যাঁর নামে গুণ্ডিচা মন্দির নির্মিত. জগন্নাথ রথযাত্রা ক'রে সেইখানেই যান, তাই সেই যাত্রার নাম গুণ্ডিচা যাত্রা বা সংক্ষেপে গুণ্ডিচা।

গুহারি— অনুযোগ, নালিশ, প্রার্থনা।

গুহারিআ— যে দেবদর্শনার্থী দেবতার কাছে 'গুহারি' জানাতে আসে।

গোটিপিলা— স্ত্রীবেশে পালাগান ও নৃত্যকারী অল্পবয়স্ক বালক।

গোটিপুঅ — 'গোটিপিলা'।

ঘা বিড়িআ— ছেঁচা 'বিড়িআ' অর্থাৎ চুন খয়ের বাদে শুধু সুপারি লবঙ্গ ও অন্য মশলা সমেত পান।

ঘোষরা— পুরীর জগন্নাথমন্দিরের সিংহদ্বার থেকে 'বড়দাণ্ড' পর্যন্ত ঢালু পথ।

চউঠি — বিবাহের চতুর্থ দিবস যেদিন বরের গৃহে বিশেষ উৎসবকৃত্য পালিত হয়।

চউপাঢী— 'খণ্ডায়ত' আখড়া যেখানে মল্লযুদ্ধ, অসিচালনা, ধনুর্বিদ্যা ও বন্দুক ছোঁড়া এই চার বিদ্যার অনুশীলন হ'ত।

চউবাহা — চার বাহু যার, জগন্নাথ।

চকা অপসর লাগি— রথের উপরে বসার জন্য ঠাকুরদের চক্রাকার বালিশ দেওয়া।

চকাডোলা— যার চোখের 'ডোলা' অর্থাৎ তারা চাকার মত, জগন্নাথ।

চড়ক নলি— বন্দুক।

চণ্ডালুণী— চণ্ডালিনী।

চন্দন অর্গলি— পুরীর জগন্নাথমন্দিরের গর্ভগৃহে ঢোকবার মুখের কাঠের আগড়।

চন্দন মুখপখাল— ঠাকুরদের মুখপ্রক্ষালনের জন্য চন্দন।

চমারুণী— চামারনী।

চহ্‌ল— ছলকানি, আলোড়ন, সাড়া।

চাপ— সুসজ্জিত বড় নৌকা।

চার— রথে ওঠার জন্য চওড়া মই।

চিনরা— পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে যারা মন্দির বেয়ে চূড়ায় মহাদীপ তোলে এবং জগন্নাথের উদ্দেশে ডাক পাড়ে।

চিনা মাল — সরু দানার হার।

চুড়ি-শাঁখা— কাচের চুড়ি ও গালার শাঁখা ওড়িযা সধবা রমণীর আযতির নিদর্শন।

ছত্রিশ-গড়— এই অঞ্চলটি বর্তমান মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত।

ছটিআ— জগন্নাথ মন্দির অথবা রাজবাড়ির প্রতিহারী।

ছান্দ— রাগিণীসংযোগ গেয পদ্য।

ছামু— রাজা ও দেবতাকে সম্বোধন।

ছায়াদেহী— যার দেহের ছাযা পড়ে, নরদেহী।

ছেরা পইঁরা— পুরীর রথযাত্রায় রথ টানার আগে রথের উপরে উঠে সেখানে সুগন্ধী জলের ছড়া দিযে ঝাঁট দেওযা। জগন্নাথের রাজসেবক হিসাবে গজপতি রাজাকে এ কাজ স্বহস্তে করতে হয।

জগতী— উচ্চস্থান, যেমন— চন্দ্রশালা বা চিলেকোঠা, পুকুরের মাঝখানে জল-টুঙ্গি ইত্যাদি।

জণাণ— জগন্নাথের উদ্দেশে রচিত ভক্তিগীতি যাতে ভক্তহৃদয়ের দুঃখ অনুযোগ ও অভিমান জানানো হয়, সেই সূত্রে তাঁর লীলাও বর্ণনা করা হয়।

জিরে ফুটলে নাকে গন্ধ পৌঁছায়— ওড়িযা প্রবচন, অর্থাৎ টনক নড়ে।

জেনামণি— রাজকুমারের পদবী।

জেমা, জেমাদেঈ— রাজকন্যা।

টমক— ডিণ্ডিম, ঢেঁঢরা, ঢাক।

টানা-হেঁচড়া মরার বাড়া— ওড়িয়া প্রবচন।

টাহিআ— শিরোভূষণবিশেষ, রথযাত্রা ইত্যাদি উৎসব উপলক্ষে সোলা ও কেতকী ফুল দিয়ে তৈরি করা হয়।

ঢোলের ভিতরে ইঁদুর— ওড়িয়া প্রবচন, অর্থাৎ বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

তড়প— উৎকৃষ্ট বস্ত্র।

তুলি— বিগ্রহের নীচে বাঁধা গোল গদি, যাতে 'পহণ্ডি'র ফলে বিগ্রহের ক্ষতি না হয়।

তেলুণী — তেলিনী।

দঅণা— দমনক বা নাগদমনক পুষ্প, যা কৃষ্ণ-বলরাম কংসের উদ্যান থেকে চুরি করেছিলেন। ['ওড়িআ ভাষাকোশ']

দণ্ডবতী যাত্রা— যে যাত্রী দণ্ডি খাটতে খাটতে অর্থাৎ সারা পথ দণ্ডবৎ করতে করতে যায় ; একবার দণ্ডবতে মাথা যতদূর পৌঁছায় পরের দণ্ডবৎটি সেইখানে দাঁড়িয়ে আরম্ভ করে। এই রকম ক্রমাগত।

দধিনউতি— ওড়িশার মন্দিরের চূড়ার দধিভাণ্ডের আকৃতিবিশিষ্ট অংশ যার উপরে ত্রিশূল চক্র প্রভৃতি বসানো থাকে।

দাযিকা— যাত্রা ও পালাগানে গীতচ্ছলে উত্তর-প্রত্যুত্তর ; উলটা রথে যাত্রা ক'রে জগন্নাথ ফিরে এলে তাঁকে মন্দিরে ঢুকতে না দিয়ে সিংহদ্বার বন্ধ ক'রে ভিতর থেকে লক্ষ্মীর পক্ষে মাহারীদের জগন্নাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ (দাযীকরণ) ও জগন্নাথের পক্ষে পাণ্ডাদের দ্বারা তার খণ্ডন— সমস্তই গীত ছন্দে।

দেঈ— বড় বোন অথবা সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যাকে সম্বোধন।

দেউলশোধ— মন্দির পরিষ্কার ও শুদ্ধিকরণ।

দেহরী— মন্দিরস্থ দেবদেবীর সেবাকারী নিম্নজাতি বিশেষ।

ধুপ— ভোগ ও তৎকালীন আরতি।

ধোইআ— ওড়িশায় যে-সব অঞ্চল প্রায় প্রতি বৎসরই বন্যায় ধুয়ে যায়; এ-সব অঞ্চলে ফসল ভাল হয়।

ধোবুণী— ধোপানী।

নলি-বাটুলি— বন্দুক ও গুলি।

নাগঅইরি— হলুদ রঙের তীব্রগন্ধযুক্ত ফুলওয়ালা কাঁটাগাছ, গন্ধে সাপ আসে না, এই প্রসিদ্ধি।

নাসি— স্থলভাগের ক্রমসূক্ষ্ম অগ্রভাগ, অন্তরীপ।

নিম্‌কী মাহাল— নিমক মহল, যে মহল থেকে লবণ দরুন রাজস্ব আদায় হয়।

নীতি— মন্দিরের নিত্যকর্তব্য কর্ম।

নীলাদ্রিমহোদয়— অতি প্রাচীন পুথি বিশেষ।

ন্যায়বল— প্রাচীন ওড়িশায় প্রচলিত শতরঞ্জ বা দাবা খেলা, যাতে সূক্ষ্ম ন্যায়বুদ্ধির (logic) দ্বারা বল (forces) চালনা করতে হয়।

পইড়— ডাব।

পঞ্চুক, পঞ্চক— কার্তিক মাসের শুক্লএকাদশী থেকে পূর্ণিমা এই পঞ্চতিথি-সংবলিত পুণ্য পর্বকা৹ ।

পঞ্চুকোশী যাত্রী— স্থানীয় যাত্রী, ক্রোশ পাঁচেকের মধ্যেই যাদের ঘর।

পরি— ক'ড়ে আঙুলের পাশের আঙুল যাতে আংটি পরে; অনামিকা।

পহড় পড়া— ঠাকুরের নিদ্রা যাওয়ার জন্য মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বার বন্ধ হওয়া।

পহড় ভাঙা— মন্দিরের গর্ভগৃহের রুদ্ধদ্বার খোলা।

পহণ্ডি, পহণ্ডি বিজে— অতি ধীর পদক্ষেপ; রথযাত্রার সময়ে বিগ্রহগণকে সিংহাসন থেকে তুলে রথের দিকে যাত্রা করানো, মনে হয় যেন তাঁরা হেলতে দুলতে ধীর দীর্ঘ পদক্ষেপে চলেছেন।

পাচন পাণি— ভাঙবাটা জল; হজমী গুণ আছে তাই 'পাচন'।

পাণ্ডোই— প্রাচীন কালের জুতা।

পাতালী— স্বস্থান ত্যাগ ক'রে অন্যত্র লুক্কায়িত।

পাদুল নাল— দেবতার পাদোদক বা চরণামৃত বাহিরে বয়ে যাবার নালা।

পালিআ— (দিন বিশেষে) যার কাজের পালা থাকে।

পাহাড়া— বস্ত্রবিশেষ, যার উপরে রাজপ্রসাদের থালা সাজানো হয়।

পিণ্ডি— চাতাল, চত্বর ; মঞ্চ বা বেদীর মত উঁচু জায়গা।

পীঢ— মন্দিরের এক-একটি পিড়ির মত অংশ। পীঢ রীতিতে নির্মিত মন্দির দেখলে মনে হয় যেন একটির উপর একটি ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে যাওয়া পিড়ি বসিয়ে মন্দিরটি তৈরি।

পূজা-পণ্ডা নিযোগ— পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে দুইটি বিভিন্ন নিযোগ বা সেবক-সম্প্রদায় আছে : মহাজন নিযোগ ও পূজা-পণ্ডা নিয়োগ।

পেণ্ঠ— গঞ্জ।

পেস্‌কস্‌— মোগল রাজশক্তিকে দেয় কর।

পোখরিআ— দেউলের বাহিরে যেখানে চরণামৃত ইত্যাদি গিয়ে পড়ে।

পোড় পিঠা— উপরে আঁচ নীচে আঁচ দিয়ে তৈরি ছানার পিঠে।

পোলাঙ্গ— বৃক্ষবিশেষ, এর ফলের বীজ থেকে প্রদীপ জ্বালানোর তেল হয়।

বউল— মেয়েদের সইপাতানো নামবিশেষ ; অর্থ বকুল ফুল, আমের বউল।

বচনিকা— লক্ষ্মীর হয়ে মাহারীদের জগন্নাথের প্রতি বচনবাণ।

বড় দাণ্ড— পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রশস্ত স্থান ও রাজপথ যেখান দিয়ে রথযাত্রার সময়ে জগন্নাথের রথ টানা হয়। 'দাণ্ড' অর্থে সদর রাস্তা বা প্রকাশ্য স্থান।

বড় পরিছা— পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দুই প্রধান সেবাধিকারিকের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ। অন্যজন সান(অ) (অর্থাৎ ছোট) পরিছা।

বড় শিঙ্গার— জগন্নাথের শয়নের পূর্বেকার শৃঙ্গার বা বেশভূষা ও বিলাস-সজ্জা ধারণ।

বন্ধকাব্য— দেহাশ্রিত আদিরসাত্মক কাব্য যার মুখ্য বিষয় শৃঙ্গারবন্ধ অর্থাৎ রতিকালে স্ত্রীপুরুষের বিভিন্ন প্রকার অঙ্গসংস্থান।

বলিআরভুজ - জগন্নাথ ; বলিআর অর্থে বলীয়ান্।

বলিতা যোগাণিআ— যে প্রদীপের পলিতার জোগান দেয়।

বসণি— পানপাতার আকৃতির নাকছাবি।

বাইডঙ্ক— আলকুশী ; এর বিচি গায়ে লাগলে গা অত্যন্ত জ্বালা করে।

বাইশ পাহাচ— বাইশ ধাপ বা পইঠা। পুরীর জগন্নাথমন্দিরের সিংহদ্বার পার হবার পর বাইশটি 'পাহাচ' বা পইঠা ভেঙে মন্দিরে উঠতে হয়।

বাটী— জমির সর্বাপেক্ষা বড় মাপ, প্রায় কুড়ি একর।

বাড়— মন্দিরগাত্র যতদূর পর্যন্ত খাড়া হয়ে উপরে ওঠে ততদূর পর্যন্ত অংশকে 'বাড়' বলে।

বানা— নিশান।

বারবাটী—কটক শহরের ইতিহাস প্রসিদ্ধ দুর্গ।

বাল— চুল।

বাহুড়া— উলটারথ।

বিজয— রাজা বা দেবতার গমন।

বিজে—'বিজয়'।

বিজে কাহালী— দেবতা অথবা রাজা 'বিজে' অর্থাৎ যাত্রা করার সময়ে যে তুরী বা বড় ভেঁপু বাজানো হয়, trumpet।

বিড়িআ লাগি— ঠাকুরকে 'িড়িআ' দেওয়া ; 'বিড়িআ' অর্থে চুন-খয়ের বর্জিত পান, সঙ্গে কেবল সুপারি লবঙ্গ ও অন্য মশলা থাকে।

বিরুদ— গদ্যে পদ্যে মেশানো স্তুতিবাক্য।

বিল— ক্ষেত।

বীর কাহালী— তুরী।

বেইপো— পুরী অঞ্চলের অশিষ্ট গালি বিশেষ।

বেঢ়া— চতুর্দিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত সমুদায় চৌহদ্দি।

বেনি— দুই।

বেহেরাণী— বেহেরা (পালকী ইত্যাদি বাহক) রমণী।

ভউঁরি— চন্দনযাত্রার শেষ দিনে ঠাকুরকে নৌকায় নিয়ে মণ্ডলাকারে জল-বিহার।

ভণা— পুরী অঞ্চলের অশিষ্ট সম্বোধন ; অর্থ— ভানকারী নেকা।

ভণ্ড গণপতি— উৎকলরাজ পুরুষোত্তমদেব কাঞ্চির রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে তাঁর গণপতি বিগ্রহকে নিয়ে এসে স্থাপন করেন, তিনিই ভণ্ড গণপতি বলে খ্যাত।

ভরণ— শস্যের বড় মাপ বিশেষ ; 40 গৌণীতে (এক 'গৌণী' একটি বড় হাঁড়ি) 1 ভরণ হয়।

ভাই— অগ্রজ ও অগ্রজপ্রতিমকে সম্বোধন।

ভাগবত ঘর— গ্রামের যে বারোয়ারী ঘরে ভাগবত পাঠ এবং অন্যান্য সর্ব-সাধারণ ক্রিয়ানুষ্ঠান হয়।

ভিতর ছো— পুরীর জগন্নাথমন্দিরের সেবাধিকারিক বিশেষ।

ভোই— প্রাচীনকালে, গ্রামের শাসনভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী।

ম— ওড়িয়া সম্বোধনসূচক কথার মাত্রা, বাংলায় যেমন গো।

মইলম লাগি— ঠাকুরের বেশভূষা পরিধান করানো।

মণিমা— প্রভু : রাজা রানী বা দেবতাকে সম্বোধন।

মণোহি— (দেবতা কর্তৃক) ভোগ-উপচার গ্রহণ।

মলাঙ্গী— যারা চিলিকার তীরের লবণের কেয়ারি থেকে লবণ নিয়ে নৌকায় চাপিয়ে কারবারীদের কাছে নিয়ে যেত।

মহাজন— প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতা।

মহাজন নিযোগ ও পূজা-পণ্ডা নিযোগ— পুরীর জগন্নাথমন্দিরের দুই বিভিন্ন নিযোগ অর্থাৎ সেবক-সম্প্রদায়।

মহাদেঈ— মহাদেবী, পট্টমহিষীর পদবী।

মহুরী— সানাই।

মাজণা মণ্ডপ— লক্ষ্মীর গাত্রমার্জনা বা স্নানের জন্য মণ্ডপ।

মাদলা পাঞ্জি— পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের তালপাতায় পঞ্জী বা রোজনামচা ; এতে শ্রীক্ষেত্র তথা উৎকলের ইতিহাসের সঙ্গে নানা জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীও লিপিবদ্ধ আছে।

মালিকা— পদ্যছন্দে লেখা ভবিষ্যদ্‌বাণীসংবলিত পুথি।

মালুণী— মালিনী।

মাহারী— পুরীর জগন্নাথমন্দিরের দেবদাসী।

মুগুনি পাথর— সবুজ আভাযুক্ত একপ্রকার কালো ভারী অতি কঠিন ও মসৃণ পাথর যা থেকে দেবমূর্তি খোদাই করা হয়।

মুতুরি— কবিরাজী গুণবিশিষ্ট কাঁটালতা বিশেষ, দাঁতনের জন্য ব্যবহৃত।

মেকাপ— মন্দিরের নানা তত্ত্বাবধায়কের এক জন।

মেঘনাদ পাচেরি— মন্দির রাজবাড়ি বা গড়ের চৌহদ্দির সুউচ্চ প্রাচীর।

মেরদা রোষ— মৃত্তিকানির্মিত অস্থায়ী রসুইশাল।

মেলি— বহু লোকের জোট, বিদ্রোহ।

মেলিআ— বিদ্রোহী।

মোগলবন্দি— ওড়িশার মোগলশাসিত অঞ্চল।

যাবচ্চন্দ্রার্কে— যতদিন চন্দ্র সূর্য থাকবে, যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।

রজ সংক্রান্তি— জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংক্রান্তি ; আষাঢের প্রথম তিন দিন যাবৎ রজ পর্ব পালিত হয়, বসুন্ধরা ঋতুমতী এই বিশ্বাসে ভূমিকর্ষণ স্থগিত থাকে।

রাউত— যুদ্ধবৃত্তিধারী প্রজা।

রাজনীতি— যে 'নীতি' বা মন্দিরসংক্রান্ত কর্ম স্বয়ং রাজাকে সম্পন্ন করতে হয়।

রাণীহংসপুর— রাজান্তঃপুরে রানীদের মহল।

রাবা— বড় ঢাক।

রুন্ধা— রথযাত্রার সময় রথের উপরে বিগ্রহগণের নড়ন-চড়ন রোধ করবার জন্য রথের সঙ্গে শক্ত ক'রে বাঁধা।

রোষ ধর— রসুই ঘর, রন্ধনশালা।

লাগুতিগহণ— যারা রাজা বা রানীর সর্বদা কাছে লেগে থাকে, অনুচর পরিচর প্রভৃতি।

লুহারুণী— লোহারনী।

লোটণি জুড়া— শিথিল কবরী, এলো খোঁপা।

শউরুণী— শবরী।

শকুনি— বাহিরে মিত্র, অন্তরে শত্রু। শকুনির পিতামাতা ও ভ্রাতাদের দুর্যোধন নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন বলে তাঁর উপর প্রতিহিংসাসাধনই শকুনির গুপ্ত ও প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, ওড়িশায় এমনি প্রসিদ্ধি আছে।

শরণপঞ্জর— যিনি শরণে পঞ্জর বা পিঞ্জর স্বরূপ। অর্থাৎ পিঞ্জর যেমন পাখীর নিরাপদ আশ্রয় তেমনি যাঁর শরণ নিলে সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়া যায়।

শরধা-বালি— জগন্নাথের রথ যাবার 'বড় দাণ্ডে'র ধুলা যা লোকে বড়ই শরধা' ক'রে (ভালবেসে) অঙ্গে মাখে।

শাসন— ব্রাহ্মণদিগকে রাজা কর্তৃক সনন্দ দ্বারা প্রদত্ত নিষ্কর ভূমিসংবলিত গ্রাম।

শিআলি— ওড়িশার বনপর্বতের স্বচ্ছন্দজাত লতাবিশেষ, আদিবাসীরা তা দড়ির মত ব্যবহার করে, বড় বড় পাতা জুড়ে খাবার পাত বানায়।

শিঙ্গার— শৃঙ্গার, ঠাকুরের বেশভূষা ও বিলাসসজ্জা ধারণ।

শুআর— জাতিবিশেষ, এঁরা আদি থেকে পরম্পরাক্রমে জগন্নাথ মন্দিরে পাচকের কাজ ও অন্যান্য সেবা ক'রে আসছেন।

শ্রীনবর— রাজবাটী।

শ্রীবৎস খণ্ডাশাল— পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের বিশেষ নাম।

সঙ্খুডি— উচ্ছিষ্ট, সকডি।

সন্তক— অভিজ্ঞান, নিদর্শন।

সমুদী— বৈবাহিক ; বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে পরস্পরের সম্বোধন।

সম্পুট— ফুলের তোড়া।

সর— দুধের সর ; বাপ-মা অনেক সময়ে আদর ক'রে মেয়ের এই নাম রাখে।

সাম্রান্ত— 'সামন্ত'র কথ্য রূপ।

সাধব— সাগরপারে বাণিজ্যযাত্রাকারী ওড়িশার সওদাগড়।

সাধব-বহু— ইন্দ্রগোপ কীট বা মখমলী পোকা। এর গা লাল মখমলের মত সুন্দর ও কোমল, যেন 'সাধবে'র (সওদাগরের) ঘরের বউ।

সান পরিছা— পুরীর জগন্নাথমন্দিরের প্রধান আধিকারিক দুই জন: বড় পরিছা ও সান(-অ) (অর্থাৎ ছোট) পরিছা।

সিওযানবিশ— সংবাদ-সংগ্রাহক চর।

সিংহার— শৃঙ্গার, ঠাকুরের বেশভূষা ও বিলাসসজ্জা ধারণ।

সুনা— সোনা।

সুনিআ— ভাদ্রমাসের শুক্লদ্বাদশী, এই তিথি থেকে নূতন ওড়িয়া সন গণনা করা হয়।

সোনার বাড়ন কালো কাঠ হযেছে— ওড়িযা মেযেলী বাক্‌রীতি, অর্থ সোনার প্রতিমা রূপ কালী হযে গেছে।

হুডপ— পান ও মশলার বাটা।

হুদা— পদবীসূচক ধাতুপট্ট, যেমন— তকমা।

হেঁস— বেনা ইত্যাদি তৃণ'নর্মিত পুরু পাটি।

———